বিশ্বভারতী পত্রিকা

সম্পাদক শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

শ্রাবণ ১৩৪৯ — পৌষ ১৩৪৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ ১৩৪৯

বিষয়সূচী

ভূমিকা	- প্রমথ চৌধুরী	১
ব্রতের দীক্ষা	- ক্ষিতিমোহন সেন	৪
শেষ পুরস্কার	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১২
অপ্রকাশিত কবিতা	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৪
মাসিমা	- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৭
পত্রাবলী	- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৮
	- হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩০
কলিকাতার পুনর্দর্শন	- প্রমথ চৌধুরী	৩৭
আর্টপ্রসঙ্গ	- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪২
চারযুগ আগে	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৮
বীরবলী ভাষাশিল্প	- নবেন্দু বসু	৫৪
সঞ্চয়ন		৫৮

চিত্রসূচী

রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি [১৯৩৫]	- হাসেগাওয়া-গৃহীত
চিত্র [পেন্সিল স্কেচ]	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্র [ওয়াশ ড্রয়িং]	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগামী সংখ্যার লেখক—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতিমা দেবী, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, প্রবোধ সেন, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি।

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিখণ্ডে কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, উপন্যাস ও গল্প এবং প্রবন্ধ, এই চারিটি ভাগ আছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে প্রতিখণ্ড সমৃদ্ধ। এ-পর্যন্ত প্রচলিত রচনার সংগ্রহ এগারো খণ্ড ও অপ্রচলিত রচনার সংগ্রহ দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আনুমানিক পঁচিশ খণ্ডে সমগ্র রচনাবলী সমাপ্ত হইবে।

প্রতি খণ্ডের মূল্য

কাগজের মলাট	··	৪॥৽
রেক্সিনে বাঁধাই	···	৫৸৹
রেক্সিনে বাঁধাই, মোটা কাগজে ছাপা	···	৬৸৽
বিশিষ্ট সংস্করণ, চামড়ার বাঁধাই	···	৮॥৹

গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলে নূতন খণ্ড প্রকাশিত হইলেই জানানো হয়, বা ভি. পি.তে পাঠানো হয়।

রবীন্দ্রনাথের যে-সকল রচনা এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; যে-সকল রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই; যে-সকল রচনা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) ও কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) প্রথম প্রকাশিত হয় কিন্তু পরে আর কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই; যে-সকল গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য এবং যে-সকল গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে;—সবই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইবে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

ভাদ্র ১৩৪৯

বিষয়সূচী

বিশ্বভারতী বিদ্যায়তন	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬৫
শিল্পপ্রসঙ্গ	- নন্দলাল বসু	৭১
অহিংসা ও রাজনীতি	- প্রবোধচন্দ্র সেন	৭৩
পত্রাবলী	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৬
রবীন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি	- ইন্দিরা দেবী	৯২
মাসিমা	- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৯৩
স্বাজাতিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা	- বুদ্ধদেব বসু	১০৫
গুরুদেবের ছবি	- প্রতিমা দেবী	১১৬
আজকাল	- প্রমথ চৌধুরী	১২৭

চিত্রসূচী

চিত্র [কালীর]	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
চিত্র [রঙ্গিন]	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বরলিপি	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের যে-সকল কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা এখনো কোনো গ্রন্থে বা সাময়িকপত্রে মুদ্রিত হয় নাই, এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে সেগুলি প্রকাশিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেশে এখন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতেছে, এবং সর্বত্র এই আলোচনার সূত্রপাতও হইয়াছে। আলোচনার সেই ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিল্পকল্পনার ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষার প্রাণবান প্রয়াস সজাগ ও সক্রিয়, এই পত্রিকার দ্বারা তাহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ হইবে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন।

সম্পাদক
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পরিচালকবর্গ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

আশ্বিন ১৩৪৯

বিষয়সূচী

প্রাচীন কালের জাতিভেদ	- ক্ষিতিমোহন সেন	১৩১
ডাকঘর	- আশামুকুল দাস	১৫০
বস্তুর চেয়ে বাস্তব	- ভবানীশঙ্কর চৌধুরী	১৫৪
আধুনিক পাঠ্য	- বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৫৯
পত্রাবলী	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৫
রামমোহন রায়	- প্রমথ চৌধুরী	১৭৩
স্বরলিপি	- শৈলজারঞ্জন মজুমদার	১৭৬
শ্রদ্ধাঞ্জলি	- প্রমথ চৌধুরী	১৭৮
সঞ্চয়ন		১৮০

রবীন্দ্র-প্রতিভা
আর্টের একটা দিক
কিপলিংয়ানা
জাতিতত্ত্ব
সত্যং ব্রুয়াৎ

চিত্রসূচী

মুয়েজ্জিন (ওমর খৈয়াম)	- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রাজা (তপতী)	- অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
নাট্যচিত্র (ডাকঘর)	

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র বাংলা রচনা একত্র সংগৃহীত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রকাশিত হইতেছে। প্রতিখণ্ডে কবিতা ও গান, নাটক ও প্রহসন, উপন্যাস ও গল্প এবং প্রবন্ধ, এই চারিটি ভাগ আছে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের প্রতিকৃতি ও বিভিন্ন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিতে প্রতিখণ্ড সমৃদ্ধ। এ-পর্যন্ত প্রচলিত রচনার সংগ্রহ এগারো খণ্ড ও অপ্রচলিত রচনার সংগ্রহ দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। আনুমানিক পঁচিশ খণ্ডে সমগ্র রচনাবলী সমাপ্ত হইবে।

প্রতি খণ্ডের মূল্য

কাগজের মলাট	...	৪॥০
রেক্সিনে বাঁধাই	...	৫৸০
রেক্সিনে বাঁধাই, মোটা কাগজে ছাপা	...	৬৸০
বিশিষ্ট সংস্করণ, চামড়ার বাঁধাই	...	৮॥০

গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলে নূতন খণ্ড প্রকাশিত হইলেই জানানো হয়, বা ভি. পি.তে পাঠানো হয়।

রবীন্দ্রনাথের যে-সকল রচনা এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; যে-সকল রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয় নাই; যে-সকল রচনা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য কাব্যগ্রন্থাবলীতে (১৩০৩) ও কাব্যগ্রন্থে (১৩১০) প্রথম প্রকাশিত হয় কিন্তু পরে আর কোনো গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয় নাই; যে-সকল গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য এবং যে-সকল গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে;—সবই রবীন্দ্র-রচনাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইবে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

কার্ত্তিক ১৩৪৯

বিষয়সূচী

ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ	-প্রবোধচন্দ্র সেন	১৯১
রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়	-বিমলচন্দ্র সিংহ	২০৫
পত্রাবলী	-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -মোহিতচন্দ্র সেন	২২২
সোনার গাছ, হীরের ফুল	-প্রমথ চৌধুরী	২২৬
বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত	-ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী	২৩৫
বাংলা ছন্দের মাত্রা	-রাজশেখর বসু	২৪৫
সঞ্চয়ন		২৫৯

চিত্রসূচী

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত 'নিজের ছবি'

২. রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র—আলোক চিত্র (সম্ভবতঃ ১৯১১ সালে গৃহীত)

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

আগামী সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় শান্তিনিকেতনের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হবে। সেখানি শান্তিনিকেতন সংখ্যা রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেশে এখন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতেছে, এবং সর্বত্র এই আলোচনার সূত্রপাতও হইয়াছে। আলোচনার সেই ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিল্পকল্পনার ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষার প্রাণবান প্রয়াস সজাগ ও সক্রিয়, এই পত্রিকার দ্বারা তাহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ হইবে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন।

সম্পাদক	সহকারী সম্পাদক
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পরিচালকবর্গ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীনন্দলাল বসু	শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

অগ্রহায়ণ ১৩৪৭

বিষয়সূচী

সম্পাদকের মন্তব্য	-প্রমথ চৌধুরী	২৬৩
শান্তিনিকেতন	-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৬৪
আমাদের শান্তিনিকেতন	-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭২
পত্রাবলী ও অভিভাষণ	-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭৫
"আমাদের শান্তিনিকেতন"		৩৪১
স্বরলিপি	-শৈলজারঞ্জন মজুমদার	৩৪২

চিত্রসূচী

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেশে এখন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতেছে, এবং সর্বত্র এই আলোচনার সূত্রপাতও হইয়াছে। আলোচনার সেই ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিল্পকল্পনার ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষার প্রাণবান প্রয়াস সজাগ ও সক্রিয়, এই পত্রিকার দ্বারা তাহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ হইবে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন।

সম্পাদক	**সহকারী সম্পাদক**
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পরিচালকবর্গ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীনন্দলাল বসু	শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

পৌষ ১৩৪৯

বিষয়সূচী

দশকরণের বানপ্রস্থ	- শ্রীরাজশেখর বসু	৩৪৫
প্রাচীন-ভারতে সাহিত্য-সমালোচনা	- শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৩৫৫
পত্রাবলী	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৭৩
সৃষ্টি ও সমালোচনা	- শ্রীনবেন্দু বসু	৩৭৬
ইস্‌লামিক সভ্যতার আদি যুগ	- শ্রীবিক্রমজিৎ হসরৎ	৩৮৫
সীতাপতি রায়	- শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	৩৯০
স্বরলিপি	- শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী	৪০১
সঞ্চয়ন	- বাণীকান্ত	৪০৩

প্রতিসংখ্যার মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

সংস্কৃতি ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে-সকল মনীষী নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন শান্তিনিকেতনে তাঁহাদের আসন রচনা করাই বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যসাধনের অন্যতম উপায়রূপে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত হইল। শান্তিনিকেতনে বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে যাঁহারা গবেষণা করিতেছেন এবং শিল্পসৃষ্টিকার্যে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন, শান্তিনিকেতনের বাহিরেও বিভিন্ন স্থানে যে-সকল জ্ঞানব্রতী সেই একই লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই শ্রেষ্ঠ রচনা এই পত্রে একত্র সমাহৃত হইবে।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গভীর ও বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেশে এখন বিশেষ-ভাবে অনুভূত হইতেছে, এবং সর্বত্র এই আলোচনার সূত্রপাতও হইয়াছে। আলোচনার সেই ব্যাপক প্রচেষ্টার সহিত যোগসূত্র স্থাপন করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশে শিল্পকল্পনার ক্ষেত্রে যে-পরীক্ষার প্রাণবান প্রয়াস সজাগ ও সক্রিয়, এই পত্রিকার দ্বারা তাহার আত্মপ্রকাশের সুযোগ হইবে, পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এই আশা পোষণ করেন।

সম্পাদক
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

পরিচালকবর্গ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন
শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীনন্দলাল বসু
শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বিশ্বভারতী পত্রিকা

শ্রাবণ ১৩৪৯

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৪৯

ভূমিকা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আজ ৭ই অগষ্ট, আমার জন্মদিন ও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুদিন। এ দিনে যে আমাকে একটি নূতন পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে, তার কারণ বোধহয় বহুপূর্বে ১৩২১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে ২৫শে বৈশাখে আমি "সবুজপত্র" নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করি।

সে পত্রের গোড়াতেই আমি লিখি যে, নতুন কিছু করবার উদ্দেশ্যে এ পত্র প্রকাশিত হচ্ছে না। এ স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও সবুজপত্র ভাবে ও ভাষায় একখানি অপূর্ব নতুন পত্র বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

সেকালে আমি ছিলুম সাহিত্যক্ষেত্রে একজন অজ্ঞাতকুলশীল লেখক। অবশ্য সবুজপত্র প্রকাশ করবার পূর্বে আমি স্বনামে ও বিনামে কিছু কিছু গদ্যপদ্য লিখেছিলুম। আমার সেই সব লেখা পড়ে রবীন্দ্রনাথ আমার হস্তে সবুজপত্র-সম্পাদনার ভার ন্যস্ত করেন। আমি সে দায়িত্ব প্রসন্ন মনে গ্রহণ করি। কেননা রবীন্দ্রনাথ আমাকে ভরসা দেন যে, তিনি তাঁর গদ্যপদ্য রচনা সব সবুজপত্রে প্রকাশিত করবেন।

এ স্থলে আমি উক্ত পত্রের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। বহু লেখক সবুজপত্রের নূতনত্বের বিরোধী হয়ে ওঠেন। তার কারণ আমি মামুলী ধরনের লেখা লিখতুম না। অর্থাৎ ছোট বড়ো মাঝারি সেকালের লেখকদের পদানুসরণ করিনি। ভঙ্গীতে ও ভাষায় প্রচলিত পথ ছেড়ে স্বকীয় পথ ধরেছিলুম। অপর লেখকদের মতে এটি একটি মহা অপরাধ। আমি বিরুদ্ধ সমালোচনায় বিচলিত হইনি। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ আমার নিজ ভাষায় নিজ মত প্রকাশ করতে আমাকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। এ ছাড়া সবুজপত্র সম্বন্ধে আমার আর কোনো সম্পাদকীয় কৃতিত্ব ছিল না। রবীন্দ্রনাথই তাঁর কবিতা গল্প ও প্রবন্ধে ও-পত্রপুট পূর্ণ করে রাখতেন। সবুজপত্র যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় উদ্ভাসিত ছিল ব'লে।

রবীন্দ্রনাথ এখন নেই। কিন্তু শান্তিনিকেতন এখনো আছে। শান্তি-নিকেতন একটি চিত্তাকর্ষক idea। এ idea-র জন্ম রবীন্দ্রনাথের মনে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে এ idea দেহধারণ করেছে। বীরবল বহুকাল পূর্বে লিখে-ছিলেন যে, আমাদের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের চর্চা যথেষ্ট স্থান লাভ করেছে। প্রমাণ, শান্তিনিকেতনের সংগীতভবন ও কলাভবন। সংগীতের চর্চা ও চিত্রকলার চর্চা যে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার প্রধান অঙ্গ, সে জ্ঞান রবীন্দ্রনাথের ছিল।

শিক্ষায় সংগীতের চর্চা যে নিতান্ত আবশ্যক, সে ধারণা আজকাল ইউরোপের শিক্ষাচার্যদের মনকে অধিকার করেছে। কিন্তু গ্রীসে এবং ভারতবর্ষে পুরাকালেও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সংগীতচর্চার রেওয়াজ ছিল। তার প্রমাণ প্রায় সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। এবং সংগীতের চর্চা যে পাণ্ডিত্যের বিরোধী ছিল না, তা বাণভট্টের একটি কথায় বোঝা যায়। তিনি যে স্থলে নিজের পূর্বপুরুষের গুণগ্রামের পরিচয় দিয়েছেন, সেখানে বলেছেন যে তাঁরা সকলেই বেদ অভ্যাস করতেন, ও নানাপ্রকার শাস্ত্রের আলোচনা করতেন; তা হলেও তাঁরা সংগীত ও কলাবিদ্যার বাহ্য ছিলেন না। সেকালের মহিলারা যে চিত্রাঙ্কণ করতেন, তার পরিচয়ও সংস্কৃত

সাহিত্যে ছড়ানো রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মন ছিল একসঙ্গে অতি নূতন ও পুরাতনের আধার। আমরা আজকাল যাকে culture বলি, তা নানারূপ আর্টের সমবায়। আর এই culture-ই হচ্ছে মানব-সভ্যতার প্রাণ।

কাব্যে রবীন্দ্রনাথের দান অপূর্ব। তাঁর ভাষার ঐশ্বর্য অতুলনীয়। তিনি বাঙালী জাতের মুখে ভাষা দিয়েছেন। আর আর্টের চর্চা কাব্যেরও কান্তিপুষ্ট করে। শান্তিনিকেতনের মুক্তির বাণী যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁদের লেখায় যে রবীন্দ্রনাথের spirit অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হবে, এ আশা আমি করি।

কোন্ কাগজ কী রকম দাঁড়াবে, তা আগে থেকে বলা যায় না। বিশেষতঃ আজকের দিনে, যখন সকলেরই ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আমাদের নবপত্রিকা যে সবুজপত্রের নব সংস্করণ হয়ে উঠবে, তার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গেই সে সম্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ও কর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সবুজপত্রের সুলেখক হয়ে উঠেছিলেন, যথা—শ্রীঅতুল গুপ্ত, ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি। আশা করি তাঁদের সহায়তায় আমি এবারও বঞ্চিত হব না এবং নবীন লেখকরাও আমাদের দলপুষ্টি করবেন। যদিচ দিন-কাল এমনি পড়েছে যে, সাহিত্যরচনায় লোকের তেমন প্রবৃত্তি নেই, সুযোগও নেই।

আজকের দিনে আমরা সকলেই ত্রস্ত ও ব্যস্ত। তবু আজও আমরা সাহিত্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পারিনি, এই পত্রিকাই তার প্রমাণ। ঐ পত্রিকার নাম বিশ্বভারতী পত্রিকা। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন হতেই উদ্ভূত। বিশ্বভারতীর ideal যে কী, আমার বন্ধু শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত এই পত্রিকাতেই আগামী সংখ্যায় তার ব্যাখ্যা করবেন। এই অশান্তির দিনে আমরা সকলেই বিশ্বশান্তির জন্য লালায়িত। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে বিশ্ব-culture ব্যাপ্ত হবার কোনো অবসর পাবে না। আর এই বিশ্ব-culture-ই বিশ্বশান্তি আনয়ন করবে।

ব্রতের দীক্ষা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বিরাট পুরুষের বিষয়ে যে সূক্তটি (৯০তম) রহিয়াছে, তাহা নানা দিক দিয়া অপূর্ব। তাহাতে আছে, সেই বিরাট পুরুষের সহস্র অর্থাৎ অন্তহীন মস্তক, অন্তহীন চক্ষু, অন্তহীন চরণ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ॥

সমস্ত বিশ্বভুবন ভরিয়াও তিনি। আবার সেইটুকু অধিষ্ঠানভুবন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নয় বলিয়া, তাহা অতিক্রম করিয়াও তিনি। এই বিস্তীর্ণা পৃথিবী কেমন করিয়া সেই বিরাটকে ধারণ করিবে?

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥

সর্বস্থানে এবং সর্বকালে যাহা কিছু আছে, সবই তিনি। সেই পুরুষই কালের মধ্যে সমস্ত অতীতকে এবং সমস্ত ভব্য অর্থাৎ অনাগতকে পূর্ণ করিয়া বিরাজমান।

পুরুষ এবেদং সর্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভব্যম্ ॥

এত বড়ো যে তাঁহার মহিমা, পুরুষ তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ ও বিরাট।

এই তো হইল সেই পরম পুরুষের কথা। জগতের মহাপুরুষরাও ঠিক এই ভাবেরই মানুষ। তাঁহাদের ভাবসম্পদের অন্ত নাই, তাঁহাদের চক্ষু অর্থাৎ দৃষ্টির ও আদর্শের পার নাই, তাঁহাদের চরণ অর্থাৎ সাধনার ও অগ্রগতির কোনো সীমা নাই। ক্ষুদ্র স্থানকালের অতীত তাঁহাদের উপলব্ধি ও সাধনা নিত্যকালের অসীম সম্পদ। তাই তাঁহাদের মৃত্যু নাই। যদিও তাঁহাদের স্থূল কায়ার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে, তবু তাঁহাদের চিন্ময় বিরাট স্বরূপের অবসান নাই। তাই ভক্তরা মহাগুরুদের মৃত্যু মানেন না। সর্বত্র ভক্তরা নিত্যকালই মহাপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাব-উৎসব করেন।

আমরা সাধারণ জীব, স্থান ও কালের দ্বারা আমরা সীমাবদ্ধ ও নিয়মিত। আমরা সব সময় এই মহাসত্য মনে রাখিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মহাপুরুষ, সেই হিসাবে তাঁহার মৃত্যু হইবে কেমন

করিয়া? বিগত ২২শে শ্রাবণ তাঁহার বাহ্যলীলাময় কায়ার তিরোধান মাত্র হইয়াছে, তাঁহার সাধনা ও তপস্যার অন্ত হইয়াছে কোথায়? তিনি নিত্য-কালের মহাকবি। এই জন্যই ঋষিরা যে বলেন, তাহা পরম সত্য, কালের না আছে জরা না আছে মৃত্যু, তাহার অনন্ত দৃষ্টি, অনন্ত সম্ভাবনা। অশ্বের মতো সপ্তরশ্মিযুক্ত এই কাল-অশ্ব সদাই চলিয়াছে ছুটিয়া।

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ
সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ॥

দুরন্ত অশ্বের মতো এই কাল সকলকেই লইয়া যায় উড়াইয়া, শুধু মনীষী কবিরাই এই দুরন্ত কাল-অশ্বকে সংযত করিয়া তাহাতে করেন আরোহণ, বিশ্বভুবন সেই কাল-রথেরই চক্র।

তমারোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিতস্
তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা॥

মৃত্যুতে তাঁহাদের অবসান নাই, বরং মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাঁহারা উত্তর-উত্তর নব-নব জীবনে আরও দীপ্যমান মহত্তর জন্মলাভ করেন। তাই তাঁহাদের বলা যাইতে পারে, নব নব ভাবে জন্মিয়া তুমি নিত্য নবীন, দিনের পর দিনকে তুমিই কর প্রকাশ, উষার অগ্রে অগ্রে তোমার জয়যাত্রা।

নবো নবো ভবসি জায়মানো
অহ্নাং কেতু রুষসামেষি অগ্রম্॥

এই সব মহাগুরুদের সাধনা শাশ্বত ও দৃষ্টি অখণ্ডিত। তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন ও পার্থিব কায়া স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ হইলেও তাঁহাদের সত্য ও সাধনা নব নব সাধকের মধ্য দিয়া নিত্যকালের পথে অগ্রসর হইয়া চিরদিন চলে। তাই এক শঙ্করাচার্যের পরে শত শত শঙ্করাচার্য, এক মীরার পরে অসংখ্য মীরা, এক নানকের পরে অনেক নানকের অভ্যুদয়।

বিগত ২২শে শ্রাবণ মহাগুরু রবীন্দ্রনাথ তিরোহিত হইলেও তাঁহার চিন্ময় প্রাণের মৃত্যু হয় নাই। সেই চিন্ময় মহাপ্রাণ ও তাহার মহাসত্য ও সাধনা আজ নিখিল লোকে জানা অজানা অগণিত ভক্ত ও অনুরাগীর মধ্যে

পরিব্যাপ্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। তাঁহাদের মধ্য দিয়া তাহা অনন্তের পথে নিত্যকাল এমন ভাবেই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

রবীন্দ্রনাথ না হয় ছিলেন বিরাট, কিন্তু তাঁহার পরবর্তী ও অনুরাগীদের সকলেরই দৃষ্টি, শক্তি ও সাধনা তো নানা ভাবেই সীমাবদ্ধ। তাঁহার অনুবর্তীরা রবীন্দ্রনাথের সেই জ্বলন্ত সাধনার দৃষ্টি ও শক্তি কোথায় পাইবেন? তাঁহার মতো সর্বস্ব-আহুতি-দেওয়া সাধনা না করিলে কি সেই দৃষ্টিটি সহজে মেলে?

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার যজ্ঞে আপনার জ্বলন্ত উৎসাহের বলে আপন অস্থিগুলি পর্যন্ত সমিধের মতো আহুতি দিয়া স্বীয় সাধনার অগ্নিকে সদা জাগ্রত ও জীবন্ত রাখিয়াছেন—

অস্থি কৃত্বা সমিধম্॥

এই অপূর্ব সাধনার মহিমাতেই বিশ্বের নিগূঢ় সত্য ও শক্তিকে তিনি সর্ব-ভাবে করিয়াছেন আবিষ্কৃত—

আবির্বিশ্বানি কৃণুতে মহিত্বা॥

এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়াও আবার তিনি নিজেরই বিরাট স্বরূপকেও করিয়া গিয়াছেন সকলের কাছে দীপ্যমান—

আবিরাত্মানম্ কৃণুতে॥

এই দৃষ্টি ও এই সাধনা কি যার-তার পক্ষে লাভ করা সম্ভব? মাত্র ২২ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,

নাই তোর নাইরে ভাবনা
এ জগতে কিছুই মরে না।

আবার পরিণত বয়সেও তিনি গাহিয়াছেন,

কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।

ইহাই আমাদের পরম ভরসা। আজ তাঁহার বাহ্য কায়ার অবসান হইলেও তাঁহার অমর সাধনার অবসান তো ঘটে নাই। তাঁহার চিন্ময় প্রাণ এখনও জীবিত। তিনি নিজেও আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন,

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,

… …

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি !
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি।
... ...
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

সেই ভরসাতেই আজ তাঁহার তিরোধানলীলা-তিথিতেই মৃত্যুহীন এই মহাগুরুকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি, আমাদের প্রাণের ভিতর দিয়াই তুমি থাকো বাঁচিয়া, আমাদের মধ্যেই তুমি থাকো জীবন্ত। মৃত্যুর মধ্যেও যেন তোমাকে না আমরা হারাই।

প্রাণেন প্রাণতাং প্রার্ণ ইহৈব ভব মা মৃথাঃ ॥

কিন্তু এত বড়ো মহাপ্রাণকে ধারণ করিবার মতো প্রাণ আমাদের মধ্যে কাহার আছে ? আমাদের একলা কারও এত বড়ো বিরাট প্রাণ নাই যে তাঁহার মতো বিরাট পুরুষকে অধিষ্ঠিত ও জীবন্ত থাকিতে বলিতে পারি। তবে শ্রদ্ধার সহিত সকলে যুক্ত হইয়া তাঁহার মহাব্রতকে যদি এক-এক দিকে কোনো মতে চালাইয়া যাইতে পারি, তবেই তাহা যথেষ্ট। বিনীতভাবে আমরা যেন তাঁহার অনুব্রত হইতে পারি। বিনয়ের সহিত এই কর্তব্য গ্রহণের কথা মহাকবি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন,

কে লইবে মোর কার্য ? কহে সন্ধ্যারবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সাধনার যে কত দিক ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি একাধারে নানা ভাবে বহুধা-বিচিত্র তাঁহার মহাব্রত চমৎকার ভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাহার একটি দিক ছিল সম্পাদকের ব্রত। নানা ক্ষেত্রে নানা সময়ে এই সম্পাদকের ব্রতও তিনি অতি সুচারুভাবে পালন করিয়া গিয়াছেন। ১৩০১ সালে 'সাধনা' পত্রিকার ভার তিনি গ্রহণ করেন।১৩০৫ সালে 'ভারতী'র সম্পাদকত্বের দায়িত্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। ১৩০৮ সালে 'বঙ্গদর্শনে'র নব পর্যায় সম্পাদনের ভার তিনি গ্রহণ করেন। ১৩১২ সালে তিনি হন 'ভাণ্ডারে'র সম্পাদক। ১৩২৬ সালে তিনি এই আশ্রম হইতে 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকার সম্পাদনায় হন প্রবৃত্ত। এই সম্পাদনার

প্রত্যেক ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রতিভা ও মনীষা আপন বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রোচিত বৈচিত্র্যের দ্বারা আপন ব্রতকে অপরূপ ও মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এক্ষণে শুধু তাঁর সম্পাদনার বিশেষত্বের কথাই বলিতেছি, নানা পত্রিকায় তাঁহার যে লেখার বিশেষত্ব তাহার কথা আলোচনার অবসর ইহা নহে। নানা সময়ে নানা পত্রিকায় তিনি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিলেও সেই সাধনার মধ্যেও তাঁহার নিজস্ব একটি অপূর্ব মহিমা ছিল। সেই-সেই পত্রিকাতেও তাঁহার পূর্বে ও তাঁহার পরে সেই বিশিষ্ট মহিমাটি আর দেখা যায় না। তাঁহার সময়ে তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকাগুলিতে যত জনেরই লেখা থাকুক, সর্বত্রই তাঁহার নিজস্ব একটি জ্বলন্ত ও দীপ্ত দৃষ্টি সব যেন আছে পূর্ণ করিয়া। তাঁর 'ভারতী' পূর্বের 'ভারতী' নয়। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' আর এক অভিনব বস্তু। তাঁর 'সাধনা' পত্রিকায় ছিল একটি অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্য। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা যখন তাঁহার হাতে ছিল, তখন তাহারও একটি স্বরূপগত বিশিষ্ট মহিমা ছিল। সেই সময়কার 'শান্তিনিকেতন'গুলি পর পর দেখিয়া গেলেই সেই বিশেষত্বটুকু বেশ বুঝা যায়। একই রবীন্দ্রনাথ নানা পত্রিকায় নানাভাবে অভিনব করিয়া আত্মপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার একটি পত্রিকার বিশেষ স্বরূপকে অন্য পত্রিকার বিশিষ্টতার সঙ্গে কখনই তিনি ঘোলাইয়া তোলেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের অনন্তমুখী সাধনাকে তো আমরা ধারণ করিতেই পারি না, তাঁহার পত্রিকাসম্পাদনের মধ্যেও তাঁর যে মহিমা আছে, আমরা তাহাও ধরিয়া রাখিতে অক্ষম।

তাঁহার শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁহার প্রবর্তিত বিশ্বভারতীর কাজ এখনও চলিতেছে। সেখানে তখন যে সত্যের সাধনা ও প্রকাশের ভার লইয়া তিনি শান্তিনিকেতন পত্রিকা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আজও তাহা চালাইয়া যাইবার প্রয়োজন আছে। সেই আশ্রম ও বিশ্বভারতীর কাজ এখনও চলিতেছে, অথচ এখন আর তাহার প্রকাশ নাই; ইহা বড়ই দুঃখের কথা। তাঁহার প্রবর্তিত ইংরাজী ও হিন্দী বিশ্বভারতী পত্রিকা আজও চলিতেছে, অথচ বাংলা পত্রিকাখানি আজ নাই, বাংলাদেশের পক্ষে কি ইহা কম লজ্জার কথা?

কিন্তু তাঁহার এই সম্পাদনার অনুবৃত্তিভার বহন করিবার মতো সামর্থ্য

আমাদের কোথায়? তাঁহার গাণ্ডীব অন্যের পক্ষে যোজনা করা অসাধ্য। তাই বিনীত ভাবে আমরা প্রার্থনা করি সেই 'শান্তিনিকেতন'-পত্রিকা-গত তাঁহার বিশিষ্টতাই তাঁহার ভক্তিনম্র সেবকদের মধ্য দিয়া আজও যথাসম্ভব এই নবপ্রবর্তিত 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র মধ্যে কাজ করুক।

'শান্তিনিকেতন' পত্রিকাতেও তিনি কোথাও উদ্ধত গর্বিত আত্মপ্রচার করিতে চাহেন নাই, তাঁহার সাধনার সংযত ও সংহত স্বরূপটিই তিনি দীপাবলী উৎসবে ভক্তের প্রদীপের মতো, মানব-সাধনার মহামন্দিরের পাদপীঠতলে ভক্তির সহিত স্থাপনা করিয়াছেন মাত্র। আজও যেন আমরা সেই ভক্তি-বিনম্র ভাব হইতে ভ্রষ্ট না হই।

তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা কোথাও যদি এই উপলক্ষে নিজেকে জাহির করিতে চাই, তবে তাহা নিদারুণ প্রমাদ হইবে। সর্বভাবে আমাদিগকে সাবধান হইয়া দেখিতে হইবে যেন রবীন্দ্রনাথের নিত্যমুক্ত ভাব ও সাধনাই আমাদের মধ্য দিয়া শান্তিনিকেতনের এই নূতন ধারায় নূতন প্রভাবে প্রবাহিত হইয়া চলে। তিনি আমাদের মধ্যে যদি নিত্য জীবন্ত ও জাগ্রত না থাকেন, তবে তাহা হইবে কেমন করিয়া? তাই আমরা অন্তরের সহিত ঋষিদের ভাষায় আজও প্রার্থনা করি, হে বাণীর মহাগুরু, তোমার দিব্য মনটি লইয়া আবার আমাদের মধ্যে তুমি অধিষ্ঠিত হও।

পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ ॥

আমাদের অন্তরের সত্যকে তুমি দীপ্ত করো। আমাদের যথার্থ পরিচয় যে কী তাহা ভালো করিয়া নিজেরাই জানি না বলিয়াই সীমাবদ্ধ মন লইয়া আমরা রহিয়াছি দীপ্তিহীন প্রকাশহীন হইয়া। সেই পরিচয়টি তুমি ফুটাইয়া তোলো—

ন বিজানামি যদিবেদমস্মি
নিণ্যঃ সন্নদ্ধো মনসা চরামি ॥

হে মহাগুরু, আমাদের মধ্যেও যেটুকু শক্তি-সামর্থ্য আছে তাহার পরিচয় তুমি দাও, আমাদের ব্রতের যে মহাদায়িত্ব আছে তাহা তুমি দেখাও। সেই দৃষ্টিটি সে-ই দেখিতে পায় যে-সাধকের চক্ষু আছে। সাধনাহীন অন্ধ তাহা দেখিবে কী প্রকারে?

পশ্যদক্ষন্বান্ ন বিচেতদন্ধঃ ॥

মানবের মধ্যে যে ব্রহ্ম বিরাজিত, তাহা না বুঝিতে পারিলে কেমন করিয়া তোমার ব্রত পালনে অধিকারী হইব? মানবের মধ্যে যেজন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়াছে, সে-ই পরমেষ্ঠিকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপে অধিষ্ঠিত দেখিয়াছে—

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুস্
তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্ ॥

আজ আমরা আমাদের মহাগুরুকে বলিতে চাই, হে গুরু, তোমার ব্রতপালনের জন্যই আমাদিগকে তোমার মহাদীক্ষা দাও। যাহারা অবসন্ন হইয়া তলাইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে নবজাগরণের দীক্ষায় জাগাইয়া তোলো।

উত্থাপয় সীদতো বুধ্ন এনান্ ॥

আমাদের চিত্ত ও দৃষ্টি সংকীর্ণ বলিয়া পদে পদে ভয় হয় পাছে সাধনার ক্ষেত্রেও আমরা আত্মপর ভেদবুদ্ধি আনিয়া সীমা ও সংকীর্ণতা লইয়া সাধনাকে নষ্ট করিতে বসি। তাই হে উদার গুরু, তোমার কাছে আজ উদার দীক্ষা প্রার্থনা করি।

আমাদের আপন জনের সহিত আমাদের সম্যক্ জ্ঞানের সত্য যোগটি ঘটুক। পরের সহিতও আমাদের সেই যোগটি ভালো করিয়া ঘটুক।

সংজ্ঞানং নং স্বেভিঃ
সংজ্ঞানম্ অরণেভিঃ ॥

সর্বকাল ও সর্বস্থানের যোগ্য মহত্ত্ব ও বিশালতার যোগে যেন সেই যোগটি সত্য হইয়া উঠে। তাই প্রার্থনা করি, হে মহাচার্য, তোমার সেই দৃষ্টি সেই বাণী সেই সাধনা দাও, যাহা পূর্ব-পশ্চাৎ অতীত-অনাগত বিশ্বের সকল সত্যের মঙ্গলসাধনার সঙ্গে সর্বভাবে আমাদিগকে যুক্ত করে—

যা পুরস্তাদ্ যুজ্যতে যা চ পশ্চাৎ
যা বিশ্বতো যুজ্যতে যা চ সর্বতঃ ॥

হে মহাজ্ঞানদাতা, আমাদের এই নূতন ব্রত আরম্ভের দিনে পদে পদে তোমার মহাদীক্ষার প্রয়োজন অনুভব করি। তাই আজকার এই মহাতিথিকে দীক্ষা-তিথি মনে করিয়া ভক্তিভরে তোমাকে নমস্কার করি।

হে আচার্যসত্তম, আজ এই ব্রতগ্রহণ কালে সর্বভাবে তোমাকে নমস্কার করি।

উদিত-হইবে-যে-তুমি, তোমাকে নমস্কার। উদিত-হইতেছ-যে-তুমি, তোমাকে নমস্কার। উদিত-হইয়াছ-যে-তুমি, তোমাকে নমস্কার।

বিবিধরূপে বিরাজিত তোমাকে নমস্কার, স্বাধীন প্রকাশ স্বরাট তোমাকে নমস্কার, সম্যক্ স্বপ্রকাশে বিরাজিত সম্রাট তোমাকে নমস্কার।

উদ্যতে নমঃ উদায়তে নমঃ উদিতায় নমঃ।
বিরাজে নমঃ স্বরাজে নমঃ সম্রাজে নমঃ॥

শেষ পুরস্কার*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেদিন আই. এ. এবং ম্যাট্রিক ক্লাশের পুরস্কারবিতরণের উৎসব। বিমলা ব'লে এক ছাত্রী ছিল, সুন্দরী ব'লে তার খ্যাতি। তারই হাতে পুরস্কারের ভার। চারদিকে তার ভিড় জমেছে আর তার মনে অহংকার জমে উঠেছে খুব প্রচুর পরিমাণে। একটি মুখচোরা ভালোমানুষ ছেলে কোণে দাঁড়িয়ে ছিল। সাহস করে একটু কাছে এল যেই, দেখা গেল তার পায়ে হয়েছে ঘা, ময়লা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। তাকে দেখে বিমলা নাক তুলে বললে, "ও এখানে কেন বাপু, ওর যাওয়া উচিত হাসপাতালে।"

ছেলেটি মনমরা হয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। বাড়িতে গিয়ে তার স্কুল-ঘরের কোণে বসে কাঁদছে, জলখাবারের থালা হাতে তার দিদি এসে বললে, "ও কী হচ্ছে জগদীশ, কাঁদছিস কেন।" তখন তার অপমানের কথা শুনে মৃণালিনী রাগে জ্বলে উঠল, বললে, "ওর বড়ো রূপের অহংকার, একদিন ঐ মেয়ে যদি তোর এই পায়ের তলায় এসে না বসে তাহলে আমার নাম মৃণালিনী নয়।"

এই গেল ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। দিদি এখন ইন্‌স্পেকট্রেস্ অব্ স্কুলস্। এসেছেন পরিদর্শন করতে। তিনি তাঁর ভাইয়ের এই দুঃখের কাহিনী মেয়েদের শোনালেন। শুনে মেয়েরা ছি ছি করে উঠল, বললে, কোনো মেয়ে কখনও এমন নিষ্ঠুর কাজ করতে পারে না—তা সে যত বড়ো রূপসীই হোক না কেন।

মৃণালিনী মাসি বললেন, জগতে যা সত্য হওয়া উচিত নয়, তাও কখনও কখনও সত্য হয়।

আজ আবার পুরস্কার বিতরণের উৎসব। আরম্ভ হবার কিছু আগেই

* এটি ঠিক গল্প নয়, গল্পের কাঠামো মাত্র। রবীন্দ্রনাথের শেষ অসুখের সময় এটি কল্পিত হয়েছিল। এটিকে সম্পূর্ণ রূপ দেবার তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।—সম্পাদক

মৃণালিনী মাসি মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, সেদিন সেই যে ভালো-মানুষ ছেলেটিকে অপমান করে বিদায় করা হয়েছিল, সে আজ কী হলে তোমরা খুশী হও।"

কেউ বললে, কবি ; কেউ বললে বিপ্লবী ; বাইরে থেকে নিমন্ত্রিত একটি মেয়ে বললে, হাইকোর্টের জজ।

ঘণ্টা বাজলো, সবাই প্রস্তুত হয়ে বসল। যিনি প্রাইজ দেবেন তিনি এসে প্রবেশ করলেন, জগদীশপ্রসাদ—হাইকোর্টের জজ। তিনি বসতেই সেই নিমন্ত্রিত মেয়ে যে মজঃফরপুর মেয়েদের হাই স্কুলে তৃতীয় বর্গে অঙ্ক কষাতো, সে এসে প্রণাম করে তাঁর পায়ে ফুলের মালা দিয়ে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে দিলে। জগদীশপ্রসাদ শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "এ আবার কী রকমের সম্মান।"

মাসি বললেন, "নতুন রকমের বলছ কেন—অতি পুরাতন। আমাদের দেশে দেবতাদের পুজো আরম্ভ হয় পায়ের দিক থেকে। আজ তোমার সেই পদের সম্মান করা হোলো।"

এইবার পরিচয়গুলো সমাপ্ত করা যাক। এই মেয়েটি এককালকার রূপসী ছাত্রী বিমলা দিদি, বোর্ডিং স্কুলের অহংকারের সামগ্রী ছিল। পিতার মৃত্যুর পরে আজ ক্লাশ পড়াবার ভার নিয়েছে, আর এদিক ওদিক থেকে কিছু টিউশনি করে কাজ চালায়। যে পা-কে একদিন সে ঘৃণা করেছিল সেই পা-কে অর্ঘ্য দেবার জন্য আজ তার বিশেষ করে নিমন্ত্রণ হয়েছে। মৃণালিনী মাসি—সেই সেদিনকার দিদি। আর সেই তার ভাই জগদীশপ্রসাদ, হাইকোর্টের জজ।

এটা গল্পের মতো শোনাচ্ছে, কিন্তু কখনও কখনও গল্পও সত্যি হয়। আর যে-লোকটা এই ইতিহাসটা লিখছে সে হচ্ছে অবিনাশ, সেদিন সে লম্বা লম্বা পা ফেলে বড়ো বড়ো পরীক্ষা ডিঙিয়ে চলত, সেও উপস্থিত ছিল সেই প্রথমবারকার পুরস্কারের উৎসবে। সেদিন নানা রকম খেলা হয়েছিল—হাই জাম্প, লম্বা দৌড়, রশি টানাটানি ; তার মধ্যে এই অবিনাশ আবৃত্তি করেছিল রবি ঠাকুরের পঞ্চনদীর তীরে। কবিতার ছন্দের জোর যত, তার গলায় ছিল জোর চার গুণ বেশি। সেই-ই সব চেয়ে বড়ো পুরস্কার পেয়েছিল। আজ সে জজের অনুগ্রহে সেরেস্তাদারের সেরেস্তায় হেড কেরানীর পদ পেয়েছে।

অপ্রকাশিত কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রচ্ছন্ন পশু

সংগ্রামমদিরাপানে আপনা-বিস্মৃত
দিকে দিকে হত্যা যারা প্রসারিত করে
মরণলোকের তারা যন্ত্রমাত্র শুধু,
তারা তো দয়ার পাত্র মনুষ্যত্বহারা।
সজ্ঞানে নিষ্ঠুর যারা উন্মত্ত হিংসায়
মানবের মর্মতন্তু ছিন্ন ছিন্ন করে
তারাও মানুষ ব'লে গণ্য হয়ে আছে,
কোনো নাম নাহি জানি বহন যা করে
ঘৃণা ও আতঙ্কে মেশা প্রবল ধিক্কার,
হায় রে নির্লজ্জ ভাষা, হায় রে মানুষ।
ইতিহাসবিধাতারে ডেকে ডেকে বলি,
প্রচ্ছন্ন পশুর শান্তি আর কত দূরে
নির্বাপিত চিতাগ্নিতে স্তব্ধ ভগ্নস্তূপে॥

উদয়ন
২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪০

সংসারেতে দারুণ ব্যথা লাগায় যখন প্রাণে,
আমি যে নাই, এই কথাটাই মনটা যেন জানে।
যে আছে সে সকল কালের এ-কাল হতে ভিন্ন,
তাহার গায়ে লাগে না তো কোনো ক্ষতের চিহ্ন॥

উদয়ন
২১ জানুয়ারি, ১৯৪১

আধেক দরে জীবনটাকে চড়িয়েছি আজ বাজারে,
পাঁচশো পুরো হয় কি না হয় হাজারে।
পথিকরা সব টিকিটমারা দাম দেখে যায় থেমে,
ট্রামের থেকে কেউ বা আসে নেমে।
মোটর গাড়ি হাঁকিয়ে আসেন বড়ো বড়ো খদ্দের,
এই বিভাগটা একটুও নয় তাদের দৃষ্টি-মধ্যের।
নেড়ে চেড়ে দেখে বলে, রঙ গিয়েছে চটে ;
কোনো কদর আছে কি ওর মোটে।
হঠাৎ কভু মনে পড়ে আর-একদিনের কথা,
নামে ছিল সোনার জলের উজ্জ্বলতা।
এখন কোণে রইল পড়ে ফেলে-দেওয়ার ফর্দে,
নামের দামটা নেমে গেছে অর্ধেকেরও অর্ধে।
মিথ্যে কেন সাজিয়ে রাখা লজ্জা দেওয়া ওরে,
বিনা দামেই দাও-না উজাড় ক'রে।
পুরানো সেই নামের টানে কেউ বা আসে কাছে,
বলে, হায়রে সে-মাল কি আর আছে।
উলোট-পালোট ক'রে দেখে শুধু মিনিট ছয়,
ধৈর্য নাহি রয়,—
কানের কাছে তুলে দেখে, আওয়াজটা দেয় ফাঁকা ;
ট্যাঁকের মধ্যে ফিরিয়া যায় টাকা।
এক লম্ফে চলতি ট্রামের চড়ে সে পায়দানে,
তাজা মালের সন্ধানে যায় বউবাজারের পানে।
সময় এল শেষ আলোটা নিবিয়ে দেবে দোকানী,
বাজে মালের হিসেব হবে চোকানি॥

উদয়ন
৮ এপ্রিল, ১৯৪১

গিরিবক্ষ হতে আজি
ঘুচুক কুজ্ঝটি-আবরণ,
নূতন প্রভাতসূর্য
এনে দিক নব জাগরণ।
মৌন তার ভেঙে যাক।
জ্যোতির্ময় উর্ধ্বলোক হতে
বাণীর নির্ঝরধারা
প্রবাহিত হোক শত স্রোতে॥

কালিম্পং
সেপ্টেম্বর, ১৯৪০

দুখের দশা শ্রাবণরাতি,
বাদল না পায় মানা—
চলেছে একটানা।
সুখের দশা যেন সে বিদ্যুৎ,
ক্ষণহাসির দূত॥

উদয়ন
২১ জানুয়ারি, ১৯৪১

মাসিমা

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—"ওলো কে আছিস, অবু এয়েছে, ঘরে খৈ-মোয়া আছে নিয়ে আয়।"

—"মাসি, আমাকে দেখলেই বুঝি তোমার খৈ-মোয়ার কথা মনে পড়ে?"

—"মনে পড়বে না অবু? মাসির মোয়া খাবার জন্যে আবদার করে এমন তো দুটি নেই আমার অবু।"

—"আর একটি যদি থাকতো মাসি—"

—"ছিল তো, রইলো না যে—আহা যদি থাকতো আজ—"

—"বলতে বলতে থামলে কেন মাসি?"

মাসি আঁচলের খুঁটে চোখ মুছে ডাকলেন—"ওলো ও ঝিঙ্কারী।"

—"ঝিঙ্কারী কে মাসি?"

—"ঝঙ্কারীর বোন—নয়াদুমকা থেকে এসেছে দুজনে কাজ করতে। কাজ জানে কিন্তু কথা বোঝে না।"

—"নাম দুটো নতুন ঠেকলো মাসি; তোমার সে 'ফুকারি দাসী' কোথা গেল?"

—"সে গেছে এদেশ ছেড়ে পালিয়ে। বলি, 'যেয়ে করবি কী', জবাব করলে না—পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে মাথায় নিয়ে চলে গেল, চোখ মুছতে মুছতে।"

—"নিশ্চয় মাসি সে তুস্থ জুজুর ভয়ে পালিয়েছে—না হলে কখনো যায় তোমাকে ছেড়ে? ফুকারি দাসী লোক ছিল ভালো—তোমায় যত্ন করতো; আর রোজ আমার ঘন দুধের সরে ফুটো করে দুধটুকু ঢেলে নিয়ে নিজের জন্যে রাখতো, সরসুদ্ধু খালি বাটি আমায় ধরে দিতো—চুমুক দিয়ে যদি বলতেম, 'দুধ কোথা গেল?' তো সাফ বুঝিয়ে দিত, 'দুষ্টু গয়লা ফুঁকো দুধ দিয়েছে, ঐ সরটুকুই এখন খেয়ে নাও, ওবেলা ফুঁকো দুধের চাঁচি খাওয়াবো। মাসিকে বোলো না, আমারও চাকরি যাবে, গয়লারও জরিমানা হয়ে যাবে; দুধও আসবে না, সরও পড়বে না, চাঁচিও পাবে না।'—আমি তার নাম দিয়েছিলুম চালাক দাসী। সে তোমার মোয়া চুরি করে আমাকে এক-একদিন ধরা পড়লে দিতো মাসি!"

—"ওমা এমন!...আচ্ছা তোকে দেখলে যেমন আমার খৈ-মোয়ার কথা মনে পড়ে, আমাকে দেখলে তোর কী মনে পড়ে অবু?"

—"ছেলেবেলার কথা মাসি, খুব ছোটবেলা—যখন আসতো তাড়াতাড়ি সকাল, তাড়াতাড়ি পড়ন্ত বেলা!"

—"এখন?"

—"মাসি, আমার মনে হয় আমি ঠিক তেমনিই আছি ছোট্টটি !"

—"না তুই বড় হয়েচিস, তাই আমাকে মনে পড়তে তোর দেরি হয়ে যায়, না হলে কোন্ কালে আসতিস।...দেখ্ না, দাসী দুটোকে কোন্ কালে ডেকেছি, এখনো দেখা নেই। ওলো ও ঝিঙ্কারী, ও ঝঙ্কারী, আয় না—"

—"আঁউ মায়ী, যাঁউ মায়ী—"

—"এই দেখ্, চুল বাঁধার আয়না মুখ সাফের বাক্স নিয়ে এলো দুটোতে। হাঁউ মাউ করচেই সারা দিন। ওরাও বোঝে না আমার কথা, আমিও বুঝি না ওদের বুলি। এর কী করি উপায় বল্ তো অবু !"

—"এ তো সহজ! ছ্রীক্ষেত্তরের লোকজনের কথা তো বুঝতে মাসি ?"

—"তা এক রকম বুঝতেম—'চিতাবাড়ি ধাঁইকিড়ি মৌসীমা পড়কী চড়'—এদের কথা যে কিছু বুঝিনে !"

—"বুঝবে কী করে মাসি ? ফাইলোলজি পড়নি তো ?"

—"তুই তো পড়েছিস অবু ?"

—"একটু একটু !"

—"তাই না হয় আমাকে শেখা একটু—কী উপায়ে এদের বোঝাই কখন কী চাই !"

—"আচ্ছা দেখো মাসি, ছ্রীক্ষেত্তরের লোকেরা সব কথার গোড়ায় চন্দরবিন্দু উলকির মতো বসায়, আর এরা ডুমকা পাহাড়ের লোক, কথার শেষে উলকি টানে—'ভুখি লাগা দুধি পিলাউঁ'; তারা হলে বলতো—'ভুখ লাগিলা, দুধ না পাইলা কাঁই, ধাঁইকিড়ি গোয়ালী বাড়ি যাঁই'—বুঝলে তো মাসি ?"

—"বুঝেছি, দেখি তো তোর বুদ্ধিতে এদের মতো কথা কয়ে—ওরে শিগ্‌গিরি মেঠাই লাঁ, দাঁড়িয়ে হাঁসতা কাঁ, জলদী যাঁ !"

—"মাসি, ছুটেছে দুটোতে, বোধহয় বুঝেছে কিছু কিছু !"

—"কই অবু দৌড়ে গেল, দৌড়ে আসার নামও যে করে না !"

—"ব্যস্ত হয়ো না মাসি, আমি খেয়ে এসেছি, খিদে নেই—ওবেলা খাবো !"

—"ওমা সেকি অবু, কে এমন ভাগ্যিমন্তী, তোমায় পেটটি ভরিয়ে পাঠালে এখানে ?"

—"তাকে তুমি চিনবে কি মাসি—ফেলার মা !"

—"ফেলার মা ? কই চিনলেম না তো,—কোথায় থাকে ?"

—"সিংগির বাজারে !"

—"সিংগির বাজারে ?"

—"হাঁ মাসি, মিণ্টুদির বাড়ির কাছে। অমন করে আকাশ তাকিয়ে কী ভাবচো মাসি ? শোনো না বলি—"

—"হাঁ বল্, তারপর ?"

—"সেই তো, মাসি, পিসেমশায় আমাকে ইস্কুলে পাঠালে, তারপর কত কাল তোমার সঙ্গে আর সাক্ষাত নেই। রথ গেল, দোল গেল, চড়ক পুজো আসে আসে, গাজনের বড় সন্ন্যাসী কাঁটা-ঝাঁপ খাবে, পঞ্চাননতলার মাঠে চড়ক গাছ পোঁতা হলো, ঢাকে ঢোলে কাঠি পড়ে আর-কি—আমার আর সবুর সইলো না মাসি, তোমায় দেখতে চৌপাটি ছেড়ে দিলেম লম্বা—পায়ে হেঁটে বকুলতলার বাড়ির ঠিকানা ধরে। দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে, আবার যায় দিন, আবার আসে রাত—মনে কত ভাবনা আসে যায়—মাসি কি পর করে দিলে, মাসি কি ঘরবাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে গেল তুস্থ জুজুর ভয়ে—কিছুই ঠিক পাইনে। হাঁটতে হাঁটতে চলি—যশোর থেকে বসিরহাট, সেখান থেকে দমদমার মাঠ, পাইকপাড়া, চিৎপুর, টালার জলকল, আহিরিটোলা, হাটখোলা, নতুন বাজার, জগন্নাথের ঘাট, মাথাঘষার গলি, আমড়াতলা, খেংড়াপটি,—ঘুরে ঘুরে শেষে বাক্সপটি, মশারিপটি, চোরবাগান, জোড়াসাঁকো—বকুলতলা! এমন ফেরে কোনোদিন পড়িনি মাসি! আগেও তো তোমার বাড়িতে গেছি, গলির মোড় ফিরতেই শরীর যেন শীতল হয়ে যেত, এবারে যেন একটা তাপ এসে লাগলো মুখে। চোখ তুলে দেখি, লোহার ফটকের ধারে হেলেপড়া সে নিম গাছটি নেই—প্রাণটা তখনি কেমন করে উঠলো বাড়ি ঢোকবার মুখেই!"

—"সে বাড়ি তো আর আমাদের নেই অবু, আর একজনরা সে বাড়ি যে নিয়ে নিয়েছে। বাড়ি ছাড়বার সময় আমার অসুখ, তাই কাউকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি। তোমাকে যে একটা পত্তর দিয়ে আসবো, সেটুকু সময়ও দিলে না তারা!"

—"এতক্ষণে বোঝা গেল মাসি। পুরোনো বাড়িতে ঢুকে দেখি—সদর ফটক আধখানা আছে আধখানা নেই, পাহারায় কেউ নেই—না পটুলাল, না উচ্ছেলাল, ছেদিলাল, ছোটেলাল—সাড়াশব্দ নেই কারু। চাকরদের নাম ধরে ডাকি—ও রামলাল, ও গদাধর, ও ঈশেন, বিপিন, দুগ্‌গোদাস—কেউ দেখা দেয় না। ভয়ে ভয়ে ঢুকলেম ভিতরে, উঠে গেলেম ঘুরনো সিঁড়ি বেয়ে বৈঠকখানাতে—দেখি কী মাসি—ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালগিরি, আর্শিকুর্সি কিছু নেই। বসি কোথায় ভেবে পাইনে। কোথা টানাপাখা, কোথা ফুলকাটা গালচে, বড় বড় তসবির সব বড়-কর্তা মেজো-কর্তা ছোট-কর্তাদের, দেয়ালজোড়া বড় বড় পর্দা—সব অদৃশ্য। ফটিকের বাতিদান, চীনের পেটিসান, ফুলকাটা ফুলদান, পাথরের মুরত, দামি দামি বইঠাসা আলমারি—কিছু কি নেই; সব যেন ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। কেবল সিঁড়ির ঘরগুলো খাড়া আছে এখনো—ধাপের পর ধাপ, পঁচিশ তিরিশ বিশ পঞ্চাশ, চিৎ হয়ে পড়ে কড়ি গুনছে—বড় সিঁড়ি, ছোট সিঁড়ি, পাথরের সিঁড়ি, গোল সিঁড়ি, ঘুরনো সিঁড়ি, কেটো সিঁড়ি, মেটে সিঁড়ি। কোথায় সে ঘড়ির ঘর, নাচঘর, ছবিঘর, ইস্কুলঘর—সব ঘর একশা হয়ে চুপচাপ আছে। এমন কাউকে দেখি না যে শুধিয়ে জানি, মাসি কোথায়।

'মাসি মাসি' বলে ডেকে ডেকে গলা চিরে গেল। একবার মনে হলো যেন অন্দরবাড়ির দিকটায় কে যেন ডাকল 'মাসি গো মাসি'—তার পরেই যে-চুপ সেই-চুপ, নিঃসাড়া পুরী। ছুটলুম অন্দরের দিকে, বলি মাসির যদি দেখা পাই সেখানে। দালান, দরদালান, গলিঘুঁজি, চাকর-দাসীদের ঘর পেরিয়ে পালকিদোরের সামনে যেয়ে দেখি, মাসি—সেই যে আমাকে সময়-ভোলা ঘড়িটি দিয়েছিলে,আর আমি যেটিকে ভোলানাথের ঘড়ি নাম দিয়ে ঠিক পালকিদোরের উপরে বসিয়ে দিয়েছিলেম—সেটা ঠিক তেমনি বসে আছে, ঝ্যালেগাঁথা, চাঁদ ওঠার দিকে চেয়ে। দেখে সাহস হলো, তবে হয়তো মাসিও আছে। একছুটে দোতালায় উঠে গেলেম তোমার ঘরে, মাসি। কোথায় মাসি!! খালি ঘর চুপচাপ—সবুজ খড়খড়ি বন্ধ করে অঘোরে পড়ে আছে। বলি, দেখি তো ভাণ্ডার ঘরটা খুঁজে যদি পাই। দেখি না—তালা-খোলা দোর, তার একদিকে গলাভাঙা একটা কুঁজো, আর একদিকে কানাভাঙা কলসি একটা। ভয় করলো মাসি, উপোসী ঘরখানা গজালপোঁতা গর্তগুলো নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে যেন খাবে বলে—যাকে পায়। ঠিক মনে হলো মাসি—যেন রাবণবধের বিংশলোচন আমাকে দেখছে। সেখান থেকে পালিয়ে মাসি, তোমার তরকারিঘরে ঢুকে দেখি সেখানেও তুমি নেই। উঠানের ধারে কলতলা, সেখানে দুবেলা থালাকাঁসিগুলো বাসনমাজুনীর হাতে পড়ে 'মাসি মাসি' বলে চেঁচাতো, ঝগড়া লাগতো কাঁসাতে-পিতলে, লোহার কড়াতে-হাতাতে-বেড়িতে-খুন্তিতে—ঝন্ ঝন্ খন্ খন্; আর ঢালু বারাণ্ডা থেকে তোমার ময়না চেঁচাতো—'ও বউ, ও খোকা, ও সরলা'—সব স্নুন্‌সান্। কী বলব মাসি, বুকটা যেন ঢিপ ঢিপ করে উঠলো। মেটে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেম গিয়ে রান্নাবাড়ির ছাতে, মাথা ঘুরে গেল মাসি, সেখান থেকে চারিদিক দেখে—ঠাকুরবাড়ির চুড়ো থেকে সুদর্শন-চক্কর অদর্শন হয়ে গেছেন। বাজপড়া-শিক মুঠিয়ে ধরে যে গোদাচিল সারাদিন বসে ভাবতো আর থেকে থেকে চিল্লাতো—'চির্‌র্—আঁচি-র্ পাঁচি-র্ মাসি-র্'—সেটাও নেই চিলে ঘরে। ছাতের আলসে থেকে ঝুঁকে দেখি—তোমার ঘরের দেওয়াল ছাওয়া করেছিল যে আমসির গাছ সেটি, আর উত্তর-পশ্চিম হাতায় তিন্তিড়ি গাছ—যার গোড়ায় আমাদের সাতপুরুষের নাড়ি পোঁতা, আর যার নামে বাড়ির নাম হয়েছিল 'বকুলতলার বাড়ি' সে গাছটিও নেই। পুকুরের পুব ধার ঢেকে নেই সে জটে-বুড়ীর বটগাছ—ঝুরি নামিয়ে কালো জলে। গোলবাগানের একধারে সেই শিশুগাছ, আর একধারে সেই কাঁঠালগাছ—কিছু কি নেই। জলের ফোয়ারা, রঙিন টালির গোল রাস্তা—সব লোপাট হয়ে গেছে। গাছ নেই—বাগান থাকে? ফোয়ারা নেই—ঘাস থাকে সবুজ? মাসি, অমন বাগান মরে গিয়ে যেন শুকনো লেবুর খোলার মত পাঙাস বর্ণ হয়ে পড়ে আছে—সে ছিরি চলে গেছে পুরোনো বাড়ির। ছি ছি মাসি, অমন বাড়ি, অমন বাগান—তুমি কোন্ প্রাণে তেয়াগ করে এলে? বসে থাকলেই পারতে, কে তোমায় তাড়াতো দেখতেম। মাসি, আমার সেই সময়ভোলা ঘড়ি—সেটি এখনো বসে আছে তোমার ঘরের পাঁচিল আগলে;

তাকে নড়াতে চাইলেম, সে নড়লো না। আমি বললুম—'থাক্ তবে, মাসির ঘর পাহারা দে', —সে এখনো চাঁদ ওঠার দিকে চেয়ে বসে আছে তেমনি শক্ত হয়ে; আর তুমি মাসি এলে কিনা তাকে একলা ফেলে—মনে আছে তো সেটিকে ?"

—"আছে অবু, অসুক-শরীর তখন, গোলেমালে তাকে আনতে মনে ছিল না!"

—"তা জানি মাসি, তোমার খোঁজ নিয়ে এখানে আসতে পঁচিশ দিন সেই নিবান্ধব পুরীতে আমি একলা কাটিয়ে এলেম; আর তুমি মাসি আমায় একটা পত্তর ফেলে দুদিন অপিক্ষে করতে পারলে না সেই পুরোনো ঘরে ?"

—"পুরোনো ঘরের কথা থাক্ অবু, পুরোনো ঘরের সঙ্গে পুরোনো সবকিছু বাড়ি-বাগান, মানুষ-মুনিষ চলে গেছে—আর ফিরবে কি ? যাক্—এখন তোর সেই ফেলার মায়ের কাহিনী ক' শুনি!"

—"সে হবে এখন বৈকেলে, চিনির পানা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে। এখন একবার ঘুরে-ঘারে এই বাড়িটার সঙ্গে পরিচয় করে আসি।"

—"সেই ভালো! পুকুরে নেয়ে এসে পেসাদ পাস্—ঠাকুরের ভোগ সারা হলে।"

—"আচ্ছা মাসি!"

* * *

দিশা ॥

তুলাগাছে কুড়গাল পাখি বৈকালে কাড়ে রাও—
শঁসা, কলা, শাঁখআলু, বেলের পানা খাও ॥

ঝক্‌ঝকে কাঁসিতে জলপান সাজিয়ে মাসির বাড়ির ঠাকুরঘরের সেবায়েৎ সামনে ধরে দিয়ে বললে—"খায়েন!"

—"খায়েন কী! এই যে আড়াইটে বেলায় ভোগ খেয়ে উঠেছি।"

—"বৈকালি খায়েন!"

—"বাপু, খায়েন তো জানি—খায় কে ?"

—"উদর বাবু, উদর।"

বুঝলেম সেবায়েৎ পণ্ডিত লোক 'খাও'-কে বলেন 'খায়েং', পেটকে বলেন উদর। কাজেই অনুস্বর বিসর্গ চন্দরবিন্দু দিয়ে সাধু ভাষা কইতে হলো আমায়। নৈবিদ্যির কাঁসিখানি হাতে নিয়ে—কলার চোপা, শঁসার টিকলি, শাঁখআলুর টুকরো গালে ফেলি আর বলি—"কিং নাম ? কুত্র বাসা ? অত্র না তত্র ? চ পিতা চ মাতা ?"—আর সমস্কৃত বিদ্যেতে কুলোলো না —"কয়টি ভ্রাতা ?" ব'লেই বেলের পানাতে চুমুক।

সেবায়েৎ জবাব দিলেন—"এজ্ঞে, মোর নাম বাসুন্তে!"

—"তাই বলো, নামটা যেন শোনা-শোনা; বাসুন্দের কেউ হও ?"

—"নহঃ !"

—"হারুন্দে-মারুন্দের ?"

সে দুবার ঘাড় নেড়ে ছড়া কেটে দিলে—পুঁথির পাতায় যেন আঙুল বুলিয়ে চললো তার জিভ—

"দুস্কের কথা কিবে কহিমু তোমারে,
আমা চেয়ে অভাগিয়া না কেহ সংসারে।
পরিচয় কিবা দিমু, শুন বিবরণ,
ছেলা বয়সে মাও বাপ মরিল দুইজন।
বাপ নাই মাও নাই, নাই বহিন ভাই,
ঠাকুরসেবায় নাগিঁয়াছি—অন্য কাম নাই !"

—"এ তো ভালো কাম পাইলা" বলে খালি কাঁসিখানি তার হাতে দিয়ে মাসিকে গিয়ে গড় করতে, মাসি বললেন—"চারিদিক ঘুরে কেমন দেখলি অবু ?"

—"আশ্চর্য দেখলেম মাসি।"

—"কী দেখলে ?"

—"সুদর্শন চক্কর অদর্শন হননি মাসি, তিনি এখানে এসে ঠাকুরদালানের আলসেতে গট্‌ হয়ে বসে গেছেন।"

—"আর কী দেখলে আশ্চর্যি ?"

—"টাইবুড়ো আর চাংড়াবুড়ী দুজনে পেঁপেতলা থেকে তুলসীতলায় রোদ পোয়াচ্ছেন !"

—"আর কী দেখলে অবুচাঁদ ?"

—"মাসি এমন আশ্চর্যি কাণ্ড আমি জন্মে দেখিনি—কোথায় সে বকুলতলার পুরোনো বাড়ি, আর কোথায় এই নতুন বাসা !"

—"ঘুরেঘারে দেখলি সব তো অবু; কেমন বোধ হলো ?"

—"বোধ আর হবে কী মাসি, দেখেশুনে বুদ্ধিহত হয়ে গেছি—সেখানটা যেন এখানে কে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছে—সেই পুকুরের দক্ষিণপারে সারি সারি নারকেল গাছ, সেই ভুতুড়ি কাঁঠাল, সেই তেঁতুল, সেই পাতবাদাম,—সবাই যেন উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এখানে যে যার জায়গায়—কেউ দক্ষিণের বারাণ্ডার দিকে চেয়ে, কেউ উত্তরের পাঁচিল ঘেঁসে। নিশ্চয় তুমি ডাক-মন্তর জান মাসি—ডাক-মন্তরে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে সবাই, এতে আর সন্দ নাই—"

—"ডাক-মন্তর যদি হ'ত তবে বাগানের পারে পাঁচিল ঠেস দিয়ে বসতো সিংগির বাজার উড়ে যাত্রা, কুঁড়েঘর, ছেকড়াগাড়ি, মুদির দোকানপাট সব নিয়ে; আর ঐ ঠিক দক্ষিণে নাকের সামনে বসে যেত খেতু খোট্টার তিনতলা মোকামটা আর তারই পাশে হিমি বাড়িওয়ালীর দেড়তলার ছাতে পাঁপড়ওয়ালীর টিনের ঘরটি—কই এ সব তো আসেনি অবু ?"

—"এসেছে মাসি, পাঁপড়ওয়ালীর টিনের ঘর এসেছে, পাঁচিল টপ্‌কে তোমার বাগানে এখানে লোহার ফটকের ধারে বসে আছে চেয়ে দেখো।"

—"তাই তো ওটা তো চোখে পড়েনি!"

—"আমি শহরে থাকতে খোঁজ নিয়েছিলেম; ফেলার মা বললে, ঘর তুলে পাঁপড়-ওয়ালী চলে গেছে—কেউ জানে না কোথায়!"

—"পাঁপড়ওয়ালীকে ও ঘরে দেখলি কি অবু?"

—"না মাসি, তুমি যে ফটক বন্ধ রেখেছ, ঢুকবে কোন্ সাহসে! ভুতি কুকুর তেড়ে যাবে। ওধারে একখানা মুদির দোকান ভাড়া নিয়েছে—দেখলেম যেন তাকে!"

—"তা হবে!"

—"হবে কি মাসি, হয়েছে! আমি বলছি, তাকে একদিন খুঁজে ডেকে আনবো দেখো! বেতালা তেতালা মাড়বাড়ি মোকামগুলো ভারি বলে এতদূর উড়ে আসতে পারেনি মাসি; রেল রাস্তার উঁচু বাঁধে ঠেকে ঝুপ ঝাপ পড়ে গেছে লোহালক্কড় তালপাকিয়ে ওধারে—ইষ্টার ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মহাদেব তেওয়াড়ি সেই সব মাল কুড়িয়েবাড়িয়ে গাড়িগাড়ি চালান দিচ্ছে কারখানায়—কানাইবাবুর হুকুমে!"

—"তা ভালো! কিন্তু সেই পাঁচী ধোপানীর গলি, আর সেই 'অর্চনা' পোস্ট-আফিস?"

—"সব এসেছে মাসি, কেবল এখানে এসে ভোল ফিরিয়েছে; হয়তো পোস্ট-আফিসটা হয়ে গেছে পেট্রোলের ডিপো!"

—"আর সেই কাদামাখা অন্ধকার গলিটা অবু?"

—"ভারি সাজ সেজেছে সে মাসি—লাল শাড়িতে ঘাসী রংএর পাড়, তাতে কাঁচ-পোকার চমক—রাস্তাটি যেন পাড়াগাঁয়ের মেয়েটির মতো—ঐ টিনের ঘরের কাছ দিয়ে আমি দেখেছি।"

—"তুই কেমন করে চিনলি তাকে অবু?"

—"মাসি, পা চেনে রাস্তাকে, রাস্তা চেনে পা! গঙ্গা নাইতে যদি কোনোদিন হেঁটে হেঁটে যাও তো, মাসি সেই রাস্তায় তোমার পা পড়তেই তোমাকেও সে চেনা দেবে। যাবে একদিন মাসি, গঙ্গা নাইতে?"

—"তা যাবো, সময় হোক, তুই নিয়ে যাস পথ দেখিয়ে।"

—"সেই ঠিক হবে মাসি, পারবে তো হাঁটতে?"

—"ও অবু, কাঁকড় ফোটে যদি পায়ে?"

—"ঘাসের উপর দিয়ে যাবে!"

—"পায়ে যদি চোরকাঁটা বিঁধে যায়?"

—"রোসো মাসি, ভেবে দেখি, আচ্ছা তুমি যাবে পালকিতে আর আমি তোমার হাত ছুঁয়ে পাশে পাশে চলবো। তা হলেই হবে, এতে তো রাজী?"

—"রাজী, কিন্তু পথ যদি ভুল হয় অবু?"

—"তা হতে পারে না মাসি, আমি ফিজিকাল জিওগ্রাপি পড়েছি। বেহারাদের জানিয়ে দেবো—ঠিক রাস্তা ধর্, মানচিত্র-মতো।"

—"সে আবার কেমন?"

—"শোনো না মাসি—

কাঁধ বদলি করুক জয়নগরের পালকি
বরানগরের মোড়ে—যেখানে আফিস এ. আর. পি,—
সেখান থেকে হাফিস কল,—
ডাইনে রেখে দক্ষিণেশ্বর—
চলুক সোজা বরাবর,—
বাঁয়ে রাখো হাই ইস্কুল সাগর দত্তর,—
ডাইনে মোড় ফিরে আগড়পাড়া, আন্তপীঠ,—
তারই ওপিঠে ইছাপুর গন্ ফ্যাক্‌টারি পাচ্চি।—

দেখতে পাচ্ছ তো মাসি এপাড়া সেপাড়া পরিষ্কার?"

—"তা পাচ্ছি, কিন্তু গঙ্গা তো দেখতে পাচ্ছিনে অবু?"

—"এইবার পাবে, শোনো—

ফ্যাক্‌টারি ছাড়িয়ে দাঁতিয়ার খাল—
সেখানে রাতে বেরোয় ডাকাত, দিনে খেঁকশেয়াল।
আড়াআড়ি খালটা পেরিয়ে চলো কামারহাটি,—
তারপরেই খড়দা, শ্যামসুন্দরের বাঁধাঘাট আর-কি,—
সেখানে চান সেরে, ফের কাঁধ বদলি ক'রে
পাণিহাটি গদাধরের ছ্রীপাট ধ'রে
এখানে এসে দাখিল হোক মাসির বাড়ির পালকি।"

—"সে পালকি বুঝি আর আস্ত রেখেছ তুমি সেবারে পিসির বাড়ি যাবার কালে, নড়িটি দিয়েছিলেম, সেটিও খুইয়ে এসেছ। সেটি থাকলে না হয় হেঁটে হেঁটে গঙ্গা-চানে যেতুম—পুরোনো লণ্ঠনটিই বা কী হলো তা তুমিই জান!"

—"ও মাসি, আমি তো পষ্ট সাফ কথা ছাপিয়ে সাধারণে প্রকাশ করে দিয়েছি—লাঠি-গাছা মুন্সিবুড়ো কেড়ে রেখেছে, লণ্ঠন আর পালকি দুইই খুইয়েছে তোমার হারুন্দে মারুন্দে পাঁচ ভূতে মিলে বালুঘাই পেরোবার সময়। কটক পুলিশের বাবুরাও পড়ে দেখেছে সে

কথা—দেখো না, এবার ঠেকলেন সবাই রাহাজানির মামলায়, হুলিয়া বেরোলো বলে তাদের নামে চ্যাটার্জি কোম্পানি থেকে!”

—“ও অবু করেছিস কী? মুন্সি যে গ্রাম সম্পর্কে আমার নাতজামাই, হারুন্দে মারুন্দে তারা হলো পুরোনো চাকর—তাদের ফ্যাঁসাদে ফেলতে আছে?”

—“পুরোনো চাকর তো এলো না কেন তারা তোমার সেবা করতে এখানে? তোমাকে এই বনালয়ে একা পাঠিয়ে, তারা কেউ গেল মামার বাড়ি, কেউ গোঁসাইপাড়ায় শ্বশুরবাড়ি আরামে থাকবেন আর দরকার হলে লিখবেন—‘পত্তরপাঠ মনিঅডার করিলেই যাইব’—কেউ লিখবেন—‘হাত ভেঙে গেছে, হাঁড়ি ঠেলা অসম্ভব’—কেউ লিখবেন—‘আমি বাটি আসিয়া কালাজ্বর নুমোনিয়া ইত্যাদিতে শয্যাগত, এক বোতল সালসা পাইলে এযাত্রা রক্ষা পাই, এই পত্র টেলিগ্রাপ বলিয়া জানিবেন’—এই ব্যাভার তোমার সঙ্গে মাসি! যা এক কলম ঝেড়েছি, পুলিশের ঠেলায় তোমার পায়ে এসে পড়তে পথ পাবে না, দেখো! তোমার সম্পর্কে নাতজামাই-ই বা কেমন তা তো বুঝিনে—লাঠিটি সাফ গাপ্পাই!”

—“ছি ছি অবু, এমন জুলুম করতে নেই মানুষের উপর!”

—“মানুষ কী বলছ মাসি, হারুন্দে মারুন্দে—তারা সব ভূত!”

—“আহা গালাগাল দিসনে, আমি ইচ্ছেসুখে তাদের ছুটি দিয়েছি; তুস্থ জুজুর ভয় পেয়েছে তারা, গরিব তারা তো আমার মাইনের চাকর ছিল না অবু!”

—“তবে কে ছিল তারা মাসি?”

—“তুই বল্ না ভেবে!”

—“ভাবতে গেলে মাসি মাথা ঘুরবে!”

—“আচ্ছা, না ভেবেই বল্!”

—“বলি —

কে ছিল মাসি, কে ছিল তারা?
তোমাকে মা বলেছিল,—
আমার মাকে মাসি বলে ছিল যারা—
তারা কে ছিল সব মাসি?
কত গরব করে বলতো তারা—
‘আমরা মাসিমার লোক গো’—
তোমার ঘরকে বলতো তাদের ঘর;—
তারা সবাই কে ছিল?
চাকর চাকরানী, দাস না দাসী,
কেনা বাঁদী না কেনা নফর?

—না আপ্তজন, না কেউ অপর ?
—আর সেই যে ছিল গোবরার মা—
জাঁতা ঘোরাতো দিনে,
রাতে দাবাতো পা,
মাইনেও নিতো না, দেশেও যেতো না—
তাকে কি দাসীহাটে কিনেছিল মাসি ?
—আর সেই যে, আকাশী পিদুম ঝুলিয়ে দিতো
শুকতারার কাছাকাছি বাঁশের আগাতে,
ঘণ্টাকে বলাতো 'হুম্ তৎ সৎ' সন্ধিপূজাতে,
উঠতো দেখে উদয়তারা—নামটি ছিল যাঁর উদাসী—
পড়াপাখিকে শিখিয়েছিল সে
বলতে—জয় মাসি !
—আর সেই বেহারি ? আর সেই রাধামালী ?
—আর সেই যে সে আনতো জ্বালানী কাঠ—
কাঠফাটা রোদে খাটতো ফাইফরমাস
আমার, তোমার, বাড়ির সবার—
ছাগলছানার, হাঁসের বাচ্ছার—
কী শীতে কী গরমে—দিনরাত।
সে বলেছিল—'বাবু, তোমার বিয়েতে
আমার বউকে রুপোর বালা গড়িয়ে দেবেন মাসি।'
তাকে তোমার মনে পড়ে কি ?
—আচ্ছা মাসি, সেই যে আমাকে বিনি-পয়সায়
মুঠো ভরে দিতো টোপাকুল,
এনে দিতো রথে — রঙিন ছাতা, সোনার ফুল,
ভিঙ্গারে ভরে দিতো মিঠে জল কপ্পুরবাস,
সে খাওয়াতো কপ্পুরকাঠি পানের দোনা
চানাচুর বেগনি ভাজি—
তার নাম ছিল না রাজী ?
—এমন শত কাজের শত জনা ছিল—
কেউ আমায় কাঁধে চাপিয়ে ঘোড়া হয়েছিল,
কাঠের দোলনায় ঝাঁকানি দিয়ে—

নাট্‌সাহেবের পালকি চাপিয়েছিল,
তিনতলার ছাদে তুলে ধরে দুহাতে
চাঁদামামাকে চিনিয়েছিল—
পুকুরঘাটে কাগাবগাকে,
পাট-কৌটিকে, বেনে বউটিকে,
সোলার ঝারাতে টুনটুনি পাখিকে,—
ঝুমঝুমি-গাছে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর
কথা শুনিয়েছিল।
—এমনি সব তারা কোন্ দেশ হতে এসেছিল মাসি ?
—তারা কেউ কুটতো আনাজ বাটতো লঙ্কা—
সংক্রান্তিতে কখনো শুনিনি চেয়েছে তঙ্কা !
আপনি এসে বেড়ালের বিয়েতে থালা চাপড়ে
ডঙ্কা পেটাতো, কাজল পাড়াতো, ঘষতো চন্দন—
কাজেতে যেমন খেলাতে তেমন মজবুত
ছিল তারা বড় অদ্ভুত।
—না চাকর, না নফর, না বাঁদী, না দাসী,
তা কে ছিল ভেবে পাইনে মাসি !"

—"অবু, তারা তোমারও কেউ ছিল,
আমারও কেউ ছিল,
পাখিরও কেউ ছিল,
বেড়ালেরও কেউ ছিল।"

—"আর বলতে হবে না মাসি !"

—"বুঝলে তো অবু, আর কোনোদিন তাদের দোষ ধরে ডাইরি লেখাতে যেও না যেন পুলিশে—"

—"মাসি, যে দোষ করে চুকেছি তার আর চারা নেই। আজ থেকে হুলিয়া লেখা-লেখিতে—নাকে খৎ, দণ্ডবৎ !!"

[অবু-মাসিমা-সংবাদ আগামী বারে সমাপ্য।]

পত্রাবলী

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত —

শ্রদ্ধাস্পদেষু

তিন খানি কৃষ্ণচরিত্র পাঠাইলাম
অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি একখানি গ্রহণ করিবেন।
জ্যোতিঃ ও রবি বাবু এখন কোথায় জানি না,
এ কারণ তাঁহাদের জন্য দুইখানি পুস্তক
আপনার নিকটেই পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া
তাঁহাদিগকে দিলে বাধিত হইব। ভরসা
করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি তাং
১২ আষাঢ়

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত —

Benares City
C/o. Dr. Purna Chandra Banerjee
29/ 7/ 99

সবিনয়নিবেদনমিদম

গতকল্য জমিদার শ্রীযুক্তবাবু প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রেরিত শ্রাবণ মাসের দরুণ ১০৲ দশ টাকা পাইলাম। বুঝিলাম ইহাও আপনার দ্বারাই হইয়াছে। এই টাকাটীও কি আপনি পাঠাইবেন না প্রমথ বাবুর বাড়ীর ঠিকানায় লিখিতে হইবে এবং মাসের কোন্ তারিখের মধ্যে লিখিতে হইবে অনুগ্রহ করিয়া ও বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

আমার প্রতি আপনি যে উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার জন্য ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার আমার ক্ষমতা নাই। ইতি

আপনারই
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

P. S. এই পত্রের সহিত প্রমথবাবুকেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া এক পত্র লিখিলাম।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত —

বেনারস সিটি

যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন

জগদীশ বাবুর সহিত যে বিষয়ে কথা হইয়াছে তাহাতে কৃতকার্য্য হইবার আশা থাকিলে বিশেষ সাহায্য হইবার কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি তো সম্প্রতি জড়পিণ্ড মাত্র। না আছে শক্তি না আছে দৃষ্টি। গ্রন্থাবলী হইতে নিজে কবিতা উদ্ধৃত করিয়া শিশুপাঠ্য একখানি পুস্তক করি সে ক্ষমতাটুকু আমার আর কই ? তাহার উপর মুদ্রিত করান আছে। ইহার পরে ডিরেকটার আপিসে বা টেক্স্ট্ বুক কমিটিতে যদি কিছুকাল সাধ্যসাধনা করিবার প্রয়োজন হয় সে অবস্থা তো আর আমার নাই। কবিতাবলী হইতে

কয়েকটী কবিতা লইয়া নূতন সংস্করণ কবিতাবলী নামে পুত্রেরা একটী সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। সেখানি টেক্‌স্‌ট্ বুক্ কমিটি নাকি অনুমোদন পর্য্যন্ত করিয়াছেন এই অনুমোদন করাইতে তাহাদিগকে এক বৎসর দেড় বৎসর ধরিয়া অনবরত চেষ্টা করিতে হইয়াছে। তথাপি আজ পর্য্যন্ত, কোন্ শালে কোন্ পরীক্ষায় পাঠ্য নির্দ্ধারিত হইবে তাহার কিছুই জানা যায় নাই। ' যদি কোনও পরীক্ষায় পাঠ্য না হয় তবে বৃথা। অবস্থা আপনাকে জ্ঞাত করিলাম। আপনি পরম বিচক্ষণ। প্রস্তাবিত বিষয়ে সুফল হইবে এরূপ যদি স্থির আশা করিতে পারেন তবে যাহা সদ্‌যুক্তি হয় পরামর্শ দানে বাধিত করিবেন। ইতি

শ্রীহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত —

ওঁ

ভ্রাতঃ —

আমাদের হিতবাদী বলে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বেরোচ্চে। একটি বড় রকমের কম্পানি খুলে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যাচ্চে। ২৫, ০০০্ টাকা মূলধন। ২৫০্ টাকা করে প্রত্যেক অংশ এবং একশ অংশ আবশ্যক। প্রায় অর্দ্ধেক অংশের গ্রাহক ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। কৃষ্ণকমল বাবুকে প্রধান সম্পাদক, আমাকে সাহিত্যবিভাগের সম্পাদক এবং মোহিনীকে রাজনৈতিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে। বঙ্কিম, রমেশদত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েচেন। যাই হোক্, ইতিমধ্যে দু'তিন মাসের লেখা আমার হাতে জড় না হলে আমাকে ভারি মুস্কিলে পড়তে হবে। আবার, কথা হয়েছে প্রতি সংখ্যায় একটা করে ছোট গল্প থাক্‌বে। তোমাকে এই সঙ্কটের সময় আমার সহযোগিতা করতে হচ্চে। গুটিকতক বেশ ছোট ছোট লঘুপাঠ্য সাহিত্য প্রবন্ধ পাঠাতে হচ্চে।—যত ছোট হয় তত ভাল অতএব সময়াভাবের ওজর ঠিক খাট্‌বে না। বালকে তুমি যেমন বসন্ত উৎসব পাঠশালা প্রভৃতি পাড়াগাঁয়ের চিত্র দিয়েছিলে সেগুলি বড় ভাল জিনিষ হয়েছিল কিন্তু আমি তোমাকে ফরমাস করতে চাইনে। তুমি তোমার কর্ম্মস্থানেরও চিত্র

দিতে পার কিম্বা যা ইচ্ছা লিখ্‌তে পার। এই প্রসঙ্গে আর একটা খবর দেওয়া আবশ্যক—লেখকেরা কাগজের অংশ থেকে কিছু পরিমাণ পারিতোষিক পাবেন।—যাই হোক্ লেখা আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব পাঠাবে। আর যদি এক আধটা share নিতে ইচ্ছুক হও তাও আমাকে লিখো—আর মানসী কাব্যখানা তোমার কেমন লাগ্‌ল সে সম্বন্ধে কোন উচ্যবাচ্য না পেয়ে আশঙ্কা হচ্চে বড় একটা ভাল লাগেনি কিন্তু সে কথাটা স্পষ্ট করে জানালেও বন্ধুত্ব বন্ধনের প্রতি বিশেষ আঘাত পড়বে না নিশ্চয় জেনো। আমার একটি নব কুমারী জন্মগ্রহণ করেচে বোধ হয় পূর্ব্বেই সংবাদ পেয়ে থাক্‌বে। তোমার স্ত্রীপুত্র পরিবার কেমন আছে লিখো।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

ভ্রাতঃ —

আমার দশাও প্রায় তোমারই অনুরূপ। আমাদের এই বিরাহিমপুরের সেরেস্তা সব চেয়ে বিশৃঙ্খল—আমি আজ মাস দুয়ের অধিককাল এটাকে আয়ত্ত করবার চেষ্টায় আছি। এখনো পেরে উঠ্‌লুম না। এককালে এই পরগণা নীলকরদের ইজারাধীন ছিল সেই সময়ে তারা অনাদরে কাগজপত্র সমস্ত নষ্ট করে বসে আছে। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত এখানে গোলমাল চলেই আসছে।—সাধনার প্রথম সংখ্যা কি তোমার হস্তগত হয়েছে? আমার ত সবসুদ্ধ মন্দ লাগ্‌ল না। কিন্তু এর আরো উন্নতি সাধন করা আবশ্যক—আমি রাজধানীতে ফিরে একবার ঐদিকে মনোযোগ করব। আসল কথা, একটা কাগজের ভারি দরকার হয়েছে। অনেকগুলো কথা বলা আবশ্যক, অথচ বড় বড় লোক সবাই নীরব, এবং তাঁদের মধ্যেও দুই একজন নতুন নতুন বুলি বের করচেন। একে ত বাঙ্গালীর বুদ্ধি খুব যে পরিষ্কার তা নয় তার পরে সম্প্রতি হঠাৎ একটা আধ্যাত্মিক কুয়াশা উঠে চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে—সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য্য এবং বৈচিত্র্য এবং সত্য একেবারে লোপ পেয়েচে। দিনকতক খুব কঠিন কথা পরিষ্কার করে বলা দরকার হয়েচে। তুমি কি রাজকার্য্যে এমনি মগ্ন হয়ে

গেছ, যে রাজদণ্ড ছেড়ে লেখনী ধরবার অবসর নেই? একটু আধটু লিখো। সাধনায় কেবলই ঠাকুরের নাম ভাল দেখ্‌তে হয় না। কিন্তু আজকাল তোমাকে লেখাতে অনেক সাধনা চাই, এবং সে সাধনাও সিদ্ধ হয় কিনা সন্দেহ। তুমি কি উড়িষ্যাকে একটুখানি গুছিয়ে নিয়ে বাঙ্গলার দিকে মনোযোগ করবে না? আমরা সকলে আছি ভাল। তুমি এবং শ্রীশানী আমাদের উভয়ের প্রীতি অভিবাদন জান্‌বে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত —

ওঁ

বোলপুর
শান্তিনিকেতন

বন্ধুবরেষু

পাকা ফলের আঁটির মত আজকাল আমি নিজেকে আমার চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছি। জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী ও সুখদুঃখের সমস্ত পরিবেষ্টন হইতে আমি নিজেকে একেবারে আস্ত বাহির করিয়া লইব এই আমার ইচ্ছা। আমাদের এই সংসার-জরায়ুবেষ্টনের বাহিরে যে এক অগোচর অপরূপ জগৎ আলোকে প্লাবিত হইয়া আছে তাহারই মধ্যে ভূমিষ্ঠ হইবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। জড় জগতে জড় শরীর লইয়া জন্মিয়াছি—অধ্যাত্মজগতে আর একটা জন্মলাভ করিতে হইবে তাহা অনুভব করিতেছি। সংসারের সমস্ত বেদনা না থাকাই চিন্তার কারণ। বেদনার দ্বারা সেই আগামী জন্মলাভের দিকে অগ্রসর হইয়াছি—এখন মাঝে মাঝে সে লোকের অপরিস্ফুট পরিচয় যেন পাই, তাহা যে অদূর, তাহা যে সত্য, তাহা যে অসীম রহস্যে পূর্ণ, সংসার যে নিয়ত সেইখান হইতেই তাহার কুক্ষিস্থ আমাদের জন্য রস আকর্ষণ করিতেছে—এবং সেখানে জন্মদান না করিলে সংসার যে আমাদের পক্ষে ব্যর্থ তাহা নিশ্চয় অনুভব করিতেছি। এখন আমি প্রত্যক্ষ আমাকে এবং প্রত্যক্ষ জগৎকে প্রায়ই আমার বাহিরে দেখিতেছি। আপনারা যাহাকে রবীন্দ্র বলিয়া দেখিতেছেন আমিও তাহাকে দেখিতেছি সে তরুলতার

ফুল পল্লবের মত একটা পদার্থ—যদি সুন্দর হইয়া ফোটে ত ভাল—যদি ঝরিয়া পড়ে ত অধিক ক্ষতি নাই—এমন প্রতিদিনই কত হইতেছে যাইতেছে। কিন্তু আমি আছি তাহাকে বহুদূর অতিক্রম করিয়া—আমি আছি যুগ যুগান্তর লোক লোকান্তরের মধ্যে—আমাকে কোন্ সুখ দুঃখে, কোন্ ইতিহাসে, কোন্ জন্মমৃত্যুতে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে! আমি বন্যার প্রবাহের মত তাহাদের উপর দিয়া উদ্বেলিত হইয়া তরঙ্গরূপে অনন্ত বিশ্বাত্মাকে নিরন্তর বিচিত্র করি—আমি বিশ্বপারাবারে নানা আকার নানা সঙ্গীতকে অশেষ গতিদ্বারা নব নব রূপে উৎক্ষিপ্ত করিয়া চলিতে থাকি—আমি নব নব বন্ধনের মধ্য দিয়াও মুক্ত—মুক্তিক্ষেত্রের মধ্যেই আমার নিত্য বিহার—ইহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া আমি যেন আনন্দিত হইতে পারি। ইতি ২৫শে মাঘ ১৩০৯

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

বন্ধুবরেষু

আপনার আহ্বানে আমি বিচলিত, কিন্তু নড়িবার জো নাই। আমার মেজ মেয়ে পীড়িত।

আপনার কন্যার প্রতি আমার অন্তরের আশীর্ব্বাদ রহিল। সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে মঙ্গলে সে নিজের জীবনে ও সংসারে ঈশ্বরের প্রেমকে সর্ব্বদা পরিস্ফুট করিয়া রাখুক্। শ্রী, হ্রী ও ধী তাহার ভূষণ হউক্!

আমার নিগূঢ়তার মধ্যে যে একটি বৃহৎ অতি পুরাতন 'আমি' আছে—যে বিশেষরূপে আমার জীবনের দেবতা—যাহার গভীর গোপন আবির্ভাবের দ্বারাই আমি বিশেষভাবে দেবতাত্মা—যে অতিজগতে বাস করিয়া আমাকে জগতে সঞ্চালন করিতেছে, নানা সুখ দুঃখ অনুকূলতা প্রতিকূলতার ভিতর আমাকে সার্থক করিয়া সার্থকতা লাভ করিবার জন্য যাহার অহরহ চেষ্টা—যে আমার মধ্যে কখনো বিফল কখনো সফল হইয়াও এক মুহূর্ত্ত আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না—যাহার মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের সহিত আমার যোগ,—ঈশ্বরের বার্ত্তা,

আদেশ ও আনন্দ যে আমার মধ্যে আনয়ন ও সঞ্চয় করিবার চেষ্টা করিতেছে, আমার পাপকে দাহন করিয়া আমার পুণ্যকে উজ্জ্বল করিবার জন্য যাহার অহরহ প্রয়াস, আমাকে গড়িয়া তুলিয়া যে সম্পূর্ণতা লাভ করিবে—যাহার শক্তিতে আমি মঙ্গলের মধ্যে অগ্রসর এবং আমার মঙ্গলভাবেই যাহার বলবৃদ্ধি—যে আমার বাহ্যচেতনার অন্তরালে অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া গৃহিণীর ন্যায় আপন গুপ্ত ভাণ্ডারে ক্রমাগতই গ্রহণ বর্জ্জন করিতেছে তাহার সহিত প্রেমের আনন্দে যুক্ত হইয়া পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারিলে তবেই অতিজগতের সহিত জগতের নিত্য প্রেমের সম্বন্ধ আপনার মধ্যেই বুঝিতে পারিব—তখন ঈশ্বর আমাদের নিকট হইতে কোনো অবস্থাতেই ব্যবহিত হইয়া থাকিবেন না। আমাদের প্রত্যেকের জীবনদেবতা বিশ্ব-দেবতার সহিত আমাদের মিলন সাধনের চেষ্টা করিতেছে—নানা ঘটনা নানা সুখদুঃখসূত্রে সে সেই মিলনপাশ বয়ন করিতেছে—মাঝে মাঝে ছিন্ন হইয়া যায় আবার সে জোড়া দেয়, মাঝে মাঝে জটা পড়িয়া যায় আবার সে ধীরে ধীরে মোচন করিতে থাকে—আমার সেই চিরসহিষ্ণু চিরন্তন সহচরটির সহিত—এই সূর্য্যালোকে, এই সমীরণে, এই আকাশের নীলিমা ও ধরাতলের শ্যামলতার মাঝখানে, এই জনতাপূর্ণ বিচিত্র কলরবমুখর মানবসভাপ্রাঙ্গণে এই জীবনেই যেন আমার শুভ পরিণয় সম্পূর্ণভাবে সমাধা হইয়া যায়—আমি যেন তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি ও তাহার দক্ষিণ করতলে আমার দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করি—সে আমাকে যেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইবে সেখানে নির্ভয়ে আনন্দের সঙ্গে যেন যাই—তাহাকে পদে পদে বাধা দিয়া আমাদের মহাযাত্রাকে যেন ব্যাঘাতদুঃখে নিয়ত পীড়িত না করিয়া তুলি। আমার মধ্যে আমার এই চিরসঙ্গীর ছদ্মলীলাই আমার কবিতায় নানা সুরে নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে—তখন তাহা কিছুই জানিতাম না এখন তাহা ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছি। সেই চিরসঙ্গীই আমার অত্যন্ত অপরিণত বয়সেও বিশ্বপ্রকৃতির সহিত আমার দীর্ঘকালের একান্ত আত্মীয়তার পরিচয় কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল এবং চিরসঙ্গীই সমস্ত সুখ দুঃখ বিচ্ছেদ মিলনের মধ্যে এই পরিণত বয়সে পরমাত্মার সহিত আমার সম্বন্ধ বুঝাইবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতেছে। সে আছে, সে আমাকে ভালবাসে, তাহার ভালবাসার দ্বারাই ঈশ্বরের ভালবাসা আমি লাভ

করিতেছি—জগতে যেমন পিতাকে মাতাকে বন্ধুকে প্রিয়াকে পাইয়াছি—তাহারা যেমন জগতের দিক্ হইতে ঈশ্বরের দিকে আমাকে কল্যাণসূত্রে বাঁধিতেছে—তেমনি আমার জীবনের দেবতা আমার অতিজগতের সহচর একটি অপূর্ব্ব নিত্য প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত আমার একটি পরম রহস্যময় আধ্যাত্মিক মিলনের সেতু রচনা করিতেছে। ঠিক বুঝাইলাম কিনা জানিনা, বলিতে গিয়া ভুল করিলাম কিনা জানি না,—কিন্তু আমার কাব্যমেঘকে নানা স্থানেই বিচ্ছুরিত করিয়া এই রকমের কি একটা কথা নানা বর্ণের রশ্মিতে আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে—আমি তাহাকেই ধরিয়া ফেলিবার চেষ্টায় উদয়াচল হাতড়াইয়া বেড়াইতেছি। ইতি ৫ই ফাল্গুন, ১৩০৯

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বন্ধু

আপনি বেশ আরামে আছেন শুনিয়া বড় খুসি হইলাম। শান্তিতে অবগাহন করিয়া এবারে নবীন হইয়া আসিবেন। আমি বিশ্রাম করিতেছি। বেশি কিছু কাজ নাই—ভিতরের ষ্টীম বন্ধ করিয়া দিয়াছি—কলম আর চলিতেছে না—এক ঘণ্টা ছেলেদের পড়াই তার পরে পড়ি, চুপচাপ করিয়া থাকি, গল্পস্বল্পও করি—এক রকম করিয়া কাটিয়া যায়। কিন্তু শরীরটাকে এখনো ভাঁটার লাইনের উপরে টানিয়া তুলিতে পারি নাই— তাই ঠিক করিয়াছি ইস্কুল খুলিলে পর মাসখানেক বিদ্যালয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করিয়া দিয়া অগ্রহায়ণের আরম্ভে একবার পদ্মার হস্তে আমার শুশ্রূষার ভার সমর্পণ করিব। যাই হোক পূর্ব্বের চেয়ে একটুখানি ভাল হইয়াছি বলিয়া মনে হয়। আহারের মাত্রাও কিছু বাড়িয়াছে। কিন্তু এখনো কাজের মত অবস্থা হয় নাই। এই রকম কর্ম্মহীন অপটু অবস্থায় চিন্তা করিবার যথেষ্ট অবসর পাওয়া যায়। তাই এই সময়টুকুতে বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানা কথা ভাবিয়া রাখা যাইতেছে। আমার মনের মধ্যে সমস্ত জিনিষটা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছে—জোয়ারের জলের মত আমার চিত্তকে এক এক ধাপ ডুবাইয়া দিতেছে এবং জোয়ারের জলের মত আমার মধ্যে মহাসমুদ্রের অভিঘাত আনিয়া দিতেছে। আমি অনেক

কথা আভাসে যেন বুঝিতে পারিতেছি, সে সব কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য উৎসুক হইয়া আছি। আপনার বন্ধুত্ব আমার অধ্যাত্ম পথের সহায় হইয়া উঠিবে এই আশা প্রবল হইয়াছে।

Tolstoyর Confession বইখানি পড়িতেছি—অনেক কথা চিন্তা করিবার আছে—শাস্ত্রগ্রন্থের চেয়ে জীবনগ্রন্থ হইতে বেশি আলো পাওয়া যায়। আপনি কি এ বই পড়িয়াছেন ?

এবার তবে বঙ্গদর্শনের সম্পাদককে বঞ্চিত করিবেন না। বঙ্গসাহিত্যের বন্দিশালায় আপনাকে বন্দী করিব এই অভিসন্ধি আমার অনেকদিন হইতে আছে।

জগদীশের সঙ্গে কি দেখা হয় ? ইতি ২১শে আশ্বিন ১৩১০

আপনার

রবীন্দ্র

ওঁ

বন্ধুবরেষু

ঈশ্বর আমার শোককে নিষ্ফল করিবেন না। তিনি আমার পরম ক্ষতিকেও সার্থক করিবেন তাহা আমার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিয়াছি। তিনি আমাকে আমার শিক্ষালয়ের এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিলেন।

আগামী সোমবারে আমরা বোলপুরে যাইব। বিদ্যালয়ের জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন রহিয়াছে।

পচম্বার স্বাস্থ্যকর বায়ুতে আপনি রোগের গ্লানি সমস্তই বোধ করি পরিহার করিতে পারিয়াছেন। কবে আসিবেন ? এবার ৭ই পৌষে বোধ করি বোলপুরে আপনার সাক্ষাৎ পাইব।

গ্রন্থাবলী নূতন আকারে বাহির করিবার জন্য অন্তরের মধ্যে জানি না কেন তাড়া আসিতেছে। তাহা ছাপাখানায় পাঠাইয়াছি।

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতার পুনর্দর্শন

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমি গত পৌষ মাসের প্রথমেই কলকাতা ত্যাগ করেছি। জাপানীদের বোমাবর্ষণের ভয়ে নয়; কেননা, জাপানী আক্রমণে কলকাতা যদি বিধ্বস্ত হয় তো বাংলার অপর কোনো স্থানই যে নিরাপদ হবে না, এ জ্ঞান আমার ছিল। কিন্তু জাপানীদের কর্তৃক রেঙ্গুন ধ্বংস হবার পর কলকাতা ত্যাগ করবার জন্য এ নগরবাসীরা হাজারে হাজারে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। শুনলুম যে স্টেশনে ধাক্কাধাক্কি মারামারি করে রেলগাড়িতে উঠতে হয়। তৎসত্ত্বেও আমি সস্ত্রীক হাওড়া স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হলুম। এবং একটি প্রথম শ্রেণীর অর্ধ কামরায় কষ্টে স্থান লাভ করলুম।

গাড়িতে উঠে দেখি সেখানে আমার দু'টি পরিচিত উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁরা আমাদের সুবিধে করে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আর একটি মাড়োয়ারী দম্পতি ছিলেন, তাঁরাও দেখলুম যথেষ্ট ভদ্র। মানুষের চেয়ে পর্বতপ্রমাণ জিনিসের ঠেলাতেই সকলকে বেশি বিব্রত করে তুলেছিল। অতঃপর কায়ক্লেশে বেলা ২টার কাছাকাছি আমরা শান্তিনিকেতন গিয়ে পৌঁছলুম, ও সেখানে একটানে ৪॥ মাস সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করলুম।

তারপর বিগত ১লা মে তারিখে কিছু বিষয়কর্মসংক্রান্ত কাজে এবং অত্যধিক গরমের প্রকোপে কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হলুম। শান্তিনিকেতনেই শুনেছিলুম যে, কলকাতায় ফেরা অতি কঠিন ব্যাপার;—স্টেশনে গাড়ি পাওয়া যায় না, রাস্তায় আলো নেই, ইত্যাদি কারণে। কিন্তু আমরা রাত ৯॥ টায় হাওড়ায় পৌঁছে ট্যাক্সিও পেলুম, এবং নিষ্প্রদীপটাও এমন ভীষণ বলে মনে হল না।

কলকাতা ছাড়বার আগে যেমন অন্ধকার ছিল, সেইরকমই এখনো আছে দেখলুম। বদলের ভিতর দেখলুম গাড়িভাড়া প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে; হাওড়া থেকে বালিগঞ্জ আসতে ট্যাক্সিভাড়া ৪॥০ লাগল। ট্যাক্সির শিখ

পরিচালক মদের গন্ধে ভুর্‌ভুর্‌ করছিল। তাহলেও আমাদের নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দিল।

মনে হল যে কলকাতা বোলপুরের চাইতে একটু ঠাণ্ডা। রাতটা কেটে গেল ঘুমে। সকালবেলা উঠে শুনি যে নাপিত পাওয়া যাচ্ছে না। এ খবর পেয়ে অস্বস্তি বোধ হল; কারণ ঘুম থেকে উঠে এক পেয়ালা চা না পেলে যেরকম অস্বস্তি করে, নরসুন্দরের অভাবেও তেমনি অবস্থা হয়। আমি নিত্য কামাই, কিন্তু অদ্যাবধি ক্ষুর চালাতে শিখিনি।

পাড়ার আত্মীয়স্বজনের বাড়ি সব শূন্য। বেশির ভাগ সকলে আমার পিঠ পিঠ কলকাতা ত্যাগ করেছেন, বোমার ভয়ে। দিনটা একরকম কেটে গেল। গেরস্তালির বিষয় নিয়ে আমি জীবনে কখনো মাথা ঘামাইনি। শুনলুম যে, নুন পাওয়া যাচ্ছে না। আমি অল্প বয়সে তেল-নুন-লক্‌ড়ি নামক একটি প্রবন্ধ লিখি। যেমন নুন যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনি তেলও— অর্থাৎ মোটরের তেল—পয়সা দিলেও কিনতে পাওয়া যায় না। ফলে বাস্‌ এবং ট্যাক্সিতে এ-পাড়া ও-পাড়ায় যাতায়াত একরকম বন্ধ। শুনেছি যে transport যুদ্ধের সময় একরকম বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতা শহরে যুদ্ধ না আসতেই, আসন্ন সমরের ভয়ে লোকে একপ্রকার পঙ্গু হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা আমার চাকর খুঁজেপেতে একখানা ঠিকে গাড়ি নিয়ে এল; তার ঘোড়া খোঁড়া, গাড়িটি অর্ধভগ্ন, এবং উচ্চ পাদানিতে ভর দিয়ে আমার পক্ষে ওঠা কঠিন। চলবার সময় এত বেশি ঝাঁকানি লাগে যে, গাড়ির এক পাশ থেকে আর-এক্‌ পাশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও যাতায়াত করতে হয়। নিজের ঘরের গাড়ি থাকলেও বিশেষ সুবিধে হয় না। প্রথমতঃ তৈলাভাব, দ্বিতীয়তঃ চালক পলাতক। পা-ও এখন আর চলে না। তাই নিরুপায় হয়ে এই এক্কায় সন্ধ্যাবেলা বেরিয়ে পড়লুম। দেখা পেলুম একমাত্র আমার বন্ধু শ্রীঅতুল গুপ্তের। তাঁর পরিবারও তিনি তাঁর স্বদেশ রংপুরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কথাবার্তায় বুঝলুম তিনিও জাপানী আক্রমণের ভয় পান,—নিজের জন্য নয়, স্ত্রীপুত্রের জন্য।

তার পরদিন রবিবার। সকালবেলা খবরের কাগজে দেখি যে, যুদ্ধের খবর যেমন সংক্ষিপ্ত, তেমনি দুর্বোধ। বাঙলার নূতন কবিতার মতো। বেলা ১১টার পর প্রমাণ পেলুম যে, যাঁরা কলকাতায় থাকতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা

মুখে জাপানী আক্রমণ সম্বন্ধে উদাসীন হলেও মনে মনে আমাদের মতোই সমান যুদ্ধভয়ে ভীত। বেলা ১১॥টার পর আমি স্নান করে বেরিয়েছি, এমন সময় শঙ্কাধ্বনি শোনা গেল। যেমন ভূমিকম্পের একটু নাড়া দিলেই চারিদিকে শঙ্খধ্বনি শোনা যায়, তেমনি আকাশে জাপ বিমানের ছায়া দেখলেই এই শঙ্কাধ্বনি বেজে ওঠে। এই দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, শঙ্খধ্বনি শুনলে আমরা ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ি; আর শঙ্কাধ্বনি শুনলে তেমনি বাইরে থেকে ঘরে ঢুকি। ও ধ্বনি শোনবামাত্র কলকাতা-রহেনাওয়ালারা চীৎকার করতে শুরু করলেন এই বলে যে, 'বাড়ির ভিতর যে ঘরে বালির বস্তা আছে, সেই ঘরে সকলে চলে এসো।' আমরা পড়ি-মরি করে নিচে যাচ্ছি, এমন সময় নিঃশঙ্কধ্বনি বেজেছে বলে খবর পেয়ে নিশ্চিন্ত হলুম।

তারপর আমার হিন্দুস্থানী নাপিত এসে বললে, 'ও বোমাকা শিঠি কুছ্ নেই হ্যায়। এতোয়ার এতোয়ার হামলোককো ডরানেকে লিয়ে ফুজুল্ অ্যায়সা আওয়াজ করতা হ্যায়।' কিন্তু শিক্ষিত লোক যে এ ধ্বনি শুনে বিশেষ ত্রস্ত হয়ে পড়েন, সে বিষয় সন্দেহ নেই।

যুদ্ধ এখন মাথার উপর ঝুলছে। কবে যে আমাদের মাথার উপর ভেঙে পড়বে, তা কেউ জানে না।

পূর্বে বলেছি যে, কলকাতায় নুন পাওয়া যায় না, কেরোসিন পাওয়া যায় না, কয়লা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য। উপরন্তু ওষুধও পাওয়া যায় না। আর যা পাওয়া যায়, তার দাম হয়েছে দ্বিগুণ। জার্মান ও ফরাসী ওষুধ তো পাওয়া যায়ই না; বিলিতী ওষুধও বড়-একটা আসে না। পাওয়া যায় শুধু আমেরিকান ওষুধ। তাও দুর্মূল্য হয়েছে। ওষুধও হচ্ছে একটা জিনিস, যার উপর বর্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা ওষুধের অভাবে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছি।

যুদ্ধ এখনো বাঙলায় আসেনি; কিন্তু তার কুফল সব ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। কলিকাতাবাস এখন আরামেরও নয়, নিরাপদও নয়। রাস্তায় দেখতে পাই, লরি-বোঝাই-বোঝাই বস্তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু সে-সব চালের বস্তা নয়, বালির বস্তা। তা ছাড়া ঘেরাটোপ দেওয়া লরি-বোঝাই গোরাও দেখতে পাই। লোকজন বড় দেখা যায় না।

কলকাতায় ছাত্রসমাজ কম নয়। ইস্কুল কলেজ সব বন্ধ বলে তারা প্রায় সকলে শহর ত্যাগ করেছে। পরীক্ষা অবশ্য চলছে। কিন্তু পরীক্ষার্থীরা সকলেই বিদেশের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে। এ ব্যাপার আমি বোলপুরেই দেখে এসেছি। পরীক্ষার্থীদের ভিড় সেখানেও কম নয়।

কলকাতা ক্রমে ক্রমে বাঙলার শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এর পরে যে আবার তা হবে, আমার তা বিশ্বাস নয়। শিক্ষাহীন কলিকাতা আমি কল্পনাও করতে পারিনে। শুনতে পাচ্ছি মফঃস্বলের নানাস্থানে কলকাতার ইস্কুলকলেজের শাখাপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ভবিষ্যতে সে-সব শাখা যে শুখিয়ে যাবে, আমার তা মনে হয় না। এর থেকে বোঝা যায় কলকাতা যে ভেঙ্গে পড়ছে, তার লক্ষণ চারদিকে দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় যে লোক নেই, বাড়ি আছে, তার প্রমাণ দু'দিনেই পেয়েছি। আমার পরিচিত যত লোকের বাড়ি গিয়েছি, তার দরজা বন্ধ। এঁরা সব আমাদের সমশ্রেণীর লোক, উপরন্তু আমাদের মতোই ইংরাজীশিক্ষিত। তাঁরা স্থানান্তরে যাওয়াই নিরাপদ মনে করেছেন। এঁদের ভিতর কেউ কেউ শুধু বিলেতফেরত নন, উপরন্তু জাপানফেরত। কেউ কেউ আবার শ্যাম জাভা ও বলিদ্বীপের সঙ্গে পরিচিত। আজকাল যে-সব দেশকে আমরা বৃহত্তর ভারত বলি, সে-সব দেশ এঁরা চোখে দেখে এসেছেন। এই বৃহত্তর ভারত এখন বৃহত্তর জাপানে পরিণত হবার উপক্রম হচ্ছে। এই কারণেই কলিকাতাবাসীরা ভীত হয়ে উঠেছে। ফলে কলকাতার ভবিষ্যৎ ভেবে নগরবাসীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, ও ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

এই নির্জন ও নীরব গৃহগুলি দেখে মন খারাপ হয়ে যায়। ধ্বংসপুরী দেখতে মন্দ লাগে না—কিন্তু জনহীন পুরী আমাদের মনকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে। আর যে-সব গৃহে লোক আছে, তার অনেকগুলিই baffle wall দ্বারা রক্ষিত। সে-সব বাড়িতে ঢোকা মুশকিল। এ-সব প্রাচীর গৃহবাসীদের কতটা রক্ষা করবে জানিনে— বর্তমানে শুধু আতঙ্কটাই বাড়াচ্ছে।

এই জ্যৈষ্ঠ মাসে মাঝে যেমন গরম তেমনি গুমোট। মাথার উপর মেঘ ঝুলছে, কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি হচ্ছে না।

কলিকাতাবাসীদের মনোরাজ্যে এখন ভয়ংকর গুমোট। এই মনের গুমোট অসহ্য। আমরা খোলা হাওয়ায় মানুষ হয়েছি মনোরাজ্যে।

একদিকে নিষ্প্রদীপ, অন্য দিকে মনটাও নিবাত নিষ্কম্প। এ অবস্থা যে মনের আরামের অবস্থা নয়, তা বলা বাহুল্য। কলকাতা দেখে আমার চোখও জুড়োয় না, মনও প্রসন্ন হয় না। আর এ অবস্থায় যে আর কতদিন থাকতে হবে, তাও কেউ জানে না। আমি লিখছি আর আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরছে।

কলকাতার লোকেরাই যে শুধু ত্রস্ত হয়েছে, তা নয়; পশুপক্ষীরাও সমান আশঙ্কাগ্রস্ত। গত ১লা জুন শঙ্কাধ্বনি এখানে মিনিট দশেক ধরে হয়েছিল। আমরা উপর থেকে নিচে নেমে গেলুম, আর এ বাড়ির নেড়ীকুত্তারা নিচে থেকে উপরে উঠে এল। পরে বিপদ কেটে গেছে শুনে উপরে ফিরে এসে দেখি একটা কুকুর জিভ বার করে হাঁপাচ্ছে। বাড়ির একটি লোকের কাছে শুনি যে, শঙ্কাধ্বনির অর্থ কুকুররাও বোঝে। আমি মনে করেছিলুম যে গরমে কুকুরটা হাঁপাচ্ছে। জাপানীদের সঙ্গে কুকুরদের যে টেলিপ্যাথি হয়, সে ধারণা আমার ছিল না। কুকুরগুলো সে সময় ভাঙাগলায় ভেউ ভেউ করেনি, যা চব্বিশ ঘণ্টা করা তাদের স্বভাব। জাপানী রেডিওতে বলেছে যে বোমা তারা দেশী কুকুরের উপর ফেলবে না, ফেলবে শুধু বিলিতী কুকুরের উপর। অবশ্য জাপানীদের কোনো কথা কুকুররাও বিশ্বাস করে না। Zoo আমি দেখতে যাইনি। জনরব, Zoo এখন পিঁজরাপোল হয়েছে। সিংহব্যাঘ্রাদি সব নিস্তেজ নির্বীর্য হয়ে পড়েছে, খইয়ের মোয়ার মতো জাপানী poodle-দের আক্রমণের ভয়ে। ঘরের কোণে এখন চড়াই নেই। কাক নির্বিকার। এরোপ্লেনের পাখার ঝাপটা শুনলে তারা আগের মত আর কা কা করে না। চিলও দুটি একটির বেশি দেখা যায় না। মানুষ ও পশুপক্ষী এখন সমবস্থ।

কলকাতা কোনোকালেই প্রিয়দর্শন ছিল না। কিন্তু এখন দস্তুরমতো অপ্রিয়দর্শন হয়েছে। কলকাতার আর কিছু না থাক, প্রাণ ছিল। এখন তার নাড়ি বেজায় ক্ষীণ হয়েছে। কলকাতা ত্যাগ করতে আমারও কোনো আপত্তি নেই। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন। বৃষ্টি পড়লেই আমি কলকাতা ত্যাগ করব।

আর্টপ্রসঙ্গ *

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাল বিকেলে বসে বসে ইণ্ডিয়ান আর্টের গোড়াকার কথা ভাবছিলুম। পুবের আর্টের থেকে বিমুখ ছিলেম তখন সবাই। আমার ওর থেকে কিছু যে পাবার আছে মনেই আসতো না। যখন পুবের আর্টের দিকে ছাত্রদের চোখ ফেরানোর কাজ আমার উপরে পড়লো তখন কী উপায় করা যায়। জোর করে ঘাড় ফেরাতে গেলে নিজের দেশের আর্টের দিক ছেলেরা ভাবতে পারে—জবরদস্তি করছি, সেইজন্যে প্রথম প্রথম আমি যেমন ছোট ছেলেকে ভোলায় একটু রং, একটু রূপ, একটু রস নিয়ে কারবার শুরু করলেম। এমনি করে ভুলিয়ে তাদের চোখ একদিক থেকে আর একদিকে ফিরিয়ে দিলুম। আমার দাদা এসে দিলেন একটু ধাক্কা। তখনকার মডার্ন ইওরোপিয়ান আর্ট—যা এখন পুরানো হয়ে গেছে ভূকম্পনের একটা দোলার মতো নাড়া খেলে গুরু শিষ্য সবার মনে; দুলেছিল মন; কিন্তু টলেনি পা নিজের পথ ছেড়ে।

তারপর রবিকা চিত্রকর্মে হাত দিলেন। রবিকা যা আঁকলেন তা নতুন নয়। যখন সবাই বললে—'এ একটা নতুন জিনিস', আমি বললুম, 'নতুন নয় এ।' নতুন হতে পারে না। রবিকা আমাকে একবার বললেন—'আচ্ছা, অবন, এই যে কিউবিজিম্ এলো এটা কিছু বুঝতে পারছিনে,—তুমি কী বলো? বুঝিয়ে বলো তো।' আমি বললুম—'কী আর বলব রবিকা, রাধারও প্রেম আর কুব্জারও প্রেম। কিউবিজিম্ তো নয়, কুব্জাইজিম্ বলতে পারো।' শুনে রবিকা খুশী হয়ে উঠলেন। বললেন—'কথাটা বলেছ ভালো অবন।'

তাই বলছি—রবিকার আঁকা ছবিকে তো কিউবিজিম্ বলা যায় না,

* গত ফাল্গুনে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কিছুদিন ছিলেন। সেই সময় একদিন কোণার্কের বারাণ্ডায় বসে নন্দলাল বসু, ক্ষিতিমোহন সেন প্রভৃতির সহিত আচার্যদেবের আর্ট সম্বন্ধে যে আলোচনা হয়, তারই সারাংশ শ্রীমতী রানী চন্দ এই প্রবন্ধে সংকলন করেছেন। — সম্পাদক

নতুনও বলতে পার না। রবিকার ছবিতে যা আছে তা বহু আগে থেকে হয়ে আসছে। যে সব রং নিয়ে উনি কারবার করেছেন নেচারে সে সব আছে। মাঠের ডিজাইন, নদীর জলের ডিজাইন,—দেখো, সব ছড়ানো আছে। রবিকার ছবিও এসব থেকেই হয়েছে। তাকে নতুন বলব কোন্ হিসেবে? সবই ছিল, সবই আছে নেচারে। রবিকার ছবিতে নতুন কিছু নেই, অথচ তারা নতুন—আমার শুধু এই আশ্চর্য ঠেকে! কেমন করে এই মানুষের হাত দিয়ে এই বয়সে এই জিনিস বের হোলো। অতীতের কতখানি সঞ্চয় ছিল তাঁর ভিতরে। অতি গভীর অন্তরের উষ্মা ও তাপে এই রং রূপ সমস্তই যেন প্রকৃতির খেলাঘরের লুকোনো সামগ্রী হঠাৎ আবিষ্কারের আনন্দ দিয়ে নির্মিত; ফেটে বেরিয়েছে, রূপ পেয়েছে। এই যে একটা volcanic ব্যাপার—এ থেকে শিখতে পারবে না, হবে না তা। ভল্‌কানিক্ ইরাপ্‌শনের মতো এই একটা একটা জিনিস হয়ে গেছে। এ থেকে আর্টের পণ্ডিতেরা কোনো আইন বের করে যে কাজে লাগাতে পারবে আমার তা মনে হয় না। ভেবে দেখো, এত রং, এত রেখা, এত ভাব সঞ্চিত ছিল অন্তরের গুহায় যা সাহিত্যে কুলোলো না, গানে হোলো না—শেষে ছবিতেও ফুটে বের হতে হোলো—তবে ঠাণ্ডা। আগ্নেয়গিরি—একটা পাহাড়, যখন তার ভিতরে ধাতু গলে টগ্‌বগ্ করে ফুটতে থাকে—পারে না আর ধরে রাখতে, ফেটে বেরিয়ে পড়ে,—চারদিকে ছড়িয়ে যায় তবে পাথর ঠাণ্ডা হয়; এও ঠিক সেই ব্যাপার। যা করে গেছেন রবিকা তা এক একটি ছোট ছোট lava-র টুক্‌রো—ওঁর ভিতরে ছিল। সবাই এ জিনিস বোঝে না। আগ্নেয়গিরির কবল থেকে আগুন আহরণ করে আনা যে কত শক্ত ব্যাপার—সে কি সবাই পারে? আগে জ্বালা ধরুক তবে প্রকাশ পাবে। রবিকা বলতেন—'আমার আঁকা ছবি যখন দেখি, যেন কোন্ অতীত কালের জিনিস বলে মনে হয়।' কত বড়ো কথা। কত এগিয়ে চলে যেতেন যে কয়েক বছর আগের তাঁরই আঁকা ছবি তাঁর নিজের কাছেই কোন্ অতীত কালের ব্যাপার বলে মনে হোতো।

গাছগুলো যে বীজ থেকে ঠেলে উপরে ওঠে, ঝড় ঝঞ্ঝা সয় কেন? মাটির নিচে থাকলেই তো পারতো। পারে না ভিতরে থাকতে, মাটি ফুঁড়ে আলো আকাশের দিকে বেরিয়ে পড়ে, চারদিকে হাত বাড়িয়ে ডালপালা

বিস্তার করে, ফুলে ফলে পাতায় ভরে উঠে রূপ রংএর ফোয়ারা ছিটিয়ে প্রকাশ পায়। রবিকার জিনিসও তাই। এরকম কেউ পারে না—তা নয়। হয়ে গেছে, এই নেচারেই কত হয়ে গেছে। দেখছিলুম আজ একটা গিরগিটি, এই একটা গিরগিটি, একটা ঝিনুকের মধ্যেও সব রং আছে। এই সব সঞ্চয় ছিল তাঁর। আমারও সঞ্চিত ছিল, দিতে পারলুম না ; তাই আঁকুপাঁকু করি, ভাবি কী করলে কোন্ সাধনা করলে দিতে পারি এই জিনিস। আমি অল্প একটু দিতে পেরেছি ; ছোট্ট চড়ুই পাখি, তার ছোটবুকে করে যেমন বাচ্চাকে মানুষ করে, ছোট চঞ্চুতে করে খাইয়ে তাকে বাঁচায়। তবু এখনও আমি যেটুকু দিতে পারি, যেটুকু জোর পাই, তোমরা তাও পার না। না দেওয়ার দুঃখ যে কত।

ছবির গোড়াকার কথা হচ্ছে রূপভেদ। একটা গাছকে দেখছি—দেখি তার ভিতর human quality। রবিকা গান গেয়েছেন—'তুমি কে গো ? আমি বকুল।' যেন কিশোরী মেয়েটি ঝরে যাবে দুদিন বাদে। 'তুমি কে গো ? আমি পারুল।' হাসিখুশিতে ভরা, আর সাজসজ্জার বাহারে উজ্জ্বল, তার যেন বিশেষ একটা গর্ব আছে। 'আমি শিমূল'—একটু লজ্জিত, একটু কুণ্ঠিত,—যেন সুকুমারী। তিনি তো শুধু ফুল দেখেননি, দেখেছেন তার ভিতরে এই সব human quality-র রূপ। এই যে রূপভেদ—আমরা দুই-ই দেখি। মানুষের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা, তাই এসে যায় মানুষই। রূপ is form, চোখে দেখি, মনেও দেখি। দুটো রূপ। মানুষের মনে যা দেখি তা মানুষিক ভাব, আর চোখে দেখি প্রকৃতির ভাব। এ দুই মিলিয়ে সৃষ্টির পরিপূর্ণতা। দুই-ই থাকা চাই। মনের দেখাও থাকা চাই, চোখের দেখাও থাকা চাই। রবিকার গানে কথা ও সুরের পরিণয় হয়েছে। তার মাধুর্য আশ্চর্য জিনিস। আবার একরকম গান, তাতে সুর আছে শুধু। কিন্তু তাতেও একটা feeling আছে।

সুর মানে accent। তাতে মনের ভাব, রাগ অনুরাগ ধরা দেয়—ভিতরে পৌঁছয়। সাধারণ কথারও সুরের তফাতে মানে বদলায়।

শুধু রংএর বা form-এরও একটা appeal আছে বৈকি।

বর্ণের significance—যেমন নীল ফুলটি, লাল ফুলটি চোখে লাগে বেশ।

অনেক সময়ে মনেও বেশ লাগে। মনটা বিক্ষিপ্ত আছে—কালো মেঘ করে এসেছে—দেখে মনটা শীতল করে। চক্ষুরও তাই, সবুজ রং—খোলা বিস্তীর্ণ মাঠ দেখে চোখটা জুড়োয়। আমরা যখন ছবি আঁকি, কালো রং বুলোই, তখনও আমরা রং দেখি। কালো শুধু কালো নয়। রাত্তির যেমন কালো হলেও, সব রংই তাতে থাকে—এও তাই।

আমাদের আগে তিনরকমের ছবি হয়ে গেছে। মোগল ছবি, পারসিয়ান ছবি, অজন্তার ছবি। এ তিনের তফাৎ আছে, কিন্তু তিনটিই ভালো। ছোট বড় নেই। মোগল ছবি একটু realistic। পোট্রেট যা করেছে লাইট-শেড পড়েছে—মানুষগুলি মানুষঘেঁষা মানুষ। ফুলগাছ বা নেচারের অন্য দিকটা তারা বেশি নেয়নি; মানুষের পিছনে যা একটু আধটু দিয়েছে। ঐ পর্যন্তই। রেমব্রেন্ট আর একটু বড়, তিনি লাইট-শেডের কোয়ালিটি বাড়িয়েছেন; কিন্তু মানুষের বাইরে যেতে ততটা সাহস করেননি।

পারসিয়ান ছবি, সেও একটা বড় জিনিস। তাতে realistic-এর দিকটা চেপে গেছে। তারা চিত্র লিখে গেছে। তারা রেখার ভঙ্গীতে ভাব ফুটিয়েছে। মেয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, মাথার উপরে willow গাছটি ঝুলে পড়েছে। সেখানে রেখার ভঙ্গীই আসল। মানুষকে তারা পুতুল সাজিয়েছে। মুখের ধরনও বেশি এগোয়নি, তারা একটা ধারা বেঁধে নিয়েছে পুরুষে মেয়েতে। তারপর সব পুরুষের বা সব মেয়ের মুখেতে আর পার্থক্য বা বিশেষত্ব রাখেনি।

অজন্তা—আমার মনে হয় এগুলো কেভের ভিতর বুদ্ধের জীবনচরিত লেখার মতো। চরিত্রচিত্রন, ভিত্তিচিত্রন, সব বলতে পার—সারি সারি আছে। যথেষ্ট রস নিয়ে কারবার নেই—সেটা পৃথক ধরনের ছবি। ভাব-রাজ্যের দূত তারা। ভাবুক হয়তো বোঝে সে ছবি, নয়তো এড়িয়ে যায় দৃষ্টি। তারা সবকিছু এমন-কি বুদ্ধকেও একটা ধারায় ফেলে নিয়েছিল। দু'একটি প্রিমিটিভ মেয়ে ছাড়া। বোধহয় যখন ওঁরা কাজ করতেন গাঁয়ের মেয়েরা এসে দাঁড়াতো সেখানে, তাঁদের কাজ দেখতো—শিল্পীর চোখ তা এড়ায়নি। তাদের ছাপ পড়ে গেছে ছবিতে। মুঙ্গেরে আমার হোতো এই রকম। ছবি আঁকতুম—পিঠের দিকে গাঁয়ের ছেলেমেয়ের ভিড় জমে যেত।

হ্যাঁ, বুদ্ধের মূর্তির কথা বা নটরাজের মূর্তির কথা বলি। তাঁদের যা মূর্তি হয়েছে, মানুষ নয়—একটা টাইপ সৃষ্টি করেছে। সে সব মূর্তির ভিতরে মানুষ পাচ্ছি অথচ তা ছাড়িয়েও আর-একটা কিছু পাচ্ছি। কত বুদ্ধের মূর্তি ভেঙ্গে গেছে—নাক মুখ নেই, হয়তো কোথাও কোথাও মাথাটাও নেই, তবু বুদ্ধ বলে মনে হয় কেন? তা হচ্ছে, লাইনের ভঙ্গী। একটি লতা বেয়ে বেয়ে উঠেছে লতানো একটি লাইন, তখনি তার ভঙ্গী রয়ে গেল। সেই ভাবেই appeal করে জলের ঢেউ, হাওয়ার গতি, মেঘের খেলা; সোজা লাইন, তালগাছ সোজা উপরে উঠে গেছে—তারও একটা বিশেষ ভঙ্গী আছে। আসল realism হচ্ছে এইখানে; কারণ নেচারের 'ল' শান্ত হতে হলে যা ভঙ্গী দরকার তা তারা বুদ্ধমূর্তির জন্য নিয়েছে।

ভারতবর্ষ এই যে একটা টাইপ সৃষ্টি করেছে তা এম্‌নি এম্‌নিই হয়ে ওঠেনি। তার ভিতরে আছে নেচারের intimate স্টাডি। নিখুঁত স্টাডি করে তবে তারা এক একটি ধারা তৈরি করেছে, যার জোরে ভাঙা মূর্তিতেও বুদ্ধকে পাই।

লাইনের গুণ নিয়ে, রংএর গুণ নিয়ে convention সৃষ্টি করেছে। চোখে পড়ে আপনিই সব। form-এর ভাষা—আপনিই এসে আমাদের কাছে পৌঁছয়। বলতে পার তবে, ঐ সব দেশের লোক নানা যুগে নানা ভাবে ছবি আঁকলে কেন। কথা হোলো, যে যেভাবে রস ঢেলে দিতে চাচ্ছে সেই সব আর্টিস্ট, তারা দেশ কাল পাত্রের বাইরের মানুষ। তারা উপাদান সংগ্রহ করে বাইরে দেয়। যেমন করে সংগ্রহ করে মধুকর মধু নানা ফুল থেকে বেছে বেছে। তারই মধ্যে যে জায়গায় যে ফুলের আধিক্য বেশি—মধু যখন খাই তারই গন্ধ পাই। কোনটা কমলালেবুর মধু, কোনটা নিম ফুলের মধু—এমনি কত ফুলের সৌরভ—তা টের পাই। মোগলছবি মোগলরা আঁকত বলেই বলে না। তাতে মোগলদের সৌরভ পৌঁচেছে। এটা উপাদানের আধিক্যে হয়।

Colour-এর association আছে বৈকি। তাও একটা বড় জিনিস। বাসর ঘরে যখন কনে লালশাড়িটি পরে ঢোকে—সেই লাল রংটি কি মনে নাড়া দেয় না? আবার সেই লাল শাড়ি-পরা কনেটিই যখন শাদা শাড়ি পরে বাপের ঘরে আসে বুকের ভিতর সে কী যে করে ওঠে। চোখের জল চেপে রাখা যায় কি? Colour-এর association তেম্‌নি নাড়া দেয়।

তবে এই association একেবারে personal জিনিস। সেটা প্রধান জিনিস নয়। আমার ছেলেটা কালো হোক যা-ই হোক তার সঙ্গে যেই আত্মীয়তা, তার কান্নার সুরটা যেমন কানে লাগে, অন্য ছেলেতে কি তা হয়? মায়ার মতো জড়িয়ে রাখে, সে জাল ছিঁড়ে অন্য যে জিনিস আছে তা নিতে হবে। বুদ্ধের ভাঙা মূর্তিতে association ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে। যাতে সবাইকে সে একই ভাবে নাড়া দেয়।

এই ধরো পাকুড় গাছটি, সেটি আমি লাগিয়েছি বলে আজ তোমার কাছে তার আদর। যখন তুমি আমি আর থাকব না, তখন এই association-এ তো কারো কাছে পাকুড় গাছ ধরা দেবে না। Association ছাড়া যে একটা জিনিস আছে তাতেই সবাইয়ের কাছে একদিন ধরা দেবে, ডালপালা মেলে বড় হবে, ছায়া ফেলবে, লোক বসবে সেই ছায়াতে, পাখি বাসা বাঁধবে, গান করবে। গাছ চায় পাখি,—পাখি চায় গাছ।

Association নিয়ে ঢুকে তা ছাড়িয়ে উঠবে। নয়তো তুমি যা পাচ্ছ অন্যে তা পাবে না। ধরো না, এই গাছ যখন হয় মাটিতেই হয়। মাটি ফুঁড়ে সে ওঠে, আকাশের গায়ে ডালপালা মেলে ধরে,—চারিদিকে শোভা বিস্তার করে। মাটিতে থাকে সে, কিন্তু মাটির কথা তার মনে থাকে না—অন্য জিনিসে চলে যায়।

এখন মানুষের পক্ষে রুচিকর কোন্‌টা সেটাই দেখতে হবে। মানুষের রুচি অনুসারে রস মিলিয়ে পরিবেশন করতে হবে। এই ধরো, এই যে ছেলেমেয়েদের রবিকা এখানে ধরে এনেছেন, এই প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র আলোবাতাস গাছপালা থেকে তারা কিছু পাবে—তাদের রুচি বদলাবে। মানুষের মন সহজে টানে একটু realism-এর দিকে।

যেটা চোখে দেখছি সেটা মনেও দেখতে হবে। কিন্তু হায় মনে যা দেখছি চোখের দেখার সঙ্গে তাকে মেলাতে গিয়েও বারে বারে ঠেকছি। এই হোলো আর্টের খেলাঘরের আসল খবর। রংএ, লেখায়, রেখায় বাঁধা পড়েও পড়ছে না মনের মানস এই চরম রহস্য আর্টের,—ওর ভেদ কেই বা জানে, কেই বা জানাবে।

চারযুগ আগে

বাবামহাশয়ের আলাপ আলোচনার আসরে উপস্থিত থাকার সুযোগ ছেলেবেলায় অনেক সময় পেয়েছি। অল্প বয়সেই দিনপঞ্জী রাখার উৎসাহ বেশি দেখা যায়—জীবনের প্রতি ঘটনাই ছেলেদের কাছে মূল্যবান, নিষ্ঠা ও বিশ্বাস যা না হোলে ডায়ারি লেখা হয় না, তখন যথেষ্ট। সম্প্রতি আবিষ্কার করলুম আমারও অল্প বয়সে দিনপঞ্জী রাখার অভ্যাস ছিল। এমন কি বাবামহাশয়ের কথাবার্তার অনুলেখন রাখবার চেষ্টা থেকেও বিরত হইনি, যদিও তা নিতান্তই দুঃসাহসিকতা বই কিছু না। তাঁর মুখের কথার অনুলেখন নেওয়া এমনিতেই দুঃসাধ্য—বয়সও তখন কম, ভাষাজ্ঞান সীমাবদ্ধ, সব কথা যে বোধগম্য হোতো তাও নয়।

এই ধরনের কয়েকটি অনুলেখন কিছুদিন আগে আমার পুরানো কাগজপত্রের মধ্যে পেলুম। এদের ঠিক অনুলেখন বলা সঙ্গত হবে না, কেননা লেখাগুলোর মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যা সংশোধন-সাপেক্ষ। তবু বাবামহাশয়ের মতামত হিসাবে হয়তো তাদের মূল্য আছে, এই ভেবে আমি এই লেখাগুলি সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করেছি।

'ধর্ম' সংক্রান্ত আলোচনাটিতে তারিখ দেওয়া আছে ২রা অগস্ট। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের একটি বিশেষ ঘটনারও উল্লেখ আছে—যোগরঞ্জনের মৃত্যু। যতদূর স্মরণ হয়, এই ঘটনার সন ও মাস হবে শ্রাবণ, ১৩১০—আজ থেকে ৩৯ বছর পূর্বের ঘটনা। তখন আমরা গিরিডিতে, বাবামহাশয়ের বিশেষ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বাসার পার্শ্ববর্তী বাংলোতে কিছুদিন ছিলুম। সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ভি রায়, শশিভূষণ বসু প্রভৃতি যখন দেখা করতে আসতেন তখন প্রায়ই নানা বিষয়ে আলোচনা চলত, সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও আমি ঘরের এক কোণে বসে আবিষ্টমনে শুনতুম ও খাতায় নোট লিখে রাখতুম। দ্বিতীয় লেখাটি (মেয়েদের অধিকার) বাবামহাশয়ের জবানিতেই লেখা। সন তারিখ দেওয়া আছে—২রা বৈশাখ, ১৩১২। — শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধর্ম

মনোরঞ্জনবাবুর ছেলে যোগরঞ্জন শুক্রবার দিন বিদ্যালয়ে মারা গেছে। মনোরঞ্জনবাবু তাঁর ছোট ছেলে দেবরঞ্জনকে নিয়ে আজ সকালে এসেছেন। আমরা সকলে তাঁর বাড়িতে গেলুম। Spiritualism সম্বন্ধীয় অনেক ঘটনা ও গল্প শোনা গেল। যদি এগুলো সত্যি হয় তাহলে সত্যই আশ্চর্যের বিষয়।

বিকেলে মনোরঞ্জনবাবু এলেন। বাবার সঙ্গে অন্য কথা হ'তে হ'তে ধর্মের কথা উঠল। বাবা বলতে লাগলেন ঃ

আমি 'ধর্মপ্রচারে' বলতে চেষ্টা করেছিলুম যে ধর্মকে একটা বিশেষ স্থান বা বিশেষ সময় বা বিশেষ কথার সঙ্গে জড়িত করলে সেটা ধর্ম হ'ল না। ব্রাহ্মসমাজে এই ভাবটি খুব আছে। যে যে-পরিমাণে উপাসনাশীল সে সেই পরিমাণে ধার্মিক—এটি বড়ো ভুল ধারণা। আমি চোখ বুজে ঈশ্বরের ধ্যান করলুম, মনেতে হয়তো একটু ভাবও এল, কিন্তু তারপরে যখন বাইরে গেলুম, যার সঙ্গে শত্রুতা ছিল সে শত্রুই রইল। জগৎ আমার কাছে আগে যে রকম ছিল সেই রকমই রইল, সকলকে আপনার বন্ধুর মতো দেখলুম না—একে কি ঈশ্বরের উপাসনা বলব! অনেক লোকে এরকম ভাবে মনে করে সত্যিই ঈশ্বরকে ধারণা করেছি—নিজেদের নিজেরা প্রতারণা করে। এ একরকম মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌। খোলের আওয়াজে যে অনেক সময়ে ভাব হয়, সেও একরকম মেস্‌মেরিজ্‌ম্‌।

আমার কাছে ধর্ম ভারি concrete—যদিচ এবিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরকে কোনোরকম উপলব্ধি করে থাকি বা ঈশ্বরের আভাস পেয়ে থাকি, তাহলে এই সমস্ত জগৎ থেকে, মানুষ থেকে, গাছপালা পশুপাখি ধুলোমাটি—সব জিনিস থেকেই পেয়েছি। আমি ধুলোকে ধুলো নাম দিয়েছি ব'লে তার কি অন্য কোনো significance নেই। আমরা এই জগতের অধিকাংশ জিনিসকেই জড় নাম দিয়ে আমাদের বাইরে ঠেলে রেখে দিই। আমি এই সমস্তের মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করি। আমার কাছে ধুলো কেবল ধুলো নয়, গাছ কেবল গাছ নয়, ফুল কেবল ফুল নয়; তাদের মধ্যে একটা deeper significance আছে ব'লে মনে হয়। আকাশে বাতাসে জলে সর্বত্র আমি তাঁর স্পর্শ অনুভব করি। এক এক সময় সমস্ত জগৎ আমার কাছে কথা কয়।

আমি এইজন্য বলি ঈশ্বরকে একটা বিশেষ উপায়ের ভিতর দিয়ে, একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্বারা পাবার দরকার নেই। সর্বত্রই, লোকজন জড়প্রকৃতি সকলের ভিতরেই তাঁকে পাওয়া যায়। আর আমার তো মনে হয় এইটেই স্বাভাবিক উপায়। আমি ভারি positivist। আমি যখন ঈশ্বরকে উপলব্ধি

করব তখন সকল জিনিসের ভিতরেই তাঁকে দেখব—সব জগৎ আমার আপনার হবে, আমি সকলকে ক্ষমা করতে পারব, সবেতেই তাঁর মঙ্গলময় হাত দেখব, জগতের মধ্যে একটা harmony অনুভব করব।

১৭ শ্রাবণ, ১৩১০

মেয়েদের অধিকার

একটি ঘটনার পর থেকে আমি মেয়েদের কথা প্রথম ভাবি। বাড়িতে তেতালার ছাত, তার নিচেই দোতালার ঢাকা বারান্দা। একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখলুম একটি মেয়ে উপরের ছাতে চঞ্চলভাবে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে উপরের দিকে নুড়ি ছুঁড়ছে—তার মধ্যে কেমন একটা লীলার, একটা চঞ্চলতার ভাব। নিচের বারান্দায় ঠিক সেই মুহূর্তে আরেকটি মেয়ে ধীর ভাবে তরিতরকারি কুটছে।

এই ছবি দেখে আমার মনে হ'ল যে মেয়েদের মধ্যে দুরকমের ভাব আছে—একটা স্ত্রীর ভাব, আর একটা মা'র ভাব। একটা মনোহরণ, চিত্তরঞ্জন করার ভাব—অন্যটা মঙ্গলের ভাব। যেটাতে ক'রে মনোরঞ্জন, সেটা হ'ল সৌন্দর্য বা লীলার ভাব।

পুরুষের শক্তির মধ্যেও দুরকমের ভাব আছে—একটা বাহুবলের শক্তি, আর-একটা জ্ঞানের শক্তি। শারীরিক শক্তি উপার্জন করবার জন্য এক ধরনের জ্ঞানের দরকার, সেটাও আমি শক্তির মধ্যে ধরছি। এক্ষেত্রে জ্ঞান মানে wisdom। Spartan-দের মধ্যে এই বাহুবলের শক্তির একদিন খুব চর্চা হয়েছিল। এই শক্তিলাভের জন্য তারা নানারকম কঠোরতার ভিতর দিয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। পুরাকালে এই রকম বাহুবলের খানিকটা দরকার ছিল। তখনকার দিনে সবই ছিল অনিশ্চিত। লোকে তখনও বাসা বেঁধে শান্তিতে বসবাস করার অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারেনি।

Homer-এর ইলিয়ডে দেখবে সব জায়গায় বাহুবলেরই সম্মান। রামায়ণ ও মহাভারতে ঠিক তার উলটো রকমের ভাব—বাহুবলের চেয়ে জ্ঞানের শক্তির বেশি আদর। এটা আমি কেবল কথায় কথায় বললুম, কিন্তু

এ একটা মস্ত কথা। এ সম্বন্ধে যথার্থ আলোচনা আজও হয়নি। আমি হয়তো নিজের দেশের প্রতি একটা মমত্ব থেকে এ কথা বলছি; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে অনেকগুলি বিষয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের একটা মূলগত ভেদ আছে।

ওদের দেশে মেয়েদের স্ত্রীভাবকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বেশি। সেখানে মেয়েরা আছে কেবল পুরুষদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে। সৌন্দর্যের দ্বারা লীলার দ্বারা তাদের অভিভূত করবার জন্যে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোককে মা ব'লে মানে—তাই এত সহজে সকলকে মা সম্বোধন করে। ইউরোপের মেয়েরা মনোহারিণী ব'লে ওদেশে chivalry-র উদ্ভব। সেখানে পুরুষরা মেয়েদের মনোহরণ করবার শক্তির কাছে নিজেদের বাহুবলের হীনাংশকে সমর্পণ করে।• এ আত্মসমর্পণ একটা ছলের মতো—পুরুষরা মেয়েদের দাস, এরকম ছিল না।

আমাদের দেশে মেয়েদের এভাবে দেখা হয় না ব'লে পাশ্চাত্য দেশ আমাদের গালাগালি দেয়। যে কোনো ভাব পরিপুষ্টি লাভ করার জন্য অনুকূল ও বিস্তৃত ক্ষেত্র সন্ধান করে। ইউরোপে সমস্ত সমাজের মধ্যে স্ত্রীলোকের দাম্পত্য ভাবটি বিস্তৃত ক্ষেত্র পেয়েছে। সেখানে রমণীর প্রথম ও প্রধান কাজই হ'ল পুরুষকে তার সৌন্দর্য দ্বারা, কমনীয়তা ও রমণীয়তার দ্বারা মুগ্ধ করা—আমোদ দেওয়া। তারা যে কেবল স্বামীর চিত্তরঞ্জন করে তা নয়, সমস্ত পুরুষেরই চিত্তরঞ্জন করে; বরঞ্চ স্বামীর বেলাতে একটু মঙ্গলের ভাব। স্ত্রীলোকের মধ্যে মঙ্গলের ভাব না থেকে পারে না, দুভাবই থাকতে বাধ্য।

ইউরোপে এই মঙ্গলের ভাবটা গৃহে বদ্ধ। সেখানে স্ত্রী তার স্বামী ও মা তার পুত্রকন্যাদের সঙ্গে মঙ্গলের ভাব রক্ষা করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমার বক্তব্য হ'ল এই যে এই মঙ্গল ভাব ইউরোপে বিস্তার পায়নি, কেননা তাদের সমাজের গঠন অন্য রকমের। সেখানে গৃহ বলতে কেবল স্বামী ও স্ত্রী ও তাদের সন্তানসন্ততি বোঝায়; সব যেন একটা 'বেরোও বেরোও' ভাব—সবাই স্বাধীন, সকলেই নিজেদের স্ত্রীসন্তানাদি নিয়ে আছে, তাদের বাড়ির গণ্ডীর ভিতর আর-কারো প্রবেশনিষেধ। গৃহ যেখানে সংকীর্ণ সেখানে মাতার

মঙ্গলের ভাবও সংকীর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু মনোহারিণী বৃত্তিটি ওদেশে সেই পরিমাণেই যেন বিস্তার লাভ করেছে।

সেখানে স্ত্রীকে বহু পুরুষের সঙ্গে মিশতে হয়, সকলের মনোরঞ্জন করতে হয়। সকলে তাদের কাছে এইটাই চায় ব'লে মেয়েদেরও যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হয় এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য। বুড়ো বয়সে যখন চুলে পাক ধরেছে, যখন স্বভাব দুহাত তুলে বলছে 'আর থাক্', তখনো ঝুটো দাঁত ও পরচুলোর সাহায্যে তাদের নবীনা সাজতে হয়। cosmetics ও make-up শিল্পের দিন দিন ইউরোপে ক্রমোন্নতি হচ্ছে এই জন্যেই। একটি কথা এখানে স্বীকার করতেই হবে, বহুলোকের সঙ্গে মেলামেশা ও আদানপ্রদানের ফলে মেয়েদের সংস্কৃতিরও একটা উন্নতি হয়।

আমাদের দেশে আবার ঠিক উলটো, আগেই সে কথা উল্লেখ করেছি। স্ত্রীলোকের মাতৃভাব এদেশে খুব বিস্তৃত ক্ষেত্র পেয়েছিল—এই ভাব পরিপোষণ করেছিল এদেশের একান্নবর্তী পরিবার প্রথা। ইউরোপে যেমন মঙ্গলের ভাব স্বামীতেই আবদ্ধ—সে রকম আমাদের দেশে দাম্পত্যের ভাব কেবল স্বামীতেই আবদ্ধ, মঙ্গলের ভাব সকলের প্রতি উন্মুখ। পাড়াপ্রতিবাসী, ছেলেমেয়ে, ভাইপো-ভাইঝি, দেওর-ঠাকুরঝি ইত্যাদি সকলের প্রতি তার মাতৃভাব ধাবিত। মা যখন ছেলেকে আহার পরিবেশন করেন তখন তার মধ্যে দাসত্বের কোনো ভাবই আসতে পারে না। তাতে তাঁর মাতৃস্নেহের ভাবই সূচিত হয়। মা তাঁর মাতৃত্বের দাবিতেই ছেলের সেবা করতে পারেন। এই মাতৃভাব কেবল তাঁর সন্তানের প্রতি ধাবিত তা নয়, এই ভাবে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে তিনি সকলের সেবা করেন। এই জন্যই মাতৃভাব আমাদের দেশে এত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পেয়েছিল।

ইউরোপে মা হওয়া ওদের কাছে ক্রমশ বিভীষিকার মতো হয়ে উঠছে। মেয়েরা বিদ্রোহ করছে যে তারা গর্ভধারণের দায়িত্ব ও যন্ত্রণা ভোগ করবে না। সেখানে মায়ের সম্মান নেই। মা হ'য়ে encumbered হ'য়ে পড়া ওরা দাসত্ব মনে করে, তাই ওরা যৌবনকে আঁকড়ে ধ'রে রাখতে চায়। সমাজে যেখানে ওদের স্থান সেখানে যৌবন ও সৌন্দর্যলীলাচাপল্যই হ'ল তাদের প্রধান অস্ত্র ; সে অস্ত্র যদি হারায় তবে ওদের দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। মা হ'তে গেলে সে

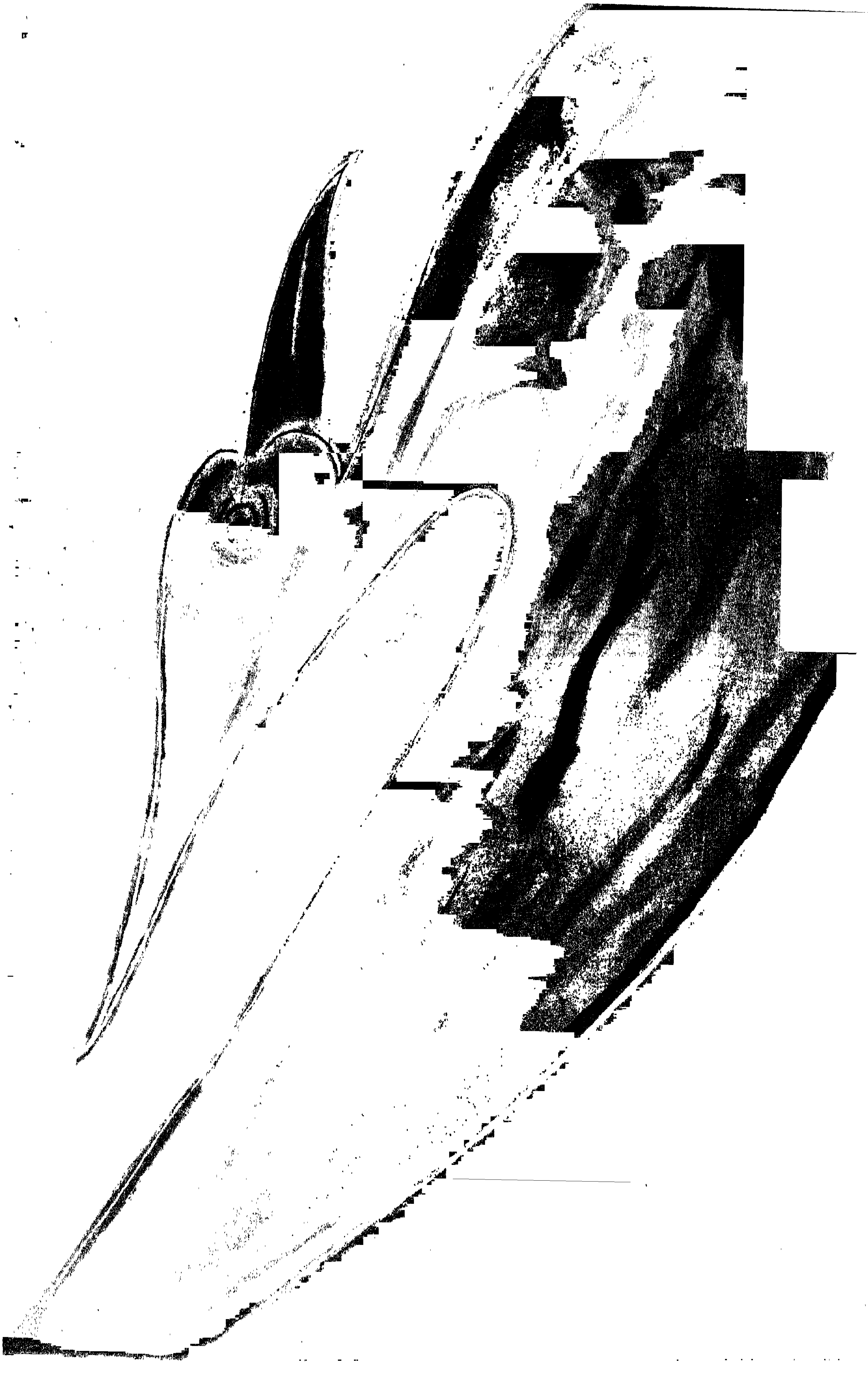

সব-কিছু যদি বিসর্জন দিতে হয় তাহলে ওদের চলে না। আমাদের দেশে একটি সন্তানের জন্য স্ত্রীলোক কত মানত, কত ব্রত, পূজাপার্বণাদি করে। ইউরোপে মেয়েদের চেষ্টা হ'ল যাতে ছেলেপিলে না হয়।

আমাদের দেশে স্ত্রীজাতি জগতের জননী, এখানে তিনি পুরুষের মা ব'লে পূজিত। ইউরোপে সে শুধু পুরুষের নর্মসহচরী—স্ত্রী। আমাদের দেশে বিধবাবিবাহ চলে না। যদি স্বামীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর সমাজের সঙ্গে যোগ শেষ হ'ত, তবে অন্য স্বামী নেওয়া ছাড়া তার উপায় থাকত না। কিন্তু তা তো নয়, স্ত্রী যে সমস্ত পরিবারের সঙ্গে সর্বতোভাবে জড়িত। সে-সমস্ত বন্ধন ছিঁড়ে সে কেমন ক'রে যাবে? ইউরোপে বিধবাবিবাহ একটা প্রয়োজনের ব্যাপার। স্বামী তার একমাত্র সম্বল, সে যদি যায় তবে অন্য স্বামী সংগ্রহ-করা ছাড়া তার অন্য গতি থাকে না।

আমাদের দেশে যারা ওদেশী প্রথামতো পরিবার থেকে এভাবে ছিটকে পড়েছে, তাদের কথা আলাদা। তাদের পক্ষে বোধহয় বিধবাবিবাহ প্রথাই ভালো। আমাদের দেশেও দেখছি একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছে, স্ত্রীলোকের সেই মাতৃভাবের দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। আগে কোথাও যেতে হ'লে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা ছিল না, সম্ভব হ'ত না। কারণ স্ত্রী তো কেবল স্বামীর নয়, সে হ'ল সমস্ত পরিবারের, তাকে কেবল নিজের সুখের জন্য ব্যবহার করা লজ্জাকর হ'ত। তবে লজ্জাও হয়তো মানত না, যদি বাইরে গতিবিধির সুযোগ থাকত। আজ সেই সুবিধে হয়েছে ব'লে স্ত্রী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

সমাজে এই যে হাওয়া-বদলের যুগ এল জানি না কোথায় এর পরিণতি—কল্যাণের দিকে না কোনো অশুভ সম্ভাবনায় এর শেষ কে জানে।

২ বৈশাখ ১৩১২

বীরবলী ভাষাশিল্প

শ্রীনবেন্দু বসু

বাঙলা ভাষার ক্ষেত্রে ঘরোয়া বাঙলা বা কথ্য ভাষার প্রতিষ্ঠা বলে এক কথায় বীরবলী ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, আর কেরী, মার্শম্যানের সময় থেকেই পণ্ডিতী বাঙলার সঙ্গে সঙ্গে এ ভাষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে আর বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্নের ভাষার পাশাপাশি টেকচাঁদ আর হুতোমের ভাষাও বিকাশ পেয়েছে, একথা বলে এ ভাষার ইতিহাসও রচনা করা যায় না।

ইতিহাসের কথাই যদি আগে ধরি, তাহলে দেখতে পাই যে আলালী বা হুতোমের ভাষায় এমন কিছু ছিল (আর এমন কিছু ছিলও না) যার জন্যে সে ভাষা সাহিত্যের ভাষায় পরিণত হতে পারত না আর পারেও নি। তখন যে ইংরাজী শিক্ষা, সংস্কৃতি আর চিন্তাধারা বাঙলায় ভাল করে শিকড় নেয় নি বলে আলালী আর হুতোমী ভাষা মুষড়ে গেল আর পরে ঐ সকল প্রভাবের সাহায্য পেলে বলেই বীরবলী ভাষা শাখা-পল্লবিত হয়ে উঠল তা নয়। আসলে টেকচাঁদ আর কালীসিংহ প্রভৃতি যে ভাষার ব্যবহার করেছিলেন, তা দক্ষতার সঙ্গে করলেও, তার শক্তি বা সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে করেন নি। বিষয়গুলি ব্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে বোঝাবেন বলে তাঁরা মনস্থ করেছিলেন, তাই যেন জেনে শুনে তখনকার মতন রসিকতার আর পথঘাটের ভাষাই ব্যবহার করে গেলেন। কোনো গুরু বিষয়ে চিন্তামূলক লেখা লিখতে হলে তাঁরা যে ঠিক কি ভাষা কাজে লাগাতেন "আলালের ঘরের দুলাল" বা "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" তার কোনো নির্দেশ দেয় না। মহাভারতের অনুবাদে কালীপ্রসন্ন আর তাঁর পণ্ডিত সহকারীরা কি ভাষা নিয়োগ করলেন? কোথায় গেল হুতোমের ভাষা? এর পরেও বঙ্কিম সাধুভাষা বনাম ঘরোয়া ভাষা প্রসঙ্গে কোনো স্পষ্ট পথ দেখালেন না।

বীরবলী ভাষার ইতিহাস তাই মনে করি আর কিছু। সে ভাষা তার ইতিহাস রচনা করেছে নিজেই। এটা বুঝতে রসসাহিত্যের ভাষা হিসাবে বীরবলী ভাষার মূল প্রকৃতি কি তাই বোঝবার চেষ্টা করতে হয়। শিল্পী বা

রসসাহিত্যকারের নিজস্ব আদর্শবাদ, রহস্যবোধ, বা স্পষ্টতঃ বলতে গেলে, ভাবচিন্তার ভিত্তিতে বিশ্বাসধারার স্বরূপ আর ভঙ্গীই তাঁর রচনার আঙ্গিক নির্ধারিত করে। বীরবলী বিশ্বাসভঙ্গী বিস্তৃতভাবে এখানে আলোচনার বিষয় নয়। বীরবলের একটু উদ্ধৃতি থেকেই তার কতকটা খবর পাওয়া যাবে। বুদ্ধদেব প্রসঙ্গে এক স্থানে অন্যান্য কথার পর তিনি বলছেন :—

"বুদ্ধদেব ছিলেন অদ্বিতীয় লোকোত্তর পুরুষ। সুতরাং তাঁর ভক্তেরা সহজ বিশ্বাসেই এই মহাপুরুষের জীবনে অনেক অতিমানব ঘটনার আরোপ করেছেন; এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সাধারণ মানুষের মনে একটা ভক্তিমূঢ়তা আছে; সেই ভক্তির মোহ যখন তাকে পেয়ে বসে তখন তার মন ও দৃষ্টি হয়ে যায় বিহ্বল। তখন সে ভুলে যায় যে বাস্তবের সংযত সীমার মধ্যেই মহামানবের মাহাত্ম্যের যথার্থ প্রতিষ্ঠা, তার মধ্যে অলৌকিকত্বের অত্যুক্তি আনলে যথার্থ মানুষকে খর্ব করা হয়। সাধারণ সত্যের মধ্যেই অসাধারণ সত্যের প্রকাশ, এ কথা তারা ধারণাই করতে পারে না যাদের অসংস্কৃত মন, যাদের বুদ্ধি দুর্বল। আমাদের দেশে সদ্যস্ক বর্তমানেও মহাপুরুষদের সম্বন্ধে আমরা অতিকারপরায়ণ মোহান্ধ দৃষ্টির আবিলতা বিস্তার করে থাকি প্রতিদিন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই কারণেই একদা ঐতিহাসিক মানুষ বুদ্ধকে তাঁর ভক্তেরা ইতিহাসের অতীত অপ্রাকৃত করে তুলেছিল। এই ছেলেমানুষির দ্বারা ইতিহাসকে বঞ্চনা করলে সমস্ত মানুষকে আমরা হারাই। এত বড় ক্ষতি আর কী হতে পারে।" [প্রাচীন হিন্দুস্থান—পৃঃ ৮১—৮২]

এ লেখার জোর থেকে এর অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের দৃঢ়তা আর আন্তরিকতা প্রমাণিত। সে বিশ্বাসের প্রকৃতিটি কি? জীবনের বাস্তবতার তীব্র তীক্ষ্ণ স্পষ্ট বোধ, সেই সঙ্গে রহস্যবোধও। একটা ভাববাদ বস্তুবোধকে সর্বক্ষণ রসলোকের সম্পত্তি করে তুলছে।

দ্বিতীয়তঃ বীরবলী রহস্যবোধ অবস্থিতি করছে ভক্তিমূঢ়তার সমস্ত জ্বাল দেওয়া রস ও খাদ বাদ দিয়ে উজ্জ্বল মুক্ত সহজ স্বপ্রতিষ্ঠ নিষ্ঠার রূপে। এখানেই শেষ নয়; পাছে খাদ মেশে তাই বুদ্ধি ও মননের শোধন তার ওপর দিয়ে চলছেই। সজাগ বিচারদৃষ্টির দুর্গে তার রক্ষণ।

এই মনোভঙ্গীই বীরবলী ভাষাশিল্পে রূপায়িত। সে ভাষাবিন্যাসে

মননের দিকটা তো সকলে লক্ষ্য করেই থাকেন আর তার বিষয়ে লেখায় কথায় বলেনও। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত রচনাটির সংহত আবেগ আর সরসতার সংক্রামণ যে ভাবে উপলব্ধিকে কবলিত করে সেটার সম্বন্ধে কে সন্দিহান হবে?

এ ছাড়া ঐ ভাষাবিস্তারে ভাবপর্যায়ের যোগস্থলগুলিতে ভাবালুতার মূঢ় মোহের আঠার জোড় নেই আর বহিরঙ্গে আবিলতার প্রলেপ নেই। এ সকল রীতির পরিবর্তে পাই পরিশুদ্ধ হৃদয়বোধের ন্যায়নিয়ন্ত্রিত, অনাড়ম্বর, স্থিরলক্ষ, সুষ্ঠু প্রয়োগে আঙ্গিকের গ্রন্থি-সংকলনের ঔৎকর্ষ্য যেটা নীরব বিস্ময়ে স্বীকৃত হতে বাধ্য।

বীরবলী ভাষাভঙ্গী তাই মননশীল তথ্যের ভাষার খ্যাতি পেলেও শিল্পের ক্ষেত্রে রসের ভাষা বা language of power হিসাবে তার ক্ষমতা আর পরিসর বাঙলা সাহিত্যের মহার্ঘ সম্পদ। আর তার সংযমের বাঁধ, তার দৃঢ় discipline, তার শক্তির ক্ষয় হতে দেবে না। আলালী, হুতোমী ভাষার এ প্রাণশক্তি ছিল না।

মননের প্রয়োগে কি ভাবে রসাবেগের ভাষাকে সুস্থ, সতেজ ও শক্তি-সম্ভাবনায় সুযোগ্য করে তোলা হয়েছে তার কারণ ও লক্ষণবিচার অসম্ভব নয়। আবেগধারার অবতারণা ও সংগঠনে প্রযুক্ত হয়েছে বিশ্বাসের জোর, বিচারের সিদ্ধি, যুক্তির পারম্পর্য, অবিচলিত স্পষ্ট লক্ষ আর অর্থের প্রাঞ্জলতা। ফলতঃ অভিব্যক্তিতে ফুটে ওঠে একটা সহজ ত্বরিত গতিবোধ, ঋজুতা ও দৃঢ়তা বা energy, আন্তরিকতা ও আগ্রহপ্রসূত ধ্বনিবোধ আর চিত্তজয়ী সংক্রামকতা। বাক্যধারার গঠনে ধরা যায় আড়ম্বরহীনতা বা বলতে পারি নিরাভরণতা, শব্দরাজির ভরাট অথচ অর্থস্বচ্ছ বিন্যাস, যতির সুচিন্তিত প্রয়োগ, প্রয়োজন-সঙ্গত সুতেজ, স্পষ্ট, শক্তিশালী এবং অর্থ আর সঙ্কেতে সমৃদ্ধ কথার চয়ন, ভাষার ব্যাপারে কুসংস্কারপূর্ণ জাতীয়তার অভিমান বর্জন করে।

ওপরে যে ভাষার বর্ণনা করা হল ওটাকে আজকের শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তার আদানপ্রদানের বা কথার ভাষা বলে অভিহিত করায় কোনো দোষ দেখি না। ওর ওপর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সংস্কৃতি ও চিন্তার প্রভাব মানতেও কোনো আপত্তি নেই। যা পেয়েছি তা হল বাঙলা সাহিত্যে একটা সহজ স্বাভাবিক প্রাণবন্ত শক্তিশালী সরস গদ্যের আবির্ভাব; একটা ভদ্র সুরুচির

ভাষা, রসলাবণ্য যাঁর আছে কিন্তু সংযমে যে অভিজাত ; সম্ভ্রম আর কৌলিন্য যার ন্যায়সংগতি আর প্রাসঙ্গিকতায়।

রসসাহিত্যের জন্য বাঙলায় এই যে ভাষাশিল্প তৈরি হয়ে গেল এর সঠিক আর পূর্ণ ব্যবহারের দিন এখনো আসা বাকি আছে। এর ব্যবহারে কখনো অসুবিধা ঘটবে না, কেননা এর ধর্মের ভিত্তিই হল এই যে, যে কোনো উদ্যোগীর যেটা আন্তরিক নিজস্ব ভাষা সেইটেই হবে এই ভাষা ; কোনো ছাঁচে ঢালা আদর্শের কাঠামো তাকে পীড়িত করবে না ; সে হবে মুক্তির ভাষা অথচ নিজের সংযমের বন্ধনে হবে নির্দোষ ও শুদ্ধ ; আর যথেচ্ছাচার আর বিশৃঙ্খলতা থেকে থাকবে যোজন যোজন দূরে ; কৃত্রিমতার লেশবিহীন হয়ে নিজস্ব প্রকৃতিতে বিভিন্ন হাতে সে হয়ে উঠবে বিচিত্র, অথচ মূলধর্ম আর লক্ষণে হবে জাত ভাষা— অভিজাত ভাষা।

কাজের ভাষা আর রসের ভাষার কল্পিত দ্বিত্বকে, কারুশিল্প আর চারুশিল্পের মধ্যে বিচারদোষ-প্রসূত ব্যবধানকে আমরা আমাদের সংস্কারের বশে বাড়িয়েই চলেছিলুম। শিল্পের ইতিহাসের গোড়ার দিকে কারিকরই হ'ত পরিকল্পনাকারী বা designer আর artist। আজ ধনতন্ত্র আর সহজ লাভের ব্যবস্থাতেই দুজনে আলাদা হয়ে পড়েছে আর আমরাও তাই কাজের ধারণার সঙ্গে রূপরসের ধারণাকে মেলাতে পারি না। বীরবলী ভাষাভঙ্গী দেখিয়ে দিয়েছে যে শিল্পরচনার কারুতাই কি ভাবে চারুতার আকর হয়, ন্যায়নিষ্ঠা হয় গঠনমর্যাদার ভিত্তি।

বীরবলী ভাষাশিল্প সম্বন্ধে বর্তমানে শেষ কথা এই যে শক্তিশালী শিল্পীর ব্যঞ্জনাপদ্ধতিতে তার একটা ব্যক্তিগত রীতি প্রকাশ পেতে পারে। বীরবলী ভাষার ধর্ম ও লক্ষণের আনুষঙ্গিক হিসাবে তাতে আছে বিশ্লেষণী শব্দসম্ভার, নিক্ষিপ্ত বাক্য, বিরোধালংকার, শ্লেষ, বিরোধী উক্তি প্রভৃতি। এইগুলিকে একত্রিত করে সাধারণতঃ বীরবলীভাষা বলে পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই বহিরঙ্গের ভঙ্গীগুলিতে মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হবার কথা নয়। ভাষার মূল প্রকৃতিই মুখ্য। বিস্ময় চমৎকৃতির চেয়ে বড়। বাঙলা গদ্যের ভাষা অনুকূল পরিবেশে আরো দৃঢ়মূল আর প্রাণপ্রচুর হবে। তখন বীরবলী ভাষাশিল্পকে উপলক্ষ করে এই বিস্ময়ের পরিসর আরো বিস্তৃত হবে।

সঞ্চয়ন

শিক্ষাপ্রণালী নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামিয়ে থাকেন গোড়াতেই তাঁদের মুশকিল হয় স্থির করা মানুষের ব্যক্তিত্বকে কতখানি তার পরিবেশ গড়ে তোলে আর কতখানিই বা তার বংশানুক্রম নির্দিষ্ট করে দেয়। ইস্কুল কমিটির কাছে মাস্টারদের সব সময়েই কৈফিয়ত দিতে হয়, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না কেন। এ বিষয়ে বিজ্ঞান কী বলে সে সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ সেদিন নজরে পড়ল Nature কাগজে।

আমেরিকার জীববিজ্ঞানী Blakeslee এই বিষয়ে আলোচনাসূত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর ঝোঁক দিয়ে নানান উদাহরণ তুলে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে প্রকৃতিতে সাম্য বলে কিছু নেই। একই গাছের কোনো দুটো পাতা ঠিক একরকম হয় না। বাইরের চেহারায় যেমন পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী, জীবের শারীরিক ইন্দ্রিয়শক্তির মধ্যেও যথেষ্ট তফাত দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে মানুষের ক্ষেত্রে মনের গঠন বা মননশক্তি একরকম হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা শিক্ষার গুণে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের বিকাশ কতকটা অগ্রসর হতে পারে, কিন্তু কায়েমী উন্নতির পথে তা বেশি দূর এগোয় না। সুগন্ধি কোনো ফুল পাঁচজনকে শুঁকতে দিলে দেখা যায় কারো কাছে তার তীব্রতা অসহ্য, আবার কেউ কোনো গন্ধই পায় না—প্রত্যেকেরই ঘ্রাণশক্তির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। এ বিষয়ে নিম্নশ্রেণী জন্তুদের মতো আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় তেমন তীক্ষ্ণ নয়। তবু দেখা যায় ছোটো শিশুরা অনেক সময় গন্ধ শুঁকে মানুষ চিনতে পারে। বয়সের সঙ্গে সেই শক্তি ক্রমে আমরা হারাতে থাকি। স্বাদ সম্বন্ধে আমরা জানি প্রত্যেক লোকেরই রুচি কী রকম বিভিন্ন। একজন যে খাদ্য উৎসাহ সহকারে খেয়ে তৃপ্তি বোধ করবে, অন্য লোকে সেই জিনিসই হয়তো ঘৃণার চোখে দেখবে।

ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে আমরা বহির্জগতের পরিচয় পাই, সেই পরিচয়ের মাত্রা কতক পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া ক্ষমতা ও কতক আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করে দেখতে পাই। কিন্তু নিজেরই মধ্যে যে মননশক্তি বা বিচারবুদ্ধি আছে তার বেলাও যে এই নিয়ম খাটে, সাহিত্য ও শিল্পকলাক্ষেত্রে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন, প্রত্যেক কবির কল্পনা ও প্রকাশকৌশলের মধ্যে কত তফাত। এদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় না পেলেই সমালোচকেরা আপত্তি করেন। যে সব আদালতে এক বেঞ্চে একাধিক জজ বিচার করতে বসেন, তাঁদের মধ্যে সকলের একমত হতে প্রায়ই দেখা যায় না।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা চেষ্টা করে আমরা বদলাতে পারি, কিন্তু মানুষের বেলায় তার বংশানুক্রমের উপর আমাদের হাত নেই। সামাজিক উন্নতির একমাত্র উপায় তাহলে

মানুষের মানসিক পরিবেশের উন্নতিসাধন। ইতিপূর্বে এই কাজ করার ভার নিয়েছিলেন ধর্মযাচক ও শিক্ষকরা। তাঁরা ক্রমাগত চেষ্টা করেছেন তাঁদের আদর্শ অনুযায়ী একটা বিশেষ ছাঁচের মধ্যে ফেলে মানুষকে গড়ে তোলবার। উৎসাহের চোটে ভুলেই যেতেন বংশানুগত পার্থক্যের কথা, সকলেরই সমান অধিকার ধরে নিয়ে এক নিয়মে বাঁধাধরা প্রাণালীতে সকলকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছেন।

সব মানুষের বুদ্ধি যে এক মাপের এক ওজনের নয় এবং তাদের ক্ষমতার গতি যে বিভিন্ন দিক নিতে পারে গভর্নমেণ্ট-প্রচলিত সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী তা অবজ্ঞা করে এসেছে এতদিন পর্যন্ত। Blakeslee সাহেব American Association for the Advancement of Science-এর ভূতপূর্ব ১৬ জন সভাপতিকে প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন গভর্নমেণ্ট-প্রবর্তিত মধ্যমশ্রেণীর (Secondary) বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতে তাঁরা নিজেদের উপযুক্ত মনে করেন কি না। যে মাপকাঠিতে বিচার করে এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, তাঁরা সকলেই জবাব দেন যে কেউই তাঁরা তার উপযুক্ত বলে নিজেদের মনে করেন না। এই ঘটনা এই ১৬ জন মনীষীর অক্ষমতার পরিচয় নিশ্চয়ই দেয় না, যে নিয়মে বা আদর্শে এখনকার বিদ্যালয়গুলি চালিত তার ভিতর কোথাও গলদ আছে, সেইটাই প্রমাণ হয়। শিক্ষাপ্রণালীর উপরই বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়; শিক্ষার বিষয় বা তদপেক্ষা বড়ো জিনিস শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব—তার যেন কোনো মূল্য নেই।

Mass Education-এর কুফল সম্বন্ধে মাত্র সম্প্রতি আমরা একটু বুঝতে আরম্ভ করেছিলুম, এমন সময়ে এলেন রাষ্ট্রতন্ত্রীরা। তাঁদের হাতে আরো বেশি ক্ষমতা, রাজশাসনের জগন্নাথের রথ চালিয়ে দিলেন সমাজসংস্কারের কাজে। Totalitarian শাসনতন্ত্রে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের কোনো স্থান নেই। এই রাষ্ট্রবাদে সাধারণ মানুষের অধিকার কেবল যে অসম্মানিত তা নয়, তার ব্যক্তিত্বকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। অথচ বিজ্ঞানসমর্থিত ক্রমোন্নতিবাদের ভিত্তিই হ'ল জীবের প্রকৃতিগত ভেদপ্রবণতা, গণতন্ত্রবাদের সঙ্গে জীববিজ্ঞানের এই জায়গায় বিরোধ নেই। Totalitarian রাষ্ট্রনীতির সাময়িক অগ্রগতি যতই চোখে পড়ুক না কেন, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে সে বেশি দূর যেতে পারবে না। তার ভিতরে এত বড় অসত্য আছে যে, আপাত সুবিধা থাকলেও সে কোনো মতেই টিকে থাকতে পারে না। র-ঠা

... ...

Nature-এর ঐ একই সংখ্যায় শ্রীনিবাস রামানুজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বন্ধে অধ্যাপক E. H. Neville লণ্ডন বেতার প্রতিষ্ঠানে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারাংশ প্রকাশিত হয়েছে। ইংরেজরা বিদেশীর স্তুতি সাধারণত সহজে করতে চায় না—বিশেষত ভারতবাসীর। তার ভালো রকম প্রমাণই পাওয়া গিয়েছিল লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিসভায়,

তাঁর ইংরেজ বন্ধু ও ভক্তদের বক্তৃতাগুলিতে। রামানুজন এ বিষয়ে ভাগ্যবান। তাঁর মতো মনীষীর যে সম্মান প্রাপ্য E. H. Neville তা দিতে একটুও কার্পণ্য করেননি।

দক্ষিণভারতের অঞ্জোর জেলার ইরোদ গ্রামে ১৮৮৭ সালে রামানুজনের জন্ম। তাঁর পিতা দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সেইজন্য তাঁর পুত্রের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেননি। এণ্ট্র্যান্স পরীক্ষা দিয়ে কলেজে ভর্তি হবার পূর্বে রামানুজনের হাতে একখানি গণিতের বই এসে পড়ে যাতে ছ'হাজার theorem সংগৃহীত ছিল। এইগুলিকে প্রমাণ করতে সেই যুবকের পরম আনন্দে সময় কাটতে লাগল। যদিও কলেজে ভর্তি হতে হ'ল তবু এই কাজেই তাঁকে এমন পাগল করে রেখেছিল যে এক বছরের মধ্যেই কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁর বৃত্তি বন্ধ করে দিলেন। রামানুজন বাধ্য হয়ে কলেজ ছেড়ে দিলেন এবং কয়েক বছর নিরিবিলি নিজের মনে গণিত চর্চা করতে লাগলেন। এই সময় তিনি একটি খাতাতে তাঁর নিজের যে সব formula মনে আসত সেইগুলি নোট রেখে যেতেন। এই হ'ল অধুনাবিখ্যাত রামানুজন নোটবুক সিরিজের গোড়াপত্তন।

এর পর তাঁর পিতামাতার দরিদ্র সংসারের ভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ শহরে একটি সামান্য কেরানীর পদগ্রহণ, রামচন্দ্র রাওয়ের সাহায্যে দুএকজন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়াতে গণিতচর্চার সুযোগপ্রাপ্তি, তখনকার Director of the Meteorology Gilbert Walker সাহেবের সুপারিশে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তিলাভ, এবং শেষে কেম্‌ব্রিজের অধ্যাপক E. H. Neville-এর সঙ্গে আলাপের ফলে তাঁর বিলাতযাত্রা—এ সবই শিক্ষিতসমাজে সুবিদিত। E. H. Neville-এর সহায়তা ব্যতীত রামানুজনের অসাধারণ পাণ্ডিত্য হয়তো ভারতবর্ষের এক কোণেই চাপা পড়ে থাকত;—কিন্তু যে যোগাযোগ তাঁর জীবনের বিশেষ ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে, সে হচ্ছে অধ্যাপক G. H. Hardy-র সঙ্গে পরিচয় যা পরে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক ও গণিতবিজ্ঞানের শীর্ষস্থানীয় G. H. Hardy রামানুজনকে আবিষ্কার করেছিলেন বলে গর্ব বোধ করেন, কিন্তু আসলে রামানুজনই Hardy-কে তাঁর সহকারী হিসাবে বেছে নেন। তখন Hardy Trinity College এর তরুণ lecturer মাত্র। Hardy-র একখানি পুস্তিকা হাতে পড়ায় রামানুজন দেখেন তার ভিতর অনেকগুলি Formulae রয়েছে তিনি নিজে যে ধরনের অঙ্ক নিয়ে কাজ করছেন তার অনুরূপ। রামানুজন তখুনি Hardy-কে চিঠি লেখেন ও নিজের একখানি নোটবুক পাঠিয়ে দেন। ১৯১৩-র জানুয়ারি মাসে কেম্‌ব্রিজে এই নোটবুক পৌঁছালে সেখানকার গণিত-মহলে যে আলোড়ন উপস্থিত হয় তা সেখানে 'গীতাঞ্জলি'-আবিষ্কারের সঙ্গেই কেবল তুলনীয়। সময়টাও লক্ষ করার বিষয়—ঐ ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান। প্রথমে কেম্‌ব্রিজের পণ্ডিতদের সন্দেহ হ'ল এই অঙ্ক-

গুলির মধ্যে বুঝি বা কোথাও কিছু চাতুরী আছে; কিন্তু ভালো করে দেখবার পর তাঁদের আশ্চর্যের সীমা রইল না। Hardy এই অঙ্কগুলির বিষয় উল্লেখ করে পরে লিখেছেন—"They defeated me completely; I had never seen anything in the least like them before. A single look at them is enough to show that they could only be written down by a mathematician of the highest class. They must be true because, if they were not true, no one would have had the imagination to invent them."

বিজ্ঞানজগতের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতবর্ষের এক কোণে বসে উচ্চাঙ্গের গণিত চর্চা করতে যাওয়া কত যে দুঃসাহসের কাজ তা কল্পনাতীত। যতদিন বাড়িতে বসে কাজ করেছিলেন পাশ্চাত্ত্যে গত ১৫০ বছর গণিতবিজ্ঞানের যা অনুশীলন হয়েছে সে বিষয় জানবার সুযোগ পাননি। তাঁকে প্রত্যেক formula আবিষ্কার করতে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের অসামান্য প্রতিভা ও অধ্যবসায়েরই উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কেম্‌ব্রিজে গিয়ে বিশেষতঃ Hardy-র সহযোগিতায় তাঁর এই পরিশ্রমের অনেক লাঘব হয়েছিল এবং গণিতের নতুন নতুন সমস্যার বিষয় চিন্তা করবার ও তার সমাধান করবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। তারপরেও যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত হওয়ায় আরো মীমাংসা করবার অবকাশ পেয়েছিলেন। তিন বছরের পর তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয় ও ১৯২০ সালে অনুমান ৩৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তিনি শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেছেন;—শেষের দিকে তিনি যে সব আবিষ্কার নোটবুকে লিখে রেখে গিয়েছিলেন, সেইগুলি বুঝতে পাশ্চাত্ত্য গণিতবিৎদের ১৫ বছর লেগেছিল, এতই অদ্ভুত এই যুবকের মেধাশক্তি। র-ঠা

... ...

শান্তির মধ্যেই সংগ্রামের বীজ লুকিয়ে থাকে—কথাটা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হ'লেও ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে খুব বেশি নূতন ঠেকবে না। বিভিন্ন কালে বিভিন্ন দেশে যে সব সন্ধি চুক্তি হয়েছে সেগুলি যদি মেনে চলা হ'ত, তবে এই পৃথিবীর মত নিরঙ্কুশ শান্তির দেশ খুব কমই থাকত। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্যবিধান করা রাজনীতিকদের স্বভাব নয়; বিশেষতঃ স্বার্থ সন্দেহ ও শক্তির দাবি যেখানে বেশি সেখানে সন্ধির নামে বড় জোর ভার্সাই চুক্তি ও শান্তির নামে জাতিসঙ্ঘ হ'তে পারে।

ধরে নেওয়া যাক যে ফাশিস্তবাদের মধ্যে যে-দুষ্কৃতি ও অধর্ম অন্তর্নিহিত আছে, পরিণামে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তা যেন হ'ল, কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রের পর যে শান্তিপর্ব আসবে তার সম্বন্ধে আমাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা আছে কি? সেদিন Sir Stafford Cripps রাশিয়া সম্বন্ধে একটি বিবৃতি দিতে গিয়ে বলেছেন যে শান্তি কী রূপ পরিগ্রহ করবে, সে বিষয়ে আমাদের একটা খোলাখুলি রকম আলোচনা হওয়া সত্বর প্রয়োজন। গুরুতর প্রসঙ্গ অনির্দিষ্ট

কালের জন্য মুলতবী রেখে শেষ মুহূর্তে জোড়াতাড়া-দেওয়া একটা শান্তি সংস্থাপনের প্রচেষ্টা বাতুলতা হবে। সমস্ত পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আমাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে, এ একটা মস্ত দায়িত্ব। আমাদের ভ্রমপ্রমাদের ফলে ভাবীকাল যদি বিপর্যস্ত হয় তবে ইতিহাসের আদালতে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে—একথা আমরা যেন স্মরণে রাখি। পৃথিবীর যে-সকল দূরদৃষ্টিবান মনীষীরা এ বিষয়ে এখন থেকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তাঁদের মধ্যে চীনদেশের বিখ্যাত লেখক লিন্ ইউ টাঙ্ অন্যতম।

তিনি বলেন যে জার্মানি জাপান ও ইতালির পতনের পর যে-শান্তি স্থাপিত হবে তাতে এসিয়ার স্থান কী ও কোথায়, সে সম্বন্ধে লণ্ডন ও ওয়াশিংটন উভয় রাজধানীর কূটনীতিজ্ঞদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। আমেরিকার সঙ্গে এসিয়ার সম্বন্ধ রবার ও টিন আমদানি নিয়ে। ব্রিটিশ মনোবৃত্তিতে এসিয়ার বেলা একটা কেমন যেন অবহেলা ও বিদ্রূপের ভাব বরাবর তাদের দূরদর্শিতার অভাবের সূচনা করে এসেছে। পৃথিবীর অর্ধেক লোক যে-সব দেশে বসবাস করে তাদের সম্বন্ধে এই নিদারুণ ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতা যদি না ঘোচে তবে শান্তির নামে আবার সংগ্রামকে ডেকে আনা হবে—এতে আর বিচিত্র কী?

আজ প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের যে-বিপর্যয় ঘটে গেল তার জন্য দায়ী ব্রিটিশ মনোভাবের সংকীর্ণতা। এই মানসিক বিকৃতির পরিণাম হ'ল Atlantic Charter ও লিবিয়া রক্ষার অজুহাতে সিংগাপুর ও রেংগুনকে বলিদান। শোনা যায় যে মালয়বাসী ও বর্মীরা জাপানের সঙ্গে প্রাণপাত লড়েনি। এর কারণ অনুমান করা কি খুব শক্ত? চীন লড়ছে মরিয়া হয়ে—তার নিজের দেশকে অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। মালয় ও বর্মা কোন্ ভরসায় লড়বে? পরপদানত জাতির কাছে জন্মভূমির নামে সাম্রাজ্যবাদের বনিয়াদ পোক্ত করার চেষ্টা বিফল হ'তে বাধ্য। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে বৃটেনের জ্ঞাতিকুটম্বিতার সম্পর্ক; তারা সাম্রাজ্যের অংশীদার। তারা পূর্ণ উদ্যমে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তা করবে এতে আর আশ্চর্য কী? কিন্তু যারা জ্ঞাতিকুটুম্ব নয়, সাম্রাজ্যবাদ যাদের শোষণ করছে তাদের কাছে যুদ্ধের ফলাফলে কী আসে যায়? যেখানে প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ সেখানে মনিব বদল হওয়াটা খুব বেশি সাংঘাতিক নয়। ফাশিস্তবাদের নৈতিক বিভীষিকার কথা তুলে কেউ কেউ হয়তো আপত্তি করতে পারেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে যে-দেশের সমূহ লোকের জ্ঞানবুদ্ধি ছেলেমানুষির সীমা অতিক্রম করেনি, তাদের কাছে এ-প্রসঙ্গ তোলা অর্থহীন ও অবান্তর।

চীনদেশ ভদ্র। বহু-শতাব্দীসঞ্জাত সৌজন্য তাদের মজ্জাগত। জাপানকে হাতে রাখার উদ্দেশ্যে মার্কিন যখন দুহাতে তেল সরবরাহ করেছে, চীন কিছু বলেনি; বর্মারোড সাময়িক ভাবে বন্ধ রেখে চার্চিল যখন জাপানকে ঘুষ দিলেন, তখনও চীন আপত্তি করেনি। তাদের এই স্বভাবজাত সৌজন্য যে রাজনীতিজ্ঞানের অভাব—এ কথা যেন কেউ কল্পনা না

করেন। চীন বিচার করছে, সে দেখছে যে মার্কিন ও ইংরেজ বণিকের জাত আর বাণিজ্যের মেরুদণ্ডই হ'ল সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহ। তাই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চীন বড় বেশি সন্দিহান। ক্ষি-রা

... ...

এই তো গেল চীনের কথা। 'এসিয়াবাসীর জন্য এসিয়া' নীতির প্রবর্তক হিসাবে জাপান এসিয়ার মনে যে-সব প্রশ্ন জাগিয়েছে সে-প্রসঙ্গ ধামাচাপা দিয়ে রাখা আর চলবে না। জাপানের ভাঁওতায় কেউ হয়তো ভুলবে না, কিন্তু যে আপ্তবাক্য সে আওড়াচ্ছে তার ষোলো আনাই যে মিথ্যা, একথা আজ কোনো এসিয়াবাসী বলবে না। ইন্দোচীনের লোক ফরাসীদের সইতে পারে না; জাভার লোকেরা ওলন্দাজদের চায় না; ভারতে বৃটেনে প্রীতির অভাব আজ বহুদিন হ'ল ঘটেছে।

জাপানের প্রচারকার্যের মেরুদণ্ডই হ'ল ইউরোপীয়দের বর্ণবিদ্বেষ। আজ তাই সে জোর গলায় বলছে—ওদের বিশ্বাস ক'রো না, ওদের হাত থেকে কালা আদমীর সুবিচার পাবার আশা নেই। এই মোটা সত্য—যার প্রতিষ্ঠা হ'ল অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞানের উপর—এসিয়া কেমন করে অস্বীকার করবে? Pearl S. Buck তাই তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "আজ এসিয়াবাসী অপেক্ষা করে আছে। জাপানের কথায় তারা কান দিচ্ছে, কারণ তার কথায় সত্য আছে, সে কেবল নিছক প্রচারকার্য নয়। মিথ্যাকে উপহাস করা চলে, কিন্তু সত্যকে বিদ্রূপ করা চলে না! মার্কিন ও ইংরেজদের মনোভাবকে তারা যদি সন্দেহের চোখে দেখে, যদি তাদের ট্রেডমার্কওয়ালা গণতন্ত্র তাদের মনঃপূত না হয়, তবে সে দোষ আমাদেরই।"

Pearl S. Buck-এর এই সাবধানবাণী সত্ত্বেও একদল লোক বলছেন যে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষাকল্পে ইংরেজভাষাভাষীদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসংঘ হওয়া উচিত। যদি এই ধরনের রাষ্ট্রসংঘ বাস্তবে পরিণত হয় তবে চীন ও ভারতের পক্ষে আশঙ্কার কারণ থেকে যেতে বাধ্য। তাই লিন্ ইউ টাঙ্ বলেন যে শক্তির ভারসাম্যরক্ষার জন্য আরো একটি পৃথক রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থা করা দরকার চীন ভারত ও রাশিয়াকে নিয়ে। এই তিন মহাদেশের জনসংখ্যা সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার অর্ধেক। ভৌগলিক দিক দিয়েও আজ এরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রসংঘের সঙ্গে এরা যুক্ত হতে পারে না তার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে কোনো পাশ্চাত্ত্য জাতি তাদের বর্ণবিদ্বেষ অতিক্রম করে চাইবে না যে, লোকসংখ্যার হিসাবে চীন ভারত ও রাশিয়া গণতন্ত্রের সুবিধা ভোগ করে। তারা যেখানে হাজার হিসাবে গোনে আমরা সেখানে গুনি লক্ষের হিসাবে। সুতরাং জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সমান অধিকার দেবার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত একই রাষ্ট্রসংঘের আওতায় আমাদের মিলন অসম্ভব। ক্ষি-রা

ভবিষ্যতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের চিন্তাধারার নমুনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধেও দেখা যাচ্ছে অনেকে ভাবছেন। তার একটা কারণ হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে চলতি শিক্ষাপদ্ধতির দোষগুলি বেশি রকম ধরা পড়েছে। সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে যতটা সুফল আশা করা গিয়েছিল, তা পাওয়া যায়নি। ইস্কুল-কলেজ থেকে যে সব যুবক শিক্ষিত হয়ে বেরচ্ছে কর্মক্ষেত্রে তারা যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে না।

বিজ্ঞানশিক্ষকদের বার্ষিক অধিবেশনে লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের শিক্ষাসচিব E. G. Savage গত এপ্রিল মাসে একটি বক্তৃতায় Secondary Education-এর লক্ষ্য কী হওয়া উচিত সে বিষয় যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। এখনকার আনুষ্ঠানিক আড়ষ্ট ও পরীক্ষাসংকুল শিক্ষাবিধির অনিষ্টকারিতার সমালোচনার পর, তিনি Secondary Education-এর উদ্দেশ্য সাত দফায় সংক্ষেপে বিবৃত করেন ঃ

(১) শারীরিক পটুতাঅর্জন ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

(২) কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল বিষয়ে মানসিক নৈপুণ্য অর্জন এবং অনুশীলন, যথা ভাষা, লিখন, গণনা ও সুসম্বদ্ধভাবে চিন্তা।

(৩) গার্হস্থ্যজীবনের উপযোগী কতকগুলি বিশেষগুণ ও দক্ষতা আয়ত্ব করা।

(৪) পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রব্যবস্থার যোগ্য প্রজা হবার উদ্দেশ্যে শিক্ষালাভ।

(৫) উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও বুদ্ধিকে জাগ্রত করা।

(৬) অবসরকালের সদ্ব্যবহারার্থে উপযুক্ত জ্ঞান এবং কৌশলের চর্চা।

(৭) ভবিষ্যৎ জীবিকার উপায়স্বরূপ শিক্ষণীয় বিষয় নির্বাচন।

রবীন্দ্রনাথ কোনোকালেই ইংরেজ আমলের ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে তার প্রতিকারের চেষ্টা করতে গেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষার অলঙ্ঘনীয় নিয়মাবলী তাঁকে বাধা দেয়। সেইজন্য অল্প কয়েকটি গ্রামের বালক নিয়ে "শিক্ষাসত্র" নাম দিয়ে স্বতন্ত্র একটি নতুন ধরনের বিদ্যালয় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়টি এখন শ্রীনিকেতনে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে এই শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁর আদর্শ অনুযায়ী কাজ যাতে ঠিকমতো চলে, বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি আলোচনাসভা আহ্বান করেন। এই সভায়, শিক্ষাসত্রে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার লক্ষ কী, প্রথমেই তা লিপিবদ্ধ করা হয়। শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্য বলে যা গৃহীত হয়েছিল, তার সঙ্গে E. G. Savage-এর উল্লিখিত আদর্শের মূলগত কোনো প্রভেদ নেই। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়েও পঞ্চাশ বছর পূর্বে যা ভেবে গেছেন, এখন লোকে তা বুঝতে আরম্ভ করেছে। র-ঠা

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা

ভাদ্র ১৩৪৯

বিশ্বভারতী বিদ্যায়তন *

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রত্যেক বৎসর আমাদের একবার ভাববার সময় আসে যে, আমরা কী সংকল্প নিয়ে কোথায় কাজ আরম্ভ করেছিলাম, কোন্ জায়গায় এসে আজ পৌঁচেছি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ গতিপথ কোন্ অভিমুখে। আমার আর সময় বেশি দিন নেই, তাই আমার যা বলবার কথা তা এই সময় শেষ করে দিতে চাই।

আমাদের এই বিদ্যায়তনের ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে, অনেকবার অনেক জায়গায় এই সম্বন্ধে বলেছি এবং লিখেছি। এ'কে পরিচালনা করার যে-ভার আমি গ্রহণ করেছিলেম, সত্যি কথা বলতে গেলে সে-কাজ আমার প্রকৃতিসংগত নয়। বাল্যকালে আমি নিজের মনে লেখাপড়া নিয়ে ঘরের কোণে মানুষ হয়েছি, বাইরের লোকসমাজের সঙ্গে আমার সংযোগ ছিল অল্প। পরবর্তী জীবনে একলা বসে সাহিত্য রচনা করেছি নিভৃতে, নির্জনে,

* বিশ্বভারতীপরিষদে প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের অভিভাষণ, ৮ই পৌষ, ১৩৪২। শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত।

নদীতীরে। এমন সময় একদা এখানকার কাজের আহ্বান অনুভব করলাম অন্তরে। কোথা থেকে প্রেরণা এল বলতে পারি না। তবে একটা জিনিস চিরদিন আমি গভীরভাবে অনুভব করেছি—শিশুদের নির্বাসনদণ্ড-ভোগ ছাড়া আমাদের দেশে কোনো ব্যবস্থা নেই। একে তো তারা শহরে ইটের খাঁচায় আবদ্ধ, তারপরে আবার বিদ্যালয়েও বন্দী। শিক্ষাক্ষেত্রে সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পড়া-মুখস্থর ভিতর দিয়ে গুরু-শাসনপীড়নে তারা যে-কষ্ট পায়, আমাকে তা অনেকদিন থেকেই দুঃখ দিয়েছে। কিন্তু আমি কখনো ভাবিনি যে আমা দ্বারা এর কোনো প্রতিকারের উপায় হোতে পারে। তবু শিলাইদা ছেড়ে এখানে এসে একদিন আহ্বান করলেম দেশের শিশুদের, শিক্ষার্থীদের। যে-উৎসাহ আমাকে এই কার্যে প্রবৃত্ত করেছে, তাও একদিক থেকে সৃষ্টি করারই কাজ। লোকহিতের জন্য জনসেবার যে-কাজ, সেও বড়ো কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু ঠিক সেদিক থেকে আমার মনে প্রেরণা আসেনি। আমার কল্পনাতে ধ্যানের লোকে ছবি জেগেছে, প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে শিশু শিক্ষার্থীদের মন সহজেই বিকশিত হয়ে উঠবে, তার আবরণ যাবে ঘুচে, তারা পাবে মুক্তির আনন্দ। এরই রূপ আমি দেখতে পেয়েছিলেম। যখন জানলেম, বুঝতে পারলেম আর-কেউ আমার এই কল্পনার স্বপ্নকে বিশ্বাস করে না, তখন নিজেকেই অগ্রসর হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হোতে হোলো। এর মধ্যে প্রধান কথা ছিল ছেলেদের প্রাণের প্রকাশ এবং তাদের ঔৎসুক্যের বিকাশচেষ্টা। একটা ভালো আদর্শ ইস্কুল স্থাপন করব যেখানে পরীক্ষা পাশের সর্ববিধ সুব্যবস্থা থাকবে, এ লোভ আমার মনে কিছুমাত্র ছিল না। আমি দেখতে চেয়েছিলেম ছেলেরা থাকবে আনন্দিত, প্রকৃতির শুশ্রূষা পাবে এবং শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেরা বিকশিত হ'য়ে উঠবে। এই আদর্শ নিয়ে অল্পক'টি ছেলে জুটিয়ে গাছতলায় শুরু হোলো শিক্ষাদান। লক্ষ্য ছিল তাদের মন চারদিক থেকে অন্ন ও আনন্দ পেয়ে সজীব, সবল হয়ে যেন ওঠে। এর জন্য প্রথম যে-আয়োজন সে হচ্ছে প্রকৃতির শোভা, আমাদের তা তৈরি করতে হয়নি। তারপরে চেষ্টা করেছি শিক্ষার সঙ্গে আনন্দ মিশ্রিত করে তাদের উৎসাহকে জাগিয়ে তুলতে। তাদের রামায়ণ মহাভারতের কথা শুনিয়েছি, সন্ধ্যেবেলায় নানা রকমের খেলা তৈরি করে তাদের নিয়ে একসঙ্গে খেলেছি। চিত্তবিনোদনের জন্য তাদের সঙ্গে মিশে যাকে

অধুনা নাম দেওয়া হয়েছে 'হেঁয়ালি নাট্য' সেই ধরনের অভিনয় করেছি। যাতে তারা অন্ধকারে কষ্ট না পায়, সেইজন্যে তাদের প্রতি মুহূর্তকে পূর্ণ করার চেষ্টা করেছি। তারা মুক্তির ক্ষেত্র পেয়েছে প্রচুর, অনেক সময় গাছে চড়ে কত রকমের দৌরাত্ম্য করেছে। অনেকে আপত্তি করেছেন, বলেছেন, এভাবে প্রশ্রয় দিলে বিদ্যালয়ের সম্ভ্রম নষ্ট হয়। কিন্তু আমি শুনিনি সে-সব কথা, আমি নির্বিবাদে ছেলেদের সমস্ত দৌরাত্ম্য সহ্য করে তাদের ভিতরের মানুষটিকে জাগিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। নিজের সমস্ত শক্তি ঢেলে তাদের জন্য গান ও নাটক রচনা করেছি। এ সমস্ত জিনিস আমাদের প্রচলিত শিক্ষাবিধির হয়তো অন্তর্গত নয়। ক্রিয়াপদ, ধাতু, সর্বনাম বিশুদ্ধভাবে ছেলে মুখস্থ করতে পারল কিনা অভিভাবকদের দৃষ্টি থাকে স্বভাবতই সেদিকে। হয়তো এখানে কিছু ঢিলেমি আমাদের হয়েছে। কিন্তু ছেলেরা প্রকৃতির মধ্যে সহজ মুক্তির আনন্দ পেত আর তার চেয়েও বড়ো কথা, আমি ছিলেম তাদেরই মধ্যে। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ দেওয়াটাকেই আমি কর্তব্য বলে গণ্য করিনি। আমি সব সময় স্নেহ দিয়ে, সঙ্গ দিয়ে তাদের ভিতরকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি। মনে হয়, সেটাই প্রধান। নিজে বসে বসে নানা উপায়ে sense-training-এর চর্চা করে তাদের শিখিয়েছি। সব দিক দিয়েই তাদের নিয়ে বিদ্যায়তনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করে তোলবার সাধ্য-মতো চেষ্টা করেছি। নিয়মের যন্ত্রে যাতে এ'কে পিষ্ট শুষ্ক করে ফেলতে না পারে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। আমার উদ্যমের সূচনায় সৌভাগ্যবশত আমি একজন কর্মীর সহায়তা পেয়েছিলেম, তিনি ছিলেন কবি, নিজের অন্তরের আনন্দ দিয়ে তিনি শিক্ষাদানকে এমন সরস করে তুলতেন যে, শিশুমনে তা চিরদিনের মতো মুদ্রিত হয়ে যেত। যারা তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছে, তারা জানে Shakespeare আদি বড়ো বড়ো সাহিত্যিকদের কঠিন রচনাও তিনি অল্পবয়স্ক ছাত্রদের এমনভাবে পড়াতেন যে, জৈব পদার্থ যেমন সহজে আমরা গ্রহণ ও হজম করি, সাহিত্যের রসও তেমনি অনায়াসে তাদের অন্তর্লোকে প্রবেশ করত। এই সময়ই এখানে ঋতু-উৎসবের প্রচলন হয়। মনে পড়ে, তখন থেকেই শারদোৎসবের সূচনা। আমার উদ্দেশ্য ছিল, এই সমস্ত অভিনয়, গান ও ঋতু-উৎসবের ভিতর দিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের

একটি সহজ যোগ গড়ে উঠবে অগোচরে, অজ্ঞাতে,—তাদের দৃষ্টি যাবে খুলে।

একটা মস্ত সুবিধে ছিল তখন, ছাত্রসংখ্যা ছিল অল্প। স্বীকার করি যে, এই সুবিধা না থাকলে নিজের পরিকল্পিত আদর্শ অনুযায়ী বিদ্যালয়ের কাজ চালানো আমার একলার পক্ষে সম্ভবপর হোত না। বহুসংখ্যক ও নানাস্থানের ছাত্র এবং শিক্ষককে নিয়ে একটি সত্যিকার unit গড়ে তোলা অত্যন্ত দুরূহ, বিশেষত যদি তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন থাকেন যে, তাঁরা এখানকার শিক্ষার আদর্শকে অন্তরে বিশ্বাস অথবা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেন। যখন আমি একলা এই বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য দায়ী ছিলাম, তখন অনেকবারই এরূপ সংকটের সম্মুখীন আমাকে হোতে হয়েছে। নানা সময়ে অনেক শিক্ষক এখানে এসেছেন যাঁরা এখানকার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তাঁরা অনেক ক্ষতি করেছেন, অনেক কাজ নষ্ট করেছেন। সে-সবই আমাকে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতে হয়েছে। আবার কখনো বা এমনও ঘটেছে যে, একসঙ্গে বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদায় দিতে হয়েছে, কিন্তু আমি তার জন্য বিন্দুমাত্র চিন্তা করিনি। আর্থিক ক্ষতির ভয় আমার দৃঢ় সংকল্পকে কিছুমাত্র টলাতে পারেনি। ধার করে হোক বা যেমন করে হোক, সমস্ত আর্থিক দায়িত্বকে আমি অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করে নিয়েছি। তখন দেখেছি একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছাত্র ও শিক্ষকবর্গ একযোগে কাজ করে গেছেন, আর আমি ছিলাম তার কেন্দ্রস্থলে। ক্রমে বিদ্যায়তন বড়ো হয়েছে এবং আমাদের চেষ্টা ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক নিয়মে line of least resistance-এর পথ ধরে চলেছে। তারপরে দেখতে দেখতে University ও Education Department-এর দাবি বলবান হয়ে উঠে আমাদের অগোচরে আমাদের বিদ্যালয়ের ছাঁচকে বদলে দিয়েছে, চলতি ছাঁচ এর উপরে তার প্রভাব বিস্তার করেছে ক্রমশই প্রবলভাবে। তার একটা কারণ, সেইদিকে ঝোঁক দেওয়া সহজ। শিক্ষক ও অভিভাবকদের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি থাকে সেই দিকেই। ফলে আমাদের সহজ দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে সফলতার আদর্শ। আমরা এখন কৃতকার্যতার বিচার করি সেই আদর্শ থেকেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপাশ এখন আমাদের মাপকাঠি।

মাঝখানে যখন বিধিবদ্ধ constitution-এর শৃঙ্খলা এল, তখন আমার মন সম্পূর্ণভাবে তাতে সায় দিয়েছে, এমন কথা জোর করে বলতে পারিনে। হয়তো কবিপ্রকৃতি বলে এই আশঙ্কাকে দূর করতে পারিনি যে, নিয়মের কাঠামোর মধ্যে যে-কাজ এবং কৃত্রিম উপায়ে যার পরিচালনব্যবস্থা, তাতে স্বাভাবিক প্রাণধর্মকে ক্ষুন্ন করে তার সৃষ্টিতে ব্যাঘাত করবেই। তবু মনে করলেম, সর্বসাধারণ যখন এই বিদ্যায়তনকে গ্রহণ করার দায়িত্ব নিতে চায়, তখন সর্বসাধারণের ইচ্ছা এবং রুচিই এ'কে চালনা করুক, এ'কে গড়ে তুলুক, আমি তাতে নিজে হাত দিতে গেলে স্বভাবতই আর মিশ খাবে না। তাই ব্যক্তিগত ইচ্ছাপ্রবৃত্তি আর খাটবে না মনে করে constitution-এর উপর নির্ভর করেই পরিচালনার কেন্দ্র থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছি। শারীরিক দুর্বলতার জন্য অবকাশও হয়তো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে যে, যে-কাজের জন্য দুঃসহ দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, অর্থসাহায্য এবং অভিজ্ঞতার অভাবে অত্যন্ত দুঃখে যাকে তৈরি করা হোলো, যদি তার কোনো বিশেষত্ব আজ না থাকে তবে তো ঠকলেম, বঞ্চিত হলেম। আমাদেরও সমস্ত ব্যবস্থা যদি দেশের অন্যান্য ইস্কুলের মতোই হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে efficiency বাড়তে পারে, নিখুঁত হোতে পারে, কিন্তু শিক্ষাদান কিছুতেই সজীব থাকতে পারে না। শিক্ষকতার আদর্শ যদি আজ হয় dignity বজায় রেখে দূর থেকে ছেলেদের চালনা করা মাত্র, তবে যে-মানবসম্বন্ধের ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের অন্তঃকরণকে সহজে জাগিয়ে তোলা যায়, তার মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়। আদর্শের দিক দিয়ে এতে যে-ক্ষতি আনবে সে-ক্ষতি অত্যন্ত বড়ো রকমের ক্ষতি।

সম্প্রতি আশ্রমের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে, অনেক নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে, নানা রকমের ক্লাস করতে হচ্ছে। মোটের উপর আমাদের যে-প্রচেষ্টা একদা ক্ষুদ্রপরিসর ছিল, আজ তা বৃহদায়তন হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে এখানে কর্মী যাঁরা আছেন, তাঁদের চিন্তা হয়তো নিজের বিভাগীয় কর্মক্ষেত্রে সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হয়ে আশ্রমের সজীব সমগ্রতাকে যথার্থভাবে ধারণা করতে বাধা জন্মাচ্ছে। যে-loyalty শুধু কর্মের দিকেই থাকে, সেটা স্বভাবতই নির্জীব হয়ে পড়ে।

আমাদের যত বিভিন্ন বিভাগ আছে, যদি সব এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয় তবে বিপদ ঘটবে। সভাসমিতি, তর্কবিতর্ক, হিসাবনিকাশ, ব্যক্তিগত মতামতের দ্বন্দ্ব তাতে বাড়তে পারে, কিন্তু আত্মীয়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হবে না কোনোদিন। আমাদের অনেক অভাব-অভিযোগ ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে ; বেদনার সঙ্গে কাছে এসে অন্তরের শুশ্রূষা দিয়ে সেগুলোকে পূরণ করতে হবে।

বিশ্বজগতের সঙ্গে ভারতের যোগসাধন করবার idea আমাদের আদর্শে প্রবেশ করেছে। আমরা বিদেশীদের জন্যও আমাদের আতিথ্য সঞ্চয় করে রাখতে চাই। সৌভাগ্যক্রমে বাইরের লোক আমাকে স্বীকার করেছে। কয়েকটি বিদেশী বন্ধু ত্যাগের অর্ঘ্য দিয়েছেন ভালোবেসে। আশ্চর্য এই যে, আমাদের কী আছে, আমারা কী দেখাতে পারি, দারিদ্র্য আমাদের পরম সম্পদ, আমাদের কত নিন্দে হয়তো তাঁরা শুনেছেন, তবু প্রীতির সঙ্গে তাঁরা এগিয়ে কাছে এসেছেন। শ্রীনিকেতনকে রক্ষা করেছেন এল্ম্‌হার্স্ট, তিনি কী না দিয়েছেন আমাদের। আজ যে শ্রীনিকেতনের কাপড় প'রে এসেছি, সে তো তাঁরই দান। এণ্ড্রুজ নিজে দরিদ্র, কিন্তু তিনি যা পেরেছেন আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছেন। পিয়ার্সন, উইণ্টার্‌নিজ, লেভি আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন। অকৃত্রিম প্রেম দ্বারা তাঁরা আমাকে এবং এই আশ্রমকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অনেক ক্ষতি এবং অনেক দুঃখের মধ্যে এই আমাদের একটা বড়ো সান্ত্বনা। তাঁদের ভিতর দিয়ে আমাদের বহির্জগতের সঙ্গে যোগ সার্থক হয়ে উঠেছে। আজ এই বিদেশের বন্ধুদের কাছে একান্তমনে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার শেষ বলবার কথা এই যে, আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা এবং পরিচালনার কাজে যেন আমরা যথার্থভাবে সংযুক্ত হয়ে চলতে পারি। বাইরে থেকে বিচার করার প্রবৃত্তিকে দমন করে বেদনাবোধের দ্বারা যেন আমরা সম্মিলিত হোতে পারি, এই নিবেদন।

শিল্পপ্রসঙ্গ

শ্রীনন্দলাল বসু

পরিমল, তোমার ১৭ই শ্রাবণের চিঠি পেলাম।* আমি লিখে নিজেকে প্রকাশ করতে শিখিনি। ছবি এঁকে তোমাদের কাছে নিজের আনন্দ ব্যক্ত করবার চেষ্টাই ক'রে এসেছি। অনুরোধে পড়ে কিছু লিখে প্রকাশ করবার চেষ্টা করব।

শরীরে স্থূল ও সূক্ষ্ম যে ক'টা ইন্দ্রিয় আছে সেগুলিকে আশ্রয় করে সংগীত, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য, অভিনয়, কারু ইত্যাদি চৌষট্টি কলার সৃষ্টি হয়েছে। একটি অন্যটির 'পরে নির্ভর ক'রে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দিয়ে চিত্ত 'রস'কেই উপলব্ধি করছে এবং প্রত্যেক শিল্পযোগে সেই 'রস'কেই সাকার ও সুগোচর ভাবে সৃষ্টি করছে। মর্মগত এই রসের দিক দিয়ে সংগীত, কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য— কোনো শিল্প থেকে কোনো শিল্পের ভেদ নেই। এবং এটিও মনে রাখবার বিষয় যে সমুদয় শিল্পকলা রূপের দিক দিয়ে সুনির্দিষ্ট, কিন্তু ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে অপরিসীম, অনির্বচনীয়।

উপায় ও উপকরণের ভিন্নতাবশতঃ কাব্য ও চিত্রের বহিরঙ্গে কিছু কিছু তফাৎও দেখা যায়। যেমন, কাব্যে প্রথমে আসে ইঙ্গিত— গাছ, tree বা বিটপঃ ; এইরূপ একটা শব্দপ্রতীক ; পরে বস্তুর বোধ। চিত্রে প্রথমেই আসে বস্তু ;—convention-এর ভাষাযোগে তা চিত্রের বিষয় হয়। অতঃপর কবিতার গাছ আর ছবির গাছ, কোনোটিই গাছ হিসাবে স্থির থাকে না, নিজ নিজ ব্যঞ্জনার দ্বারা রসিকের মনকে রসের অভিমুখে প্রেরণ করে।

অনেকে মনে করেন, চিত্রে একটা মুহূর্ত (moment, unit of time) নিয়ে কারবার আর কবিতায় গানে অনেকগুলি মুহূর্তের প্রবাহ। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কথাটা শুধু আংশিক ভাবেই সত্য। ছবি চোখ খুলে একেবারেই দেখা যায় বটে, তাবলে সঙ্গে সঙ্গেই তার উপভোগ সম্পূর্ণ হয় না। চিত্রে অঙ্কিত

* এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত পরিমল সরকারের একটি প্রশ্নের উত্তরে লেখা। —সম্পাদক।

গাছটি ফুলটি পাতাটি— খুঁটিনাটি প্রত্যেক বিষয় (detail) ও প্রত্যেক করণ-কৌশলটি (technique) ঘুরে ঘুরে দেখতে হয় ; এই ভাবে যাকে এক মুহূর্তে চোখের সামনে দেখলাম তাকেই অসংখ্য মুহূর্তে টুকরো টুকরো ক'রে তবে আবার যথার্থ একটি মুহূর্তের রহস্যে পৌঁছুতে পারি। আর, কবিতায় গানেও আসলে অনেক মুহূর্ত নেই। তার সবগুলি খণ্ড খণ্ড মুহূর্তকে অনুসরণ ক'রে যতক্ষণ না একটি অখণ্ড মুহূর্তের ধারণায় পৌঁচুচ্ছি ততক্ষণ কবিতা বা গানকে পাইনি। কবিতা বা গানের সূচনায় ঐ অনন্য মুহূর্তটি আছে আভাসে, পরিণামে আছে নিশ্চিত উপলব্ধিরূপে। সুতরাং দ্রষ্টব্য আর শ্রোতব্য শিল্পে এ বিষয়েও আসলে ভেদ নেই।

শিল্পক্ষেত্রে একটা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুকে অপর-একটা ইন্দ্রিয়গোচর বস্তু ক'রে তোলা, শিল্পের একটা বিশেষ কৌশল। গায়ক বা কবি বিশেষ খুশী হন যখন সুর দিয়ে বা কথা দিয়ে রূপের আভাস দিতে পারেন— যখন প্রভাত বা সন্ধ্যা বা ঘনঘটার ছাপ ছন্দ ও সুরের গুণে ফুটে ওঠে। আবার শিল্পী ইচ্ছা করেন, তাঁর অঙ্কিত ফুলটিতে ফুলের পেলব স্পর্শ ও মিষ্ট গন্ধ অনুভব করা যাবে। এরকমই হয়। এবং এইজন্যই পূর্বে বলেছি, চৌষট্টি কলা একটি অন্যটির 'পরে নির্ভর ক'রে নিজেকে প্রকাশ করতে সক্ষম।

শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার সঙ্গে তুলনা ক'রে বুঝতে পারি সমস্ত শিল্পসৃষ্টি কী ভাবে চলেছে। মাঝখানে অনির্বচনীয় রসঘনমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্রকাশা পরাপ্রকৃতিকে নিয়ে বিরাজ করছেন। তাঁর চারিদিকে বিভিন্ন শিল্প বিভিন্ন রসের হাত ধ'রে, বহু কৃষ্ণ ও বহু গোপিনীরূপে, মণ্ডলাকারে ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছেন— ছন্দে তালে। ইতি ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৯।

অহিংসা ও রাজনীতি

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

আধুনিক কালের ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে অহিংসা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। অহিংসার ভাব ও আদর্শটি হচ্ছে বিশেষ-ভাবে ভারতীয়; অন্য কোনো দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনে এই আদর্শটির এ-রকম প্রবল প্রভাব দেখা যায় না। ভারতবর্ষেও আজকাল আমাদের চিন্তা-জগতে এই আদর্শটি যে-রকম প্রাধান্য লাভ করেছে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে আর-কখনও সে-রকম হয়েছে ব'লে মনে হয় না। এই যে অহিংসার আদর্শটি আজকাল আমাদের রাজনীতি তথা জাতীয় জীবনকে এমন গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেছে, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এটি যুগে যুগে কিরূপে বিবর্তিত হয়েছে, সংক্ষেপে তারই একটু আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১

প্রথমেই বলা দরকার যে, অহিংসার আদর্শটি অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছিল একটি ধর্মনীতি-রূপে এবং বেদ-বিরোধী ধর্ম-আন্দোলন বা ধর্ম-সংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে। উপনিষদের যুগেই এই সংস্কার-আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয়। পরবর্তীকালে ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব), জৈন এবং বৌদ্ধ, এই তিনটি সাম্প্রদায়িক ধর্মকে আশ্রয় ক'রে এই আন্দোলন প্রবল হ'য়ে ওঠে। এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অনুষ্ঠান-বহুল বৈদিকধর্ম, বিশেষত পশুহিংসাময় যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-জ্ঞাপন। উপনিষদের যুগে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট প্রতিবাদ-ধ্বনি উত্থিত না হ'লেও ওই সময়েই যে আনুষ্ঠানিক যজ্ঞধর্মকে গৌণতা দান ক'রে জ্ঞান ও চারিত্র-নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৭) যজ্ঞের যে রূপকার্থ

করা হয়েছে তাতেই ক্রিয়াময় বা দ্রব্যময় যজ্ঞের ব্যর্থতা অত্যন্ত নিঃসংশয়রূপে স্বীকৃত ও ঘোষিত হয়েছে। ওই উপনিষদে মানুষের সমগ্র জীবনটাকেই একটি যজ্ঞরূপে গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই জীবন-যজ্ঞ উক্তগ্রন্থে পুরুষযজ্ঞ নামে অভিহিত হয়েছে। যা-হোক, মানুষের জীবনরূপ যজ্ঞের দক্ষিণার যে রূপকার্থ করা হয়েছে, সেইটেই সব চেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়। বেদবিহিত যজ্ঞের দক্ষিণা হ'লো পুরোহিতকে অর্থদান; কিন্তু পুরুষ-যজ্ঞ বা জীবন-যজ্ঞের দক্ষিণা হচ্ছে কয়েকটি চারিত্র-নীতি, যথা—তপস্যা, দান, ঋজুতা, অহিংসা এবং সত্যবচন (অথ যত্তপোদানমার্জবমহিংসাসত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ—ছান্দোগ্য, ৩।১৭।৪)। বিস্ময়ের বিষয় এই যে,—আধুনিক কালে যেমন অহিংসা ও সত্যাগ্রহ পাশাপাশি চলে, ছান্দোগ্য উপনিষদেও তেমনি অহিংসা ও সত্যবচন পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে।

এই উপনিষদুক্ত পুরুষ-যজ্ঞের যিনি উপদেষ্টা তাঁর নাম হচ্ছে ঘোর আঙ্গিরস এবং যাঁকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁর নাম দেবকীপুত্র কৃষ্ণ (ছান্দোগ্য, ৩।১৭।৬)। অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাভারত-খ্যাত বাসুদেব কৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি (ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী-কৃত Political History of Ancient India, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ১১৯, ৩নং পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য)। ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতা। স্মরণীয় বিষয় এই যে, পুরুষ-যজ্ঞের ব্যাখ্যাতা ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশ এবং কৃষ্ণোক্ত গীতার উপদেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। উপনিষদের পুরুষ-যজ্ঞের আদর্শটিই গীতার "যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ" ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোকটিতে (৯।২৭) অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। পুরুষ-যজ্ঞের দক্ষিণা-রূপ চারিত্র-নীতিগুলিও গীতায় যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে— (দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ অহিংসা সত্যম্ ইত্যাদি, ১৬।১-২)। উপনিষদে যে বেদ- ও যজ্ঞ-বিরোধী ভাব ও অহিংসার আদর্শ সূচিত-মাত্র হয়েছে, গীতায় কিন্তু তা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।...
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ২।৪৫-৪৬

এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে, গীতায় বেদকে পরমার্থলাভের পক্ষে চরম সহায় ব'লে স্বীকার করা হয়নি, বরং তাকে স্পষ্টতই একটু নীচু স্তরে স্থাপিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥

ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে (২।৪২-৪৪) যাঁরা বেদকেই একান্ত-রূপে মানেন এবং বেদাতিরিক্ত অন্য কিছুই স্বীকার করেন না, তাঁদের অতি কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছে, এমন কি অবিপশ্চিৎ বা অল্পবুদ্ধি ব'লে অভিহিত করা হয়েছে। শুধু ঐকান্তিক বেদমার্গীদের অপ্রশংসা ক'রেই গীতাকার ক্ষান্ত হননি, বেদোক্ত দ্রব্যযজ্ঞকেও নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন (শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ, ৪।৩৩)। এই জ্ঞানযজ্ঞ পূর্বোক্ত জীবন-যজ্ঞেরই প্রকার-বিশেষ। অহিংসার আদর্শটিও গীতাতে যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে। গীতায় অনেক স্থলেই যথার্থ ধর্মসাধনার উপায়-স্বরূপ কতকগুলি চারিত্র-নীতির উল্লেখ করা হয়েছে; ওই নীতিগুলির মধ্যে অহিংসা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গীতায় চার জায়গায় এই অহিংসা-নীতির উল্লেখ পাই। যথা—

(১) অহিংসা-সমতা-তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ। ১০।৫
(২) অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্। ১৩।৭
(৩) অহিংসাসত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্। ১৬। ২
(৪) দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৭।১৪

বেদ ও বৈদিক যজ্ঞবিধির বিরুদ্ধতার সঙ্গে অহিংসা-নীতির কি সম্পর্ক, ছান্দোগ্য উপনিষদ ও গীতা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মনীতিতে ওই সম্পর্কটি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৈদিক যজ্ঞবিধি-অনুসারে যে পশুহত্যা অবশ্য-কর্তব্য, তারই বিরুদ্ধতা করার উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম অহিংসা-নীতিকে এতখানি প্রাধান্য দিয়েছে। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম-প্রচারের প্রায় দুই হাজার বছর পরেও ভারতবর্ষ বৌদ্ধ ধর্মের এই বিশিষ্টতার কথা বিস্মৃত হয়নি। জয়দেবের দশাবতার-স্তোত্রে বৌদ্ধ ধর্মের এই যজ্ঞবিরোধী অহিংসাবাদের কথা অতি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষিত হয়েছে। যথা—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

অহিংসা-নীতির পরম সমর্থক মৌর্য সম্রাট প্রিয়দর্শী অশোকের অনুশাসন থেকেও এই কথা সমর্থিত হয়। তাঁর প্রথম পর্বত-লিপিতেই তিনি বলেছেন, "ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজূহিতব্যং" অর্থাৎ এখানে কোনো জীবহত্যা ক'রে হোম বা যজ্ঞ করা কর্তব্য নয়। 'এখানে' শব্দের দ্বারা কোন্ জায়গা বোঝাচ্ছে, এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু অশোক যে জীব-হিংসা করে যাগযজ্ঞ করার বিরোধী ছিলেন, এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই।

সুতরাং দেখা গেল, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যজ্ঞোপলক্ষে পশু-হত্যা নিবারণের উদ্দেশ্যেই অহিংসা-নীতির আবির্ভাব হয়েছিল। সে হিসাবে এটি একটি ধর্ম-নীতি এবং ধর্ম-সংস্কার-আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ ব'লেই স্বীকার্য। এই ধর্ম-নীতিটি প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিকে কি-ভাবে প্রভাবিত করেছে এখন তাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়।

২

প্রথমেই দেখতে পাই, অহিংসার আদর্শটি চারিত্র-নীতি হিসাবে গীতায় পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হ'লেও ওটিকে কখনও যুদ্ধ-বিরোধী নীতি ব'লে স্বীকার-করা হয়নি। অর্জুনকে অহিংসার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করা হয়নি, বরং যুদ্ধ করতেই উৎসাহিত করা হয়েছে।

অতঃপর অহিংসানীতির পরম অনুরাগী বৌদ্ধ সম্রাট অশোক ওই নীতিটিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োগ করেছিলেন, তা বিচার ক'রে দেখা দরকার। এ-কথা আজ সর্বজনবিদিত যে, কলিঙ্গ-যুদ্ধের পর রাজ্যলিপ্সু অশোকের মনে যে অনুশোচনা ও ধর্মকামতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে তাঁর রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি মগধের দিগ্বিজয়-নীতি বর্জন ক'রে নূতন নীতি প্রবর্তন করলেন; ওই নূতন নীতির নাম হ'লো ধর্মবিজয়।

শরশক্য-বিজয় অর্থাৎ অস্ত্রবিজয়েরই নাম দিগ্বিজয়; আর, প্রেম বা প্রীতির সাহায্যে যে বিজয় তাকেই অশোক ধর্মবিজয় নামে অভিহিত করেছেন। কলিঙ্গ-যুদ্ধের পর অশোক যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পরিহার ক'রে ধর্মবিজয়ের নীতি অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর অবিজিত প্রতিবেশী রাজ্যের অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়ে জানিয়ে দেন যে, তাঁর কাছ থেকে তাদের কোনো ভয় নেই; তিনি তাদের দুঃখের হেতু না হ'য়ে সুখেরই হেতু হবেন। তিনি নিজে দিগ্বিজয়-নীতি পরিহার ক'রেই ক্ষান্ত হননি; তাঁর পুত্র-প্রপৌত্রেরাও যেন ভবিষ্যতে নবরাজ্য-বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা মনে স্থান না দেন, সে ইচ্ছাও তিনি তার গিরিলিপিতে চিরস্থায়ী রূপে অঙ্কিত করে গিয়েছেন। এ-ভাবে অশোকের সাম্রাজ্যে রণভেরী গিয়েছিল স্তব্ধ হ'য়ে এবং তার স্থল অধিকার করেছিল ধর্মঘোষণা (ভেরীঘোসো অহো ধম্মঘোসো)।

এইরূপে রক্তপাত-বিতৃষ্ণা শুধু যে অশোকের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল তা নয়; তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও এই অহিংসা-নীতির দ্বারা বিশেষ-ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তৎকালে রাজাদের মধ্যে বিহার-যাত্রা ক'রে মৃগয়া প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের রীতি খুবই সুপ্রচলিত ছিল। পশু-শিকার স্পষ্টতই অহিংসা-নীতির বিরোধী; তাই অশোক বিহার-যাত্রার স্থলে ধর্ম-যাত্রা অর্থাৎ তীর্থাদি দর্শন ক'রে ধর্ম-প্রচারের রীতি প্রবর্তন করেন। পূর্বে অশোকের রন্ধন-শালার জন্যে প্রতিদিবস বহু প্রাণী নিহত করা হ'তো; পরে ওই প্রাণীদের সংখ্যা বহুল পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রত্যহ মাত্র দুটি ময়ূর ও একটি মৃগ নিহত করার ব্যবস্থা হয়,—অবশ্য প্রত্যহ একটি ক'রে মৃগ বধ করার রীতিতে প্রায়ই ব্যতিক্রম ঘটত। কিন্তু কালক্রমে এই তিনটি প্রাণী বধ করাও অশোকের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠলো এবং তিনি রাজ-মহানসে প্রাণী-হত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ক'রে দিয়ে নিরামিষাহারী হলেন। এভাবে অশোক ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে অহিংসা-পথের পথিক হলেন। তখনকার দিনে একাজ যে কত কঠিন ছিল, আজকাল তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করাও সহজ নয়।

ব্যক্তিগত জীবনে অবিমিশ্র-রূপে অহিংসা-পন্থী হওয়া সম্ভব হ'লেও রাজনীতিতে তা কতখানি সম্ভব, তা অশোকের ইতিহাস থেকে বিচার ক'রে দেখা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি তিনি একেবারেই বিমুখ

হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুশাসন থেকেই প্রমাণিত হয় যে, যুদ্ধের সম্ভাব্যতাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে পারেননি। যে অনুশাসনটিতে তিনি কলিঙ্গ-যুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে নিজের বেদনা ও অনুশোচনার কথা জ্ঞাপন করছেন এবং বলছেন যে, ওই যুদ্ধে মানুষের যে দুঃখ-কষ্ট হয়েছিল এখন তিনি তার শতভাগ বা সহস্রভাগ দুঃখকষ্টকেও অত্যন্ত শোচনীয় ও গুরুতর ব'লে মনে করেন, সেই অনুশাসনটিতেই কিন্তু বলা হয়েছে যে, যদি কেউ আমার অপকার করে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করা চলে ততক্ষণই আমি তাকে ক্ষমা করব (য়ো পি চ অপকরেয় তি ছমিতবিয়মতে বো দেবনং প্রিয়স য়ং শকো ছমনয়ে, ১৩নং গিরিলিপি)। এই কথার ইঙ্গিত হচ্ছে এই যে,—কলিঙ্গ-বিজয়ের পর অশোক যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিহার করেছেন বটে এবং ওই যুদ্ধের সহস্রাংশ দুঃখ-কষ্টও তিনি কোনো রাজ্যকে দিতে অনিচ্ছুক বটে, কিন্তু তা ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে, তবে তো অশোকের রাজ্যের অপকার করা খুবই সহজ। ওই অপকারেচ্ছুদের তিনি শাসিয়ে বলছেন যে, তাঁরও ধৈর্য এবং ক্ষমার একটি সীমা আছে, ওই সীমা অতিক্রান্ত হ'লে তিনি অস্ত্রধারণ ক'রে তাদের শাস্তিবিধান করতে কুণ্ঠিত হবেন না। এই উপলক্ষে ওই ত্রয়োদশ গিরিলিপিটিতেই অশোক তাঁর সাম্রাজ্যান্তর্গত অটবীরাজ্যের অধিবাসীদের অনুনয় ক'রে জানাচ্ছেন যে, কলিঙ্গ-যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হ'লেও তিনি শক্তিহীন নন, তাদের কৃতকার্যের জন্যে তারা যদি লজ্জা প্রকাশ না করে তবে তাদের হনন করা হবে (অবত্রপেয়ু ন চ হংঞেয়সু)। অন্যত্র যেখানে তিনি তাঁর অবিজিত প্রতিবেশী (অংত) রাজ্যের অধিবাসীদের অনুদ্বিগ্ন হবার আশ্বাস দিয়ে জানাচ্ছেন, "আমার কাছ থেকে সুখই লাভ করবে, দুঃখ নয়", সেই অনুশাসনটিতেও তিনি কিন্তু তাঁর যুদ্ধ-বিমুখতার সীমাটুকু নির্দেশ করে দিয়ে এ-কথা বলতে ভোলেননি যে, যতটুকু পর্যন্ত ক্ষমা করা যায় ততটুকুই ক্ষমা করা হবে (খমিসতি নে দেবনং পিয়ে অফাকং তি এ চকিয়ে খমিতবে), তার বেশি নয়।

এ-সমস্ত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হ'য়ে ওঠে যে,—অশোক যুদ্ধ-বিমুখ ছিলেন বটে, কিন্তু সে শুধু রাজ্যবিস্তারমূলক (অর্থাৎ offensive

ও aggressive) যুদ্ধের বিরুদ্ধে ; রাজ্যরক্ষামূলক (অর্থাৎ defensive) যুদ্ধেরও তিনি বিরোধী ছিলেন, এ-কথা মনে করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। আধুনিক কালের অহিংসা-নীতির সমর্থকদের মতো অশোক সর্বপ্রকার যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন না, এ-কথাটি স্মরণ রাখা উচিত। কলিঙ্গ-যুদ্ধের পরে অশোককে আর কখনও সমর-সজ্জা করতে হয়েছিল কি না, অথবা রামকৃষ্ণ-কথিত অহিংস সর্পের মতো শুধু ফোঁস ক'রেই তাঁর অপকারকদের নিরস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তা স্পষ্টরূপে জানা যায় না।

অশোক অনাবশ্যক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু তা ব'লে তিনি যে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ থেকেই বিরত ছিলেন, তা নয়। তিনি যে এক সময়ে বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ ক'রে ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভিক্ষুবেশী অশোকের হৃদয়ে ভিক্ষুধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ ঘটেনি। ভিক্ষুব্রতী হ'লেও রাজনীতি-পালনে তিনি কিছুমাত্র শৈথিল্য বা দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। তাঁর ধর্মপ্রচারের ফলে সকলেই যে অপকার্য থেকে বিরত হ'য়ে ধর্মপ্রাণ হ'য়ে উঠেছিল তা মনে করা যায় না। ধর্মপ্রচার সত্ত্বেও বহু লোকই নানা প্রকার অপরাধে লিপ্ত হ'তো এবং অশোককেও তাদের শাস্তিবিধান করতে হ'তো। কেননা দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন, উভয়ই রাজার কর্তব্য। দুষ্টের দমন বলপ্রয়োগ-সাপেক্ষ এবং ওই বল-প্রয়োগে অশোক কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁকেও কারাগার রক্ষা করতে এবং অপরাধীদের কারাবদ্ধ করতে হ'তো। তবে বছরে একবার ক'রে তিনি কয়েদিদের কারামুক্তি ('বন্ধন-মোক্ষ') দিতেন। আর, যারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হ'তো তাদের প্রাণদণ্ড-বিধানেও তিনি ইতস্তত করেননি। তবে তিনি বধদণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীদের তিন দিনের সময় মঞ্জুর করতেন, যেন তারা ওই সময়ের মধ্যে দান, উপবাস প্রভৃতি ধর্মাচরণের দ্বারা নিজেদের পারত্রিক কল্যাণ সাধন করতে পারে ও প্রজা-সাধারণের মধ্যে অধিকতর ধর্মপরায়ণতার প্রেরণা রেখে যেতে পারে।

আলোচিত তথ্যগুলি থেকেই মানুষের প্রতি প্রযোজ্য অশোকের অহিংসা-নীতির সীমা কোথায়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় থাকে না। কিন্তু

ওই নীতিটি আধুনিক কালের ন্যায় প্রাচীন কালেও মানুষ এবং পশু উভয়ের প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। অশোক নিজেকে মানুষ এবং পশু সকল জীবের নিকটই ঋণী মনে করতেন; তাই মানুষ পশু প্রভৃতি সর্বভূতের সেবা ও কল্যাণ-সাধন ক'রে আনৃণ্য লাভ করাই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য (ভূতানং আণংনং গচ্ছেয়ং, ৬নং গিরিলিপি)। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে তিনি স্বীয় রাজ্যে তথা চোল, পাণ্ড্য প্রভৃতি ভারতীয় প্রত্যন্ত দেশে এবং এন্টিয়োকস প্রভৃতি প্রতিবেশী যবন (অর্থাৎ গ্রীক্) রাজাদের রাজ্যে মানুষ এবং পশু উভয়েরই চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন (দ্বে চিকীছা কতা মনুস-চিকীছা চ পসু-চিকীছা চ, ২নং গিরিলিপি)। শুধু তাই নয়, মানুষ এবং পশুর উপযোগী (মনুসোপগানি চ পসোপগানি চ, ঐ) ওষুধের গাছ-গাছড়াও যেখানে যা নেই সেখানে তা আনিয়ে রোপণের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তা-ছাড়া, পথে পথে তিনি কূপ-খনন এবং বৃক্ষ-রোপণও করিয়েছিলেন; উদ্দেশ্য মানুষ এবং পশু উভয়েরই স্বাচ্ছন্দ্য-বিধান (পরি-ভোগায় পসুমনুসানং, ঐ)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুধু মানুষের প্রতি নয়, পশু প্রভৃতি জীবের প্রতি দয়াতেও অশোকের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। এখন দেখা যাক, এই জীবের প্রতি অহিংসা-নীতি সম্পর্কে অশোক কোন্ জায়গায় সীমারেখা টেনেছিলেন।

আমরা পূর্বেই দেখেছি অশোক নিজে আমিষাহার ত্যাগ ক'রে স্বীয় রন্ধনশালার জন্যে সর্বপ্রকার পশুহত্যা সম্পূর্ণ-রূপে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। বিহার-যাত্রা বা মৃগয়াতেও তিনি পশুবধ থেকে বিরত হয়েছিলেন। এ-ভাবে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে অহিংসা-নীতির অনুসরণ করতেন বটে; কিন্তু প্রজা-সাধারণকে অহিংসা-নীতি পালনে তিনি কতখানি বাধ্য করেছিলেন, সেইটেই জিজ্ঞাস্য।

প্রথমেই ব'লে রাখা ভালো যে, এ-বিষয়ে তিনি প্রজাদের শুধু উপদেশ দিয়েই নিরস্ত হয়েছিলেন; কখনও তাদের বাধ্য করেছিলেন বা শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন, এমন প্রমাণ নেই। তিনি শুধু পুনঃপুনঃ ঘোষণা করেছেন, যজ্ঞার্থে প্রাণী-বধ বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে জীব-হিংসা না করাই ভালো (সাধু অনারংভো প্রাণানং, অবিহীসা ভূতানং); কিন্তু এই উপদেশ পালিত না হ'লে

কোনো শাস্তি-বিধানের উল্লেখ তাঁর অনুশাসনে নেই। যজ্ঞার্থে প্রাণী-বধ (প্রাণারম্ভো) এবং মাংসাহার বা অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্যে জীব-হিংসা (বিহিংসা চ ভূতানং), এই দুয়ের মধ্যে প্রথমটিই অশোকের মতে অধিকতর অন্যায় ব'লে গণ্য হ'তো। এ-রকম মনে করার হেতু এই যে, অশোক যতবার ভূত-বিহিংসার কথা বলেছেন তার চেয়ে বেশি বলেছেন প্রাণারম্ভের কথা; তৃতীয় গিরিলিপিতে তিনি শুধু বলেছেন 'প্রাণানং সাধু অনারংভো', কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে 'অবিহিংসা (অশোকের অনুশাসনে 'অহিংসা' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় না) ভূতানং' বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রথম গিরিলিপিতে "ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা প্রজূহিতব্যং" এই উক্তির মধ্যে যজ্ঞার্থে পশুবধের বিরুদ্ধে যে-রকম স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, সাধারণ জীব-হিংসার বিরুদ্ধে তেমন স্পষ্টোক্তি কোথাও নেই। তা-ছাড়া, যজ্ঞার্থে পশুবলির বিরুদ্ধে এই উক্তির কোনো ব্যতিক্রমের উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু সাধারণ জীব-হিংসা-বিষয়ক বিধানটির বহু ব্যতিক্রমের কথা দেখা যায় পঞ্চম স্তম্ভলিপিতে। ওই লিপিতে দেখা যায়, অশোক তাঁর রাজ্যাভিষেকের ষড়্বিংশ বৎসরে কতকগুলি জীবকে অবধ্য ব'লে ঘোষণা করেন; এই অবধ্য প্রাণীদের তিনি একটি তালিকা দিয়েছেন। যথা—শুক, সালিক, চক্রবাক, হংস, ষাঁড়, গণ্ডার, শ্বেতকপোত, গ্রামকপোত; এবং তার পরেই বলছেন, "যে-সব চতুষ্পদ জীব মানুষ খায়ও না, (চামড়া প্রভৃতির জন্যে) মানুষের কাজেও লাগে না" (সবে চতুপদে যে পটি-ভোগং নো এতি ন চ খাদিয়তি) সেগুলিও অবধ্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অশোক খাদ্যার্থে বা চর্ম প্রভৃতি লাভার্থে পশুবধ নিষেধ করেন নি, যদিও তিনি নিজে খাদ্যের জন্যেও পশুহত্যা থেকে বিরত ছিলেন। ওই লিপিতেই দেখা যায়, বছরের মধ্যে কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি মাছ ধরা ও বিক্রি করা এবং কতকগুলি জন্তুকে নির্মুষ্ক করা অনুচিত ব'লে জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময়ে এই নিষেধ-বিধি প্রযোজ্য ছিল না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অশোক ব্যক্তিগত জীবনে জীবজন্তু-সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অহিংসা-নীতির পক্ষপাতী হওয়া সত্ত্বেও প্রজা-সাধারণের উপর নিজের ধর্মবিশ্বাসকে চাপিয়ে দেওয়া সংগত মনে করেননি। এখানেও তাঁর রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাই। তখনকার দিনে মাছমাংস খাওয়া সমগ্র দেশে সুপ্রচলিত ছিল; এ অবস্থায়

সমগ্র দেশকে নিরামিষভোজী ক'রে তোলা সম্ভবও ছিল না এবং সে চেষ্টা করাও যথার্থ রাজনীতির কাজ হ'তো না। অশোকও তাই মাছমাংস খাওয়া এবং খাদ্যার্থে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে জীবহত্যা নিষেধ করেননি। তিনি শুধু যজ্ঞার্থে জীবহত্যা ও নিষ্প্রয়োজন জীবহত্যার বিরুদ্ধেই প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। উপনিষদের যুগে পশুঘাত-মূলক যাগযজ্ঞের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, অশোকের আমলেই তার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই।

পূর্বে দেখেছি অশোক অহিংসা-নীতির সমর্থক হ'লেও সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধবিরোধী বা নরহত্যা-বিরোধী ছিলেন না। রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিগ্রহ এবং তজ্জাত অকারণ নরহত্যার তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রাজ্যরক্ষা-মূলক যুদ্ধ এবং অপরাধীদের প্রাণদণ্ড-বিধানের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন। এখন দেখলাম, অকারণ জীবহত্যা ও যজ্ঞার্থে পশুবধের বিরুদ্ধে প্রচার করলেও তিনি রাজ্যমধ্যে খাদ্যার্থে বা অন্যবিধ প্রয়োজনে জীবহত্যার প্রয়োজনকে অস্বীকার করেননি। অর্থাৎ অশোক নিজে ব্যক্তিগত ভাবে অহিংসা-নীতির উপাসক হ'লেও তিনি তাঁর রাজনীতিকে কখনও ওই অহিংসা-নীতির কুক্ষিগত ক'রে ফেলেননি। ধর্মনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রগত পার্থক্য তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

৩

এবার ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে অহিংসা-ও রাজনীতি-বিষয়ক আরও কয়েকটি কথা ব'লেই প্রবন্ধ শেষ করব। কুষাণ-সম্রাট কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হ'লেও যুদ্ধবিগ্রহ তথা নরহত্যার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র অরুচি ছিল না। বাংলা দেশের বৌদ্ধ পাল-সম্রাটগণের পক্ষেও এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। সম্রাট হর্ষবর্ধনও তাঁর বৌদ্ধধর্ম তথা অহিংসা-নীতির প্রতি অনুরাগের জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জীবনের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন।

ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব) সম্প্রদায়ও অহিংসা-প্রীতির জন্যে বৌদ্ধ এবং জৈন সমাজের সমশ্রেণী ব'লে গণ্য হয়েছে। ভাগবত সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ

ভগবদ্‌গীতাতেও পুনঃ পুনঃ অহিংসা-নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তা সত্ত্বেও গীতা যে যুদ্ধবিরোধী নয়, তাও পূর্বে বলা হয়েছে। এবার ভাগবত-সম্প্রদায়ের ইতিহাসের নজিরে দেখা যাক অহিংসা ও রাজনীতি তথা যুদ্ধবিগ্রহের পারস্পারিক সম্পর্ক কতখানি। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অশোকের যুগ যেমন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ভাগবত-ধর্মের ইতিহাসেও তেমনি গুপ্ত-সম্রাটগণের যুগই সব চেয়ে গৌরবময়। বিক্রমাদিত্য-প্রমুখ পরম ভাগবত গুপ্ত-সম্রাটগণের আধিপত্য ভারতবর্ষের ইতিহাসকে মৌর্য যুগের চেয়ে কম গৌরবান্বিত করেনি। কিন্তু ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্রাটগণ যুদ্ধবিগ্রহ তথা রাজ্যজয়কেই সর্বশ্রেষ্ঠ রাজকীর্তি ব'লে গণ্য করতেন। শুধু তাই নয়, যে অনুষ্ঠান- ও হিংসা-মূলক যাগযজ্ঞকে ভগবদ্‌গীতায় নিকৃষ্ট ও নিম্ন স্তরে স্থাপন করা হয়েছে, পরম ভাগবত গুপ্ত-নরপতিরা সেই যাগযজ্ঞকেও স্বীয় কীর্তি-প্রতিষ্ঠার প্রধান অঙ্গরূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাঙ্ক এবং কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য এই দুইজন সম্রাটই অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। অথচ ভাগবত-ধর্মশাস্ত্র গীতার মতে ওই যজ্ঞ প্রশস্ত নয়, কেননা অশ্বমেধ দ্রব্যময়ও বটে এবং অহিংসা-নীতির প্রতিকূলও বটে।

এবার কয়েক-জন বিখ্যাত জৈন রাজার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ করা যাক্। জৈন নৃপতিদের মধ্যে কলিঙ্গের চেত-বংশীয় সম্রাট্ খারবেল (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় বা প্রথম শতক), দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট-বংশীয় সম্রাট অমোঘবর্ষ (৮১৫-৭৭) এবং গুজরাটের চৌলুক্য-বংশীয় অধিপতি কুমারপালের (১১৪৩-৭৪) নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দিগ্‌বিজয়-লিপ্সু খারবেলের বিজয়-বাহিনী উত্তরে মগধ থেকে দক্ষিণে পাণ্ড্যভূমি পর্যন্ত ভারতবর্ষের বহু স্থানেই কলিঙ্গ-রাজবংশের পরাক্রম বিস্তার করেছিল; জৈন ধর্মের অহিংসা-নীতি এই দিগ্‌বিজয়ের বিরোধী ব'লে গণ্যই হয়নি। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ ছিলেন জৈন ধর্মের পরম অনুরাগী এবং সুপ্রসিদ্ধ জৈনকবি জিনসেনাচার্য ছিলেন তাঁর ধর্মগুরু। এই পরম উৎসাহী জৈন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় নবম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে জৈন ধর্মের অতি দ্রুত অভ্যুদয় ঘটেছিল। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অমোঘবর্ষ তাঁর সমগ্র রাজত্বকালটাই বহু যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়েছিলেন। চৌলুক্যরাজ কুমারপাল জৈনাচার্য হেমচন্দ্র সূরীর প্রভাবে জৈনধর্ম গ্রহণ

করেছিলেন; কিন্তু তাঁর এই নব-গৃহীত ধর্মের প্রতি অত্যধিক অনুরাগও তাঁকে রাজ্যলিপ্সা ও সংগ্রাম থেকে নিরস্ত করতে পারেনি। অথচ অহিংসা-নীতির প্রতি তাঁর অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, কথিত আছে পশু-পক্ষী বা কীট-পতঙ্গের প্রাণনাশের অপরাধে তিনি মানুষের প্রাণদণ্ড-বিধানেও দ্বিধাবোধ করতেন না। অহিংসা-নীতির আতিশয্য ও বিকার ঘটলে তা যে কতখানি স্ব-বিরোধী ও মারাত্মক হ'য়ে উঠতে পারে, কুমারপালের এই আচরণ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা দেখেছি বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও সম্রাট্ হর্ষবর্ধন রাজ্যজয় ও যুদ্ধবিগ্রহে কখনও বিরত হননি। তাঁরও অহিংসা-প্রীতির আতিশয্যের প্রমাণ পাই হিউএন্থ্ সাঙ্-এর গ্রন্থে। উক্ত চৈনিক লেখকের মতে হর্ষবর্ধন স্বীয় রাজ্যে সর্বপ্রকার জীব-হত্যা ও আমিষ-ভোজন নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন এবং এই নিষেধাজ্ঞা অপালনের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড। চৈনিক পণ্ডিতের এই উক্তিটি কতখানি সত্য তা বলা যায় না; আর সত্য হলেও আপাত-দৃষ্টিতে এটিকে যত গুরুতর মনে হয় বস্তুত তা ছিল না। কেননা, হর্ষবর্ধনের পূর্ববর্তী গুপ্তযুগেই দেখা যায় অহিংসা-নীতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে একটি সর্বজন-গ্রাহ্য নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১৩) রাজ্য সম্বন্ধে চৈনিক ভিক্ষু ফা হিয়ান লিখেছেন: Throughout the country no one kills any living thing......they do not keep pigs or fowls, there are no dealings in cattle, no butchers' shops or distilleries in their market-places. এর থেকে বোঝা যায়, দিগ্‌বিজয়-নীতির অনুসরণের ফলে গুপ্তযুগে যুদ্ধবিগ্রহ এবং অশ্বমেধ যথেষ্ট লোকপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও জন-সাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অহিংসা-পন্থী ও নিরামিষ-ভোজী হ'য়ে উঠেছিল। এবং আজও ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের হিন্দু-সমাজ সম্বন্ধে এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। এটি যে অশোকের প্রচারিত 'অবধ্য'-নীতির একটি বিস্ময়কর ফল, এ-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। যা-হোক, হর্ষবর্ধনের আমলে সমাজের সাধারণ অবস্থা যে গুপ্ত-যুগ থেকে ভিন্নরূপ ছিল, এ-কথা মনে করবার কোনো কারণ নেই। যদি তাই হয়, তবে হিউএন্থ্ সাঙ্-এর পূর্বোদ্ধৃত উক্তির গুরুত্ব

যে অনেক ক'মে যায়, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তথাপি চৈনিক পরিব্রাজকের উক্তি সত্য হ'লে বলতে হবে যে, হর্ষবর্ধনের অহিংসা-নীতি বিকারগ্রস্ত হ'য়ে বাড়াবাড়ির দিকে ঝুঁকেছিল।

৪

আশা করি এই সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে যে, ভারতবর্ষীয় অহিংসা-নীতি আসলে ছিল ধর্মসংস্কার-মূলক, মুখ্যত যজ্ঞার্থে পশুবলি-বিরোধী। পরে ওই নীতি আহারার্থে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে পশু-হত্যার বিরুদ্ধতার রূপও ধারণ করে। কিন্তু ওই নীতি কখনও যুদ্ধ বা মৃত্যুদণ্ড-বিধানের বিরোধী ব'লে স্বীকৃত হয়নি।

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্তোষকুমার মজুমদারকে লিখিত —

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ, পর্শু আমরা এখান থেকে আমেরিকায় পাড়ি দিচ্চি। আশা করচি তোমাদের ইলিনয়ে গিয়ে কিছুদিন নির্জ্জনে রোদ পুইয়ে আবার মনটা তাজা হয়ে উঠ্‌বে। এদেশে কেবল যে কুয়াশায় দশদিক আচ্ছন্ন—এদেশে নিজের আলোচনার মধ্যে নিজে কি রকম ঢাকা পড়ে যেতে হয়। বিদায়ের পূর্ব্বে এখানকার কাজ যতটা পেরেছি সেরে নিয়েছি। অনেক তর্জ্জমা করে ফেলেছি। সেইজন্যে তোমাদের জন্যে কোনো লেখা লিখে পাঠাতে পারিনি—একটা আরম্ভ করেছিলুম কিন্তু শেষ করতে পারিনি। দেখি যদি জাহাজে এই দেশের বিবরণ শেষ করে ফেলতে পারি।

কাল এই লণ্ডনে বসে সিংহদের কাছ থেকে সুরুলের বাড়ি কিনে ফেলেছি। রথীকে যে জিনিষ নিয়ে আলোচনা করতে হবে তার জন্যে ঐ বাড়ি ও বাগানের দরকার। এই চিঠির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বাড়ি দখল করবার অনুমতি পাবে। আমার ইচ্ছা তুমি সপরিবারে ঐখানেই আশ্রয় লও। আমরা ফিরে গেলেও তোমরা আমাদের সঙ্গেই থাকতে পারবে। রথীর সঙ্গে বরাবর তোমার কাজের ও জীবনের যোগ থেকে যায় এটা আমার পক্ষে একটা আনন্দের বিষয়। তোমরা থাকলে বাগানটা বাড়িটা যত্নে থাকবে। নইলে হয়ত দরজা জানলা ভেঙেচুরে নিয়ে যাবে। তোমার গোরু মহিষও যদি ঐখানে রাখবার ব্যবস্থা করতে পার তাহলে তাদের চরবার এবং স্নান প্রভৃতির অনেক সুবিধা হতে পারবে। সেদিক থেকে হয়ত ওদের খোরাকি খরচ কিছু কমবার সম্ভাবনা আছে। বাগানে প্রায় একশো বিঘা জমি—তা ছাড়া আশে পাশে চারিদিকেই চরবার ডাঙা নিশ্চয়ই আছে। রোজ দুধ ইস্কুলে পাঠাবার বন্দোবস্ত তোমাদের গোরু কিম্বা মহিষ দিয়েই কি হতে পার্ব্বে না? একটা ছোট cart রাখ্‌তে হবে।

তুমি যাতায়াতের জন্যে একটা ঘোড়া কিম্বা bicycle রাখ্‌লে অসুবিধা হবে না। কিম্বা যে গাড়িতে তোমার দুধ আসবে তাতে করেই তুমি আসতে পার্ব্বে— তোমার সঙ্গে এলে দুধ চুরি যাবে না। যাই হোক্ বাড়িটা বাগানটা দখল করে বসতে তোমরা দেরি কোরো না—তা হোলে হয়ত লোকসান হতে পারে। রথীর জন্যে জমি সংগ্রহ করে বাড়ি ও ল্যাবরেটরি তৈরি করিয়ে বাগান প্রভৃতি করতে বিস্তর খরচ পড়বে এবং সে খুব সম্ভব আমার সাধ্যাতীত হবে এই জন্যেই আমার আর্থিক দুর্গতি সত্ত্বেও এই বাড়ি কিনে ফেলতে হল। রথীকে তোমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে আমি আনন্দিত ও নিশ্চিন্ত হব সেই প্রলোভনেই আমি নিতান্ত দুঃসাহসিকতার সঙ্গে এই একটি কীর্ত্তি করে বসে আছি— এখন, যে পর্য্যন্ত না আমরা যাই তোমরা ঐ জায়গাটাকে আগ্‌লে রক্ষা কোরো।

আমার দ্বিতীয় কিস্তি তর্জ্জমা পড়ে Stopford Brooke যে চিঠি লিখেছেন তার একটুখানি নকল পাঠাই:—"I send back the poems. I have read them with more than admiration, with gratitude, for their spiritual help, and for the joy they bring and confirm, and for the love of beauty which they deepen, and for more than I can tell. I wish I were worthy of them."

আশা করি তোমরা এটা কাগজে ছাপিয়ে বস্‌বে না। এ সব গর্ব্ব করবার জিনিষ নয়। নিজের জীবনের কর্ম্ম কোনো একটা জায়গায় সফল হয়েছে এই জানাতেই গৌরব আছে কিন্তু হাটের মধ্যে সেটা জানিয়ে বেড়াতে গেলে সে গৌরব ম্লান হয়ে যায়।

এখন থেকে কিছুকাল তোমাদের চিঠি পেতে আমার দেরি হবে এবং আমার চিঠি পেতেও তোমাদের দেরি হবে। দু তিন হপ্তা কিম্বা আরো বেশি বাদ পড়তে পারে।

508, W. High St
Urbana Illinois

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ, ইংলণ্ড থেকে চিঠিপত্র যা পাওয়া যাচ্চে তাতে বোধ হচ্চে বইটা সেখানে লোকের ভালই লেগেছে। রোটেনস্টাইন লিখেচেন— People have felt your work more than ever I dared to hope and more than you yourself will readily believe. A friend sent the book as a gift to Mrs. Watts, the wife of G. F. Watts the painter, and she wrote that your book has brought her closer to her great husband (dead now some dozen years) than ever since she lost him.

Evelyn Underhill যিনি "Mysticism" বইয়ের লেখিকা, Nationএ তিনিই গীতাঞ্জলির সমালোচনা লিখেচেন। Rothensteinকে তিনি লিখেচেন:—I am delighted that my review of Mr. Tagore's poems did not displease you and that you even think he may like it. Myself, I felt it to be horribly inadequate although I tried my best. It was deliberately made as detached as possible, partly because it seemed to me that the personal note was much overdone in the Introduction and partly because he is too big to sentimentalize over. And I hoped by being objective to help those out of touch with these thoughts to understand his poems. The book itself I look on as a priceless possession and I am always turning to it.

আমার ডাকঘরের তর্জ্জমাটা Yeatsএর ভারি ভালো লেগেছে। তিনি আমাকে লিখেছেন এটা " most beautiful ". রোটেনস্টাইন লিখেছেন— "Yeats thinks the Post Office a masterpiece." খবর পেয়েছি Messrs Macmillan are to republish Gitanjali and to follow it up with the new plays and poems. The terms have only been touched upon.

In any case, you are to have half the profits after the expenses have been paid, and I hope a sum in advance, and the book will, I think, be published in America and in India.

গীতাঞ্জলি তোমাদের হাতে পৌঁছনর সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি— কিন্তু পৌঁচেছে তাতে সন্দেহ নেই। এখানে Christmas ছুটি নিকটবর্ত্তী হয়ে এসেছে। ছুটির সময় আমাদের চিকাগোতে আমন্ত্রণ আছে। সেখানকার যাঁরা খবর পেয়েছেন তাঁরা আমাকে আহ্বান করে পাঠিয়েছেন। এখানকার নিরিবিলি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে সেখানে বোধ হয় কিছু হাঙ্গামার মধ্যে পড়তে হবে। সেখান থেকে জানুয়ারির শেষভাগে Rochester-এ একটা Congressএ যেতে হবে। অতদূরেই যদি যাই তাহলে ওখান থেকে হয়ত Boston প্রভৃতি নানাদিগ্‌দেশে একবার পাক খেয়ে আস্‌তে হবে— তারপরে একেবারে ঝোড়ো কাকের মত হয়ে গ্রীষ্মাবকাশে ইংলণ্ডে গিয়ে উপনীত হব। ইতি ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩১৯

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ, পথের মধ্যে আছি। সময় অত্যন্ত অল্প। কাল ভোরে বষ্টনে যাত্রা করতে হবে— সেখানে সম্ভবত ভিড়ের মধ্যে পড়ব সেই ভয়ে আজ রাত্রেই তোমাদের চিঠিপত্র লিখে রাখছি। এক আধ হপ্তা যদি চিঠি না পাও তাহলে জেনো আমি ব্যস্ত আছি এবং সে ব্যস্ততা হয়ত নিতান্ত নিরর্থক নয়। Prof. Eucken আমার গীতাঞ্জলি পড়ে যে চিঠি লিখেছেন সেটা নকল করে পাঠাই। দেখো যেন কাগজে ছাপিয়ে বোসো না।

"It was a great joy for me to receive your kind letter and your admirable book. I have read it with greatest interest, and I am delighted through its beauty and its profundity. It is wonderful, how you give from the all-embracing unity a vivid

aspect of nature and human life as well religious as artistic ; we have nothing in our modern literature that could be compared with your songs. I have heard from you long time ago through Mr. Chakravarti, who spoke with great enthusiasm from you and who has sent me clippings from the newspapers concerning your works and your personality. Now I am glad to see you very soon in Rochester, and I hope that we both will consider together the great problems which are common to mankind and for which no people has worked more than the Hindus and the Germans.

Will you kindly excuse my bad English, in manifold works and tasks I found no time to practise it sufficiently.

I repeat my warmest thanks and my hearty joy to see you personally very soon.

এবারে আমেরিকার প্রবাহের মধ্যে গা ভাসান দিয়েছি। কিন্তু এ রকম ভেসে বেড়ানো আমার পক্ষে যে কি রকম ক্লেশকর তা আমি বলে শেষ করতে পারিনে। মনের ভিতরটাতে কোনো আরাম পাইনে। যে লোক মাতাল নয় তাকে জোর করে মদ খাওয়ালে তার যে রকম দশা হয় আমার তাই হয়েছে। ভয় হয় পাছে এই আন্তরিক অশান্তিতে হঠাৎ আবার আমার শরীরযন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে।

অনেক রাত হয়ে গেছে— কাল খুব ভোরে উঠে যাত্রা করতে হবে অতএব আমার পত্রের এই পৃষ্ঠায় খানিকটা শূন্য স্থান রেখে দিলুম। সেটুকু আমার স্নেহাশীর্ব্বাদে ভরিয়ে নিয়ো। আরো চিঠি লেখা বাকি আছে। ইতি ৩০শে জানুয়ারি ১৯১৩।

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

508 W. High Street
Urbana. Illinois.
U. S. A.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ, নরেন্দ্রসিংহকে কয়েকদিন হোলো তাঁর সুরুলের বাড়ির অবস্থা জানিয়ে চিঠি লিখেছি। আমার চিঠি পেয়ে যদি তিনি নিষ্কৃতি দেন তাহলে ভালোই, না যদি দেন তাহলে ঐ ভাঙা সম্পত্তিই প্রসন্নমনে শিরোধার্য্য করে নিতে হবে। লোকসান জিনিষটাকে মর্ম্মের মধ্যে বিঁধিয়ে রক্ত বিষাক্ত করে তোলবার দরকার নেই— যা গেছে তাকে যেতে দাও, যা এসেছে তাকে নিয়ে নাও এবং যতটুকু তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পার সেইটুকুই আদায় করে নাও। সংসারের এই সমস্ত ছোটখাট লোকসানের কামড়গুলো পিঁপড়ে লাগার মত— তারা অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু যদি তাদের লেগে থাকতে দাও তাহলে তারা সমস্তটাকে ক্ষয় করে ফেলে। অতএব ঝেড়ে ফেলে দাও। জীবনের অন্তরতর প্রসন্নতা সুরুলের ভাঙাবাড়ির চেয়ে ঢের বড়। আজ সকালে বসে খামকা একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা হোলো—ধাঁ করে লিখে ফেল্লুম। লেখা হয়ে গেলে তারপরে চেতনা হোলো এটা আমারই জীবনের ইতিহাস— আমার জীবনদেবতা হাস্যমুখে সেইটে লিপিবদ্ধ করেছেন। জীবনে কি রকম লাভের ব্যবসাটা যে আমি ফেঁদেছি তিনি বিষয়ী লোকের কাছে সেইটে প্রকাশ করে দিয়েছেন। তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ। অনেক ঘোরাঘুরির পরে শেষকালে নিঃসম্বল খরিদ্দারদের কাছে বিনামূল্যে কি রকম বিক্রিটা হোলো।—

"কে নিবিগো কিনে আমায় কে নিবিগো কিনে?"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।

... ...

২৪ শে পৌষ ১৩১৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি

পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লিখিত এই স্বরলিপিটি আমার কাছে এতদিন ছিল। আজ লোকচক্ষু-সমক্ষে তাকে বার করলুম এইজন্য যে, আমার বিশ্বাস এইটিই তাঁর স্বকৃত একমাত্র স্বরলিপি। অন্যান্য যে-সব পুরনো গানের বইয়ে স্বরলিপিকার বলে তাঁর নাম রয়েছে দেখতে পাই, সেগুলি তাঁর নিজের হাতে করা কিনা, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। অন্তত কলকাতা-বাসকালে আমরা তাঁকে কখনো স্বরলিপি করতে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। শান্তিনিকেতনের অধিবাসীরাও বোধহয় এ সম্বন্ধে অনুরূপ সাক্ষ্যই দেবেন।

এই স্বরলিপি করবার সনতারিখ আমি দিতে পারব না; তার বিশেষ আবশ্যকতাও বোধহয় নেই। তবে কাগজটি যে বহুদিনের, তার দুরবস্থাই তার প্রমাণ। মূল স্বরলিপির নীল পেন্সিলের লেখা ব্লক করা সম্ভব হয়নি। তা ভিন্ন আর সবই যথাযথ রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক স্বরলিপিজ্ঞগণ দেখে কৌতুক বোধ করবেন যে, কবিগুরু মামুলী আকারমাত্রিক স্বরলিপির সংকেত সম্পূর্ণ মেনে চলেননি। সেটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্বকীয়তা-বশতঃ, অথবা তখন আকারমাত্রিক পদ্ধতির শৈশব অবস্থা ছিল বলে, সে কথা এখন নির্ণয় করা শক্ত।* — শ্রীইন্দিরা দেবী।

* আর-একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, গানের কথাগুলি স্বরলিপিতে যেরূপ দেখা যায়, মুদ্রিত অবস্থায় সেরূপ কতকটা বদলে গিয়েছিল। গানটি কবিতা-আকারে পরিবর্ধিত হয়ে প্রকাশিত হয় 'কল্পনা'তে। নিচে এই দুটি রূপই পাশাপাশি দেখানো হ'ল।—সম্পাদক

স্বরলিপিতে	কল্পনাতে
এ কি সত্য সকলি সত্য,	এ কি তবে সবি সত্য,
হে আমার চিরভক্ত।	হে আমার চিরভক্ত।
মোর নয়নের বিজুলি-উজল আলো	আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে,
যেন ঈশান কোণের ঝটিকার মত কালো,—	হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,—
এ কি সত্য।	এ কি সত্য।
মোর মধুর অধর বধুর নবীন	আমার মধুর অধর বধূর
অনুরাগসম রক্ত,—	নব-লাজসম রক্ত,—
হে আমার চিরভক্ত,	হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য।	এ কি সত্য।
অতুল মাধুরী ফুটেছে আমার মাঝে,	চির মন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি।
মোর চরণে চরণে সুধাসংগীত বাজে,—	চরণে আমার বীণাঝংকার বাজে কি।
এ কি সত্য।	এ কি সত্য।
মোরে না হেরিয়া নিশির শিশির ঝরে,	নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া।
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারি তরে,—	প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া,—
এ কি সত্য।	এ কি সত্য।
মোর তপ্ত কপোলপরশে-অধীর	তপ্ত কপোলপরশে অধীর
সমীর মদিরমত্ত,—	সমীর মদিরমত্ত,—
হে আমার চিরভক্ত,	হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য।	এ কি সত্য।

[illegible]
এ কি স — ত্য, স-ক-লি স — ত্য?... হে আ-মা-র — — — চির

[illegible]
ভ ক্ত - এ কি স -- ত্য -- এ কি স -- ত্য --- হে আ-মা-র -- চি- র

[illegible] ||
ভ -- ক্ত -- এ কি স --- ত্য।

||
[illegible]
মোর ন -- য়-নে-র বি-জু-লি-উ-জ্জ-ল আলো --- যেন ঈশানের কোণের

[illegible]
ঝটিকার -- র মতো ক -- লো, এ কি স — ত্য — মোর মধুর অধর

[illegible]
রুচির -- নবীন অনুরাগের সম র -- ক্ত, - হে আমার -- চির ভ -- ক্ত

[illegible] ||
— এ কি ||

[illegible]
অ-তু-ল মা-ধু-রী ফু-টে-ছে আমার মা — ঝে, -- মোর

[illegible]
চ-র-ণে চ-র-ণে সুধা সংগীত - বা — জে -- এ কি স — ত্য ....

[illegible]
মোরে হেরিয়া নিশিদিন ঝি ঝি করে ... প্রভাত আলোকে পুলক
[illegible]
অঙ্গে ভরে ---- এ কি স -- ত্য --- মোর ত -- নু কপোল রাঙে

[illegible]
আজীবন সাধনার মণি তুমি স --- ত্য --- হে আমার -- চির

[illegible] ||
ভ --- ক্ত --- এ কি ||

মাসিমা*

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাসির বাড়ির দক্ষিণ পাঁচিল ঠেসান দিয়ে ঘরখানি— রেলের ধারেই লাল রংকরা তিনটি জানলা। ঘরটা চায়ের ক্যাবিন ডাকবাংলা মিলে দেড় ছটাক, পুরো একটা কিছু হতে পারেনি— হবেও না কোনোদিন।

বাসন্তে ভালো ঘর পেয়ে এটা ছেড়ে দিয়েছে আমার জন্যে— দিনরাত রেলগাড়ির চলার শব্দে ঘরখানা কাঁপে, পাছে কোন্‌দিন ঘাড়ে পড়ে এই ছিল তার ভয়। এই ঘরখানি দখল করে থাকি আমি একা। একটা পুরোনো কুর্শি, একটা টেবিল, একটা বেঞ্চি, আর পায়াভাঙা একটা তক্তা, আর-একটি ডালাফাটা কাঠের সিন্দুক— একটি শুঁড়ভাঙা মাটির গণেশ— এই দিয়ে সাজিয়ে ত্থালে পেরেক-আঁটা পট ঝুলিয়ে বসে গেছি আরামে ফুলবাগিচার একপাশে— পুতুল খেলা, পটদাগা, অল্প পড়া, অনেকখানি মনগড়া কত কী নিয়ে। লণ্ঠন নেই, চাঁদ সুর্যি আলো দেয়— পাই, পাখিরা গায়— শুনি ; বাসন্তে মাসির কাছে তেলবাতির পয়সা নিয়ে ফুলুরি কিনে খায়। বললে বলে— আমার কাছে ঘরভাড়া তো চাইতে পারে না, এমনি করে উসুল দিচ্ছে— মাসি যেন না শোনে।

ফুলবাগিচার উত্তরধারে দেখা যায় মাসির দোতলা বাসাবাড়ি— গেরিমাটির রং-করা ছোট্ট যেন পুতুলখেলার বাড়িটি। পশ্চিমধারে দিঘি, পুবধারে পুকুর হাঁসচরা, আঁকতে ইচ্ছে করে ; বসে বসে নিজের ঘরে দেয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে কত কী দেগেছি— বাঁশঝাড়, পানাপুকুরে হাঁস ; পুতুলও গড়েছি— ঝিঙ্কারী-ঝঙ্কারী, কাঠবেড়াল, গোহালের শিংভাঙা বাছুর।

এই সব করছি বসে বসে, মাসি যে কখন এসে গেছেন বুঝতেই পারিনি।

—"ও অবু, তোর খেলাঘর কেমন গোছালি দেখি !"

—"ও মাসি, তুমি এসেছ ? এ যে ভাঙা তক্তা— কোথায় বসবে ?"

—"দেখি-না ঘুরে ঘুরে। ওমা, এ যে পট লিখেছিস দেয়ালে,— ওমা, এ যে চমৎকার সব পুতুল— নিজে গড়লি নাকি ? বাঃ, বেশ তো হয়েছে খেলনাগুলি— সিংগি, বাঘ, গরু, কাছিম,— এটি কি টিয়েপাখি ?"

—"না মাসি, ও পরিবানু বেগম !"

—"এ দুটি ?"

—"চিনতে পারছ না ঝিঙ্কারী-ঝঙ্কারী— একটু শালুর টুকরো দিও মাসি, ওদের পরিয়ে দেব ; দেখবে ঠিক দুটি বোন।"

* পূর্বানুবৃত্তি

—"এ সব কাঠকাটরা কোত্থেকে জোগাড় করিস্ ?"

—"এই বাগান থেকেই কুড়িয়ে-বাড়িয়ে জমা করি সিন্দুকে।"

—"দেখ্ অবু, তোকে আমি কেষ্টনগরে পাঠিয়ে দেবো।"

—"কেন মাসি, আমি তো দুষ্টুমি করিনি !"

—"তা নয় অবু,— পুতুলগড়া, পটলেখা, এ সব কারিগরের কাছে শিখতে হয়। কেষ্ট-নগরে কুমোরপাড়ায় আমার চেনা লোক আছে, গেলে সে যত্ন করে শেখাবে।"

—"কেন মাসি, আমায় মিথ্যে পাঠাবে? আমি আবার পালিয়ে আসব তোমার কাছে।"

—"তা কি হয় অবু? এ সব বিদ্যে গুরুর কাছে শিখতে হয়।"

—"শিখলে কী হয় মাসি?"

—"পয়সা হয়, কড়ি হয়, গাড়ি হয়, জুড়ি হয়!"

—"হয়ে কী হবে?"

—"প্রবাসী কাগজে তোর নাম বেরোবে; চাকরি পেয়ে যাবি বিশ্বভারতীতে!"

—"দুলালকে চিঠি লিখে জানি মাসি; সে যদি বলে তো যাবো!"

—"দুলাল আবার কে অবু?"

—"সে একজন বড়দরের আর্টিস্— আমার বন্ধু!"

—"ও বুঝেছি, মোটা মোটা চুরুট খায়, ঠেংঠেঙে লুঙি, ঠনঠনের চটি, নাকের উপরে গোল চশমা, ঢিলে আস্তিন, বুকের-বোতাম-খোলা জামা, লম্বা ইষ্টিক হাতে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটে— কী যেন খুঁজছে, থেকে থেকে ধুলোবালি হাতড়ে কী যেন তুলে নিয়ে পকেটে ভরে, মাথার তেলোতে চুল নেই …"

—"মাসি, তুমি কী বলছ! দুলাল তো কোনোদিন পুরোনো বাড়িতে যায়নি। তুমি অন্য কাউকে দেখেচো। দুলাল এই আমার সঙ্গে ইস্কুল পালিয়েছে।"

—"অবু, সব ইস্কুল-পালানো ছেলের সঙ্গে মিশো না— তারা সব কুবুদ্ধি।"

—"মাসি, দুলাল বুদ্ধিমান ছেলে বলে ইন্‌স্পেক্‌টারের মেডেল পেয়েছে।"

—"কু-বুদ্ধি বলি আর কাকে! মেডেল পেলি তো ইস্কুল ছাড়লি কেন বাপু?"

—"সে কেন মেডেল পেলে শোনো, তবে তার বিচার কোরো!"

—"আচ্ছা শুনি!"

—"বলি —

ইন্‌স্পেক্‌টার শুধোলেন— 'দুলাল,
ইজিরিডার, মোক্তব উর নোক্তা,
বুধচন্দ্রিকা, ঋজুপাঠ

কেমন লাগে তোমার ?'
—'মশায়, একেবারে গুরুভার !'
গুরুমশায় বেত তুলেছিলেন—
ইন্‌স্পেক্‌টার তাঁকে থামিয়ে বলেন—
'কেমন হওয়া চাই শিশুদের শিক্ষাটি ?'
—'আজ্ঞে, যেমন বোঝার উপর শাকের আঁটি !'
—'আর, এখন কেমন আছে ?'
—'ধোপার মোট যেন উলটে পড়েছে
কল্‌মিশাকের গাছে !'
ক্লাশসুদ্ধু লোক কেলাপ্ কেলাপ্ !
পেয়ে গেল মেডেল
মাষ্টার রামদুলাল।"

—"ও অবু,
পাকা পাকা কথা কয়,
মন নেই পড়াশুনায়,
ইঁচড়ে-পাকা তারে কয় ! —
তোমার এ বন্ধুটিকে তো ভাল বোধ হচ্ছে না ! বুড়িয়ে গেছে যে !"

—"না মাসি, ছেলেমানুষ— ফেলা তাকে দাদা বলে।"

—"ও বুঝেচি ! ফেলা তোমারে কী বলে অবু ?"

—"সে বড়ো হাসির কথা মাসি,— সে আমার নাম দিয়েছে নসিবমশায়।"

—"তার মানে !"

—"সে'ই জানে মাসি ! এখানে আসার আগে পুরোনো বাড়িতে রোজ একবার করে এসে বলতো—'নসিব, আমি এয়েছি।' —'এয়েছ, বেশ করচো !'—'দাও আমি তোমার জিনিসগুলি গুছিয়ে দিই !' — মুখ চললো বকে, হাত চললো গুছিয়ে— 'এই কাগজগুলো কী হবে নসিব ?' —'ফেলে দাও।' —'আমি নিই এইগুলি !' —'নিয়ে হবে কী ছেঁড়া কাগজ ?" —'নিয়ে মা মুড়ির ঠোঙা করবে। এই টিনের কৌটটি দাও-না !' —'কী করবি ?' —'মা সিঁদুর রাখবে। এই নুড়িগুলি নেবো ?' —'বা রে, ও আমার দরকারি নুড়ি, ওতে হাত দিও না !' —'আচ্ছা থাক্, গুছিয়ে রাখি। এই কড়িগুলি আমি নিলুম।' —'কড়ি নিয়ে করবি কী ?' —'ঘুঁটি খেলাবো আমরা !' —'আচ্ছা, কড়িগুলো নিতে পারো।' —'মনিব তো ধমকাবে না ?' —'মনিব কে ?' —'ঐ যে দুয়োরগোড়ায় বসে থাকে বৌদাসীর কোলে চেপে !' 'ওঃ, সেই বুঝি তোমার মনিব ? কিছু বলবে না সে, নিতে পারো তুমি।'

আর কিছু বলে না, যাবার সময় বলে যায়—'তুমি যা ফেলে দেবে আমাকে দিও— মা নেবে, আমরা খেলাবো, বাবা বেচবে বাজারে!' এমন গিন্নি মেয়েটা, কিছু ফেলতে দেবে না। আমি শুধোলেম—'ফেলা, তোর মায়ের নাম কী?' —'কোমদী!' —'বাপের নাম?' —'বসন্ত!' —'কী করে তারা?' —'কাজ করে!' —'কী বললি নাচ করে?' —'ধেৎ, কাজ করে বলচি!' আমাকে এক ধমক দিয়ে চলে গেল মাসি! ভাবলেম, আর আসবে না। সকালে একলা সন্দেশ কিনে খাচ্ছি, দেখি ঠিক সময়ে ফেলা হাজির, ।—'নসিব, সন্দেশ দাও-না!' —'খাও!' তারপর চললো— 'এটা দেবে, সেটা দেবে, তোমাদের ঘর দেখাও-না!' খুব কাজের মেয়েটা; মাসি, তুমি চাও তো আমি লিখলেই চলে আসবে; তোমার হুঙ্কারী-মুঙ্কারীর চেয়ে ঢের ভালো দাসী হবে সে!"

—"তার মা তাকে কেন ছেড়ে দেবে অবু?"

—"ফেলা যে বললে—'মা বলেছে, নসিব যদি ডাকে তো যাস্ ফেলা।'"

—"ওমা, এমন! কত বড় মেয়েটা?"

—"এই মাসি এতো বড়,—না না, এই এমন ছোটটি,—না না, রোসো মাসি, দেখি, ঐ যে তোমার দক্ষিণ বারণ্ডার কোণে দেখা যাচ্ছে ঐ ওইটির মতো এতটুক্ মেয়েটা।"

—"ওটি বুঝি এতটুক্ হলো। ওটি যে একটি সুপুরি গাছ, ফুলের লতা তাকে জড়িয়ে আছে; এখান থেকে দেখাচ্ছে বটে ছোট্ট!"

—"হাঁ মাসি, ঠিক অমনটি— খোঁচা খোঁচা চুল তার, সুন্দর মেয়েটি। কিন্তু একটি দোষ আছে বলে রাখি। সন্দেশ দাও, খেয়ে নেবে; তারপর বলবে— 'তোমাদের সন্দেশ কেমন আটা-আটা; আমার মা যে সন্দেশ দেয় ডেলা-ডেলা মিছরির মত, মিষ্টি খেতে।' একটু নিন্দুক আছে— যদি এখানে এসে তোমার নিন্দে করে বসে?"

—"তা হলে কী করবে অবু?"

—"সেই তো ভাব্‌নার কথা! এলো তো ঘাড়ে-পড়া হয়ে রয়ে গেল!"

—"দেখি বিবেচনা করে; এখন তুমি লেখাপড়াতে মন দাও। পরের কথা পরে হবে। ফেলাও দেখছি ফেলনা নন!"

এই বলে মাসি তো যান! আমি জানলার ধারে বসে পড়া মুখস্ত করতে লাগি—

"ইঞ্জিলী বিঞ্জিলী তিমি তিমিঙ্গিলী
ওয়ান্ টু থিরি
ফোর্ ফাইব্ সিক্স্— ম্যাথেম্যাটিক্স্।"

রাস্তার ওপার দিয়ে তিনটি মানুষ পায়ে পায়ে যাচ্ছে; পুরুষ মানুষটি নিয়েছে শাবল কোদাল, তার পাছে পাছে দুটি মেয়ে— মাঝেরটির মাথায় পুটুলিবাঁধা ভাতের হাঁড়ি, কোলে খুকু একটি ঘুমিয়ে, হাতে ধরেছে ছাগলের গলার দড়ি; শেষের মেয়েটি চলেছে কালো ছাগল-ছানা একটি বুকে করে। তিনটি জানলা পেরিয়ে যায় তারা, পড়ে চলি আমি—

—"সিক্সপিয়ার, হিস্‌টিরী,
ট্রী মানে বিরিক্ষ, থ্রী মানে তিন,
নাইট্‌ মানে বীরপুরুষ, ডে মানে দিন।"

গড়ানে টিনের চালে শালিক পাখির ছা দৌড়নো অভ্যেস করছে; খুটখাট্‌ শব্দ পাই আর পড়ে চলি— "ফ্রী মানে ছাড়া, হরি মানে তাড়াতাড়ি।"

এবারে শালিক পাখিদুটো ঘাসের 'পরে নেমে আমার সঙ্গে যেন পড়া মুখস্ত করছে—
—"ব্রীক্‌ ইট্‌, ব্রীজ্‌ পুল, গন্থ্‌ মাস, স্কুল্‌ ইস্কুল"—

ঘর কাঁপিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে যায় স্টেশনের নাম মুখস্ত করতে করতে— ডান্‌কুনি বাঘনান্‌ ডান্‌কুনি বাঘনান্‌। আমিও তেজে মুখস্ত বলি—

—"ময়দা ফ্লাউয়ার, বোকা ফুল্‌,
ডক্‌কে বলে বন্দর, ওর্ককে বলে কাজ, লিপ্‌ হল লাফ, শিপ হল জাহাজ,
হিমগিরি ইমোলোইয়াস্‌, লঙ্কা চিলি,
টেমারিণ্ডিকা তিন্তিড়ি,
মেকাপ্‌কে বলে সাজ, সাজাকে বলে পানিশ্‌মেণ্টো,
সদাগর মারচেণ্টো, মোচার ঘণ্টো নো ইঞ্জিলী
—ইতি রুল অফ্‌ থ্রী।"

রুল অফ্‌ থ্রী—রুল—অফ্‌—থ্রী—রু-রুন্‌ বাঁশি শুনলেম ইষ্টিমারের, বিগুল শুনলেম কেল্লার মাঠের, তম্বুজুজ্‌ জুজু তুম্বু— তারপরে আর সান নেই, একেবারে ঘোরতর স্বপন। টেঁক হাতড়াচ্ছি পয়সা দেব— টেঁক খুঁজে পাচ্ছিনে,— কোথায় আছি বোঝা দায় হোটলে না মুদিখানায়!

পেট চাপড়ে বোঝাতে চাচ্ছি খিদে লেগেছে, পেট আর খুঁজে পাচ্ছিনে। পেটের ছাঁদ কন্‌ভেক্‌সিটি না কন্‌কেভিটি— সিটি আর মনে পড়ে না। সিটি কলেজ, ইউনিভার্‌সিটি, মিউনিসিপালিটি, পোকামাকড়ে দাঁত-খিটিমিটি দিলে খানিক, তারপরেই এলো— মেডিক্যাল্‌ ফ্যাকাল্‌টি। বিদ্যুৎপ্রকাশ অকস্মাৎ! দেখি-না পুকুরঘাটের কাছেই জলে পড়ে আছে খুঁটে-বাঁধা চক্‌চকে দুয়ানি! তুলতে যেতে হাত পিছলে পালালো। 'কড় কি কড় কি' ডাক দিল কোলাব্যাঙ। ঘেটো রাঘব বোয়াল খুঁটসুদ্ধ দুয়ানি মুখে পুরে কড়বলাং ঝম্প দিয়েই ডুব মারলো; থিরজলে গণ্ডির পরে ভাই লক্ষ্মণের গণ্ডি— চৌকো পুকুর হয়ে গেল গোল চশম্‌! হঠাৎ ফিস্‌ফিনিস্‌ বলে কানের ছাঁদায় মশা ঢুকে পড়ে—ব্যস্‌। চট্‌কা ভেঙে কান ঝাড়তে ঝাড়তে খাতা ফেলে দে দৌড়— মোচা চিংড়ি চড়িয়েছে যেখানে চাংড়াদি।

এমনি প্রায়ই কোনোদিন ঠেকে যাচ্ছে পড়া মোচার ঘণ্টোতে, কোনোদিন গুড়-অম্বলে,

কাঁটা-চচ্চড়িতে, দাঁটাসিদ্ধতে, কখনো বা হাঁসের ডিমের কালিয়াতে। চাঁইবুড়ো চাঁপাতলার ঘাটে ছিপ ফেলে বসে আমাকে আড়চোখে দেখে বলেন— "আজ কিসের হাঁড়িতে বিদ্যের জাহাজ তলাতে চললে হে অবুবাবু ?"

আমি রোজই বলি— "সুক্তার হাঁড়িতে চাঁইদাদা !"

চাঁইবুড়ো অমনি শোলক আউড়ে দেন ছিপ গুড়িয়ে—

—"শুক্তায় মুক্তা, ডিম্বের মধ্যে হাঁস,
ডুবুরি হই তো তুলি— তলাক্-না জাহাজ।

— চলো দাদা, দুটো ডুব দিয়ে বসা যাক্‌গে পাতে।"

চাঁইবুড়ো মন্তর পড়েন, পুকুর জলে দাঁড়িয়ে— "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ— যাবৎ পিবেৎ, তাবৎ জীবেৎ"— দুচার কুলকুচি, দুটো ডুব, দুপাক ডুবসাঁতার, একপাক চিৎসাঁতার খেয়ে পৈতে মাজতে মাজতে ঘাটে ওঠা হয়— রোদে জলে তেলে পিতলাই হাঁড়ার মতো চাঁইবুড়োর পেটটা চক্‌চক্ করতে থাকে।

আমি বলি— "চাঁই দাদা যে মন্তরটা জপো তার মানে কী ?"

—"মন্তরের মানে ভাঙতে নেই দাদা, গুরুর নিষেধ আছে।" বলে গামছা নিঙড়োতে নিঙড়োতে চলেন আর হাঁক পাড়েন বুড়ো— "রান্না হল গো ?— আর কত দেরি ? একবাটি ঘী বেশি দিও আবুবাবুকে।"

এমনি রোজ দুপুরবেলায় মাসির বাড়িতে চাঁইদাদার বাসাঘরে ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ মুখস্ত করে কাটাচ্ছি। এক-একদিন রোদ-ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরবেলায় শালিক পাখির ছানারা কপচাতে শেখে 'প্রথমপাঠ' — "কীট্ কীট্ কিড়িং।"

তক্তার পরে চাঁইবুড়ো তালপাতার পাখা চালেন আর বলেন—"পাখিগুলো কী বলছে বলো তো অবুদাদা !"

—"ওরা কবর্গ মুখস্ত করছে। কীট্ মানে কিড়িং।"

—"অ্যাঃ, এও জানো না, ওরা কিট্ কিট্ খেলছে গাছতলায়। কাঠঠোকরা কী করছে শুনে বলো তো দেখি।"

—"ওরা কে জানে কী করছে !"

—"বুঝলে না, ওরা কোটরে বসে কাঠের তক্তিতে ক-খ না লিখে টুক্‌টাক্ খেলাচ্ছে হে অবু। ওরা কেউ পড়া মুখস্ত করছে না। ওরা জানে পড়া নয়, দইবড়া মুখস্ত করতে হয়।"

—"তুমি কেমন করে জানলে চাঁইদাদা ?"

—"শকুনবিদ্যের জোরে !"

—"আমাকে শকুনবিদ্যে শেখাও-না !"

—"ক্রেমশঃ প্রকাশ্য ভাই। আগে বো'বিদ্যেতে তোমার নাক দোরস্ত হোক !"

—"সে কবে হবে? হবে তো?"

—"অভ্যেস করো, কেন হবে না? এখন বাগানের ওপারে বসে চাংড়ার রান্নার খোশবো পাচ্ছ, এর পর রেল রাস্তার ওপার থেকে পাবে।"

—"তারপর?"

—"তারপর আর কি— দক্ষিণেশ্বরে আমার শ্বশুরালয়ে চাংড়া চড়াতো হাঁড়ি, গঙ্গা-পারে উত্তরপাড়ার টোলে বসে পেলেম তার খোশবো— খেয়ানৌকো ধরে বসলেম গিয়ে ষষ্টি-বাটার ভোজে!"

—"এমন?"

—"হাঁ ভাই, এমন যখন হবে তখন জানবে বোবিদ্যের বি-এ পাশ হলে।"

—"তোমার চেয়ে বোবিদ্যেয় বেশি পাশ করেছে কেউ?"

—"করেছে বই কি? গন্ধগোকুল এ বিদ্যেয় এম-এ, মৌমাছি পোস্ট-গ্রাজুয়েট পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে। বোবিদ্যেয় পুরো দখল পেয়ে গেছে অনেক কৃষ্ণের জীব ভাই!" বলেই চাঁইবুড়ো পাঁচালি আওড়ালেন—

—"তাই-না আসে বাদুরছানা না পাকতে তেঁতুল,
কলা না পাকতে আগে থাকতে বাগানে পড়ে লেঙুর,
মালী না জানতে জেনে নেয় কাঠবেলাল
কোন্ ডালে লিচু হল বলে লাল,
কোন ডালে ঝোলে নারকোলে কুল
মালী জেগে দেখে খ্যাক্‌শৃগাল রাতারাতি টপকে আল
বেগুনের খেত করেছে নির্মূল।"

এইবার বুঝলে তো দাদা?"

—"বুঝেছি।"

—"কই বুঝিয়ে বলো কেমন বুঝেছো দেখি।"

—"রোসো বুড়োদা, ভেবে বলছি, বো = বাস, বাস = সেন্ট = খোশ্‌বো।"

—"হাঁ, ঐ বিদ্যেয় কৃষ্ণের জীবমাত্রে পাকা হয়ে ওঠে মানুষের আগেই।"

—"না বুড়োদাদা, তোমার হিসেবে ভুল আছে।"

—"শুনি কেমন ভুল!"

—"বলি বুড়ো দাদা—

১। প্যাঁচা আর ছুঁচা দুজনে বেরোলো রাতের ঘোরে,
বুড়ো ছুঁচা পড়ে গেল কেন খপ্ করে কাল্‌প্যাঁচার খপ্পরে?

২। শেয়াল বেরোলো গন্ধযুক্তি ধরে পাহারা হেঁকে
পাকড়াও করলে সহজে পাতিহাঁসটাকে দাঁতিয়ার খাল বেঁকে।

—এমনটা হয় কেন কৃষ্ণের জীবের বিদ্যে যদি সমান হয়?"

—"আহা দাদা, এটাও বুঝলে না — ছুঁচোটার নাক তার নিজের গায়ের বিকট গন্ধে নস্যিঠাসা, প্যাঁচার গন্ধ পায় কখনো?"

—"পাতিহাঁসের ছানাগুলো"—

—"ওঃ, তাদের পুকুরে নেয়ে ছর্দি লেগে নাক বন্ধ ছিল, প্যাঁক্ করতে সময় পেলে না।"

এমনি শকুনবিদ্যের পাঠ দিতে দিতে চাঁইবুড়োর নাকডাকা শুরু হয়ে যায়— 'থাক্ থাক্ থাক্ প—ড়—আ।' কামানের গাড়ি—তারপরে সরু স্বরে সাইরিন—'ভুঁ ভুঁ ভুঁই শাঁই।'

রোদ উঠোনের আড়াই ভাগ ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমদেয়ালে লাগে, আমিও সরি চাংড়াদির কাছে বিদ্যে ফলিয়ে টিফিন আদায় করতে।

—"জানো চাংড়াদি, আমি বোবিদ্যে সাধন করেছি? বাগানের ওপার থেকে তোমার রান্নার গন্ধ পাই। চাঁইদাদা বলেছেন শিগ্‌গিরি বোবিদ্যেয় বিয়ে পাশ করবো ফাস্ কেলাস্।"

—"ও দাদা, যেদিন বোয়ের হাতের চাপড়ঘণ্টো খেয়ে বলতে পারবে, তাতে কতভাগ তেল, কতভাগ লঙ্কা, কত ভাগই বা গুড়, তখন জানবে পাশ করলে— ফাস্-কেলাস্ থাস্-গেলাস! আগে নয়, জেনে রাখো!"

—"চাঁইদাদু এ পরীক্ষায় পাশ করেছিল— শুধিয়ে নেবো তো—"

—"ও মা ছিঃ, এ কথা শুধোতে নেই; বুড়ো চটে যাবে, বলবে, ছেলেমানুষকে জ্যাঠামো শেখানো হচ্ছে! রেগে শেষ খড়মপেটা করে হয়তো—"

—"হয়তো কী করবে চাংড়াদি?"

—"হাতের হাড় এমনি গুঁড়িয়ে দেবে যে আর কোনোদিন হাতাবেড়ি ধরতে হবে না— রান্না চড়ানো জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবে।"

—"তাহলে এ কথা তুলে কাজ নেই কি বলো?"

—"দেখো, ভুলেও যেন একথা প্রকাশ না হয়— যা জানলে তুমি!"

—"আমি আর জানলেম কী? তুমি শুধোতেই দিলে না!"

—"দুঃখু করো না দাদা, বদলে সাতখানা আকের টিক্‌লি নিয়ে লক্ষিটি হয়ে নিজের ঘরে যাও। বুড়োকে আর ক্ষেপিও না— খড়ম তো খড়ম, আবার যদি ভাস্কা লাঠি বেরোয় তো তুমিও গেছ আমিও গেছি!"

—"ভাস্কা লাঠি! সে কেমন?"

—"আবার সে কেমন! তুমি দেখছি ফ্যাঁসাদ বাধিয়ে ছাড়বে। ভাস্কা লাঠির কথা তুলো না যেন বুড়োর কাছে!"

—"কেন ?"

—"আবার কেন ! মানা করছি তুলতে— নাও আকের টিক্‌লির সঙ্গে কুঁচো গজা একমুঠো— লক্ষিটি হয়ে ঘরে যাও।"

* * *

মাসির কথামতো তুলালকে পত্তর দিয়েছিলেম কেষ্টনগর যাবে কিনা পরামর্শ নিতে। জবাব এলো তুলাল লিখছে— শ্রীশ্রীতুলাল ওরফে রামতুলাল লিখছে—

"অত্র অমঙ্গল বিশেষ। মাসিমাতা-ঠাকুরানী পাড়া ছাড়িয়া যাওয়াবধি শহরে জুজু-জুজুর ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। শহরে লোক তিষ্ঠিতে পারিতেছে না, নচেৎ তোমাকে বলিতাম শহরে আসিয়া তোমার নিজের গড়া পুতুলের একটা প্রদর্শনী খুলিতে। কিন্তু দেখিতেছি ফেলার মা'র ফেলাকে লইয়া বিপদ— তাহারা বাসা উঠাইয়া অন্তর্ধান করিয়াছে, কুত্র তাহা জানা নাই। কেহ বলিতেছে তাহারা মাসির বাড়ি গিয়াছে, কেহ বলিতেছে অন্য প্রকার। কবিরাজ বলিল, যাইবার কালে ফেলা বারবার বলিয়া গেল —'নসিব ডেকেছে'— তিনি স্বকর্ণে ইহা শ্রবণ করিয়াছেন। ব্যাপার কিছু জটিল বোধ হইতেছে। তুমি লিখিয়াছ মাসিমাতা-ঠাকুরানী তোমাকে কেষ্টনগরে আর্টশিক্ষার জন্য পাঠাইতে চাহেন—ইচ্ছা হয় যাইতে পারো, কিন্তু বলিয়া আমি খালাস, যথা—

সেখানে মাটিতে গড়বে ঠিক সন্দেশ,
ঠিকঠাক সরভাজা, খৈচুর, জিভে-গজা—
বোধ হবে দেখে রসে ভিজে,
মুখে দিলেই বুঝবে কানা যা ভেবেছিল তা না—
পাতখোলার মতোও না খেতে সরেস।— জলসাই তুলাল।

এ্যারোড্রম সিনেমা, ট্রেঞ্চ গার্ডেন, ডিষ্টিক্ গাঞ্জাম। পত্র দিও। ইতি—

অবুবাবু—

মাসিমাতার বাসা, গুপ্তনিবাস
পোঃ আলমবাজার, বরাহনগর, বেলঘুরিয়া।

পুনশ্চ— মোলায়েম মুন্সির দেওয়া পুঁথিখানি আমার নিকটে ছিল, অত্র সহিতে ফেরৎ দিলাম।"

ব্যস্! চুকে গেল কেষ্টনগরের ল্যাঠা! তুলালের চিঠিখানা বালিশের তলায় রেখে মোলায়েম মুন্সির পুঁথি নিয়ে থাকলেম—

—"পুকুরে ভরিছে জল, আঁখি ঝরায় পানি।
প্রাণরূপি পানকৌটি ডুবে মরে জানি॥"

পড়তে পড়তে চোখে জল আসে। পাতা ওলটাই উর্দু ফ্যাশানে—ডাইনে থেকে বাঁয়ে না বাঁয়ে থেকে ডাইনে, ঠিক করতে পারিনে। পড়ে যাই—

—"কুমার কুসন্ত কাচ বিশেষ বিকাশ।
কান্দন শুকাত্রিক কিবা ভুবন প্রকাশ॥
মঙ্গল পঞ্চসিমউচ্ছ হয় মহাসুখ।
মুঞি অতি ভাগ্যহীন, মরমে মোর দুখ॥"

মানে না বুঝেই কান্না পায়—

—"ভাব সুখ খঞ্জরীট কুটায় সানন্দ।
ভেলা ভক্তি মিলনে করুণ অতি বন্দ॥"

গোটা গোটা অক্ষরে ছাপা পুঁথি— পড়তে কষ্ট নেই, মানে বুঝতে কথায় কথায় মিনিং বুক কন্‌সল্ট করায় না; পড়তে পড়তেই হাসি পায়, কান্না পায়, পেটে খিল ধরে, চোখের জল গড়িয়ে পড়ে, ঘাম ছোটে— কেচ্ছা শেষ, জ্বরও ছাড়ে!

নতুন কেচ্ছা শুরু হয়, বেগুনা বেগম দম্পোক্তি চড়িয়ে ফোছনৎ মিঞার জন্যে হা-হুতাশ করে চলছে— মন উদাস হয়ে গেছে, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে! হঠাৎ মাসি এসে উদয় টিনের ঘরে!

—"কী পড়ছিস্ অবু? চোখ ছল্‌ছল্ করছে কেন? আয় তো দেখি কপালটা— একটু যেন গরম ঠেকছে!"

—"ও কিছু নয় মাসি, অনেকক্ষণ ধরে পুঁথি পড়েছি কিনা!"

—"পুঁথি পড়তে পারিস্?"

—"পারি, কিন্তু সব পুঁথি নয়। বটতলার পুঁথি পারি, কলুটোলার নয়!"

—"এমন হয় কেন?"

—"মাসি, বটতলার পুঁথি গোটা গোটা কাঠের টাইপে ছাপা। আর কলুটোলার কলে-ছাপা পুঁথি— রোগা রোগা অক্ষর, পড়তে মাথা ধরে যায়, পিঁপড়ের সারি যেন সব অক্ষর বিজ বিজ করে পাতায়, একরকম চেহারা! বটতলার পুঁথি তেমন নয়!"

—"তুই এখন কী পুঁথি পড়ছিলি?"

—"মসল্লম মসল্লা, মোলায়েম মুন্সির লেখা!"

—"আচ্ছা, ছবি দিয়ে মাসিকপত্তর যেগুলো বেরোয় সেগুলো?"

—"ছবিগুলো পড়তে পারি, প্রবন্ধগুলো নয়। থিয়েটারের বাংলা, উর্দু, ইঞ্জিলী খুব চক করে পড়তে পারি, বুঝতেও পারি!"

—"তোর নিজের লেখা ছবি পড়তে পারিস্?"

—"চেষ্টা করিনি মাসি, হয়তো পারি!"

—"পুতুল যা গড়িস—যে সব পশুপক্ষি, কীটপতঙ্গ, দ্বিপদ-চতুষ্পদ, ওদের ?"

—"ওদের আর পড়তে হয় না মাসি, গড়ে ছেড়ে দিতেই ওরাই পড়তে থাকে নানা বুলিতে নানা কথা,—আমি খালি শুনি মজার মজার কল্পকথা গল্পকথা !"

—"দুচারটে কথার নাম বল্-না শুনি !"

—"এই যেমন, হজফেরৎ উটের কথা, গানবন্ধ পাখির কথা, টোটাচোর ইঁদুর ঝাঁটাখোর বেড়ালের সংগ্রাম, জষ্টিস অ্যান্টিফোজেষ্টিনের জীবনচরিত, আমজাদ উজির ও ব্যাঙমাষ্টার, মিস্ বেলা কাউটের দাস্তান, ঝারার পাখি কাব্য, তাম্বাক অসুরের দরবার !"

—"আমার ভারি ইচ্ছে করে এমনি-সব কথা শুনতে !"

—"মাসি, চাঁইদাদুকে বলো-না কেন, সন্ধ্যেবেলা তোমাকে পুঁথি পড়ে শোনায় !"

—"বেই যে কার্তিক মাস ছাড়া পুঁথি ছোঁবেন না। আমি একটা কথক পুতুল গড়াবো কেষ্টনগরে ফরমাশ দিয়ে, সে কথা কইবে— আমি রোজ শুনব !"

—"সে কি হবে মাসি ? কথকপুতুল যেন কতো কথকতা করছে এই ভাব দেখিয়ে বসে থাকবে তাক জুড়ে। মাসি সে হবার জো নেই, আমার পুতুল-সব সেই বত্রিশ সিংহাসনের পুত্তলিকাদেরও কথার আগেকার, তারও আগেকার কথা কয়, আবার আজকের কথাও কয়— কথক সেজে বসে থাকে না ! আমার ভাবুকে দেখনি মাসি ?"

—"না !"

—"ভারি মিষ্টি কথাগুলি বলতো সে। তার একটি হাত ছিল না মাসি, ডাবগাছ থেকে তুম্বুজুজু তাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল !"

—"কোথায় সে এখন ? দেখা-না !"

—"তাকে ঘাটশীলায় কাবুলীদের কাছে হাওয়া বদলাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুম্বুজুজুর রাগ আছে তার উপর, এখন আর আনবো না।—সে তো তোমার ঘরের তাকেই শুয়ে থাকতো, দেখনি ?"

—"না তো অবু ?"

—"আর লাট্টুরামের ভাইঝি ?"

—"তাকে দেখেছি !"

—"তার নাম মাসি, সেঁদুরীয়া বাই ?"

—"তা তো বলেনি সে।"

—"তুমি শুধোলেই বলতো। লাট্টুরাম মাসে লাখটাকার লাটিম আর কাটিম গড়ে চালান দেয় বর্মা থেকে চীনেতে সুতোর কলের জন্যে— তুম্বুজুজু তাদের গদি পুড়িয়ে মেয়েটাকে ফতুর করে ছেড়েছে। রাজমহিষীর টাকা ছিল সেঁদুরীয়ার। ওকে তোমার দয়া হবে ভেবে আশ্রয় দিয়েছি অনাথা বলে, সব নিচের তাকে, তোমার ঘরের দেয়ালে ! ভালো করিনি মাসি ?"

—"তা ভালো করেছ। কিন্তু উট ঘোড়া, এসব এনে আমার ঘরে ঢুকিও না।"

—"তা কি পারি মাসি? তাদের জন্যে আলমারির তাকে আস্তাবোল পিঁজরাপোল আছে, তাতেই থাকে তারা। আর-সব পুতুল নম্বরওয়ারি ঘরে থাকে— আলমারির গায়ে লেখা আছে ভোজবিল্‌ডিং।"

—"তুমি বুঝি তাদের বাড়িওয়ালা?"

—"না মাসি, আমাকে তারা ডাকে ল্যাণ্ডলর্ড বলে।"

—"কত ভাড়া আদায় হয় মাসে বাড়ি থেকে?"

—"সে কি মাসি, তারা কি বাইরের কেউ যে ভাড়া চাইবো? এরা সব আমার কুটুম্‌-কাটাম। তুমি চাও আমার কাছে এই ক্যাবিন-ভাড়া?"

—"না চাইলেই দেবে তুমি অবুচাঁদ? দেখ্‌, অবু, পুরোনো বাড়ি ছাড়বার সময় রোগ-শয্যেতে পড়ে আমি ঠাকুরকে ডেকে বলেছিলেম— প্রভু, যেখানেই যাই যেন উদয়অস্ত চাঁদ-সূর্যির আলো পাই, আর সেখানে খেলাঘরে অবু আমার হেসে খেলে বেড়াবে দেখবো।"

—"তুমি যেমনটি চেয়েছিলে তেমনটি তো দিয়েছেন ঠাকুর মাসি?"

—"দিয়েছেন অবু, দেখ্‌, প্রথম-প্রথম এখানে এসে দেখতুম সারাদিনরাত সামনে দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে-আসছে কতলোক নিয়ে; তখন মনে হতো হায় এই পথ দিয়ে আমার বাড়ি যাবার গাড়ি আর আসবে না! তারপর একদিন এই ঘরের দাওয়াতে বসে একলা, চাঁদ ছিল না আকাশে, তুইও ছিলি না কাছে, সেইকালে হাওয়া এসে যেন পর্দা সরিয়ে দিলে চোখের উপর থেকে— দেখলেম, আমি আমার সেই বাড়িতে বসে আছি।"

—"মাসি, এখানে সেই বাড়িরই হাওয়া বইছে! আমি তো এখানে এসেই বলেছি তোমায়— সেই বাড়িই এটা মাসি; মিছে তুমি উতলা হও নানাখানা ভেবে!"

—"আর ভাববো না অবু, তোর কথাই ঠিক!"

—"মাসি!"

—"অবু!"

পশ্চিমবাগানের উপরে আকাশে ধরলো চম্পাই রং; পুবধারে পুকুরের পারে শিশুগাছ নতুন পাতা ছেড়েছে, তারই ফাঁক দিয়ে উঠলো চাঁদ; পুকুরজলে তার ছাওয়া— শালুক পাতার কিনারায় যেন মাসির পোষা শাদা হাঁসটি ঘুমিয়ে যাবার আগে গা ভাসিয়ে চুপ হয়ে আছে। চাঁদের আলো, পাতার ছাওয়া মাড়িয়ে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘরে—যেন শ্বেত-পাথরের পুতুল বাগান ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে। মাসির ঘরের আজন্ম-চেনা কতদিনের ঘড়ি সুর পাঠালে— যেন একটি ছোট্ট মেয়ে সোনার মন্দিরাতে ঘা দিয়ে দিয়ে থামলো।

স্বাজাতিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

কোনো-এক জর্মান দার্শনিক বলেছেন যে স্বাজাতিকতার গর্ব তাকেই মানায় নিজের মধ্যে যার গর্ব করবার মতো কিছুই নেই। যার নিজের মধ্যে বিশেষ-কোনো গুণ আছে, সে নিশ্চয়ই ঘৃণা বোধ করবে এমন-কিছু নিয়ে গর্ব করতে, লক্ষ-লক্ষ লোক যার সমান অংশভাগী।

কথাটা ভেবে দেখবার মতো। স্বজাতিবোধের গৌরব সকল ক্ষেত্রেই ভিত্তিহীন। সাধারণ মানুষের অহমিকা থেকে তার জন্ম, কাল্পনিক ইতিবৃত্ত আর মেকি বিজ্ঞান তার সহায়। পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে শুরু ক'রে মহাদেশের সীমান্ত পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি, আর এর ভয়াবহ ফলাফলের তো আজ আমরা প্রত্যক্ষদর্শী। দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক লোকই আমরা দেখতে পাই যাদের মগজ কোনো-না-কোনো সমষ্টিগত গর্ববোধে ঠাসা, যার উত্তেজনায় ন্যায়-অন্যায় সত্য-মিথ্যার ভেদ তাদের কাছে লুপ্ত। কেউ তাঁর নিজের বংশটিকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জেনে নিয়ে পরম আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন; তাঁর সঙ্গে যে-বিষয়েই আলাপ করুন না, স্বীয় বংশকৌলীন্যই তাঁর শেষ যুক্তি। কেউ বা বলবেন, 'আমরা অমুক জেলার লোক, গান-বাজনার কিছু-কিছু বুঝি।' অন্য কারো মুখে হয়তো শোনা যাবে যে তিনি বিশেষ এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব'লেই তর্কবিদ্যায় পারদর্শী। কারো গর্ব তিনি হিন্দু, কেউ আবার হিন্দু নন ব'লে ঠিক একইরকম গর্বিত। বাঙাল ব'লে অনেকে বুক ফুলিয়ে বেড়ান, আবার পশ্চিমবঙ্গীয় মর্যাদাবোধই অনেকের সম্বল। আমরা বাঙালিরা গত একশো বছর ধ'রে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ব'লে চারদিকে খুব দম্ভ প্রকাশ ক'রে বেড়িয়েছি, তারপর আজ যখন অন্য প্রদেশের লোকের মনেও স্বজাতিবোধ জেগে উঠেছে তখন আমরা অবাক হ'য়ে বলছি, 'আরে এ কী কাণ্ড! উড়ে মেড়ো খোট্টা— এরাও যে আবার কথা বলে!'

বলা বাহুল্য, এত রকমের ভিন্ন-ভিন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গর্ববোধ সত্য হ'তেই পারে না। গুণ জিনিসটা কোনো শ্রেণীতে বা জাতিতে আবদ্ধ নয়।

ভৌগোলিক কিংবা জাতিগত কারণে মানুষে মানুষে মনীষার তফাৎ কতটা হয় এ-প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞান আজও ক'রে উঠতে পারেনি। বরং আজকাল এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে এমন অনেক প্রভেদ, যা এতদিন প্রাকৃতিক ব'লে স্বীকৃত হ'য়ে এসেছে, তার কারণ আর-কিছুই নয়, শুধু সুযোগ-সুবিধার অসমান বিতরণ। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণজাতি শ্রেষ্ঠ কিছুদিন আগেও এ-বিষয়ে লোকের মনে সংশয় ছিলো না, অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে এ-শ্রেষ্ঠতা বিধাতারই অলঙ্ঘনীয় বিধান। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে যখন অব্রাহ্মণেরও বিদ্যাশিক্ষায় সমান অধিকার জন্মালো তখন দেখা গেলো যে মনীষার ব্যবহারে অব্রাহ্মণের দক্ষতা কিছুমাত্র কম নয়। তেমনি, আজও যারা এ-দেশে শূদ্র ব'লে গণ্য তারা যখন সমান সামাজিক অধিকার পাবে, তখন তাদেরও মধ্যে গুণী বিদ্বান বরেণ্য ব্যক্তির আবির্ভাব যে হবেই এ-ভবিষ্যৎবাণী করতে হ'লে দৈবজ্ঞ হ'তে হয় না। বুদ্ধি জিনিসটা আলো-হাওয়ার মতো মানুষমাত্রেরই উত্তরাধিকার, অনুশীলনের সুযোগ-সুবিধার তারতম্য অনুসারেই জাতিতে জাতিতে প্রভেদ হয়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে স্বাভাবিক প্রভেদ থাকে; কিন্তু কোনো-এক সমষ্টির সঙ্গে অন্য-কোনো সমষ্টির প্রভেদ অনিবার্য স্বাভাবিক কারণে ঘটেছে এ-কথা কোনো যুক্তিসম্পন্ন মন কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, কেননা জগতের ইতিহাস অন্বেষণ করলে বৈষম্যের বাস্তব কারণ সহজেই বেরিয়ে পড়ে।

মানুষ যে নিজেকে কত মিথ্যা সংস্কারে, কত কৃত্রিম অনুশাসনে শত ভাগে বিভক্ত করেছে ভাবলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। বর্ণ, জাতি, ভূগোল, ধর্ম, উপধর্ম— শেষ পর্যন্ত জেলা, গ্রাম, পৈতৃক বংশ, এই বিভাগের কত যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রশাখা তার যেন আর অন্ত নেই। এবং এই ভেদবুদ্ধি দুর্বল মনেরই আশ্রয়। নিজেদের সম্বন্ধে আর কিছুই যাঁদের বলবার নেই, তাঁরাই স্বজাতি স্বধর্ম কিংবা স্ববংশের গৌরবে স্ফীত হ'য়ে যথাসম্ভব আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এই গৌরবের সুবিধে এই যে এতে প্রমাণের দায় নেই। আমি যদি বলি, 'গণিতশাস্ত্রটা আমি কিছু-কিছু জানি', তাহ'লে তার প্রমাণ দাখিল করবার দায়িত্বটা আমারই; কিন্তু, 'আমাদের বংশে সকলেরই অঙ্কে খুব মাথা' এ-কথা ব'লেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, তার প্রমাণস্বরূপ বক্তাকে দুটো ক্যালকুলসের অঙ্কও ক'ষে দেখাতে হয় না। 'আমি খুব উদার' এ-কথা বললে কোনো দুষ্ট ব্যক্তি

হয়তো হাতে হাতে উল্‌টোটা প্রমাণ ক'রে দেবে; কিন্তু, 'হিন্দুধর্ম খুব উদার, এবং আমি হিন্দু', এ-কথা খুব সহজে বলবার কোনো বাধা নেই, কেননা বক্তা যে হিন্দু তা তো সকলকে মানতেই হবে, আর হিন্দুধর্মের উদারতা সম্বন্ধে যারা সন্দেহ প্রকাশ করবে তাদের বিধর্মী ও দেশদ্রোহী ব'লে গাল দিলে অন্তত এক দলের কাছে বাহবা পাওয়া সম্ভব।

অবশ্য এ-ধরনের মনোভাব আজকাল আমাদেরও শিক্ষিত সমাজে নিন্দিত, একে আমরা সাম্প্রদায়িকতা নাম দিয়েছি, এবং মুখে অন্তত এ-কথা প্রচার ক'রে থাকি যে সাম্প্রদায়িকতা বর্জনীয়। মনে মনে আমরা অনেকেই এখনো কোনো-না-কোনো ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার বশ, কিন্তু প্রকাশ্যে যে তার নিন্দা ক'রে থাকি এটুকুই ভালো। বিশ শতকের গোড়া থেকেই আমরা বিবিধ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, এবং পশ্চিমের অনুসরণে স্বাজাতিকতা বা ন্যাশনালিজ্‌ম্‌কে ক'রে তুলেছি আরাধ্য। সকলের মনে ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-এর আবেগ সঞ্চারিত করতে পারলে ক্ষুদ্র ভেদগুলি লুপ্ত হবে এই ছিলো আমাদের আশা। বাংলার স্বদেশি আন্দোলনের সময় আমাদের কণ্ঠ ছাপিয়ে ফেনিল হ'য়ে ঝরেছিলো স্বজাতিবোধের তীব্র নবীন সুরা। পাশ্চাত্ত্য ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-এর প্রকৃত স্বরূপটি যে কী তা সে-যুগে এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর-কেউ বুঝেছিলেন ব'লে মনে হয় না, অন্তত কাগজে-কলমে তার কোনো প্রমাণ নেই। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রথম থেকেই ধরা পড়েছিলো ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-এর প্রীতিকর মুখোশের অন্তরালে ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌-এর বিকট মুখ-ব্যাদন; বিশ শতকের আরম্ভেই লেখা 'জন চীনেম্যানের চিঠি' প্রবন্ধে তার পরিচয় পাই। স্বদেশি আন্দোলনের যেটি ভাবের দিক, প্রেমের দিক, তাকে তিনি সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেছিলেন, এবং তার বাণী গানে-গানে বইয়ে দিয়েছিলেন দেশের লোকের প্রাণে। কিন্তু ও-আন্দোলনের আর-একটি দিক ছিলো যার মূল বিদেশি-বিদ্বেষে, মানুষে-মানুষে নতুন ভেদ রচনায়। এ দিকটিতে যে রবীন্দ্রনাথের কোনোদিনই আস্থা ছিলো না তা বুঝতে পারি 'ঘরে বাইরে' পড়লে। বিদেশি ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্‌কে তাড়িয়ে তার গদিতে স্বদেশি ন্যাশনালিজ্‌ম্‌কে অধিষ্ঠিত করলে তারও বিপদ আছে—কেননা উগ্র স্বাজাতিকতা সুযোগ পেলেই নিদারুণ সাম্রাজ্যতন্ত্রে পরিণত হ'য়ে ওঠে।

এ-পরিণতি কেমন ক'রে ঘটে, এবং একবার ঘটলে তার ফল কী সর্বনাশা হয় আধুনিক ইতিহাসে তার উদাহরণের অভাব নেই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে দেশপ্রেম ও স্বাজাতিকতার প্রভেদ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দেশপ্রেম মানুষের একটি স্বাভাবিক সুন্দর বৃত্তি, তাতে স্বদেশের প্রতি ভালোবাসা আছে কিন্তু বিদেশের প্রতি বিদ্বেষ নেই। আর স্বাজাতিকতায় আছে আত্মম্ভরিতা, তার মধ্যে বিদেশের প্রতি বৈরীভাব কখনো প্রচ্ছন্ন কখনো প্রকট। যতদিন তা প্রচ্ছন্ন ততদিন 'শান্তি'র সময়, অর্থাৎ ততদিন যুদ্ধের আয়োজন শুধু চলে, আর যখন প্রকট হয় তখনই যুদ্ধ বাধে। মানুষ যেমন তার মা-কে, তার নিজের বাড়িটিকে ভালোবাসে, তেমনি ভালোবাসে তার স্বদেশ, স্বদেশের জল হাওয়া আকাশ গাছপালা। কিন্তু কোনো সুস্থ মানুষই বলে না যে তার মা পৃথিবীর সমস্ত নারীর মধ্যে সব চেয়ে মহীয়সী, কিংবা তার বাড়ি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সৌধ। নিজের মা যা-ই হোন, তাঁর প্রতিই আমাদের হৃদয়ের স্নেহ-ভালোবাসা উচ্ছ্বসিত হয়; ক্ষুদ্র হোক, জীর্ণ হোক নিজের বাসস্থলের প্রতি আমাদের প্রাণের সহজ মমত্ববোধ। এ-ভালোবাসার এমনিই প্রকৃতি যে অপর ব্যক্তির মা-কেও আমরা স্বতঃই শ্রদ্ধার চোখে দেখি, এবং বন্ধুর গৃহে অতিথি হ'য়ে তাঁর স্বাবাসপ্রেমের অংশীদার হ'তে আমাদের বাধে না। সত্যি যেটা স্বদেশপ্রেম সেটাও এই জাতের বৃত্তি। তার প্রভাবে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ শুধু যে নিজের দেশকে ভালোবাসি তা নয়, কোনো বিদেশি যে তার স্বদেশকে ভালোবাসে সেই ভালোবাসাকেও ভালোবাসি। স্বাজাতিকতায় এ-জিনিস সম্ভব নয়, তাতে অন্য-সকলের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠতা ঘোষণার ভাবটা আছেই আছে। আমার দেশ সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে সুন্দর, আমরাই বিধাতার নির্বাচিত জাতি— এ-কথা বার-বার আওড়াতে-আওড়াতে চোখ লাল হ'য়ে ওঠে, রক্তে নেশা ধরে, আর তখন স্বদেশ ও স্বজাতির প্রসার-সংকল্পে সুদূরবাসী 'অসভ্য' জাতিদের সর্বনাশসাধন মনে হয় মহাপুণ্য, প্রতিবেশীদের প্রতি সন্দেহ ও বিদ্বেষ হ'য়ে ওঠে রাজকর্মের প্রধান প্রেরণা। নিজের বাড়ি ভালোবাসি ব'লে যদি আর-পাঁচজনের বাড়ি জোর ক'রে দখল করতে যাই তাহ'লে লোকে আমাকে পাগল ছাড়া কিছু বলবে না, কিংবা বড়ো-জোর আমি ডাকাতের দলে নামজাদা হ'য়ে উঠবো; অথচ

দেশাত্মবোধের নাম ক'রে অপরের স্বদেশকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যে যেতে পারে, কিছুকাল অন্তত পৃথিবীর অনেক লোকের চোখেই সে হ'য়ে ওঠে বীর, দেশত্রাতা, মহাপুরুষ! ব্যক্তিগত জীবনের ছোটো গণ্ডিতে যে-জিনিস নৈতিক বিচারে অবশ্য দূষ্য, সমষ্টিগত জীবনে তারই প্রকাশ যখন অত্যন্ত বৃহৎ, এমনকি অত্যন্ত বীভৎস হ'য়ে দেখা দেয় তখন তাকে বাহবা দেবার লোকের অভাব ঘটে না, মানবচরিত্রের এ এক অদ্ভুত অসঙ্গতি। 'আমার মা-র মতো মা আর জগতে নেই, তিনিই বিশ্বের চরমতম মা'— এ-কথা যদি কেউ মুখে বলে কিংবা এই মর্মে কাব্যরচনা করে, সভ্যসমাজের চোখে সে-ব্যক্তি হবে অতীব হাস্যকর, কিন্তু নিজের দেশ সম্বন্ধে অনুরূপ ভাববিলাসিতা লোকে যে শুধু ক্ষমা করে তা নয়, তার মোহে অন্ধ হয়ে হত্যার পথে ধ্বংসের পথে দলে দলে ধাবিত হয় এ তো আজ চোখের উপরেই দেখা যাচ্ছে। আমার স্বদেশ সমগ্র পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করবে, এটাই বিধাতার ইচ্ছা, এ-রকম ভ্রষ্টবুদ্ধি ভাবালুতা যখন কাব্যে সাহিত্যে আবিল হ'য়ে ওঠে, তখন সব পাঠকই হো-হো ক'রে হেসে ওঠে না, এমনকি দেশমাতৃকাকে যখন রক্তপায়িকা নরমুণ্ডলুব্ধা 'দেবী' রূপে কল্পনা করা হয় তখনও তার প্রতিবাদে খুব বেশি কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। নৈতিক বিচারের কথা ছেড়েই দিলুম— কিন্তু নিছক মূঢ়তা সংঘবদ্ধ মানুষ যে কতখানি সহ্য করতে পারে— শুধু তা-ই নয়, সেই মূঢ়তার দাসত্ব ক'রে নিজের সর্বনাশ ঘনায়— তা ভাবলে আজকের দিনেও অবাক না-হ'য়ে উপায় থাকে না।

স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাতিকতার এই প্রভেদ খুব সত্য একটা জিনিস, কিন্তু অনেকের কাছেই এ-প্রভেদ স্পষ্ট নয়, অনেকেই মনে করেন ও-দুই একই বস্তু। তার ফলে আমাদের চিন্তায় ও কর্মে অনেক ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। 'জনগণমন-অধিনায়ক' স্বদেশপ্রেমের আনন্দধ্বনি, 'রুল ব্রিটানিয়া' স্বাজাতিকতার উচ্চ নিনাদ। আজ জাপান যে লড়াই করছে তার মূলে আছে অতিস্ফীত স্বাজাতিকতা, যার অন্য নাম ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্; কিন্তু চীন যে অনাহূত অতিথিকে বাধা দিচ্ছে সেটা তার দেশপ্রেমেরই ব্যঞ্জনা— আজ যে-কোনো চীনের মুখের দিকে তাকালে আমাদের মরা প্রাণেও উৎসাহ জাগে, এমন দীপ্তি তার মুখে, এমন দৃঢ়তা তার চোখে— তার দেশের যে-হাওয়া তাকে প্রাণ দিয়েছে সেই হাওয়াটিকে সে বাঁচাবে— তার শক্তির প্রেরণা তার নিজেরই প্রাণে। দু' পক্ষের

যুদ্ধের প্রকৃতিগত পার্থক্যটা আমাদের পক্ষে খুব স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করা দরকার।

আজকের এই প্রলয়ের পিঙ্গল আলোয় এইটেই খুব স্পষ্ট হ'য়ে দেখা গেলো যে স্বাজাতিকতা বড়ো আকারের সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া কিছু নয়। ন্যাশনালিজ্‌ম্— এই জাতুমন্ত্রের আড়ালে লুকোনো ছিলো যত হিংসা যত হীনতা যত ব্যভিচার আজ তা উলঙ্গ নির্লজ্জতায় সমস্ত ভূলোক ছারখার করে বেড়াচ্ছে। গত যুদ্ধের পর পূর্ব ও পশ্চিমের নানা রাজধানীতে রবীন্দ্রনাথ এই ভয়াবহ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই তাঁর নিতান্তই অযোগ্য কিন্তু নিতান্ত প্রিয় মনুষ্যজাতিকে সতর্ক করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁর সেই বাণী সাম্রাজ্য-লোভীর কানে মধুবর্ষণ করেনি। কবির কথায় কাজের লোকেরা কর্ণপাত করে না— করলে কি পৃথিবীর এ-দশা হ'তো!—তাই যে-রণক্লান্ত জর্মানি রবীন্দ্রনাথের বাণীকে গভীরতম শ্রদ্ধা নিয়ে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করেছিলো সেই জার্মানিতেই স্বজাতিবোধের উন্মত্ততা পৈশাচিক হ'য়ে উঠলো। যাকে ফ্যাশিজ্‌ম্ বলা হয় সেটা তো আর-কিছু নয়, স্বাজাতিকতারই চরম দশা— এবং মরণদশা। যে-সমাজনীতি ও রাজনীতি পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষের পক্ষে তুঃসহ হ'য়ে উঠেছে, যার ধ্বংস আসন্ন ও অনিবার্য, তাকে আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখবার শেষ প্রাণান্তকর যে-চেষ্টা, ইটালির ভাষায় তাকেই বলে ফ্যাশিজ্‌ম্ আর জর্মানির ভাষায় ন্যাশনাল সোশ্যালিজ্‌ম্। এই আসুরিক প্রচেষ্টায় নাৎসি জর্মানি শুধু যে যন্ত্রপাতি বোমা-বারুদ আর যুযুধান অক্ষৌহিণী ব্যবহার করছে তা নয়, হত্যাকারী স্বাজাতিকতার সমর্থন-স্বরূপ মেকি বিজ্ঞান ও মেকি দর্শনও সৃষ্টি করেছে। 'জোর যার মুলুক তার' এই বর্বর নীতিই সেই 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞানে'র সার কথা। ডারুইনের বিবর্তনবাদের বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে নাৎসিরা বলছে যে জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতমেরই জয় হয়, অতএব দূর হোক ইহুদি, কালো ব্রাউন হলদে মানুষরা উচ্ছন্নে যাক, বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নর্ডিক মানুষের গোলামি ক'রে অন্য সব মনুষ্যাকৃতি জীব জীবন ধন্য করুক। নর্ডিক মানুষ অথবা তথাকথিত আর্যজাতির শ্রেষ্ঠতা 'প্রমাণ' করতেও অনেক পাণ্ডিত্য ঝরেছে, তবে তার শ্রেষ্ঠ যুক্তিটা বোধ হয় নাৎসি বেঅনেট, যা আজ পৃথিবীর বুক এ-পিঠ ও-পিঠ ফুঁড়ে দিয়েছে। ত্যাখো, কেমন আমাদের জোর,

অতএব আমরা যে শ্রেষ্ঠ তাতে সন্দেহ কী। দেখতে পাচ্ছি জোরটা সত্যি ভয়ানক, সেইজন্যই সন্দেহ করি এ টিঁকবে না, এ জীবনসংগ্রামের অযোগ্য। 'Survival of the fittest' বলতে কি এটাই বুঝবো যে সব চেয়ে যার গায়ে বেশি জোর তারই জয় হবে? তাহ'লে সেই সব অতিকায় জন্তু, নখদন্তে যারা আরক্তিম, যারা দুঃসীম পশুশক্তির তেজে পৃথিবীর নরম মাটিতে একদা প্রচণ্ড তোলপাড় তুলেছিলো, তারা কেন জীবনের নাট্যশালা থেকে বিলুপ্তির অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো, আর সেই মানুষই বা কেন পৃথিবীর রাজা হ'য়ে বসলো যে আকারে ছোটো, নখদন্তে অতি দুর্বল, ক্ষীণ চর্ম নিয়ে রোদে বৃষ্টিতে শীতে একান্ত অসহায়? যোগ্যতম বলতে তাকেই বোঝায় পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সব চেয়ে ভালো ক'রে যে আপন জীবনের ছন্দ মেলাতে পারে, যে তার পৃথিবীকে সঙ্গতির সূত্রে নিজের সঙ্গে বেঁধেছে। এই ছন্দোবন্ধনে মানুষ জীবকুলের মধ্যে সব চেয়ে কৃতী ব'লেই আজ এ-পৃথিবী তারই রাজত্ব। প্রকাণ্ড জানোয়ারগুলোর গায়ের জোর ছিলো, ছন্দের জোর ছিলো না, তাই বিশ্বসৃষ্টির কারখানায় তারা বাতিল হ'য়ে গেলো। দেখা গেলো, এ-জিনিস চলে না। তেমনি আজকের দিনের উন্মত্ত স্বাজাতিকতার রক্তলিপ্ত স্ফীতকায় মূর্তির দিকে তাকিয়েই বোঝা যায় যে এর বিনাশ আসন্ন। এও সেই আদি যুগের বিপুলায়তন ভীষণ জন্তুর মতো; তেমনি জোরালো, তেমনি অসঙ্গত। পদে-পদে তার তাল কাটছে, যা-কিছু সে করে তা-ই ছন্দ-ছাড়া। স্বাজাতিকতার প্রেরণায় প্রত্যেক জাতি যদি অন্য প্রত্যেক জাতির উপর প্রভুত্ব করতে চায় এবং সে-উদ্দেশ্যে রক্তস্রোত বইয়ে দিতে প্রস্তুত হয়, তাহ'লে তার কুৎসিত মাৎলামির বেতালা বিশৃঙ্খলায় মনুষ্যজাতির অস্তিত্বই হয়তো সংশয়ের বিষয় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু ইতিহাসে এটাই বার-বার দেখা যায় যে ছন্দোচ্যুতি মানুষ বেশিদিন সইতে পারে না। কিছুদিন উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে নিজেরই পক্ষে দুঃসহ দুর্দশার সৃষ্টি করলেও শেষ পর্যন্ত সে যে ছন্দের অনুবর্তিতায় ফিরে আসে তা থেকে এইটেই বোঝা যায় যে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবার দিন মানুষের এখনো আসেনি। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না, এবারেও সে ফিরবে ছন্দের পথে, সঙ্গতির পথে।

ইতিমধ্যে দুর্দান্ত স্বাজাতিকার রক্তাক্ত জয়যাত্রার দৃশ্যে কেউ বা সম্মোহিত

কেউ বা নিতান্ত হতাশ হ'য়ে বলছেন যে প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করবে এটাই বিশ্ব-বিধান, এ নিয়ে আক্ষেপ নিষ্ফল, প্রতিবাদ বৃথা, আর এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। অতএব যতদিন দুর্বল আছো মুখ বুজে চুপ ক'রে সহ্য করো, যদি কোনোদিন প্রবল হ'য়ে উঠতে পারো, তুমিও দু' হাতে লুঠ-তরাজ করবে, কেউ টুঁ শব্দটি করতে সাহস পাবে না। জঙ্গলের জানোয়ারদের মধ্যে যেমন যে যাকে পারছে তাকেই খাচ্ছে, তার মধ্যে কোনো বিধি-ব্যবস্থা নেই, মনুষ্য-সমাজও সেইরকম, সেটা মেনে নেয়াই ভালো। এ-সব বুলি অবশ্য নাৎসি 'দার্শনিক'রাই জগৎকে উপহার দিয়েছেন, এবং কথাগুলি বেশ চটকদার তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্যক্তিগত কি জাতিগত স্বার্থের মাৎলামিতে যার বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়নি এমন লোকের পক্ষে এ-সব কথা মেনে নেয়া অসম্ভব। অরাজকতার অতল অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে-খেতে মনুষ্যজাতি পরস্পরের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে, এবং চিরকাল তা-ই খাবে, কেননা সেটাই নিয়ম— এই কল্পনায় এত নৈরাশ্য এত ভীরুতা, মনুষ্যত্ব বলতে যা-কিছু বুঝি তার এমনই চরম পরাভব যে বুদ্ধির আলো যাঁদের মনে এখনো জ্বলছে তাঁরা তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেন না। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক বিচারেও এ-কল্পনা নিতান্ত মিথ্যা, কেননা সমগ্র বিশ্ব-বিধানে যে একটি অটুট শৃঙ্খলা আছে এ-কথা ছেলেমানুষেও বোঝে; জঙ্গলের জানোয়াররাও জীবনের ছন্দ মেনে চলে, তাদের দুর্দান্ত জীবনসংগ্রামের অন্তরালে একটি পারস্পরিক সহনশীলতা ও শান্তির স্রোত নিরবছিন্ন ধারায় ব'য়ে চলেছে। যেখানে ভীষণ বিষাক্ত সাপের নিঃশব্দ চলাফেরা সেই প্রান্তরেই নববর্ষার শ্যামায়মান ঘাসে টুকটুকে লাল নরম মখমল-পোকা তাদের ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষণিক আনন্দটুকু আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে দেয়— প্রকৃতির বিশাল লীলাভূমিতে দুটোই সত্য, দুটোই সার্থক। জীবজগতে মারামারি খাওয়াখাওয়ির কথাটাই যদি একমাত্র সত্য হ'তো তাহ'লে জানোয়াররা এতদিনে পরস্পরকে নিশ্চয়ই নিঃশেষ ক'রে দিতো, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো সত্য এই যে তারা সকলেই বিশাল জীবনের সমান অংশীদার, যে যার রাজত্বে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত, সেখান থেকে কেউ কাউকে সরাতে পারে না— আর সেইজন্যেই জীবজগতে এমন অফুরন্ত বৈচিত্র্যস্রোত আজ পর্যন্ত প্রবাহিত। স'রে পড়তে হয় শুধু তাদেরই যারা হঠাৎ অত্যন্ত অসঙ্গত ও বিসদৃশ হ'য়ে ওঠে, তা ছাড়া সকলেরই জায়গা আছে।

তা ছাড়া পশুর সঙ্গে সভ্য মানুষের তুলনাটা মূলতই ভুল। এ-তুলনা পশুর পক্ষে অপমানকর এই রসিকতাটা আজ অত্যন্ত পুরোনো হ'য়ে গেছে, কিন্তু এ-কথাও তো সত্য যে পশুর লোভ নেই, সে ক্ষুধার তাড়নায় মারে, 'আত্ম-সম্প্রসারণের মহৎ ব্রত'-উদ্‌যাপনে লক্ষ-লক্ষ আত্মজাতি হত্যা করে না। তেমনি এও সত্য যে পশুর বুদ্ধি নেই, বিচারশক্তি নেই, সে তার প্রবৃত্তির অদম্য তাড়নায় অন্ধের মতো চলে, সে একেবারেই প্রকৃতির দাস; কিন্তু মানুষ তার প্রবৃত্তিকে বাঁধতে শিখেছে, তার বুদ্ধি তার কল্পনা তার যুগ-যুগ-সঞ্চিত জীবন-সাধনা দিয়ে পদে-পদে প্রকৃতিকে জয় করেছে— তারই নাম সভ্যতা। এই সভ্য মানুষ যখন পাশবিকতার ভজনা করে তখন সে পশুর চেয়েও ঢের বেশি পাশবিক হ'য়ে ওঠে, কারণ তাতে সে প্রয়োগ করে তার আশ্চর্য বুদ্ধি যা তার মানবমহিমারই উত্তরাধিকার। এই মানুষী পশুত্ব যদি কখনো আপাতবিজয়ী হয় তাহ'লেই কি সঙ্গে-সঙ্গে বলতে শুরু করবো যে সভ্যতা মিথ্যা, পশুত্বই চরম সত্য, শৃঙ্খলার সাধনা ভাবালু বিলাসিতা মাত্র এবং অরাজকতাই মুক্তি? না কি এই কথাই বলবো যে যেমন ক'রে হোক, সভ্যতাকে বাঁচাতেই হবে, ফিরিয়ে আনতেই হবে জীবনের ছন্দ, মানুষের মধ্যে যা সব চেয়ে বড়ো গ'ড়ে তুলতেই হবে তার সব চেয়ে অনুকূল পরিবেষ? সমগ্র মনুষ্যজাতি আজ এই প্রশ্নের সম্মুখীন। মানুষের মধ্যে এখনো যে কেউ-কেউ আছেন যাঁরা সভ্যতায় আস্থা হারিয়ে ফেলেননি তা দেখেই আশা হয় যে আজকের এই সংকট মনুষ্যজাতি উত্তীর্ণ হ'তে পারবে। তাঁরা কারা? তাঁদের কোনো জাতি নেই, বংশ নেই, গোত্র নেই— ধর্ম যদি কিছু থাকে তো মনুষ্যধর্ম। তাঁরা পৃথিবীর সব দেশের গুণী, জ্ঞানী, মনীষী, জীবনের পূর্ণতা যাঁদের তপস্যা, সংস্কৃতি যাঁদের সৃষ্টি। সংস্কৃতি জিনিসটাই বিশ্বমানবিক, তা ইতিহাস ভূগোলের কোনো সংস্কারই মানে না, তার হৃদয়ে সকলেরই আমন্ত্রণ, তার ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বে। স্বাজাতিকতার সঙ্গে তার মৌল বিরোধ। তাই যে-সব দেশে স্বাজাতিকতা আজ দুর্দান্ত হ'য়ে উঠেছে, সেখানে সংস্কৃতি ক্ষত-বিক্ষত, নির্যাতন নির্বাসন অপমান মনীষীর পারিশ্রমিক। কিন্তু এমন কোনো অত্যাচার নেই যা মানুষের এই অমূল্য সৃষ্টিকে বধ করতে পারে। হিংসার দুরন্ত উত্তেজনা পার হ'য়ে তার হাওয়া দেশে-দেশে মানুষের হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কারো-

কারো প্রাণে এই সহজ সত্যটা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়েছে যে সত্যি তো মানুষে-মানুষে মিলনের কোনো বাধা নেই—যাকে বলি জাতি সে একটা কথা মাত্র। যাকে পর ভেবেছি সে যখন আপন হয় সে বড়ো আশ্চর্য। ব্যক্তিগত জীবনে এ-অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই হয়, অনাত্মীয় বিদেশী বিধর্মীর সঙ্গে প্রেমের বিনিময়ে ধন্য হই, বুঝতে পারি মানুষে-মানুষে প্রভেদগুলি তুচ্ছ, খুব একটা গভীর জায়গায় মিলনের ক্ষেত্র আছে প্রস্তুত। সেটা কোথায়? সেটা রুচির শিক্ষার প্রীতির আনন্দের ক্ষেত্র— সে-মিলন সংস্কৃতির মিলন। সেইজন্যে এমনও অনেক সময় হয় যে রক্তের সম্পর্কে যে অত্যন্ত নিকট তাকে একেবারেই দূর অনাত্মীয় মনে হয়, যে একান্ত পর, যে হয়তো আমার ভাষাও বলে না তার সঙ্গে মিলনের গ্রন্থি সহজে বাঁধা হ'য়ে যায়। সংস্কৃতির স্তর যত নিচু, ততই নিজ-নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবার ঝোঁক, বিদেশি-বিদ্বেষ বর্বরতারই লক্ষণ। যাঁর মন যত বেশি উদ্বুদ্ধ, দেশে-বিদেশে অনুরূপ মনের সঙ্গে তাঁর ততই সহজ ও গভীর সংযোগ। সংস্কৃতিকে অবলম্বন ক'রেই মানুষের মনে-মনে বিশ্বমানবিকতার আবহাওয়া রচনা করতে হবে, তবে যদি সভ্যতাকে বাঁচানো যায়। এ-কাজে আমরা তাঁদেরই পাবো যাঁরা ধূর্ত গণপতি কি দাম্ভিক ধনপতি নন, যাঁরা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যাঁরা জীবনসাধনায় অগ্রণী। তাঁরা কবি তাঁরা শিল্পী তাঁরা প্রেমিক। নতুন জগৎ রচনার ভার আসলে তাঁদেরই হাতে, কারণ প্রকৃতপক্ষে নিঃস্বার্থ শুধু তাঁরাই। স্বজাতিবোধ যদি মানুষের মন থেকে উচ্ছিন্ন না হয়, যদি প্রত্যেক মানুষই বিশ্বমানবিকতার প্রীতিপূর্ণ উদার আনন্দে দীক্ষিত না হয়, তা'হলে কুড়ি বছর পর-পর 'বৈজ্ঞানিক' যুদ্ধের জগৎব্যাপী পৈশাচিকতায় সভ্যতার টিঁকে থাকবার আশা কম। স্বজাতিবোধের বদলে বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের চেতনা জাগলে যুদ্ধের মূল কারণ না হোক, মূল প্রেরণা দূর হ'য়ে যায়। এই যুদ্ধাবসানে পুনর্গঠনের দিনে এই হবে প্রধান কাজ, এবং তার জন্য মনে-মনে এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হবে।

বিশ্বমানবিকতা কথাটাকে অনেকেই ভুল বোঝেন, তাই গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যখন 'শিক্ষার মিলন' লেখেন তাঁকে এ-দেশে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছিলো। বিশ্বমানবিকতা অসিধর স্বাজাতিকতারই বিরোধী; দেশপ্রেমের দীপশিখার নয়। বিশ্বমানবিকতার মানে এ নয় যে

বিভিন্ন জাতির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সব একরকম হ'তে হবে। অনুরূপ হ'লেই যে প্রেমের সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে তা নয়, ইওরোপের প্রতিবেশী দেশগুলি তো ধর্মে জাতিতে আচারে ব্যবহারে এক, চীন জাপানও অনেকটা তা-ই। এদিকে বৌদ্ধ যুগ থেকে চীন-ভারতের মধ্যে একটি প্রীতির স্রোত প্রবাহিত, যদিও এ-দুই দেশবাসী সব দিক থেকেই স্বতন্ত্র। আসল কথা এই যে চীন-ভারতের মিলনের ভিত্তি ছিল 'ডিপ্লম্যাটিক রিলেশন্স' নয়, সংস্কৃতি; সে-যোগ স্বার্থের নয়, প্রাণের— তাই বহু শতাব্দী ধ'রে তা অক্ষুণ্ণ র'য়ে গেছে। ঠিক এই সংযোগ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের সঙ্গে প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির সঙ্গে প্রত্যেক জাতির হ'তে পারে, সমস্ত দেশের জনসাধারণ মনে-প্রাণে তা-ই চায়, তার বাধা শুধু পৃথিবীর রাষ্ট্রপতি-বাণিজ্যসম্রাটের দল, যারা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের যূপে বিশ্বমানবকে বলি দিতে কুণ্ঠিত নয়। মিলনের পথে বৈশিষ্ট্য বাধা নয়, বরং সহায়; বসন্তে যেমন নানা রঙের ফুল ফোটে ও সমস্ত রং মিলে একটি আনন্দগান হ'য়ে ওঠে, তেমনি নানা দেশের লোক স্বীয় বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হ'য়ে সৃষ্টি করবে সমগ্র মানবজাতির বিশাল মহান সুর-সঙ্গতি —সভ্যতার এইতো চরম লক্ষ্য। স্বাজাতিকতাই বৈশিষ্ট্য-বিকাশে বাধা, কারণ তার প্রচণ্ড তাড়নায় যে-সব জাতির স্বাধীনতা নষ্ট হয়, তারা আস্তে-আস্তে তাদের নিজেদের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে, প্রভু-দেশে প্রস্তুত বিবিধ বিচিত্র মাল কিনতে বাধ্য হ'য়ে-হ'য়ে তাদের শিল্পকলা আচার ব্যবহার সবই ক্রমে নির্জীব ও বিকৃত হ'য়ে আসে। বিশ্বমানবিকতায় প্রত্যেকেই স্বাধীন ও সমান, তাই প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণবিকাশ শুধু তাতেই সম্ভব।

এ-আদর্শ আজ হয়তো অনেকেরই সুদূরপরাহত মনে হবে, অনেকে হয়তো ভাববিলাসিতা ব'লে একে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু এ-কথা জোর ক'রেই বলবো যে মনুষ্যজাতিকে যদি টিঁকে থাকতে হয়, সভ্যতার বিপুল সম্ভাবনা যদি পূর্ণ হ'তে হয়, তাহ'লে আজ হোক কাল হোক, কোনো দূর ভাবীকালে হোক এ-আদর্শই বাস্তব হ'য়ে উঠবে, এ ছাড়া মানবজাতির কোনো ভবিষ্যৎ নেই, অন্য-সব ব্যবস্থাই পিছনে ফিরে যাওয়া। এ-আদর্শ বাস্তব হবে এ-আশা আছে ব'লেই এই বিভীষিকাগ্রস্ত জগতে জীবনের স্বাদ এখনো একেবারে চ'লে যায়নি। আরো অনেক দুঃখ হয়তো সইতে হবে, আরো করাল হবে প্রলয়ের অন্ধকার; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুগান্তকারী রক্তিম প্রত্যুষে জীবনের জয় হবে, জয় হবে মনুষ্য-ধর্মের। বিশ্বভারতী কবিকল্পনা মাত্র নয়, রবীন্দ্রনাথের বাণী মিথ্যা হবার নয়।

গুরুদেবের ছবি

শ্রীপ্রতিমা দেবী

আজ এক বৎসর হোলো গুরুদেব আমাদের কাছ থেকে সরে গেছেন; যাকে চোখে দেখা, হাতে পাওয়া বলে, তার বাইরে আজ তিনি। তবু মন বলে না যে তিনি আজ নেই। ভাষার মধ্যে ছবির মধ্যে তিনি নিজেকে এমন করেই বেঁধে রেখেছেন; বই খুলেই দেখি তাঁর বাণী, চোখ মেলেই দেখি তাঁর ছবি। এই আশপাশের গাছগুলি, আজ যারা প্রতি ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ডালা নব নব উপহারে সাজিয়ে আনে, রঙের বিচিত্র সম্ভার, দৃশ্যের অভাবনীয় চিত্রশালা আলোকিত করে প্রকৃতি আপন ঐশ্বর্য ঢেলে দেয়, গুরুদেবের চোখে তাদের এই নিগূঢ় রসের সৌন্দর্য ধরা পড়ত নিয়ত। তিনি নিজে যা দেখতেন, অন্যদের তাই দেখাবার চেষ্টা করতেন। তাঁর দেখার ভঙ্গীই ছিল আর-এক রকমের, যা আমাদের সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে; তাই তাঁর ভাষাও নিত্য নতুন চেহারা নিয়ে আমাদের কাছে আসত। কখনো হাস্যরসে, কখনো গদ্যের গম্ভীর মাধুর্যে, কখনো ছন্দের হিল্লোলে মানুষের প্রাণকে তিনি আলোড়িত করে তুলতেন। আবার তেমনি অতি সহজভাবেই সরল শিশুর মতো ধরা দিতেন নিকটের লোকের কাছে। এই যে মনের প্রসারতা, দৃষ্টির গভীরতা, এরি ভিতর দিয়ে সকলকে তিনি কাছে টেনেছিলেন। তাঁর বাড়ির চাতালঘেরা ফুলগাছগুলোর উপর তাঁর কী গভীর মমতা ছিল। যেদিন পলাশ ফোটার সময় আসত, শিমুল গাছে যেদিন রং ধরত, শালফুলের মৃদুগন্ধ যেদিন বাতাস চুরি করে এনে দিত তাঁর ঘরের আকাশে ছড়িয়ে, সেদিন ওঁকে কত খুশীই যে হতে দেখেছি। এই আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সুরের পর সুর তিনি বানিয়ে চলতেন আর ভাবের আবেগে গানের তরী চলত বয়ে। গাছপালা যেন তাঁর প্রাণের সঙ্গী, জীবন্ত মানুষের চেয়ে তাদের সঙ্গ কিছুমাত্র কম ছিল না তাঁর কাছে। এদের প্রাণের কথা তিনি বুঝতে পারতেন, যে নীরব প্রত্যাশা তাদের বোবা মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকত, কবির কাছে আসত তারই ভাষাহীন বার্তা— তিনি কাছের লোককে ডেকে বলতেন, "দেখো, দেখো, এত রূপ,

এত রঙ— এই যে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য এ কি তোমাদের চোখে পড়ে না?"— সত্যিই আমরা কতটুকু দেখতুম; তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন, কত অদৃশ্য জিনিস দেখতে শেখাতেন, নতুন কিছু দেখলে তাঁর মন ভরে উঠত।

এমন যে মানুষ, যিনি এমন নিবিড় করে জগৎটাকে দেখে গেছেন, বুঝে গেছেন তার ভাষা, এমন করে যিনি আমাদের ভাবতে শিখিয়েছেন, সে মানুষকে জানা একদিকে যেমন সহজ, আর-একদিকে তেমনি দুরূহ। মানুষ এবং প্রকৃতিকে তিনি সমভাবেই উপভোগ করতেন এবং উভয়ের প্রতিই তাঁর অনুরাগ ছিল সমান গভীর। সেইজন্য তাঁর কাছে দেশকালের তফাত ছিল না। লণ্ডন থেকে তিনি লিখেছিলেন— "যারা আইডিয়া নিয়ে কাজ করে তাদের পক্ষে সেই দেশই দেশ যেখানে সেই সব আইডিয়ার বীজ ক্ষেত্র পায়, সফল হয়। চাষী যদি সমস্ত সাহারা মরুভূমির মালেক হয় তাহলে সে তার পক্ষে ফাঁকি। আমার পরে ঈশ্বরের দয়া এই যে, তিনি আমাকে যা শক্তি দিয়েচেন তার এমন ক্ষেত্র দিয়েচেন— সমস্ত পৃথিবীকে আমি আপন বলে বিদায় নিতে পারব— সমস্ত পৃথিবীতে আমার বাসা তৈরী হল।"* এইভাবেই মানুষের প্রতি টান দেশ-দেশান্তরে তাঁকে টেনে নিয়ে যেত। মানুষকে জানবার আগ্রহই তাঁকে গল্প বলিয়েছে, কবিতা লিখিয়েছে, আইডিয়া প্রচার করিয়েছে। প্রকৃতির প্রতি টান তেমনি তাঁকে ছবি আঁকিয়েছে, গান গাইয়েছে। তাঁর অল্প বয়সের আঁকা ছবি পাওয়া যায়— একখানা পারিবারিক খাতার মধ্যে। সে ছিল কৌতুক করে' আঁকা ছবি, কিন্তু তারই মধ্যে শিল্পীর রেখার দৃঢ়তা ও সূক্ষ্মতার পরিচয় আছে। এ ছাড়া অল্প বয়সের আঁকা আর-কোনো ছবি দেখেছি বলে মনে হয় না। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে চিত্রকলার বিকাশের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বরাবরই ছিল। আমেরিকা থেকে বহুকাল আগের লিখিত চিঠি থেকে সেটা জানা যায়— "আমি যত দেখ্‌লুম, জাপানের ছবি এবং এখানকার, আমার ততই দৃঢ় বিশ্বাস হয়েচে আমাদের বাংলা দেশে যে চিত্রকলার বিকাশ হচ্চে তার একটা বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। এ যদি নিজের পথে পূরো উদ্যমে চল্‌তে পারে, তাহলে পৃথিবীর মধ্যে আপনার একটা খুব বড়ো জায়গা পাবে। দুঃখের বিষয় এই যে বাঙালীর প্রতিভা যথেষ্ট

* শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত চিঠি।

আছে, কিন্তু উদ্যম ও চরিত্রবল কিছুই নেই। আমরা নিজের দেশকে এবং কাজকে একটা বৃহৎ দেশ এবং কালের উপর দাঁড় করিয়ে উদারভাবে দেখ্‌তে জানিনে। সেইজন্যে আমাদের যার যেটুকু শক্তি আছে সেইটুকু নিয়ে ছোট ছোট ভাবে কারবার করি— তারপরে একটু ফুঁ লাগ্‌লেই সেই শিখা নিবে যায়, তারপর আবার যেমন অন্ধকার তেমনি অন্ধকার। ... ... আশা করেছিলুম 'বিচিত্রা' থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্রকে অভিষিক্ত করবে, কিন্তু এর জন্যে কেউ যে নিজেকে সত্যভাবে নিবেদন করতে পারলে না। আমার যেটুকু সাধ্য ছিল আমি ত করতে প্রস্তুত হলুম কিন্তু কোথাও ত প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা ত আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তাহলে একবার দেখাতুম আমি কি করতে পারতুম। যাহোক্ আর কোনো সময়ে আর কেউ উঠ্‌বে— এবং দেশের মধ্যে চিত্রকলার যে শক্তি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েচে তাকে বিপুল বেগে চলবার জন্যে পথ করে দেবে। ... ... কিন্তু রাজমিস্ত্রি কোথায় যে গড়ে তুলবে ; সেই বেদনা কোথায়, কল্পনা কোথায়, আত্মদান কোথায় যার জোরে বিধাতার অভিপ্রায়কে মানুষ সার্থক করে তোলে ?"*

এই সময় তিনি জানতেন না যে সেই রাজমিস্ত্রী তিনি নিজেই, ভারতের ভবিষ্যৎ চিত্রধারায় নতুন স্রোত বইবে তাঁরি তুলির টানে। ভারতের শিল্পকলার সমস্ত ধারা (ট্রাডিশন) উল্‌টে পাল্‌টে দিয়ে আর্টকে নবজন্ম দান করে গেলেন। কোথায় গেল কাঙড়া, কোথায় বা মোগল আর অজন্তা,— সব গেল গুলিয়ে। যে নতুন রূপ নিয়ে আর্ট দেখা দিল— সে আর কিছু, অন্য কিছু, যার সঙ্গে আমাদের নতুন পরিচয়ের পালা সবে শুরু হয়েছে। পাতার পর পাতা উল্‌টে তার রহস্যকে এখন আমাদের আবিষ্কার করতে হবে, বুঝতে হবে তার ভাষা। এই নবপরিচিতার ঘোমটার তলায় আচ্ছন্ন আছে যে রস, তাকে উপভোগ করতে গেলে আমাদেরও নতুন করে prism-এর ভিতর দিয়ে তাকানো অভ্যাস করা দরকার। বোধ হয় 1927-এ তিনি তুলির কাজ বা কলমের মুখ দিয়ে রেখাঙ্কন শুরু করেন। বহুকাল পরে পাণ্ডুলিপির খাতায় লেখা কাটার ছলে এই আঁকাজোকার কাজে মন দেন। তাঁর লেখা কাটার

* শ্রীমতী মীরা দেবীকে লিখিত চিঠি।

পদ্ধতি একটি নতুন নক্সার আলপনা তৈরি করে তুলত, এই ছিল তাঁর বিশেষত্ব। পুরনো পাণ্ডুলিপির খাতা খুললে যে-সব বিচিত্র আঁকজোক চোখে পড়ে, সেগুলি যেন নতুন রকমের আল্‌পনা বলে মনে হয়। এইরকম অনেকদিন ধরে লেখার সঙ্গে আঁকার খেলা মিলিয়ে, খাতার পর খাতা ভরে' গান কবিতা লিখেছেন। এই উদ্দেশ্যহীন আঁকার সময় তাঁর মন ডানা ছড়িয়ে অবাধে কল্পনালোকে ঘুরতে পারত; তাই লেখার মাঝে ফাঁকা সময়টুকু তাঁর চিত্তকে চিন্তা করবার অবকাশ দিত। তিনি সেই শূন্য সময়টা পূর্ণ করতেন রেখাঙ্কনের অবলীলায়মান খেলায়। সেই সঙ্গে তাঁর মনোলোকের 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম' ভাবগুলো ভাষায় যেমন বিশেষ আকৃতি নিয়ে বাঁধা পড়ত, রেখায় থাকত তেমনি জল্পনাকল্পনার অনির্দিষ্ট সংকেত। অর্থাৎ রেখায় পড়ত ধরা সৃষ্টির প্রাক্কাল। আর ভাষায় দেখা যেত ভাবের পরিপূর্ণ রূপ। বস্তুত এমনি করেই তাঁর লেখা—কাটাকুটির খেলা একদিন চিত্রজগতের দ্বারে এসে ঘা দিল। তিনি লিখলেন—

"The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite. The Universe has its only language of gesture, it talks in the voice of pictures and dance. Every object in this world proclaims in the dumb signal of lines and colours the fact that it is not a mere logical abstraction or a mere thing of use, but it is unique in itself, it carries the miracle of its existence."

তিনি যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন, সে যেন বন্যার মতো তাঁর তুলির টানে বেরিয়ে আসত রূপের রেখা। চারপাঁচখানা ছবি তিনি অনেক সময় দৈনিক শেষ করতেন, তবু যেন তাঁর তৃপ্তি হোত না। সৃষ্টির প্রেরণায় হাতের কাছে যা পেতেন— যেমন ভাঙা কলম বা পেনসিল, যা'-তা' কাগজের টুকরো— তাই দিয়েই হাত চলত। ভালো রঙের ধারও ধারতেন না, নানা প্রকার জিনিস নিয়ে চল্‌ত তাঁর আঁকা; অবশ্য পেলিকেন কালিই বেশির ভাগ ব্যবহার করতেন। আঁকার পদ্ধতি ছিল তাঁর সম্পূর্ণ নিজের— স্বদেশী বা বিদেশী কোনোপ্রকার প্রণালীই অনুসরণ করেননি।

প্রকৃতি যেমন স্বাভাবিক গতির তাড়নায় বস্তুজগতে নতুন নতুন রূপ দিচ্ছে, তেমনি করেই তাঁর সৃষ্টিশক্তি রেখাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। সেইজন্য তাঁর কোনো আঙ্গিকই শেখার প্রয়োজন হয়নি। তাঁর নিজের আঙ্গিক তিনি নিজেই আবিষ্কার করেছিলেন। প্রকৃতির এমন একটি স্বাভাবিক নিয়ম তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল, যার জন্য তাঁকে আর আর্টস্কুলের ছাত্র হবার অপেক্ষা করতে হোলো না; তাঁর নিজ ধীশক্তিগুণে তিনি অনায়াসেই দেখতে পেয়েছিলেন প্রকৃতির মধ্যে রেখারঙের যে অভিনয় চলছে। তাঁর চিত্রগুলি স্বয়ম্ভু, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে সেগুলি আঁকা হয়নি। তিনি নিজেই বলতেন,—"আমি হাতে যখন কলম নিই, ছবির পূর্বানুভূতি মনে তখন কিছু থাকে না; কলম যেমনি চলতে থাকে চিত্র আপনি ফুটে ওঠে কলমের মুখে।" এমনি করেই তিনি ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন। বোধ হয় আজ সেই সমস্ত ছবির সংখ্যা দু' হাজারের বেশি তো কম হবে না। সেই সব চিত্রাবলীর অনেকগুলিই আজ দেশবিদেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে।

লেখায় যেমন তিনি ভবিষ্যৎকে টেনে এনেছেন, আঁকাতেও তেমনি সুদূরকালকে দৃষ্টির মধ্যে রেখে গেলেন। বর্তমান যুগের ক্ষুধা নিবারণ করে তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য সঞ্চিত হোলো ভবিষ্যৎ মানুষের খোরাকের ভাণ্ডারে, লেখাতে আঁকাতে।

গুরুদেব অনেক সময় বলতেন, "লিখতে পারি তা আমি জানি, সেখানে আমার নিজের লেখার শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস আছে; কিন্তু আঁকা সম্বন্ধে আজও আমার সংকোচ যায় না। আমি তো নন্দলাল অবনের মতো আঁকতে শিখিনি, তাই অনেক সময় মনে হয় ওটা আমার পথ নয়।" নিজের চিত্র সম্বন্ধে অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন বলে, তিনি যে কত বড়ো আর্টিষ্ট সেটা তিনি ইচ্ছে করেই নিজের কাছে স্বীকার করতে চাইতেন না। প্যারিসে যখন তাঁর প্রথম এক্‌জিবিশান হোলো, তাঁর মুখেই শুনলুম পল্‌ ভেলেরি এবং আঁদ্রে জিদ্‌ ছবি দেখে বলেছিলেন;—"ডাঃ টাগোর, আমরা এখন সবেমাত্র যা ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দেশের এই সব বিচিত্র আর্ট-আন্দোলনের তলায় তলায় যে-নতুনকে পাবার চেষ্টা লুকোনো রয়েছে, আপনি কী করে এত সহজে সেই জিনিসকে চোখের সামনে এনে ধরলেন? আপনার এই অত্যাশ্চর্য কীর্তি যে

কত বড়ো, তা হয়তো এখন সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না—সংস্কৃতির উৎকর্ষের সঙ্গে মানুষের চিন্তাশক্তি যতই বিকশিত হবে, এই চিত্রগুলির কথা ততই তারা বুঝতে পারবে।"

সেদিনকার এই এক্‌জিবিশানে 'হোটেল পিঁগালে' প্যারিসের খ্যাত্‌নামা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এদিন মনে রাখবার মতো দিন।

১৯২০-এ প্যারিস থেকে আমাকে একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন,—"বস্তুত আজকাল আমার লেখবার স্রোত একেবারে বন্ধ। ছুটি যখন পাই ছবি আঁকি—যারা সমজদার তারা বলে এই হাল আমলের ছবিগুলো সেরা দরের। একটু একটু বুঝতে পারছি এরা কাকে বলে ভালো, কেন বলে ভালো।"

ওই বৎসরেই বার্লিন থেকে লেখেন,—"আমার বয়স সত্তর হয়ে এল, আজ ত্রিশ বৎসর ধ'রে যে দুঃসাধ্য চেষ্টা করচি, আজ হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ভিৎ পাকা হবে। ছবি কোনদিন আঁকিনি, আঁক্‌ব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি, হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হুহু করে এঁকে ফেল্‌লুম আর এখানকার ওস্তাদরা বাহবা দিলে। বিক্রিও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর মানে কী, জীবন-গ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন।

আমার "Religion of Man" সেই পরিশিষ্টেরই অঙ্গ। জীবনে যা কিছু শুরু করেছি তা সারা করে যেতে হবে। কোনোটাই বাকি থাকবে না।"

সাধারণত গুরুদেবের চিত্রকলা তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—প্রাকৃতিক চিত্র, মানুষের মুখের প্রতিকৃতি এবং জীবজন্তু। তাঁর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি ও জীবজন্তু যেমন ফরাসী জাতির চিত্ত আকর্ষণ করেছিল, বার্লিনের এক্‌জিবিশানে দেখা গিয়েছিল মানুষের মুখের প্রতিকৃতি সেইরূপ জর্মানির হৃদয়-হরণ করত।

বাস্তবিক এই সব চিত্রগুলিকে বিশ্লেষণের পর্যায়ে ফেলা চলে না। এগুলি সৃষ্টির এমন একটি মূল সত্যকে প্রকাশ করছে যেটা শুধু ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝাবার নয়; এ হোলো অনুভূতির জিনিস। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে কেউ যদি সে

জিনিস ধরতে পারল তো বুঝল, নইলে খনির ভিতর মণির মতো তার দীপ্তি রইল ঢাকা।

প্রথমত মানুষের মুখের কথা ধরা যাক্। এদের দিকে তাকালে মনে হয় যেন কত জানা লোকের মুখের ছায়া দেখতে পাই, হঠাৎ যেন বহুকালের বিস্মৃত মানুষের চেহারা ও চরিত্রগুলো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এই সব মুখগুলির মধ্যে যেন তাদের সত্তার গভীর সংঘাত ফুটে বেরিয়েছে। তারা যেন মনোজগতের এক একটি নীহারিকা। তাদের অপরিণত জীবন কুয়াশাচ্ছন্ন বাষ্পের ভিতর আপন সৃষ্টির কাজে লেগে আছে। যে সব মানসিক গতি নিজের কাছেও অজানা অথচ অচেতন চিত্তলোকে যা কখনও ভেসে উঠছে কখনও বা মিলিয়ে যাচ্ছে, সেই সব কল্পনাপ্রবণ মনের রহস্যপূর্ণ বিশেষত্ব ছবির মুখের রেখাতে যেন জীবন্ত রূপ নিয়েছে। তারা আঙ্গিকের বাঁধাধরা নিয়ম মানেনি ব'লেই তাদের প্রকাশভঙ্গী এত জোরালো এবং গতি এত অবাধ। সাধারণত আর্টিস্টরা যে-সব ভাবভঙ্গীকে আর্টের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন এবং তাঁদের প্রকাশভঙ্গীতে যে সনাতনীয় ছাপ থাকে, গুরুদেবের চিত্রকলা সেই সাধারণ পথ এড়িয়ে নতুন পথ নিয়েছিল।

সেই মতো তাঁর নানাপ্রকার প্রাণীর চেহারাগুলি সবই বাস্তব জীবজন্তুর থেকে তফাত। কারণ শিল্পীর চোখ এই সব জীবের দেহের চেহারাকে এড়িয়ে ভাবের আকৃতিকেই দেখতে পেত। এমনি করেই তাঁর বাঘের ছবিতে ফুটে উঠত হিংসার লোলুপতা। আসলে বাঘের দৈহিক ভঙ্গীকে অবলম্বন করে হিংসা ও লোভের গ্রাসকেই তিনি আঁক্‌তেন। তাই বাস্তবিক বাঘের চেহারার সঙ্গে তার মিল না থাকলেও, ছবির রেখায় বাঘের চরিত্রের দাগ মুদ্রিত হল। তাঁর আঁকা মস্ত বড়ো একটা মহিষের মতো জন্তুর আকৃতির মধ্যে প্রকৃতির একটা আদিম শক্তির চেহারা যেন বেরিয়ে আসে, যাকে ম্যাডাম ড্য নোয়াই বলেছেন—'ক্ষুধিত মোহগ্রস্ত অভিশপ্ত জীব'। সেটাকে নাম দিতে গেলে হয়তো বলব, হিপপটামস্ বা আর-কিছু; কিন্তু এটি তাঁর নিজের তৈরী জিনিস। প্রকৃতির গড়া জিনিস এখানে শিল্পী নকল করেননি, তিনি করেছেন নিজের মনের মতো করে সৃষ্টি। যাঁদের চোখ নিয়মের বাঁধাধরা রাস্তা দিয়ে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁরা এই সব ছবির মধ্যে কোনো অর্থই খুঁজে

পাবেন না। এমন শ্রেণীর লোকদের পক্ষে এই সব চিত্রের রসগ্রহণ সম্ভব নয়। তিনি তাঁর ভূমিকায় বলেছেন—

"People often ask me about the meaning of my pictures. I remain silent even as my pictures are. It is for them to express and not to explain."

এখন দৃশ্যচিত্র বা ল্যাণ্ড্স্কেপ আলোচনা করা যাক। অনেক সময় দৃশ্য আঁকতে গিয়ে কেবল কতকগুলি রঙের পোঁচ কেন লাগানো হয়েছে, এ প্রশ্ন লোকের মনে উঠতে পারে। প্রাকৃতিক চিত্রে তিনি রেখা বা পার্সপেক্টিভ্-এর নিয়ম মেনে চলেননি; বিচিত্র আলোছায়াকে হরেক রকম রঙে ফলিয়েছেন। তাঁর ছবিগুলি আলোছায়ার সমন্বয়ে গঠিত সাদাকালোর বিরহমিলনের খেলা—

'কভু দূরে কখন নিকটে
প্রবাহের পটে,
মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে—
কালো আর সাদা।'

কতকগুলি আলোর সংমিশ্রণে জগতে রঙের সৃষ্টি হচ্ছে; আসলে রঙ বলতে কিছু নেই। আলোর গ্রহণ ও বর্জনেই রঙের উৎপত্তি। অনন্ত আকাশ-পথে যে আলো বিচরণ করছে, তারই পদক্ষেপের চঞ্চল ভঙ্গীর বিচিত্র রঙিন ছায়া জগতে প্রতিফলিত হচ্ছে। শিল্পীর মনে লেগেছিল সেই আলোকমায়া। তাঁর সমগ্র চিত্রকলা সেই কিরণরশ্মির ছন্দলীলা। কবিতায় তিনি সেই মনের কথা লিখেছেন—

'স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র
কায়াহীন বেগে
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া
উঠে বর্ণস্রোতে—
ধাবমান অন্ধকার হতে
স্তরে স্তরে—
চন্দ্র সূর্য যত বুদ্বুদের মতো।

বিশ্বসৃষ্টির এই প্রবাহ রূপায়িত হোলো তাঁর চিত্রলোকে নানাভাবে নানা রসে। কেবলমাত্র নমনীয় কমনীয় ললিতকলা এঁকে তাঁর মন তৃপ্ত হয়নি, ভালোমন্দ-সুখদুঃখ-পূর্ণ জগৎটাকে কেতাবের পাতার মতো খুলে ধরেছেন চোখের সামনে। মনোজগৎ ও বাস্তব জগতের বিচিত্র রূপ, চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্রের মতোই বেরিয়ে এসেছে তাঁর অন্ধকার মানসগুহা থেকে, সৃষ্টির বিচ্ছুরিত গতির খণ্ড খণ্ড উল্কার মতো; কোনোটা স্বপ্নময় ইন্দ্রজাল, আর কোনোটি বা তাণ্ডবের স্খলিত চরণের দুর্দমনীয় বেগের উদ্দাম প্রগল্‌ভ মূর্তি।

এই সব অজ্ঞাত চেতনলোকের অহেতুক রূপকে মানুষ কী সংজ্ঞাই বা দিতে পারে? এই রূপলোক হোলো অনন্ত সাগরের লীলায়িত তরঙ্গের সসীম আকৃতি। এগুলি একদিকে যেমন ব্যক্তিগত, আর-একদিকে তেমনি বিশ্বজনীন। তাঁর দৃষ্টির বাতায়নপথে যে অসীম দীপ্তির ছায়া পড়ত, তার থেকেই উদ্‌ভূত হোত তাঁর চিত্রকলা। তিনি আলোর গতিপূর্ণ বর্ণগুলিকে ধরেছেন তাঁর রঙের খেলায়। এগুলি তাঁর অনন্ত শিশুচিত্তের খেলনা,—পৃথিবীতে যারা অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতার আভাস রেখে গেছে।—

তাঁর বড়ো ভালবাসার এই ছবি। অনেক সময় তিনি কৌতুক করে বলতেন,—"ছবিই হোলো আমার শেষ বয়েসের প্রিয়া, তাই নেশার মতো আমাকে পেয়ে বসেছে।" অসুস্থ অবস্থায়ও বলতেন,— "আমার শরীরে যদি শক্তি থাকত, তাহলে কেবল ছবিই আঁকতুম।" এই স্নেহের জিনিসটি অতি সন্তর্পণে সমালোচকের চোখের অন্তরালে রাখতে চাইতেন। অনেক সময় নিজের ছবির বিষয় বলতে গিয়ে বলতেন,—"কবিতার রবীন্দ্রনাথ আর ছবির রবীন্দ্রনাথ এক নয়।" কবিতায় তিনি লিরিকাল কবি, ছবিতে তিনি নির্ভীক বিজ্ঞানী। প্রকৃতির আদিরূপকে দেখেছিলেন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ও বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তির পাহারা সেখানে খাটত না, রূপকারের মন সে সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন ছিল। সেইজন্য তিনি তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর ক্যাটালগের ভূমিকায় বলেছেন —

"In the process of this salvage work I came to discover one fact, that in the universe of forms there is a perpetual activity of natural selection in lines, and only the fittest survives which

has in itself the fitness of cadence, and I felt that to solve the unemployment problem of the homeless heterogeneous into interrelated balance of fulfilment, is creation itself".

প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় অতি অনায়াসেই ঘটেছিল; জগৎ-সৃষ্টিতে অনুপরমাণু নিয়ে যে নিত্য-নাট্য প্রতি মুহূর্তে চলেছে, তারই ছবি আপনি রচিত হোত তাঁর ধ্যানলোকে।

গতিশীল বস্তুমাত্রেই সম্পূর্ণ আকৃতিতে পরিণত হবার আগে একটা অসম্পূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়; সেই সাময়িক পরিবর্তনশীল রেখা নানাপ্রকার চেহারার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ একটা বিশিষ্ট আকারে পরিণত হচ্ছে। শিল্পীর মনে সেই গতিভঙ্গীগুলির অচল রূপের আবির্ভাব হোত।

কবিতায় তিনি যেমন একটি সৃষ্টির সম্পূর্ণ চেহারা দিয়েছেন, চিত্রে তেমনি জগৎটা বস্তুপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে আবর্তিত হোতে হোতে কী করে রেখা ও রঙের মিলনে নানাবিধ আকৃতিতে পরিণত হচ্ছে, তারই ইতিহাস তিনি আঁকলেন। গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে যে ঘূর্ণ্যমান গতি তেজের চাপে রচনার কাজে নিরন্তর নিযুক্ত, তারি জোয়ার-ভাঁটার টানে রেখা হোতে রেখান্তরে প্রাণী ও জড়জগতের চেহারা ছাঁচে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসছে। শিল্পীর মনে লেগেছিল সেই স্রোতের ঢেউ। ব্যক্তিত্বের রসে মজে তাই তুলির টানে বেরিয়ে এল রূপ হোতে রূপান্তরে সৃজিত অপরূপ মানুষ পশুপক্ষী ও দৃশ্য। কিন্তু এ তো গেল বাস্তব জগতের কথা। এরই তলায় তলায়, আধ্যাত্মিকলোকে অস্তিত্বের যে মহাকাব্য ধারাবাহিকভাবে বিশ্বজগতে চলেছে, তথ্যের পর্দা সরিয়ে, প্রচ্ছন্ন চৈতন্যের অন্ধকার পশুলোক কেমন করে ধীরে ধীরে মানবচিত্তের জ্ঞানলোকে প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল, তারই ক্রমবিকাশের পালা তিনি জগতের রঙ্গমঞ্চে দেখেছিলেন। যদিও বাস্তবকে নিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের কারবার, তবুও ব্যক্তিত্ব সকলপ্রকার তথ্যকে অতিক্রম করে নিজেকে স্থায়ী করবার প্রয়াসে অসীমের ভাণ্ডার থেকে অমৃতপাত্র চুরি করে পান করে।

এই অমৃতের তৃষ্ণাই মর্ত্য রাত্রির পরপার হোতে বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য শিল্পীর ব্যাকুল চিত্তকে অহরহ আকর্ষণ করত। সৃষ্টি করবার গভীর প্রেরণায় প্রাণের বিচিত্র ধারাকে কখনো ভয়ংকর বিপ্লবের রূপে, কখনো

বা আনন্দের অমৃত ছন্দে, বর্ণরেখার অনন্ত ব্যঞ্জনায়, গতির সীমাহীন তাৎপর্যকে নব নব অর্থে ও রূপে প্রকাশ করেছেন —

"This is the meaning of the poet's vision of the ancient Aegean shore where the silent hours of night throbbed with the heartbeat of the sea, and when he realised that his experience was the experience of ages and the eternity of Man in him was awake to the tremulous cadence of the tide."

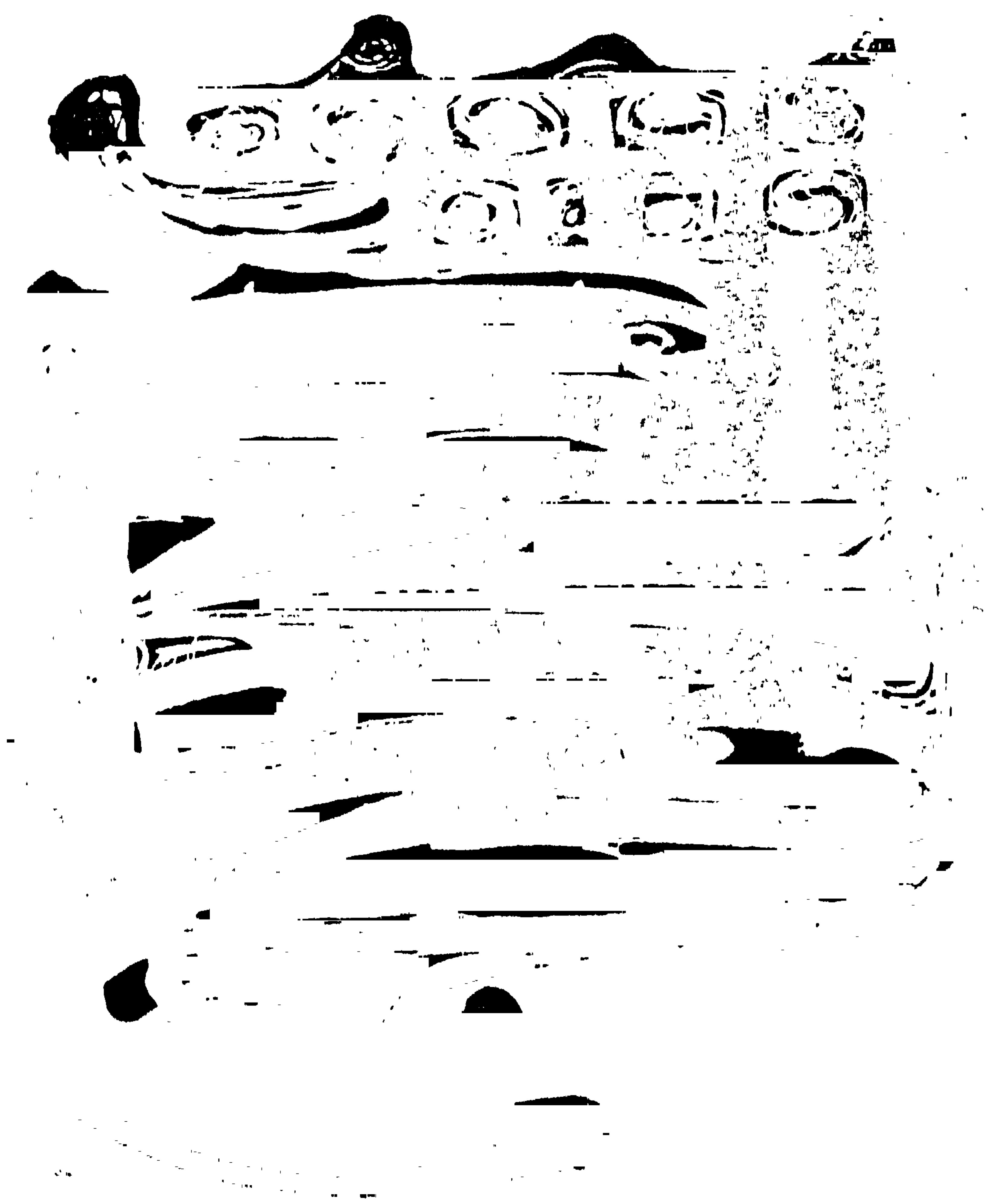

আজকাল

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমরা বিশ্বভারতী পত্রিকা, ইংরিজীতে যাকে বলে ivory tower, সেখানে চড়ে লিখছিনে। প্রথমতঃ, সেখানে চড়বার আমাদের সামর্থ্য নেই। আকাশদেশ থেকে দৈববাণী প্রচার করবার আমাদের সাধ্যও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

যখন এ পত্রিকার নাম বিশ্বভারতী, তখন আমরা রবীন্দ্রনাথের পদানুসরণ করব। রবীন্দ্রনাথের মন আকাশ ও মাটি, সমাজ ও ব্যক্তি, সবই অবলম্বন করেছিল। আমাদের দেশের এমন কোনো বিষয় নেই, যার প্রতি তিনি আমাদের চিন্তা ও ভাব উদ্রেক করেননি।

আজকের দিনে দেশের লোকের মনে যে ভাব উদ্বুদ্ধ হয়েছে, আর যার ফলে বর্তমান অশান্তি ঘটেছে, রবীন্দ্রনাথ থাকলে সে বিষয় উদাসীন হতে পারতেন না। কারণ তিনিই হচ্ছেন এই নব মনোভাবের একজন স্রষ্টা। আমার যখন বয়স সবে ১৮ বৎসর পেরিয়েছে, তখন আমি তাঁর প্রথম দর্শন-লাভ করি। এবং সেই সময় তাঁর মুখে তাঁর একটি স্বরচিত গান শুনি। সে গানটি এই —

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না
একি শুধু হাসিখেলা প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা, ছলনা।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরমবেদনা। ইত্যাদি

এ গানের সুর,—সংগীতের সুর নয়, ভাবের সুর—আমার মর্মে প্রবেশ করে।

এ সুর রবীন্দ্রনাথের সকল গদ্য পদ্যে পাওয়া যায়। যাঁরা সেটি লক্ষ্য

করেন না, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের মনের মূল কথা সম্বন্ধে উদাসীন। সবুজ পত্রেরও এই ছিল প্রধান সুর। এমন কি, বীরবলের রসিকতারও।

আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি, আমাদেরও মনের সুর তাই। সুতরাং সেই ভাবটি জাগিয়ে রাখা আমাদেরও কর্তব্য হবে।

বর্তমান অশান্তির সময় আমরা ইচ্ছে করলেও শুধু হাসিখেলা ও প্রমোদের মেলায় মত্ত হতে পারব না। বর্তমান যুগ যন্ত্রযুগ। প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার প্রকাণ্ড প্রভেদ এই যে, প্রাচীন সভ্যতা বর্তমান সভ্যতার মতো যন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।

যন্ত্র অবশ্য সব যুগেই কিছু-না-কিছু ছিল। কেননা, আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে নির্জীব এবং সজীব, দু'রকম যন্ত্রের উল্লেখ দেখতে পাই। এ যুগের মুখ্য বস্তু হচ্ছে সজীব যন্ত্র, অর্থাৎ মানবচালিত যন্ত্র। যন্ত্র এক হিসেবে মারাত্মক। অপরপক্ষে তা' আমাদের জীবনযাত্রার প্রধান সহায়। হাত-পা'র স্থলাভিষিক্ত যন্ত্র নব সভ্যতার শক্তি অসম্ভবরকম বৃদ্ধি করেছে। অপরপক্ষে নখদন্তের স্থলাভিষিক্ত যন্ত্র মানুষ মারবার কল হয়েছে, হত্যাকাণ্ডের প্রধান অস্ত্র হয়েছে। সেইজন্যেই য়ুরোপীয় সভ্যতার মধ্যে মানুষের আদিম বর্বরতা আজ ফুটে উঠেছে; এই যুদ্ধই তার প্রমাণ।

সভ্যতার একটি অঙ্গের কথা বলি।—যাতায়াত এখন লোকে যন্ত্রারূঢ় হয়ে করে। সে যন্ত্র বিগড়ে গেলে মানুষ অচল হয়ে পড়ে। এখন ভারতবর্ষে পথঘাট সব বন্ধ হচ্ছে। ফলে আমরা সব পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি এবং হতভম্ব হয়ে গিয়েছি। খবরের কাগজে যে সংবাদ পাওয়া যায়, তা' চাঞ্চল্যকর; আর গুজব যা' শুনতে পাই তা' ভয়ঙ্কর। সংবাদপত্রের খবর অর্ধসত্য, আর গুজব হয়তো বারো আনা মিথ্যে। তাহলেও গুজবে কতকটা না বিশ্বাস করে উপায় নেই।

শুনছি বাংলার বাইরে ভারতবর্ষে যে গোলযোগ হচ্ছে, তা' ক্রমে বাংলাতেও ছড়িয়ে পড়ছে। এই শান্তিনিকেতনের কিছু পশ্চিমে ঘোরতর অশান্তি হয়েছে। রেল যাচ্ছে না ও ডাক আসছে না। দু'দিন পরে হয়তো জীবনধারণের মালমশলা পাওয়া যাবে না। এই যুগকে পূর্বে বলেছি যন্ত্রযুগ, কিন্তু একে বৈজ্ঞানিক যুগও বলা যেতে পারে। সম্ভবতঃ যন্ত্র থেকে বিজ্ঞান

উদ্ভূত হয়নি, কিন্তু এখন যন্ত্র বিজ্ঞানকে গ্রাস করেছে। তাই এ যুদ্ধকে বৈজ্ঞানিক যুদ্ধ বলা হয়। যদিচ এ যুদ্ধ আসলে যন্ত্রযুদ্ধ। এ অবস্থায় মাথা ঠাণ্ডা করে ধীরশান্তভাবে কিছু ভাবা কিম্বা লেখা অসম্ভব। আমাদের মাথার ভিতরেও নানা idea এবং প্রবৃত্তি ঘুলিয়ে গিয়েছে। আমরা কাল কী হবে তা' আজ জানিনে। আমরা আশা করি আমাদের অতীতের সকল সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে মীমাংসা হবে।

ভবিষ্যৎ আশার দেশ, যেমন অতীত স্মৃতির দেশ। বর্ত্তমানে আমাদের আশা আমাদের স্মৃতির আর-এক ধাপ উপরে নয়। আগামী কল্য গতকল্যও হতে পারে। আমার বিশ্বাস তা' হবে না। ঘরে-বাইরে এই যুদ্ধের ফলে মানবসমাজের একটা ঘোর পরিবর্তন হবে। আর অতীতের পুনরুক্তি হবে না। কী যে হবে, সে বিষয় আমরা কল্পনা খেলাতে পারি, কিন্তু সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হবে না। এ সময়ে মনের জোর পাওয়া যায় একমাত্র idealism-এ, realism-এ নয়। কারণ idealism কী হওয়া উচিত তার উপর প্রতিষ্ঠিত, কী হচ্ছে তার উপর নয়। আমাদের এ পত্রিকা সে-কারণ idealism-ই প্রচার করবে। অবশ্য যথার্থ idealism realism-বর্জিত নয়।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ ৩তীয় সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৪৯

প্রাচীন কালের জাতিভেদ

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

প্রাচীন কালে যখন ভারতে জাতিভেদ প্রবর্তিত হইল তখনও উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে দোষ হইত না। ইহাকেই বলে অনুলোম বিবাহ। প্রতিলোম বিবাহ অবশ্য নিন্দনীয় ছিল। নিম্নবর্ণের পুরুষ উচ্চবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাকে বলে প্রতিলোম। তাহাতে আভিজাত্য ক্ষুণ্ণ হয়। এই মনোবৃত্তি অল্পবিস্তর প্রায় সব দেশেই আছে। মোটকথা জাতিভেদ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের মধ্যে সর্ববিধ কড়াকড়ি আরম্ভ হয় নাই, সেগুলি ক্রমে ক্রমে পরে আমদানি হইয়াছে।

দেখা যায় তখনকার দিনে বংশশুদ্ধি না থাকিলেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে বাধা হইত না। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ (১৪, ১, ১৭) বলেন দীর্ঘতমা ঋষির মাতার নাম উশিজ। বৃহদ্দেবতার মতে উশিজ ছিলেন শূদ্র দাসী। সেখানে দেখা যায় উশিজ ছিলেন কক্ষীবান প্রভৃতি ঋষির মাতা। দীর্ঘতমাই উশিজের গর্ভে এই সব ঋষির জন্মদান করেন (৪, ২৪-২৫)। কন্ববংশীয় বৎসকেও দাসীপুত্র বলা হইয়াছে (১৪, ৬, ৬)। অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা মহর্ষি বৎস আপন ব্রাহ্মণত্বের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইলুষ ছিলেন একজন অনার্য দাসী। তাঁহার পুত্র ঐলূষ কবষ সরস্বতী নদীতীরে সোমযাগে দীক্ষিত হন। অন্যান্য

ঋষিগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "এই কিতব অব্রাহ্মণ দাসীপুত্র কিরূপে আমাদের মধ্যে সোমযাগে দীক্ষিত হইল?" (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ২য় পঞ্চিকা, ৮ম অধ্যায়)। এই বলিয়া তাঁহারা ঐলূষ কবষকে সরস্বতী নদী হইতে দূরে জলহীন দেশে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি সেখানে "প্র দেবত্রা ব্রহ্মণে গাতুরেতু" মন্ত্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সরস্বতীকে নিজের কাছে লইয়া আসিলেন। তখন ঋষিগণ নিরুপায় হইয়া ঐলূষ কবষকে ঋষি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন (ঐ)। দাসীপুত্র ঐলূষ কবষ তখন ঋষির পূজ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

জবালার পুত্র সত্যকামের কথা সকলেই জানেন। সত্যকাম ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার্থ গুরুর কাছে যাইবেন। মাতা জবালাকে সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতা, আমার কী গোত্র?" মাতা বলিলেন, "কেমন করিয়া জানিব বাছা, তোমার কী গোত্র? যৌবনে বহুচারিণী হইয়া আমি তোমাকে লাভ করিয়াছি, তাই আমি জানিনা তোমার কী গোত্র।"

> বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ
> যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৪, ৪, ২)

"আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম, তাই জবালাপুত্র সত্যকাম বলিয়াই তুমি আত্মপরিচয় দিও।"

> জবালাতু নামাহমস্মি সত্যকামো নাম ত্বমসি
> স সত্যকাম এব জাবালো ব্রুবীথা। (ঐ, ৪,৪,২)

সত্যকাম তখন হারিদ্রুমত গৌতমের কাছে গিয়া বলিলেন, "হে ভগবন্, আপনার কাছে ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিতে চাই, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৪, ৪, ৩)

গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সৌম্য, তোমার গোত্র কী?" সত্যকাম বলিলেন, "আমার গোত্রের পরিচয় তো আমি জানি না। মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি বলিলেন, 'যৌবনে পরিচারিণী আমি বহুচারিণী হইয়া তোমাকে পাইয়াছি, তাই আমি জানি না তোমার গোত্র কী; জবালা আমার নাম, সত্যকাম তোমার নাম।' তাই হে ভগবন্, জবালাপুত্র সত্যকাম এইটুকুই আমার পরিচয়।" (ঐ, ৪,৪,৪)

তখন ঋষি গৌতম তাঁহাকে বলিলেন, "এমন (সত্য) কথা যথার্থ ব্রাহ্মণ ভিন্ন কে খুলিয়া বলিতে পারে? অতএব হে সৌম্য, তুমি সমিধ্ লইয়া আইস, আমি তোমাকে উপনীত করিব, যেহেতু তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হও নাই।"

তং হোবাচ নৈতদব্রাহ্মণো বিবক্তুমর্হতি
সমিধং সৌম্যাহরোপ ত্বা নেষ্যে ন সত্যদগা ইতি। (ঐ, ৪,৪,৫)

উপনিষদে আগাগোড়াই একটি উদার সামাজিক ব্যবস্থার পরিচয় পাই। সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের বড় বড় সব উপদেষ্টা ক্ষত্রিয়। রাজা অজাতশত্রু, জনক, অশ্বপতি কৈকেয়, প্রবাহণ জৈবলি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ বড় বড় ব্রহ্মবিৎ মহাজ্ঞানী। ব্রাহ্মণেরাও তাঁহাদের কাছে ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ যাইয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে (২,১,১) গর্গবংশীয় বালাকি বাগ্মী ও অহংকারী ছিলেন, তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে বলিলেন, "তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দিব"। পরে তাঁহার দর্পচূর্ণ লইল। তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ের কাছে ব্রহ্মবিদ্যার মর্ম বুঝিলেন। কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদেও (৪,১) এই আখ্যানটি আছে।

প্রাচীনশাল ঔপমন্যব, সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়, জন শার্করাক্ষ্য, বুডিল আশ্বতরাশ্বি, এই পাঁচজন মহাশালাপতি মহাশ্রোত্রিয় আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ উদ্দালক আরুণির কাছে গেলেন। উদ্দালক বলিলেন, রাজা অশ্বপতি কৈকেয়ের কাছে যাওয়াই ভাল। সকলে রাজার কাছে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিলেন। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৫,১১ খণ্ড)

রাজর্ষি জনক ছিলেন বিদেহপতি। তিনি এতবড়ো ব্রহ্মবিৎ ছিলেন যে ব্রাহ্মণেরাও তাঁহার কাছে মাথা নত করিতেন। তাঁহার একটি বহুদক্ষিণ যজ্ঞে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনার কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে (৩,১,১)। তাঁহার সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের সমাগম-কথা আছে ছান্দোগ্য উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে (১,১ ; ২,১ ইত্যাদি)। বুডিল আশ্বতরাশ্বিকে জনকের উপদেশের বর্ণনা আছে ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ে (৫,১৪,৮)।

ব্রহ্মবিদ্ রাজা প্রবাহণ জৈবলির সঙ্গে আরুণেয় শ্বেতকেতুর সমাগমের কথা দেখা যায়—বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬,২,১)। ছান্দোগ্য উপনিষদে শিলক শালাবত্য, চৈকিতায়ন দাল্ভ্যের সঙ্গে প্রবাহণ জৈবলির ব্রহ্মবিষয়ে তত্ত্বকথার বিবরণও (১,৮,১) পাওয়া যায়।

২

ক্ষত্রিয়রা যে তখনকার দিনে শুধু ব্রহ্মবাদী হইতেন তাহাই নহে, যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান পরিচালনের যোগ্যতা এবং অধিকারও তাঁহাদের ছিল। বৈদিক যুগে দেখা যায় রাজারা নিজেরাই যজ্ঞাদি সম্পন্ন করিতেন। দেশে বারো বৎসর অনাবৃষ্টি। রাজা শান্তনু বৃষ্টিলাভের জন্য যজ্ঞ করিবেন। যজ্ঞের পুরোহিত হইলেন রাজা ঋষ্টিসেনের পুত্র দেবাপি (ঋগ্বেদ ১০,৯৮)। বৃহদ্দেবতা বলেন, শান্তনু ও দেবাপি দুই ভাই।

আর্ষ্টিসেনস্তু দেবাপিঃ কোরব্যশ্চৈব শান্তনুঃ।
ভ্রাতরৌ কুরুষু ত্বেতৌ রাজপুত্রৌ বভূবতুঃ। (৭,১৫৫)

নিরুক্তেও এই কথাই জানা যায় (২,১০)।

আবার ভৃগুবংশীয়গণ রথ নির্মাণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। 'ভৃগবো ন রথম্'। (ঋগ্বেদ ১০,৩৯,১৪)

ঋগ্বেদেই দেখি ঋষি আঙ্গিরস বলিতেছেন, "আমি স্তব রচনা কবি, আমার পিতা ভিষক্, আমার মাতা শিলার দ্বারা শস্যচূর্ণকারিণী।"

কারুরহং ততো ভিষগ্ উপলপ্রক্ষিণী ননা। (ঋগ্বেদ ৯,১১২,৩)

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, শ্যাপর্ণ শায়কায়ন ছিলেন একজন বিখ্যাত পুরোহিত। যজ্ঞবেদিরচনায় তাঁহার দক্ষতা ছিল সর্বজনবিদিত। সেই শ্যাপর্ণ শায়কায়ন বলিতেছেন, তাঁহার সন্তানেরা গুণানুসারে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বা বৈশ্য যে কোনো জাতি হইয়া যাইতে পারেন (৪,১,১০)। কাঠক সংহিতায় (১৯,১০; ২৭,৪) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১২,৮,৩,১৯) যে ব্রহ্মপুরোহিত দেখা যায়, অনেকে মনে করেন তাহাতে ব্রাহ্মণ ছাড়াও পুরোহিত যে হইত এই কথাই সূচিত হয়। (Caste and Race in India, by G.S. Ghurye, p44)

পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী তাঁহার ঋগ্বেদ সংহিতার অনুক্রমণিকায় (৯০ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণ ঋষিই অনেক কিন্তু রাজন্য ঋষিও ছিল। সায়নাচার্য ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকাতে ঋজ্রস্ব, সহদেব, অম্বরীষ, ভয়মান, সুরাধস্ প্রভৃতিকে রাজর্ষি বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, পৃথিবৈন্য, কক্ষীবান প্রভৃতি বহুসংখ্যক রাজর্ষি ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই বেদসূক্তের রচক বা ঋষি ছিলেন।

দুই একস্থলে শূদ্র ঋষির উল্লেখ পাওয়া যায়। কবষ ঐলূষ নামে দশম মণ্ডলে একজন নিষাদ ঋষি আছেন; সুতরাং নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইতেছে যে বৈদিক যুগে আধুনিক জাতিভেদ ছিল না।”

রাজা বিশ্বামিত্র যে স্বীয় তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন সে কথা সকলেই জানেন। ক্ষত্রিয়বল যখন ব্রহ্মবলের নিকট পরাজিত হইল তখন “তিনি ক্ষত্রভাবে নির্বিণ্ণ হইয়া কহিলেন, ক্ষত্রিয়বলকে ধিক্, ব্রহ্মতেজই যথার্থ বল।”

বিশ্বামিত্রো ক্ষত্রভাবান্ নির্বিণ্ণো বাক্যমব্রবীৎ।

ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্॥ (মহাভারত, আদিপর্ব, ১৭৫,৪৫)

তাহার পর তিনি কঠোর তপস্যায় ব্রাহ্মণত্বলাভ করিলেন (ঐ, ৪৮)। ক্ষত্রভাব হইতে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্বলাভ করিলেন।

ক্ষত্রভাবাদপগতো ব্রাহ্মণত্বমুপাগতঃ॥ (ঐ, উদ্যোগপর্ব ১০৬,১৮)

উগ্রতপস্যাতে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া কৃতকাম বিশ্বামিত্র দেবতার মতো সারা জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন (ঐ, শল্যপর্ব, ৪০, ২৯)। তাই ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মবংশের কারক হইলেন (ঐ,শল্যপর্ব, ৪,৪৮)। পরে শল্যপর্বেই দেখা যায়, বিশ্বামিত্র মহাদেবকে আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। “ব্রাহ্মণ হইবার আকাঙ্ক্ষায় আমি মহাদেবকে আরাধনা করি।” (ঐ, শল্যপর্ব, ১৮,১৬)। তাঁহার প্রসাদেই দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলাম।” (ঐ, ১৮,১৭)

পুরাকালে বহু ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। তবে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে বসিষ্ঠের এই জন্য এত বাদবিবাদের কথা প্রসিদ্ধ কেন?

ম্যাক্‌ডোনাল ও কীথ সাহেব তাঁহাদের Vedic Index-এ (Vol II, 274-277; 310-312) দেখাইয়াছেন বসিষ্ঠ একজন নহেন। বিশ্বামিত্রও একাধিক ছিলেন। বিশ্বামিত্র একসময়ে সুদাসের পুরোহিত ছিলেন (ঋগ্বেদ ৩, ৩৩, ৫)। বিশ্বামিত্র পরে এই পুরোহিতপদ হইতে অপসারিত হওয়ায় সুদাসের শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দেন। বসিষ্ঠপুত্র শক্তির সঙ্গেও বিশ্বামিত্রের কলহের আভাস ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (৩,৫৩,১৫-১৬; ২১-২৪)। সদ্‌গুরুশিষ্য বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। ইহাতে

বুঝা যায় সুদাসের পৌরোহিত্য প্রভৃতি স্বার্থ লইয়া স্বার্থের খাতিরেই বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের প্রসিদ্ধ কলহের উদ্ভব। এই বিষয়ে Vedic Index গ্রন্থে আরও অনেক কথা আছে। যাঁহাদের কৌতূহল হয় তাঁহারা দেখিতে পারেন।

আসলে জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের দাবি যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যাইবে, বসিষ্ঠও স্বর্গের নর্তকী উর্বসীর সন্তান। মিত্রবরুণের ঔরসে তাঁর জন্ম।

উতাসি মৈত্রাবরুণো বসিষ্ঠোর্
বস্যা ব্রহ্মন্ মনসোঽধি জাত : ॥ (ঋগ্বেদ ৭, ৩৩, ১১)

বসিষ্ঠের জন্মের মধ্যে একটু গোলমাল ছিল বলিয়াই ঋগ্বেদে কোথাও তাঁহাকে উর্বসীর পুত্র কোথাও-বা তৃৎসুর বংশ বলিয়া বলা হইয়াছে (ঋগ্বেদ, ৭, ৮৩, ৮)। ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়াও অনেক স্থলে বসিষ্ঠের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে (মহাভারত, আদি, ১৭৪,৫)। মনুসংহিতায় (১,৩৫), বায়ুপুরাণে (৯,৬৮-৬৯) এবং মৎস্যপুরাণেও (১৭১ অধ্যায়) এই কথা আছে। অগ্নি হইতে তাঁহার জন্মের কথাও পাওয়া যায় (বায়ু ৬৫, ৪৬)। মৎস্যপুরাণেও এই কথা সমর্থিত।

পুরাণকারেরা যে বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-সংবাদ দিয়াছেন তাহাতেও তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিষয়ে শিবপুরাণ (৬০,৬১ অধ্যায়) এবং ব্রহ্মপুরাণ চমৎকার আলোকপাত করিয়াছেন। মান্ধাতার বংশে বিদ্যা ও প্রভাবসম্পন্ন ত্রয্যারুণির জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র মহাবল সত্যব্রত (ব্রহ্মপুরাণ, ৭ম অধ্যায়, ৯৭)। ত্রয্যারুণির একটু চরিত্রদোষ ছিল (৭,৯৮-৯৯)। পিতা তাই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন (৭,১০০)। পুত্র বলেন, "যাই কোথায় ?" পিতা বলিলেন, "চণ্ডালদের সঙ্গে বাস করো।" (৭,১০১)। ভগবান বসিষ্ঠ ঋষি সব দেখিলেন কিন্তু কোনো বাধা দিলেন না (৭,১০৩)। ত্রয্যারুণিও বনবাসব্রত গ্রহণ করিলেন। পরে যখন রাজ্য অরাজক হইল, বসিষ্ঠই রাজ্যরক্ষক হইলেন (৮,৪)। এই সত্যব্রতই পরে ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন।

৩

দ্বাদশবর্ষ অনাবৃষ্টি ও দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল (৭,১০৪-১০৫)। বিশ্বামিত্র তখন পরিবার হইতে দূরে গিয়া তপস্যায় রত (৭,১০৬)। তাঁহার

সন্তানেরা দুর্ভিক্ষে মরিবার মতো হইলে সত্যব্রতই তাঁহাদিগকে বাঁচাইলেন (৭,১০৬-১০৯)।

বসিষ্ঠের প্রতি সত্যব্রতের বহুকালের ক্রোধ সঞ্চিত ছিল। বসিষ্ঠ তাঁহাকে কখনও সাবধান করেন নাই এবং তাই পিতা তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তখনও বসিষ্ঠ বাধা দেন নাই (৮,৫-৬)। বরং সত্যব্রত রাজ্য ত্যাগ করিলে বসিষ্ঠই রাজ্যচালনার ভার লইলেন (৮, ৪)। সত্যব্রত এদিকে মৃগয়ার দ্বারা নিজেকে ও বিশ্বামিত্রের পরিবারকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন (৮, ১-২)। অভাববশতঃই হউক বা ক্রোধবশতঃই হউক, তিনি পরে বসিষ্ঠের গাভীটিও বধ করিয়া নিজের এবং বিশ্বামিত্রের পরিবারের অন্নসংস্থান করিলেন। বসিষ্ঠ তাহাতে সত্যব্রতকে শাপ দিলেন (৮, ১৯)। বসিষ্ঠ তাঁহাদের পৌরোহিত্যও ছাড়িয়া দিলেন বিশ্বামিত্র সেই শূন্যতা পূরণ করিলেন। কৃতজ্ঞ বিশ্বামিত্র তখন আসিয়া পুরোহিতহীন সত্যব্রতের সহায় হইয়া তাঁহার পৌরোহিত্যে ব্রতী হইলেন (৮, ২০-২৩)। সত্যব্রতও আসিয়া নিজ রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। রাজ্যপরিচালনার জন্যও বসিষ্ঠের আর কোনো প্রয়োজন রহিল না, পৌরোহিত্যও গেল। এইখানেই বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের কলহের প্রধান হেতু পাওয়া যাইতেছে।

সুদাস রাজার পৌরোহিত্যে বিশ্বামিত্রকে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। সেখানে তিনি আপন পরিচয় দিয়াছেন কুশিকবংশীয় বলিয়া (ঋগ্বেদ, ৩, ৫৩, ৯)। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায় বসিষ্ঠও সুদাসের পুরোহিত (৭,৮,৮ ; ৮,৭,৭১)। সুদাসের এই পৌরোহিত্য লইয়াও উভয়ের মধ্যে বিরোধ ঘটিয়া থাকিতে পারে। ঋগ্বেদেই দেখা যায় বসিষ্ঠপুত্র শক্তির সঙ্গে বিশ্বামিত্রের বিরোধের কথা (ঋগ্বেদ ৩,৫৩,১৫-১৬)। এই অতি পুরাতন উপাখ্যানটি মহাভারতে আদিপর্বের ১৭৪,১৭৫,১৭৬-তম অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। সেখানে দেখা যায় বিশ্বামিত্র ক্রোধপরায়ণ এবং বশিষ্ঠ ক্ষমাশীল।

বহু পুরাণেই কল্মাষপাদের প্রতি বসিষ্ঠের শাপের কথা দেখা যায়। সেখানে বসিষ্ঠ ধ্যানযোগে কল্মাষপাদকে নির্দোষ জানিয়াও "রাক্ষস হও" বলিয়া শাপ দেন। রাজা কল্মাষপাদও বসিষ্ঠকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী মদয়ন্তী রাজাকে নিবৃত্ত করিলেন (ভাগবত,

৯, ৯, ২৪)। বিষ্ণুপুরাণে এই বৃত্তান্তটি একটু বেশি বিস্তারে বলা হইয়াছে (৪, ৪, ৩০)। কল্মাষপাদের এই শাপ ব্যাপারে কিন্তু ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়কেই অধিক ক্ষমাশীল দেখা গেল। কল্মাষপাদের সন্তান ছিল না। স্ত্রীসম্ভোগও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এই জন্য পরে কল্মাষপাদের বংশ লোপ হয় বলিয়া বশিষ্ঠই কল্মাষপাদের অনুরোধে মদয়ন্তীতে পুত্র উৎপাদন করেন (ভাগবত ৯, ৯, ৩৯)।

বিষ্ণুপুরাণও বলেন, পুত্রহীন রাজার অনুরোধে বসিষ্ঠ মদয়ন্তীতে গর্ভাধান করিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪, ৪, ৩৮)।

৪

শক যবন কম্বোজ পারদ পহ্লব হৈহয় তালজঙ্ঘাদি জাতির লোকেরা পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সগরের পৈত্রিক রাজ্য ইহাঁরা অপহরণ করাতে সগর তাঁহাদের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া সগর রাজার গুরু বসিষ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৪, ৩, ১৮)। বসিষ্ঠ এখানে খুব কূট রাজনীতিবিদের মতো আচরণ করিলেন। তিনি সগরকে উপদেশ দিলেন, "এইসব জাতির রক্তে বৃথা হস্ত কলুষিত করিও না।" শক-যবনাদিকে হাতে না মারিয়া ভিতরে ভিতরে সংস্কৃতির দিক দিয়াই মারিবার ব্যবস্থাই বসিষ্ঠ করিলেন। সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইলে মানুষ তো জীবন্মৃত মাত্র। তাই তিনি সগরকে বলিলেন, "জীবন্মৃতদের মারিয়া আর লাভ কী?" (বিষ্ণুপুরাণ, ৪,৩,১৯)। বসিষ্ঠ সগরকে কহিলেন, "তুমি ইহাদের উচ্ছেদই তো চাও? বেশ, তোমার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য আমিই ইহাদের ধর্ম এবং সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণের সংসর্গ বন্ধ করিয়া দিতেছি।"

এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপালনায় নিজধর্মং দ্বিজসঙ্গ পরিত্যাগংকারিতাঃ। (ঐ ৪,৩,২০)

হাতে না মারিয়াও মানুষকে ভিতরে ভিতরে যে এমন ভাবে সমূলে বিনষ্ট করা যায়, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে ভ্রষ্ট করিলেই তাহা ঘটে, এই কথা গুরু বসিষ্ঠেরই কাছে জানিয়া রাজা সগর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। হাতে না মারিয়া মর্মে মর্মে যে মারা যায়, বসিষ্ঠ-উপদিষ্ট এই রাজনীতি সগরের অত্যন্ত মনঃপূত হইল। তখন সগর বলিলেন, "বেশ তবে তাহাই হউক।" এই

বলিয়া তাহাদের অস্ত্রে না মারিয়া তাহাদের বেশভূষা অন্যবিধ করিয়া দিলেন।

স তথেতি তদ্‌গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ। (বিষ্ণুপুরাণ, ৪,৩,২১)

তিনি যবনগণের মাথা মুণ্ডিত করাইলেন, শকদের অর্ধমুণ্ডিত করাইলেন, পারদদের লম্বিতকেশ করাইলেন, পহ্লবদের শ্মশ্রুধারী করাইলেন। ইহাঁদিগকে ও তাদৃশ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞাদি কর্ম হইতে বিচ্যুত করিলেন।

যবনান্‌ মুণ্ডিতশিরস, অর্দ্ধমুণ্ডান্‌ শকান্‌, প্রলম্বকেশান্‌
পারদান্‌, পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধরান, নিঃস্বাধ্যায়বষট্‌কারান্‌
এতানন্যাংশ্চ ক্ষত্রিয়াংশ্চকার। (বিষ্ণুপুরাণ, ৪,৩,২১)

ব্রাহ্মণাদির সংসর্গরহিত হইয়া ও নিজধর্ম পরিত্যাগ করাতে তাহারা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল।

তে চ নিজধর্মপরিত্যাগাদ্‌ ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। (ঐ)

আমাদের ইতিহাস ক্রমাগত এইরূপে আপন জনকে পর করিবারই ইতিহাস। অতিপুরাতন কালে যে কাজ সনাতনধর্মনিষ্ঠ বসিষ্ঠ করিয়াছিলেন আজও সেই কাজ চলিয়াছে। এমন করিয়াই আমরা ঘরের লোককে পর করিয়াছি। কিন্তু পরকে ঘরের লোক করিয়াছেন ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিপন্থীরা। সেকথা প্রসংগান্তরে হইবে। নিজেদের সংস্কৃতি নিজেদের বেশভূষার যে কত গভীর ঐতিহাসিক মূল্য তাহা এই সব পুরাণকথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

এখনকার দিনের পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদীরাও যখন এই পথটিকে তাঁহাদের স্বার্থরক্ষার প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদিগকে দোষ দিতে গিয়া মনে পড়ে, এই পথের আদি প্রবর্তকদের মধ্যে আমাদের বসিষ্ঠই একজন প্রধান।

যাহা হউক বসিষ্ঠ কিন্তু পরে বিশ্বামিত্রকেও ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র রোহিতকে বরুণযজ্ঞে বলি দিবার কথা ছিল। রোহিতের পরিবর্তে পরে শুনঃশেফকে যজ্ঞে বলি দিবার আয়োজন হয়। সেই যজ্ঞে বিশ্বামিত্র ছিলেন হোতা, জমদগ্নি ছিলেন অধ্বর্যু,

বসিষ্ঠ ছিলেন ব্রহ্মা, অয়াস্য আঙ্গিরস ছিলেন উদ্গাতা। এই কথা ভাগবতেও দেখা যায় (৭, ৯, ২২)।

একই যজ্ঞে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র পৌরোহিত্যে ব্রতী হওয়াতে বুঝা যায় বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব বসিষ্ঠ মানিয়া লইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে পৌরোহিত্যের দাবি বিশ্বামিত্রেরই বেশি, কারণ সত্যব্রতকে সপরিবারে দুর্দিনে বিশ্বামিত্রই রক্ষা করেন। কিন্তু তবু এই দারুণ নরমেধ যজ্ঞে বসিষ্ঠকেও ব্রতী দেখা গেল। এই যজ্ঞেই দেখা গেল তিনি পৌরোহিত্যের ব্রতে এক সঙ্গে দীক্ষিত। কাজেই বুঝা যায় তখন এমন দারুণ যজ্ঞের ভার লইয়াও তিনি বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত বলিয়াই পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করিলেন।

যদিও Vedic Index-এ বলা হইয়াছে,বসিষ্ঠ একাধিক ব্যক্তি,তবু এখানে আবার ভালো করিয়া বলা উচিত— বসিষ্ঠ নামে পরিচিত অনেক ঋষি ছিলেন এবং বিশ্বামিত্র নামে পরিচিতও বহু ঋষি ছিলেন। সকল বসিষ্ঠের সঙ্গে সকল বিশ্বামিত্রের বিরোধ হয় নাই। একের সঙ্গে যখন আর-একজনের স্বার্থের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তখনই বিরোধ ঘটিয়াছে। সকল বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরিচয় এখানে দিবার আবশ্যক নাই। পুরাণাদি গ্রন্থ দেখিলেই তাহা ভালো করিয়া বুঝা যাইবে। *

বিশ্বামিত্র ছাড়াও বেদের অনেক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব। বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম দশটি মন্ত্রেরই ঋষি হইলেন মধুচ্ছন্দা (ঐতরেয় আরণ্যক ১,১,৩ কৌশীতকি ব্রাহ্মণ, ১৮, ২)। তিনি বিশ্বামিত্রের পুত্র (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭,১৭,৭)। চন্দ্রবংশীয় নরপতি পুরুরবা ঋগ্বেদের মন্ত্রের ঋষি (১০ মণ্ডল, ৯৫ সূক্ত ; ১,৩,৬,৮,৯,১০,১২,১৪,১৭ ঋক্)। দেবাপি আর্ষ্টিসেনের কথা অন্যত্র বলা হইয়াছে। এই সব নাম ছাড়াও কোলব্রুক সাহেব আরও অনেক রাজর্ষির নাম করিয়াছেন। (As. Trans, Vol. VIII, p 393)

* ভারতবর্ষ পত্রিকায় (১৩৩৭, ভাদ্র, পৃ ৩৩৭-৩৪৭) দেখিলাম আমাদের বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বেদশাস্ত্রী মহাশয় এই বিষয়ে "বসিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-সন্দেশ" নামে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি পূর্বে পাইলে বসিষ্ঠ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে বৃথা এই কয়টি পাতা না লিখিয়া তাঁহার প্রবন্ধটিই উদ্ধৃত করিয়া দিতাম। যাহা হউক এই বিষয়ে যিনি আরও ভালো করিয়া জানিতে চাহেন তিনি যেন নিশ্চয় ঐ প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখেন। বিশেষতঃ নানা বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের পরিচয় তিনি অতি সুন্দরভাবে দিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধটি যেমন সুচিন্তিত তেমনি সুলিখিত।

যে নারীরা এক কালে বেদের বহু বহু মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি ছিলেন এখন সেই নারীরা শূদ্রমাত্র ; বেদের একটি কথাও উচ্চারণ, এমন কি শ্রবণ করিবার অধিকারও আজ তাঁহাদের নাই। নারী ঋষিদের নাম এখন এত সুপরিচিত যে সেই জন্য আর এখানে তাঁহাদের বিষয় স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইল না।

ঋগ্বেদের দেবাপি (১০, ৯৮, ৫, ৬, ৮) রাজার কথা পূর্বেও হইয়াছে। এই কথা মহাভারতেও পাওয়া যায়। সেখানে তিনি আর্ষ্টিসেন নামে পরিচিত। ইহা তাঁহার পিতার নামে প্রাপ্ত পরিচয়। দেখা যায় পাণ্ডবেরা উগ্রতপাঃ তপঃকৃশ ধমনীব্যাপ্তকলেবর সর্বধর্মপারগ রাজর্ষি আর্ষ্টিসেনের বিবিধ ফলশালী মহীরুহ ও মাল্যসমূহে পরিশোভিত আশ্রম অবলোকন করিযা তাঁহার সমীপে গমন করিলেন (বনপর্ব ১৫৮, ১০২-১০৩)। পুরোহিত ধৌম্যও সেই রাজর্ষিকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন (বনপর্ব ১৫৯, ৩)। সেই পুণ্য আশ্রমে তাঁহারা কিছুকাল বাস করিলেন। শল্যপর্বে দেখা যায় কপালমোচন তীর্থের মাহাত্ম্যকীর্তনে বলা হইয়াছে, "সেই স্থানে সংশিতব্রত ঋষিসত্তম আর্ষ্টিসেন সুমহৎ তপোবলে ব্রাহ্মণ্যলাভ করিয়াছিলেন ; রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপ, মহাতপা দেবাপি এবং মহাতপস্বী ভগবান বিশ্বামিত্র মুনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন" ইত্যাদি। (শল্যপর্ব, ৩৯, ৩৪-৩)। এখানে যেন মনে হয় দেবাপি ও আর্ষ্টিসেন ভিন্ন ব্যক্তি।

রাজর্ষি সিন্ধুদ্বীপের কথা মহাভারতে নানা স্থানে আছে। তিনি জহ্নুর বংশজাত (অনুশাসন ৪, ৩-৪)। দেবাপি আর্ষ্টিসেন ও বিশ্বামিত্রাদির মতো ব্রাহ্মণ্যলাভ করেন (শল্যপর্ব ৪০, ; ১-২, ১০-১৯)। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র রাজর্ষি বলাকাশ্ব, তাঁহার পুত্র বল্লভ (অনুশাসন ৪, ৪-৫)।

বিশ্বামিত্র রাজা হইয়াও ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণবংশকারক হইলেন (অনুশাসন ৪, ৪৮)। তাঁহার বহুপুত্র। তাঁহারা সবাই মহাত্মা, ব্রাহ্মণবংশবিবর্ধন, তপস্বী, ব্রহ্মবিদ্ এবং গোত্রকর্তা (ঐ, ৪৯)।

সেইসব ক্ষত্রিয়বংশজাত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মর্ষিগণের নামের দীর্ঘ তালিকাও মহাভারত দিয়াছেন (ঐ ৫০-৫৯)

মহাভারত আদিপর্বে দেখা যায় রাজর্ষি মনুর সন্তানেরা অনেকেই ব্রাহ্মণ হইয়াছেন (৭৫ অধ্যায়, ১২-১৫)। নহুষের ছয়পুত্র তাহার মধ্যে যতি

যোগবলে মুনি হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন (৭৫, ৩১)। ক্ষত্রিয়বংশ বহু মহাত্মা ব্রাহ্মণ হইয়া অব্যয় ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছেন (আদি, ১৩৭, ১৪)। ভৃগুমুনি এই বিষয়ে এত উদার যে তিনি জন্ম দ্বারা যে ব্রাহ্মণত্ব হয় এই কথাই মানেন না। তাঁহার মতে গুণ চরিত্র ও আচার অনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরিচয় (শান্তিপর্ব, ১৮৮, ১৮৯ অধ্যায়)। ভীষ্মও বলেন সদাচারযুক্ত শূদ্রও পূজ্য এবং সদাচারহীন ব্রাহ্মণও অপূজ্য (অনুশাসন, ৪৮, ৪৮)।

শক্রু প্রতর্দনের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া রাজা বীতহব্য ভৃগুর আশ্রমে শরণ লইলেন (অনুশাসন পর্ব ৩০, ৪৪)। প্রতর্দন আসিয়া আশ্রমে হাজির। প্রতর্দন বলিলেন, তোমার আশ্রমবাসীদের দেখিতে চাই (ঐ ৪৭)। ভৃগু বলিলেন, "এখানে ক্ষত্রিয় কেহ নাই, এখানে যাঁহারা আছেন তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ" (ঐ, ৫৩)। রাজা প্রতর্দন সব বুঝিয়াও নম্রভাবে ভৃগুকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "যাহা হউক আমার আর দুঃখের কারণ নাই। আমার তেজেই আজ আমি বীতহব্যকে ক্ষত্রিয় জাতি হইতে বহিষ্কৃত করাইলাম" (ঐ, ৫৫)। "এই আশ্রমস্থ সকলেই ব্রাহ্মণ" ভৃগুর বাক্যেই বীতহব্য ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলেন (ঐ, ৫৭)।

তাঁহার পুত্র গৃৎসমদ রচিত শ্রুতি ঋগ্বেদে আছে।

ঋগ্বেদে বর্ত্ততে চাগ্র্যা শ্রুতির্যস্য মহাত্মনঃ ॥ (ঐ, ৫৯)

গৃৎসমদ ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মচারী এবং ব্রাহ্মণদেরও পূজ্য হইলেন (ঐ, ৬০)। গৃৎসমদের পুত্র ব্রাহ্মণ সুতেজা, সুতেজার পুত্র বর্চা, বর্চার পুত্র বিহব্য, বিহব্যের পুত্র বিতত্য, বিতত্যের পুত্র সত্য, সত্যের পুত্র সন্ত, সন্তের পুত্র শ্রবা, শ্রবার পুত্র তম, তমের তনয় ব্রাহ্মণসত্তম প্রকাশ, প্রকাশের পুত্র বাগিন্দ্র, বাগিন্দ্রের পুত্র প্রমতিও ছিলেন বেদবেদাঙ্গপারগ (ঐ, ৬১-৬৪)।

প্রমতি-ঔরসে ও অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে রুরুর জন্ম। প্রমদ্বরার গর্ভে রুরুর পুত্র শুনক নামে ব্রহ্মর্ষির জন্ম। শুনকের পুত্র হইলেন শৌনক (ঐ, ৬৪-৬৫। মহর্ষির প্রসাদে এইরূপে একটি ক্ষত্রিয়বংশের আগাগোড়া সকলেই ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিলেন।

মহাভারতের পরিশিষ্ট হইল হরিবংশ। তাহাতেও আমরা এই বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারি। নাভাগরিষ্টের দুইটি পুত্র ছিলেন বৈশ্য, তাঁহারা পরে ব্রাহ্মণ হইয়া যান।

নাভাগরিষ্টস্য পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। (হরিবংশ, ১১, ৬৫৮)

বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত অনুবাদে এই শ্লোকের বাংলা দেখিতেছি, "নাভাগরিষ্টের দুইটি বৈশ্য পুত্র ছিল, তাহারা উভয়েই ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।" (পৃ ২২)। কিন্তু কেবল মাত্র অনুবাদের নৈপুণ্যে এতবড় একটি বিষয়কে কি চাপা দেওয়া যায়? বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী সমস্ত শাস্ত্রেই এই বিষয়ে ভূরি ভূরি পরিচয়, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, রহিয়া গিয়াছে। সবগুলি তো আর এই রকমে সারিয়া দেওয়া যায় না।

গৃৎসমদের পুত্র শুনক। শুনকের শৌনক নামে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শূদ্র জাতীয় অনেক পুত্র জন্মে (হরিবংশ ২৯, ১৫১৯ শ্লোক)। গৃৎসমদ যে ক্ষত্রিয় বীতহব্যের পুত্র তাহা এইমাত্র মহাভারত হইতে দেখান হইয়াছে (অনুশাসন, ৩০ ৫৯)।

বৎসভূমির ও ভৃগুভূমির ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য প্রভৃতি অসংখ্য পুত্র জন্মিয়াছে (হরিবংশ, ২৯, ১৫৯৭-১৫৯৮)।

বলিরাজার অঙ্গ বঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র কলিঙ্গ নামে পাঁচ পুত্র। তাঁহারা বালেয় অর্থাৎ বলিবংশজ ক্ষত্রিয়। বালেয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সন্তান (হরিবংশ, ৩১, ১৬৮৪-১৬৮৫)।

প্রতিরথের পুত্র রাজা কণ্ব। মেধাতিথি কণ্বের পুত্র। পরে মেধাতিথি হইতেই কণ্ব ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন (ঐ, ৩২, ১৭১৮)।

শকুন্তলার গর্ভে দুষ্মন্তের ঔরসে রাজা ভরতের জন্ম। ক্ষত্রিয় পিতা বলিয়াই ভরত ক্ষত্রিয়। সন্তান পিতার জাতিই প্রাপ্ত হয়। হরিবংশ বলেন, "মাতা তো চর্মপাত্র মাত্র, সন্তান হয় পিতার। যাহার দ্বারা উৎপাদিত, সন্তান তাহারই স্বরূপ।"

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাত স এব সঃ॥ (হরিবংশ, ৩২, ১৭২৩;
বিষ্ণুপুরাণ, ৪,১৯,২)

ক্ষত্রিয় গৃৎসমদের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য অনেক পুত্র জন্মে (হরিবংশ, ৩২, ১৭৩৪)। অঙ্গিরা হইতে ভৃগুবংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র অনেক পুত্র উৎপন্ন (ঐ, ৩২, ১৭৫৩-১৭৫৭)। পুরুবংশীয় রাজা ও ব্রহ্মর্ষি কৌশিক এই উভয় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বংশ যে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত তাহা লোকপ্রসিদ্ধ।

পৌরবস্য মহারাজ ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্য চ।
সম্বন্ধো হ্যস্য বংশেঽস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ॥ (ঐ, ৩২, ১৭৭৩)

রাজা দিবোদাসের পুত্র ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ু। মিত্রয়ু হইতেই মৈত্রায়ণী শাখা প্রবর্তিত। ইহাঁরা ক্ষত্রোপেত ভার্গব ব্রাহ্মণ (ঐ, ৩২, ১৭৮৯-১৭৯০)। মৌদ্‌গল্যরাও ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ (ঐ, ৩২, ১৭৮১)।

হরিবংশের পুরাপুরি সমর্থন মেলে বিষ্ণুপুরাণে। রথীতরের বংশীয়গণ ক্ষত্রিয়বংশজাত। তাঁহারা আঙ্গিরস বলিয়া পরিচিত। তাই তাঁহাদিগকে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ বলা হয় (বিষ্ণুপুরাণ, ৪, ২, ২)। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব, তাঁহার পুত্র হরিত, তাঁহা হইতে জাত হারিত আঙ্গিরস বংশ (ঐ, ৪, ৩, ৫)। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক চাতুর্বর্ণ্যেরই প্রবর্তয়িতা (ঐ, ৪, ৮, ১)। ভার্গভূমি হইলেন ভার্গের পুত্র, তিনিও চাতুর্বর্ণ্যপ্রবর্তয়িতা (ঐ, ৪, ৮, ৯)। নেদিষ্ট-পুত্র নাভাগ হইয়া গেলেন বৈশ্য (ঐ, ৪, ১, ১৫)। অথচ ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ যে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন তাহা অন্যত্র দেখান হইয়াছে। গর্গ হইতে শিনি, তৎপুত্রগণ গার্গ্য ও শৈনেয় নামে পরিচিত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ (ঐ, ৪, ১৯, ৯)। রাজা অপ্রতিরথ হইতে জাত কণ্ব, কণ্ব হইতে জাত মেধাতিথি। তাঁহা হইতে কাণ্বায়ণ ব্রাহ্মণেরা উৎপন্ন (ঐ, ৪, ১৯, ২; ৪, ১৯, ১০)। মুদ্‌গল হইতে মৌদ্‌গল্যগণ ব্রাহ্মণ হইলেন, কিন্তু তাঁহারা ক্ষত্রিয় বংশজাত (ঐ, ৪, ১৯, ১৬)।

ভাগবতের মধ্যেও এই সব ইতিহাসেরই সমর্থন দেখা যায়। ভগবান ঋষভদেবের শতপুত্র। জ্যেষ্ঠ ভরত হইলেন ভারতবর্ষের অধিপতি। কনিষ্ঠ ৮১ জন মহাশালীন মহাশ্রোত্রিয় যজ্ঞশীল কর্মবিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইলেন (৫ম স্কন্ধ, ৪, ১৩)। ক্ষত্রিয় পুরুবংশ হইতে কোনো কোনো বংশ হইল ক্ষত্রিয়, কোনো কোনো বংশ হইল ব্রাহ্মণ (ভাগবত ৯, ২০, ১)। রাজা রথীতরের সন্তান না হওয়ায় অঙ্গিরা তাঁহার পত্নীতে সন্তান উৎপন্ন করেন। রাজা রথীতরের বংশে ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ জন্মিলেন (ঐ, ৯, ৬, ৩)। ভরতবংশীয় গর্গ হইতে শিনি, তাঁহা হইতে গার্গ্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলেন (ঐ, ৯, ২১, ১৯)। রাজা দুরিতক্ষয় হইতে তিন পুত্র ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন (ঐ, ৯, ২১, ১৯-২০) ক্ষত্রিয় মুদ্‌গলের বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়া মৌদ্‌গল্যনামে পরিচিত হইলেন। (ঐ, ৯, ২১, ৩৩)। করুষ ক্ষত্রিয়, তাঁহার বংশীয়গণ ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্ত (ঐ, ৯, ২, ১৬)। পারের পুত্র

নীপ, তাঁহার শত পুত্র। তিনিই শুককন্যা কৃত্বীর গর্ভে যোগী ব্রহ্মদত্তকে জন্মদান করেন (ঐ, ৯, ২১, ২৪-২৫)। ক্ষত্রিয় মনুর পুত্র ধৃষ্ট, তাঁহার বংশীয়গণ জন্মত ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ হইলেন (ঐ, ৯, ২, ১৭)। নাভাগোদিষ্ট পুত্রেরা কেহ কেহ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে, কেহ কেহ আবার বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন (ঐ, ৯, ২, ২৩)।

বায়ুপুরাণও বলেন, রাজা নহুষের পুত্র সংযাতি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া তপস্যাবলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিলেন (৯৩, ১৪)। পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ এই তিন জন মান্ধাতার সন্তান। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র হারিত। ইহাঁরা সকলেই শূর। ইহাঁরা আঙ্গিরস এবং ক্ষত্রবংশীয় হইয়াও ব্রাহ্মণ। (৮৮, ৭১-৭৩)

৫

বায়ুপুরাণ আরও বলেন, আদিকালে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না, কাজেই বর্ণসঙ্করও ছিল না।

বর্ণাশ্রমব্যবস্থা চ ন তদাসন্ ন সঙ্করঃ ॥ (বায়ু, ৮, ৬১)

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আর একটি বিষয়ের অবতারণা করিতে চাই। বায়ুপুরাণের এই স্থানে প্রাচীন কালের গৃহাদি নির্মাণ ব্যাপারের অনেক চমৎকার ইতিহাসের ইঙ্গিত দেখা যায়, "যেমন তাহারা পূর্বে বৃক্ষাশ্রয়ে আবাস স্থাপন করিত, তদ্রূপই গৃহ নির্মাণও করিত। বিশেষ চিন্তা করিয়া তাহারা বৃক্ষনিদর্শনে বৃক্ষের শাখাবিস্তারের ন্যায় কাষ্ঠবিস্তার করিয়া উত্তম গৃহ নির্মাণ করিল"। (ঐ ৮, ১১৮)। শাখাকারে নির্মিত বলিয়াই গৃহের নাম হইয়াছে শালা (৮, ১২০)।

বায়ুপুরাণের মতে কর্মের শুভাশুভ অনুসারে সব জাতি নির্ণীত হইল (ঐ, ৮, ১৩৪)। যাঁহারা অন্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ তাঁহারা হইলেন ক্ষত্রিয় (বায়ু, ৮, ১৫৫)। যথাভূতবাদী সত্যবাদী ও ব্রহ্মবাদীদের ব্রাহ্মণ করা হইল (ঐ, ৮, ১৫৬)। প্রজা বৃদ্ধির জন্য ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গিরা মরীচি দক্ষ অত্রি ও বসিষ্ঠকে ব্রহ্মা মানসপুত্র করিয়া সৃজন করিলেন

(ঐ, ৯, ৬২-৬৩)। ইঁহারা নব-ব্রাহ্মণ বলিয়া পুরাণে বর্ণিত (ঐ, ৯, ৬৩)। স্থানান্তরে বায়পুরাণ মনুকেও এই নয় জনের সঙ্গে ধরিয়া ব্রহ্মার দশটি মানস পুত্রের কথা বলিয়াছেন—

ভৃগুর্মরীচিরত্রিশ্চ অঙ্গিরাঃ পুলহঃ ক্রতুঃ ।
মনুর্দক্ষো বসিষ্ঠশ্চ পুলস্ত্যশ্চেতি তে দশ ॥ (বায়ু, ৫৯, ৮৮)

ইঁহারা সকলেই মহর্ষি (ঐ, ৫৯, ৮৯)। মহর্ষি ঋষি মুনিদের পরিচয় ও তাঁহাদের বংশজাত সব ব্রাহ্মণদের পরিচয় এই অধ্যায়েই দেওয়া হইয়াছে।

বায়ুপুরাণ বলেন, অনেক ক্ষত্রবংশজাত মহাত্মা তপস্যার বলেই সিদ্ধিলাভ করিয়া মহর্ষিপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রাজা বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সঙ্কৃতি, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনূহবান, ঋথু আর্ষ্টিসেন, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিঞ্জয় রথীতর রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রভৃতি রাজারা ক্ষত্রিয়বংশজ হইয়াও তপস্যাবলে ঋষিত্বলাভ করিয়াছেন (বায়ু, ৯১, ১১৫-১১৭)। রাজাগৃৎসমদের পুত্র শৌনক, তাঁহার বংশে বিভিন্ন কর্মানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুর্বর্ণই উৎপন্ন হইলেন (বায়ু, ৯২, ৪-৫)। শৌনক ও আর্ষ্টিসেন ক্ষত্রিয় বংশজাত ব্রাহ্মণ (ঐ, ৯২, ৬)। নহুষপুত্র সংযাতি মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মভূত হইয়া মুনি হইলেন (বায়ু, ৯৩, ১৪)।

দিব্য ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় হইলেন (বায়ু, ৯৯, ১৫৭)। গাগ্র-বংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বংশজ হইয়াও ব্রাহ্মণ হইলেন (ঐ, ৯৯, ১৬১)। গাগ্র সাঙ্কৃতি এবং বীর্য বংশীয়গণও ক্ষত্রবংশে জাত হইয়াও ব্রাহ্মণ হন (ঐ, ৯৯, ১৬৪)। ক্ষত্রিয় কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ইহা হইতেই কাণ্বায়ণ ব্রাহ্মণগণ প্রসিদ্ধ (বায়ু, ৯৯, ১৭০)। রাজা সংনতির পুত্র কৃত। ইনি কৌথুমশাখী হিরণ্যনাভের শিষ্য। ইনি চতুর্বিংশতি প্রকার সামবেদের বক্তা (বায়ু পুরাণ, ৯৯, ১৮৯, ১৯০)। তাঁহার প্রবর্তিত সংহিতাগুলি প্রাচ্য নামে খ্যাত (ঐ, ১৯১)। মুদ্গলের বংশীয়রা মৌদ্গল্য তাঁহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ (ঐ, ১৯৮)। রাজা দিবোদাসের পুত্র মিত্রযু ব্রহ্মিষ্ঠ রাজা। তাঁহার বংশীয়গণ জন্মতঃ ক্ষত্রিয় হইলেও তপোবলে ছিলেন ব্রাহ্মণ (ঐ, ২০৭)।

লিঙ্গপুরাণ বলেন, বিষ্ণু— মরীচি ভৃগু অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু দক্ষ অত্রি বসিষ্ঠ সংকল্প ধর্ম ও অধর্মকে যোগবিদ্যাবলে সৃষ্টি করেন (পূর্বভাগ, ৩৯

অধ্যায়)। লিঙ্গপুরাণ আরও বলেন, সত্যযুগে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা ছিল না, বর্ণসংকরও তাই ছিল না (পূর্বভাগ, ৩৯ অধ্যায়)। পদ্মযোনি প্রজাগণের দুঃখ দূর করিতে ক্ষয়িত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন এবং স্বীয় সামর্থ্যবলে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিলেন (ঐ)।

রাজা যুবনাশ্বের পুত্র হরিত। এই হরিত-বংশীয়গণ ব্রাহ্মণ হইয়া হারিত নামে বিখ্যাত হন। ইহাঁরা অঙ্গিরো বংশের পক্ষাশ্রিত এবং ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ। .. ক্ষত্রিয় সম্ভূতির এক পুত্র বিষ্ণুবৃন্দ। এই বিষ্ণুবৃন্দ হইতে বিষ্ণুবৃন্দ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি। ইহাঁরাও অঙ্গিরো বংশের পক্ষাশ্রিত এবং ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ (লিঙ্গপুরাণ, পূর্বভাগ, ৬৫ অধ্যায়)।

ব্রহ্মপুরাণে দেখা যায় নাভাগ ও ধৃষ্টের ক্ষত্রিয় সন্তানেরা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন (৭, ২৬)। তপস্যা বিদ্যা ও শম প্রভাবে বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি-পদ প্রাপ্ত হন (১০, ৫৬-৫৬)। এই বংশে বহু সন্ততি। ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মর্ষির সম্বন্ধহেতুতে এই বংশ ব্রহ্মক্ষত্র নামে বিখ্যাত (১০, ৬৩)। রাজা বলির বংশধরগণ বালেয় ক্ষত্রিয়। বালেয় ব্রাহ্মণেরাও তাঁহারই সন্তান (১৩, ২৯-৩১)। রাজা গৃৎসমতির সন্তানেরা কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য (১৩, ৬৪)। ক্ষত্রিয় বৎসের ও ভর্গের সন্তানদেরও কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য, কেহবা শূদ্র (১৩,৭৮-৭৯)।

ব্রহ্মপুরাণের মতে ব্রাহ্মণ-ধর্ম আচরণ ও ব্রাহ্মণ-জীবিকা অবলম্বন করিলে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যও ব্রাহ্মণ হইতে পারে (২২৩, ১৪)। শুভ কর্মে বা আচরণে বৈশ্যও ক্ষত্রিয় হয়, এমন কি শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে (২২৩, ৩২)।

সত্যবাদী, নিরহংকার, নির্দ্বন্দ্ব, মধুরভাষী, নিত্যযাজী, স্বাধ্যায়বান, শুচি, দান্ত, ব্রাহ্মণ-সৎকর্তা, সর্ববর্ণের অনসূয়ক, গৃহস্থব্রত হইয়া দ্বিকালমাত্রভোজী, শেষাশী, নির্জিতাহার, নিষ্কাম, গর্বহীন, যজ্ঞশীল, অতিথিপরায়ণ হইলে বৈশ্যও ব্রাহ্মণত্বলাভ করে (২২৩, ৩৭-৪০)। শূদ্রও যদি আগমসম্পন্ন ও সংস্কৃত হয় তবে সে ব্রাহ্মণ হয় (ব্রহ্মপুরাণ, ২২৩, ৫৩)। ইহার বিপরীতবৃত্ত ব্রাহ্মণও শূদ্রতা প্রাপ্ত হয় (ঐ, ৫৪)। শুচিকর্মপরায়ণ শূদ্রকেও ব্রাহ্মণবৎ সেবা করিবে, স্বয়ং ব্রহ্মার এই মত (২২৩, ৫৫)।

জাতি, সংস্কার, শ্রুতি, সন্ততি দ্বিজত্বের কারণ নহে ; চরিত্রই কারণ। সাধু

চরিত্রেই ব্রাহ্মণ হয়, সদ্‌বৃত্ত শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে ; সর্বত্র সমদর্শনই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত স্বভাব। নির্মল নির্গুণ এই ব্রহ্মস্বভাব যাঁহার, তিনিই ব্রাহ্মণ।

> ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতি র্নচ সন্ততিঃ।
> কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্‌।
> সর্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
> বৃত্তিস্থিতশ্চ শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বঞ্চ গচ্ছতি।
> ব্রহ্মস্বভাবঃ সুশ্রোনি সমঃ সর্বত্র মে মতঃ।
> নির্গুণং নির্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥ (ঐ ২২৩, ৫৬-৫৮)

ব্রাহ্মণও যাহাতে শূদ্র হয় এবং শূদ্রও যাহাতে ব্রাহ্মণ হয়, এ পর্যন্ত তাহাই বলা হইল (ব্রহ্মপুরাণ ২২৩, ৬৫-৬৬)।

মোটের উপর দেখা যায় বৈদিক যুগে জাতিভেদের বাঁধাবাঁধিই ছিল না। ক্রমে যখন জাতিভেদ প্রবর্তিত হইল তখনও এখনকার দিনের মতো তাহাতে এত বাঁধাবাঁধি হয় নাই। মহাভারতের যুগে ও পুরাণাদির কালে জন্মগত জাতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং ব্রাহ্মণবংশজাত ব্রাহ্মণদের বহু প্রশংসা ও মাহাত্ম্য নানাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। তবু তখনও যে প্রাচীন রীতিনীতি ও আদর্শ সমাজের মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই তাহা দেখাইবার জন্যই মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল। এইরূপ কথা আরও বহু স্থলে এবং আরও বহু পুরাণে উল্লিখিত আছে, কিন্তু আর বেশি উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন এবং পাঠকের ধৈর্যের পক্ষেও তাহা কল্যাণকর হইবে না। যাঁহার এই বিষয়ে অনুরাগ আছে তিনি মূল গ্রন্থগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। যদিও অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদাদির সাহায্যে এই উদারতার ভাবটাকে আমরা অনেকটা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছি, তবু সম্পূর্ণরূপে তাহা চাপা দেওয়া অসম্ভব।

কেরল দেশে পরশুরাম যে ধীবরদের গলায় পৈতা দিয়া তাহাদের ব্রাহ্মণ করিয়াছেন, সে কথা সবাই জানে ; শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ আছে। ভবিষ্য-পুরাণ বলেন ব্যাস ধীবরীগর্ভজাত, পরাশর শ্বপচকন্যার সন্তান, শুকদেব শুকীর পুত্র, অনার্য ওলকার পুত্র কণাদ ইত্যাদি (ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মপর্ব, ৪২ অধ্যায়)। বসিষ্ঠের পত্নী অক্ষমালার পূর্বজাতিও ছিল হীন।

ব্রাহ্মণকে চিনিতে হইবে তাঁহার জ্ঞান ও তপস্যা দিয়া ; কুলপরিচয়ে জানিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই বৃথা দুঃখ দেওয়া ও পাওয়া মাত্র সার হয়। তাই কৃষ্ণযজুর্বেদ বলিলেন, "ব্রাহ্মণের আবার বাপ-মায়ের খোঁজ লওয়া কেন? যদি তাঁহার মধ্যে জানিবার মত শ্রুত থাকে তবে, সে-ই তাঁহার পিতা, সে-ই তাঁহার পিতামহ।"

কিং ব্রাহ্মণস্য পিতরং কিমু পৃচ্ছসি মাতরম্
শ্রুতং চেদস্মিন্ বেদ্যং স পিতা স পিতামহঃ ॥ (যজুর্বেদ, কাঠকসংহিতা, ৩০, ১)

মহাভারতে শান্তিপর্বের ১৮৮, ১৮৯তম অধ্যায়ে সেই প্রাচীন ভাবেরই প্রতিধ্বনি। এই শান্তিপর্বেই ভীষ্মের কথায় জানিতে পারি, একতা, সত্যতা, মর্যাদা, অহিংসা, সরলতা এবং কর্মে অনাসক্তি ব্রাহ্মণের যেমন বিত্ত এমন বিত্ত আর কিছুই নাই।

নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা সমতা সত্যতা চ
শীলং স্থিতির্দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চো পরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ ॥ (শান্তিপর্ব, ১৭৫,৩৭)

এই ভাবটি ক্রমেই ভারতে দুর্লভ হইয়া আসিল। তবে ভরসার কথা ক্বচিৎ এখনও মাঝে মাঝে তাহা দেখা দেয়। প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্বে একদিন কানপুরের নিকট বিঠুরে গঙ্গাতীরে একটি স্নানরত আচারনিষ্ঠ অর্চনার্থী ব্রাহ্মণের গায়ে একটি শূদ্রের জলের ছিটা আসিয়া পড়িতে ব্রাহ্মণ একেবারে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলেন। সেখানে স্নান করিতেছিলেন সাধকশ্রেষ্ঠ তুলসী সাহব হাথরসী। শূদ্র তো লজ্জায় ও সংকোচে কম্পমান। তুলসী সাহব এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই শূদ্রের উপর তোমার এমন ক্রোধ কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "শূদ্র ভগবানের চরণে জাত— নিকৃষ্ট, জঘন্য, তাই।" তখন তুলসী সাহব জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গায় আসিয়াছ কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "গঙ্গা ভগবানের পাদোদ্ভবা সর্বপাবনী বলিয়া।" তুলসী বলিলেন, "হায়, যেই চরণে উদ্ভূত জলময়ী গঙ্গা পবিত্রতার গুণে জগৎ-তারণ-সমর্থা, সেই চরণে জন্মিয়াই শূদ্র এমন দীন হীন পতিত যে, সে যাহাকে স্পর্শ করে সে-ই হইয়া যায় অপবিত্র!"

এই তুলসী সাহব অতি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার এই বাক্য প্রাচীন যুগের যজুর্বেদের কাঠকসংহিতার মন্ত্রচয়িতা উদার মহর্ষিদের বংশধরদেরই উপযুক্ত হইল।

ডাকঘর

১৯১৭ সালে 'বিচিত্রা' ভবনে 'ডাকঘর' নাটিকার প্রথম অভিনয় হয়। রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করেন শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে তাঁর 'ঘরোয়া' পুস্তকে লিখেচেন —

" 'ডাকঘর' অভিনয় হবে, স্টেজে দরমার বেড়ার উপর নন্দলাল খুব করে আলপনা আঁকলে। একখানা খড়ের চালাঘর বানানো হোলো। তক্তায় লাল রং, ঘরে কুলুঙ্গী, চৌকাঠের মাথায় লতাপাতা, ঠিক যেখানে যেমনটি দরকার যেন একটি পাড়াগেঁয়ে ঘর। সব তো হোলো। আমি দেখছি, নন্দলালই সব করলে। সেই নীলপর্দার চাঁদ 'ডাকঘরেও' এল। মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি বলি বেশ হয়েছে। নন্দলালের সাধ্যমতো তো স্টেজকে পাড়াগেঁয়ে ঘর বানালে। তারপর হোলো আমার ফিনিসিং টাচ।

আমি একটা পিতলের পাখির দাঁড়ও একপাশে ঝুলিয়ে দেওয়ালুম। নন্দলাল বললে —পাখি?

আমি বললুম, না, পাখি উড়ে গেছে শুধু দাঁড়টি থাক্।

দেখি দাঁড়টি গল্পের আইডিয়ার সঙ্গে মিলে গেল। সব শেষে বললুম এবারে এক কাজ করো তো নন্দলাল। যাও দোকান থেকে একটি খুব রংচঙে পট নিয়ে এসো তো দেখি। নন্দলাল পট নিয়ে এল। বললুম এটি উইংসের গায়ে আঠা দিয়ে পট্টি মেরে দাও।

যেমন ওটা দেওয়া, একেবারে ঘরের রূপ খুলে গেল। সত্যিকার পাড়াগেঁয়ে ঘর হোলো। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল যেন সাজানো গোছানো। এ সব ফিনিসিং টাচ আমার পুঁজিতে থাকত। এই রকম করে আমি নন্দলালদের শিখিয়েছি।

'ডাকঘরে' আমি হয়েছিলুম মোড়ল। ও-রকম মোড়ল আর কেউ সাজতে পারেনি। তখন মোড়ল সেজেছিলুম। সেই মোড়লি করেই চলেছি এখনো।"

উপর্যুপরি ১১ দিন এই নাটিকাটির অভিনয় হয়। রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সন্ন্যাসী, গগনেন্দ্রনাথ পিসেমশাই, অবনীন্দ্রনাথ মোড়ল, রথীন্দ্রনাথ রাজ-কবিরাজ, অসিত হালদার দইওয়ালা এবং অবনীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা সুরূপা ছিলেন সুধা। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু ছিল শ্রীমান্ আশামুকুল নামে ছোট ছেলের 'অমলের' ভূমিকায় অভিনয়। মঞ্চের উপর অমলের জীবনপ্রদীপ ধীরে ধীরে নিবে আসচে, বালক আশামুকুল এটি যে-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিল সুদীর্ঘ ২৫ বছর পরে তখনকার দর্শকরা সে-দৃশ্য স্মরণ করে পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

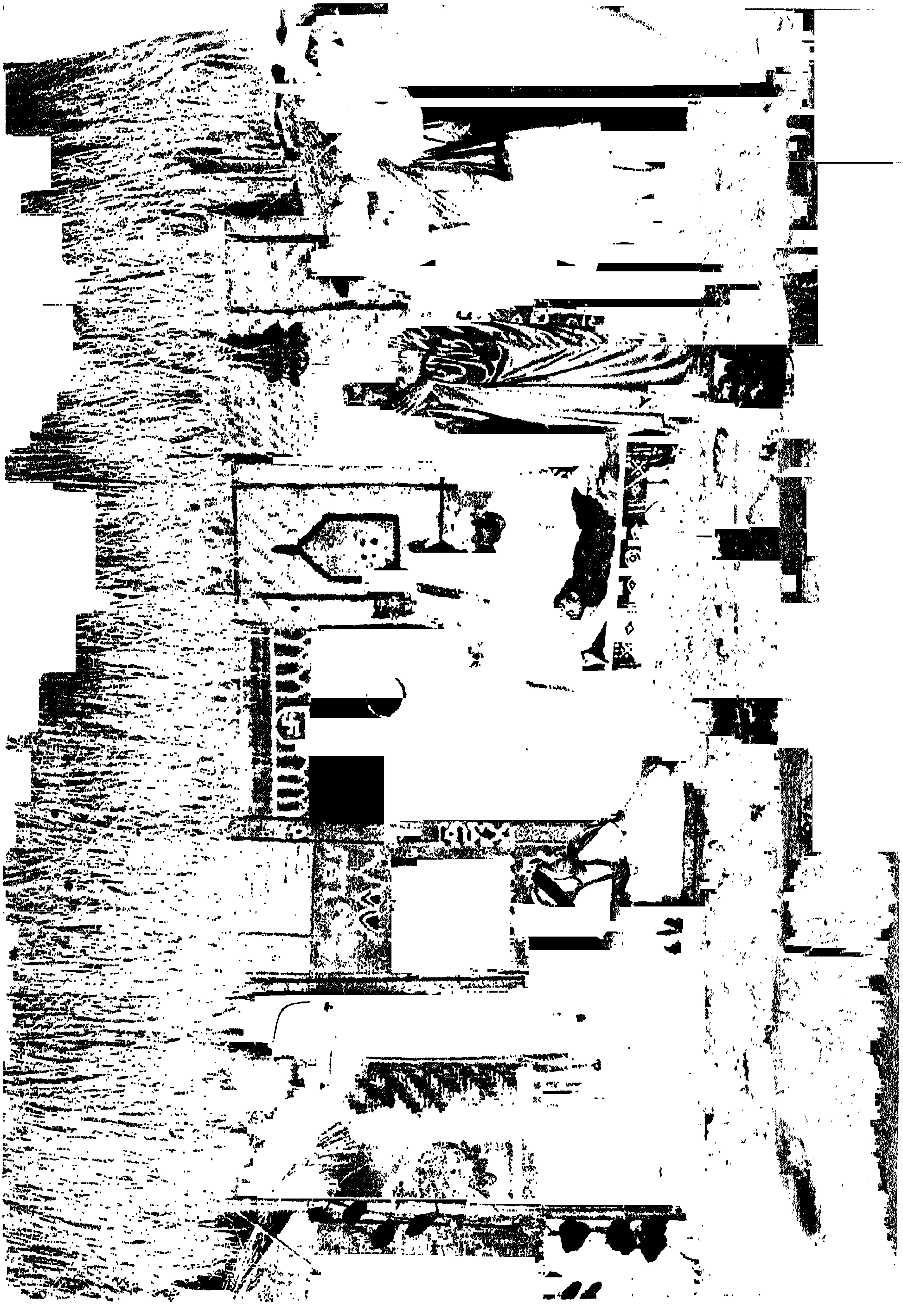

গত ৭ আগস্ট শ্রীমান আশামুকুল দাস সেই প্রথম ডাকঘর অভিনয়ের কথা স্মরণ করে একটি কবিতা লেখেন। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথকে লিখিত তাঁহার পত্র, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের পত্র এবং শ্রীমান আশামুকুলের কবিতা পত্রস্থ হল। সম্পাদক

ভাই রথী,

আশামুকুলের এই চিঠি ও কবিতা পাঠাচ্ছি। চিঠিটার মূল্য যে—ডাকঘরের প্রথম অমল প্রথম মোড়লকে লিখছে। এরই লোভে "বিশ্বভারতী পত্রিকায়" ছাপাতে দিলুম।

অবণদাদা

শ্রীচরণেষু,

মোড়ল ম'শায়, স্টেজের উপর অমল মরে গিয়েছিল। আর সবাই ছিলেন বেঁচে। কিন্তু এক এক করে সব উল্‌টেপাল্‌টে যাচ্ছে। পিসেমশায় আগেই গেছেন, সন্ন্যাসীও গেছেন, দীনদা'ও জোর ফুর্তিতে গানের সুর ধরে রাখছেন—গিয়েই আর-একবার জোর ডাকঘর শুরু হয়ে যাবে। ইতি

কানমলা-খাওয়া
'অমল'

সন্ন্যাসী, তুমি পেয়েছ রাজার চিঠি ?
তাই বুঝি তুমি গেছ চলে তাঁর কাছে—
বাহিরের পানে মেলে দিয়ে মোর দিঠি
একা বসে আমি—অমল আজিকে সাঁঝে।

পাঁচমুড়ো-তলা— শ্যামলী নদীর বাঁকে
গাছের তলায় ছায়াঘেরা সেই বাটে
মেয়েরা আর তো চলে না কলসী কাঁখে,
জল ভরে নিতে যায় না কো আর ঘাটে।

দইও'লা আর আসে নাকো দই নিয়ে—
যায় নাকো আর দই হেঁকে এই পথে ;
সন্ন্যাসী, তুমি গেছ কি ও পথ দিয়ে
—ওই ঘর্ঘর-করা চকমকে রাজরথে ?

সন্ন্যাসী, তুমি বলেছিলে, রোজ এসে
কত বিদেশের গল্প বলবে কত—
ভাল হয়ে গেলে দুইজনে দেশে দেশে
যাব ঘুরে ফিরে আপন ইচ্ছামতো।

পাহাড়ের গায়ে ঝরনার পথ ধরে
আলের ওপর আখের ক্ষেতের ধারে
ঘন বাঁশবন— তারি মাঝে পথ করে
পৌঁছাবো গিয়ে সেই ঝরনার পারে।

সেখানে তোমার ঝুলিঝোলা খালি করে
ঝরণার জলে খালি পায়ে জল খেলে
রঙবেরঙের নুড়ি দিয়ে থলি ভরে
কাঁধে করে ফিরে যাব বেলা পড়ে এলে।

সন্ন্যাসী, জানো? প্রহরী আসে না আর!
ডাকঘরে আর ঢং ঢং করে তাই
ঘণ্টা বাজে না; বলে নাকো কেউ আর,
'সময় হয়েছে— ঘণ্টা বাজাতে যাই।'

সেই যে বাউল রোজ যেত দোর দিয়ে,
আমার মনের কথাটি গাইত গানে—
'ভেঙে মোর চাবি কে যাবি আমায় নিয়ে',
আসে নাকো আর কেন যে কেবা তা জানে!

মুড়ি-মুড়কির ভোগের খবর নিয়ে
মোড়ল-মশায় আসেন না আর হেথা
গোল-ছাতা হাতে; আর এই পথ দিয়ে—
পাগড়িটা তাঁর দেখি নাকো যেথা সেথা।

পিসিমা কাঁদেন রোজ ঘরে দোর দিয়ে—
পিসে মশায়ও গেছেন রাজার কাছে।
সন্ন্যাসী, তুমি ফিরে এসো তাঁকে নিয়ে।
কাঠবিড়ালীটা কী জানি গেছে কি আছে!

সেই যে সুধা— শশী মালিনীর মেয়ে,
ফুলের খবর বলে যেত রোজ ভোরে,
খুব ঘন বনে উঁচু আগ্‌ডাল বেয়ে
ফুল পেড়ে এনে দিয়ে যেত সাজি ভরে—
আসে নাকো আর। সেই ছেলেদের দল
দেখি মাঝে মাঝে সারাদিন কাজ করে
কাঁধে গামছায় হয়তো বা কিছু ফল
বেঁধে নিয়ে ফেরে ছেলেপেলেদের তরে।

সন্ন্যাসী, আমি হয়েছি এখন ভালো,
পাহাড় ডিঙিয়ে দূরে চলে যেতে পারি,
ওই যে দূরের জঙ্গল ঘন কালো—
ওরও মাঝ দিয়ে পথ করে নিতে পারি।
ঘরে ঘরে চিঠি বিলি করবার ভার
পাব না কি তবু? তুমি তাঁকে বলে রেখো
'ডাকহরকরা' শুধু এই কাজটার
ভার নেব আমি। পারি কিনা তুমি দেখো।

সন্ন্যাসী, আজও এলো না কো কেন চিঠি?—
রাজা তো তোমার খুব বেশি কথা শোনে।
বাহিরের পানে মেলে দিয়ে মোর দিঠি
আর কতদিন রইব ঘরের কোণে?
সন্ন্যাসী, তুমি গিয়েছ রাজার কাছে
আমি একা চেয়ে রয়েছি সুদূরপানে।
'হরকরা' কাজ এখনো কি খালি আছে?
সে চিঠি পাব যে কবে তা কি কেউ জানে?

আশামুকুল দাস

বস্তুর চেয়ে বাস্তব

শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী

স্বপ্ন ও বাস্তবের লড়াই চলেছে অনাদি কাল থেকে। স্বপ্ন বলে বাস্তব সুন্দর নয়, আর বাস্তব বলে স্বপ্ন মিথ্যে। মানুষকে তাই বেছে নিতে হয়, সত্য ও সুন্দরের মধ্যে। এ দুইকে যারা এক করতে চায় আমরা তাদের বিজ্ঞ হেসে বিদায় করি কবি দার্শনিক ইত্যাদি ব'লে। কবি বলেন সুন্দরই সত্য, দার্শনিক বলেন সত্যই সুন্দর। সমালোচক তখন স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করেন, রোগ শোক দুঃখ মৃত্যু তবে কি? হেলেন সুন্দরী ছিলেন, সত্য ছিলেন কি? বিচারে কীট্‌স্ যায় বাতিল হয়ে। রবীন্দ্রনাথ তখন আসরে নাবেন, কবিকে ত্রিকালজ্ঞ ঋষি দিয়ে যান সস্নেহ আশ্বাস,—"সেই সত্য যা' রচিবে তুমি। ঘটে যা তা সব সত্য নহে।" সমালোচক আবার বলে ওঠেন, ও আর্ট আর এরিষ্টট্‌ল্; জীবনের জন্য ও কথা নয়।

জীবিতেরা ভীত হয়ে ওঠে। স্বপ্নসঞ্চারী কবির দিকে তাকাতে থাকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে। কবিকে আঘাত করে এই অবিশ্বাস। সে তখন হতে চায় বাস্তবের কবি। সংসারে সবাই যবে শত কার্যে রত, সেই সময় সারা বেলা শুধু বাঁশি বাজাবার জন্যে সে লজ্জিত হয়। খুঁজতে থাকে নতুন কোনো সত্য তার চোখে পড়ে কিনা যাতে জগতের উপকার হতে পারে। অগত্যা আপনার চতুর্দিকে যে সব মূঢ় ম্লান মূক মুখ তার নজরে পড়ে তাতে ভাষা দেবার জন্য তার সাধনা আরম্ভ হয়।

বাস্তব বা রিয়লিস্টিক সাহিত্যের এইখানেই শুরু। শরৎবাবুর নায়কদের মনে হয় মিথ্যে। ওদের সকলেরই এত টাকা যে প্রতিবেশিনীর হাতে আলমারির চাবি ছেড়ে দিতে পারে স্বচ্ছন্দ খরচের জন্য। বাস্তব সাহিত্যে থাকবে অভাব অনটন রোগ শোক মৃত্যু ময়লা জীর্ণ, সব— অর্থাৎ সব রোগ শোক ময়লা জীর্ণ-নোংরামি। লেখা হতে থাকে বস্তির গল্প, কবিতা, উপন্যাস। সবই তার রুগ্ন জীর্ণ ময়লা— নোংরা। এই নাকি আমাদের জগতের

সত্যিকারের রূপ। আর শুধু এই নয়, প্রীতি স্নেহ বন্ধুত্ব প্রেম এদেরও বাস্তব সত্তা যায় উড়ে। সব Ghost। ইবসেন ঋষি। ভাষ্যকার বানার্ড শ'।

ভীরু—ভীরু—সব ভীরুর দল। সত্যকে নগ্নরূপে দেখবার সাহস নেই, তাই তার মুখে পরিয়েছে মনোরম মুখোস। মৃত্যুর মুখে অমরতার মুখোস, কামনার মুখে প্রেমের মুখোস। বীরের দল হাঁকে, উতারো নেকাব। তারপর নিজেরাই দু'হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয় সেই মাধুর্যের আবরণটুকু। সৃষ্টির আলোর আবরণ যায় মুক্ত হয়ে, জেগে ওঠে শুধু অন্ধকার।

কালো—শুধু কালো। দেখে দেখে মানুষের চিত্ত বিকল হয়ে যায়। সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। স্বপ্ন যদি এমন মধুর ছিল, জাগরণের তবে কোন্ প্রয়োজন? কিন্তু একবার জেগে তো আর স্বপ্ন দেখা চলে না? তখন সে স্বপ্ন ও জাগরণের গবেষণায় করে আত্মনিয়োগ। জাগরণ কী? স্বপ্ন কী? কে জাগে? কে ঘুমোয়? জাগ্রতদের নিয়ে সে জেগে থাকে। তারপর হঠাৎ একদিন চীৎকার করে ওঠে, ওরে জাগ্রতস্মন্যের দল, তোরাও তো ঘুমিয়ে আছিস, তোরাও তো দেখছিস স্বপ্ন। ওই যে বিশ্বজোড়া অন্ধকার, ও তোদের স্বপ্নে দেখা জিনিস। ওরা এতকাল স্বর্গের স্বপ্ন দেখেছে, তোরা দেখছিস নরকের স্বপ্ন। রুশো দেখেছিলেন সত্যযুগের স্বপ্ন, স্বর্ণযুগের স্বপ্ন, উদার আদিমের স্বপ্ন; জোলা ও বল্‌জাক্ দেখেছেন নোংরা প্যারিসের নরকের স্বপ্ন। আর্কেডিয়া, ইউটোপিয়া বৃন্দাবন বাস্তব সাহিত্যে শুধু বিপরীত মূর্তি ধারণ করেছে। তাদের কাল্পনিকতার কোনো পরিবর্তন হয় নি। বাস্তব সাহিত্য কল্পনার জামাটা উল্‌টো করে পরে মাত্র, সেলাইগুলো বেরিয়ে থাকে, কিন্তু জামা পরে সেও। সত্য এখানেও নেই।

কোথায় তবে? বৈজ্ঞানিক বলেন, লেবরেটারিতে। প্রয়োজনবাদী বলেন, বেশির ভাগ মানুষের সমধিক কল্যাণে। তারপর কিছুকাল চলতে থাকে বিজ্ঞানের সাধনা ও প্রয়োজনের পূজা। কাব্যের মায়াপরীরা শূন্যে মিলিয়ে যায়। আকাশের রামধনু ধরা দেয় কাঁচের প্রীজ্‌মে। বস্তু, শক্তি—শাশ্বত, সনাতন। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মের রাজত্ব। তিরানব্বই ভূতের শাসন। তারপর আবার হঠাৎ কী ভৌতিক ব্যাপার আরম্ভ হয়। বিশ্বসংসার

যায় মিলিয়ে কোন্-এক ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাণুর তরঙ্গভঙ্গীতে। বস্তু ব্যক্তি স্থান গুণ সমস্তই এই অনুপরীদের মায়ারূপে দেখা দেয়।

ওদিকে বেশির ভাগ মানুষের সর্বাধিক কল্যাণে প্রয়োজনবাদীরও তৃপ্তি হয় না। ওয়ার্ডশ্‌ওয়ার্থের অসামের আধ-আধ বুলির মধ্যে সে খুঁজে পায় শান্তি। তারপর বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে আপনাকে ভেঙে ফেলে অসংখ্য অনুভূতির অনুতে। কিন্তু "আমি ঘট ভেঙে গেলে সকলই আকাশ"। আপনার অজান্‌তে বস্তু ও মনোবিজ্ঞান ব্রহ্মবাদীর হাত ধরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ব্রহ্মবাদ জীবনের পরিপোষক নয়। সৃষ্টির জন্যে ব্রহ্মকেও ঈশ্বর হতে হয়, নির্গুণকে সগুণ হতে হয়, অনাসক্তকে হতে হয় লীলাময়। এই লীলা অংশে আবার মানুষের দৃষ্টি পড়ে। জ্ঞানের আলো ফেলে দিয়ে আবার ব্রজের রাখালবালক হতে তার সাধ যায়। বৃদ্ধ বার্নার্ড শ' পরকালের পারে দাঁড়িয়ে স্বীকার করেন আদর্শবাদের প্রয়োজন। জেনেভা নাটকে তাঁর ব্যাট্‌লার (হিটলার) বলেন যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহায় ভাবে হাত মটকানোর চাইতে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের সম্মুখেও বিনা-প্রয়োজনে কাজ করে যাওয়া ভাল। জার্মান জাতি তাই মোটরকারে কেউ কখনও চড়বে না জেনেও প্রাণপণ যত্নে তাই তৈরি করে যাচ্ছে ; সর্বপ্রকারে নিষ্ফল জেনেও বম্বারডোনির (মুসোলিনী) ইতালিয়েরা মানুষের গৌরব রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, আর নিজের বেঁচে থাকবার অবলম্বনরূপেই খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিনী ধর্মপ্রচার করছেন। বেঁচে থাকবার জন্যেও কোনো মায়াপরীর নিতান্তই প্রয়োজন। প্রয়োজন স্বপ্নের।

ব্যক্তিত্বকে অনুভূতির অনুতে বিশ্লেষ করে অল্‌ডাস্ হাক্সলে লিখলেন Two or Three Graces, দু'তিনজনা গ্রেস্। একই ব্যক্তির দু'তিন রূপ। এই বিভিন্নরূপের মধ্যে এত পার্থক্য যে ইহাতে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আরোপ করা চলে। মনোবিজ্ঞান অবশ্য এই আমাদের শিখিয়েছে। আমি বস্তুটি অত নির্দিষ্ট কিছু নয়। এই আমি-অনুগুলিকে প্রয়োজনবাদের পথে ঢালাই করে নিলে কী হয় Brave New World-এ তারই হল পরীক্ষা। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মানুষ তৈরি হচ্ছে— জন্ম নয়— নাচগান আনন্দ, সকলের জন্য কাজ, অবিভক্ত সমাজপরিবার, এক কথায় নিখুঁত আদর্শ জীবন। সুখের অভাব মানুষ জানেও না। এরই মধ্যে আদিম অসভ্যকে টেনে আনা হল, তার কষ্টি-পাথরে স্বপ্নহীন সুখস্বর্গ মেকী হয়ে গেল।

ওদিকে কেবল স্বপ্নসঞ্চারীরও বিপদ কম নয়। কেল্ট জাতির প্রদোষ আলোতে (Celtic Twilight) সারাজীবন স্বপ্ন দেখে জীবনশেষে মহাকবি ইয়েট্‌স্ বাস্তবের সংঘাতে কেঁদে উঠলেন—"যৌবনের মিথ্যে-ভরা দিনগুলিতে মনের কুসুমরাশি আকাশে তুলে ধরেছিলাম। এবার সত্যের অগ্নিকিরণে তারা পুড়ে যাচ্ছে।" তবে আদিম জাতির দিন বহুকাল গত হয়েছে। তার প্রদোষ-আলোকের স্বপ্ন বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানমন্দিরে বসে দেখতে গেলে ফলটা এর চাইতে ভাল না হওয়াই স্বাভাবিক। এ-যুগে চাই এ-যুগের উপযোগী স্বপ্ন। এ স্বপ্ন তার জ্ঞানবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করে নয়— তাকে মেনে নিয়ে।

এদিকে বিজ্ঞান বাস্তবকে স্বপ্নের পর্যায়ে নিয়ে ফেলেছে। কবির সত্যদর্শন সপ্রমাণ করেছে সে।

We are such stuff
As dreams are made on, and our little life
Is rounded with a sleep.

ব্যক্তিত্ব স্বপ্ন বটে, কিন্তু এই স্বপ্নকে এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে যে সে যেন বিভীষিকাময় হয়ে না ওঠে। বাস্তবতার এই পরীক্ষা। বস্তুবাদ এই পরীক্ষায় হার মেনেছে। জড়বাদের পরিসমাপ্তি নৈরাশ্যে। তথাকথিত বাস্তব সাহিত্যও জীবনকে নিরাশার গভীরে ঠেলে দিয়েছে। স্বর্গের পরিবর্তে পৃথিবীতে নরক এনেছে—নরক করে তুলেছে বরং একে। কিন্তু স্বপ্নবাদীর—রোমান্টিকের—এইখানেই হল জয়। লীলাবাদে সে তার দার্শনিক প্রশ্নগুলির সমাধান করে নিয়ে বেঁচে থাকার প্রশ্নটি নিয়ে পড়ল। "হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোথা, অন্য কোন্‌খানে" বলে একদিন যে বিদ্রোহের সুর সে তুলেছিল সেই বিদ্রোহ আনত করে এখানেই খুঁজে পেল তার কামনার রাজ্য। 'স্বর্গ হতে বিদায়'—নিতে গিয়ে আবিষ্কার করল সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত অশ্রুজলে চিরশ্যাম করা ধরণীর স্বর্গখণ্ডগুলি। কিন্তু অল্‌ডাস্ হাক্সলের আদিম অসভ্য রোমান্সের নামে জীবনকে গ্রহণ করলেও রোমান্স এখানে খুব কমই মেলে বলে সাধারণের ধারণা। জীবনকে স্বপ্ন করে তুলতে হলে চাই অর্থ। বার্ণাড শ' বললেন, গরিবেরাই দারিদ্র্যের গুণগান করুক। আসলে দারিদ্র্যদোষো

গুণরাশি—অর্থাৎ স্বপ্নরাশি-নাশীঃ। তখন রবীন্দ্রনাথ আবার আসরে নাবলেন। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণপরিবার সুখের আশায় তিন পুরুষ ধরে করল অর্থের সাধনা। অর্থহীন জীবন তাদের কাছে নিরর্থক বোধ হল। তারপর পাতালের সোনার ভাণ্ডারে বসে মৃত্যুঞ্জয় দেখতে পেল, সন্ধ্যায় যে-সোনা প্রতিদিন দীন-দরিদ্রের কুটীরপার্শ্বে অজস্র ঝরে পড়ে সে-সোনার কাছে তাল তাল স্বর্ণরাশি কিছু নয়। দীনতম হয়েও মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার তুলনা নেই দেখা গেল। জীবনের গুপ্তধন আবিস্কার হল খানিকটা। অন্তত খনির সন্ধান মিলল এইখানে। এবার উপযুক্ত খননকারীর হাতে অপর্যাপ্ত মূল্যবান ধাতু সংগৃহীত হতে পারবে আশা রইল। এ-পথে চললে জীবনস্বপ্ন বিভীষিকাময় না হয়ে আনন্দে ভরে উঠবে। আর এই নিশ্চয়তাই হল এ-পথের বাস্তবতার প্রমাণ। তথাকথিত বাস্তব সাহিত্য কিন্তু এই আদর্শ থেকে নিয়ে যাচ্ছিল আমাদের বহুদূরে। জীবনকে তা বিভীষিকাময়ই করে তুলেছিল। এই আদর্শবাদ স্বপ্ন— তাই বস্তুর চেয়েও বাস্তব। অথবা বলা যেতে পারে যে উচ্চতর বাস্তবতা স্বপ্নধর্মী।

আধুনিক পাঠ্য

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বর্তমান জগতে যে বিষয়গুলি তাদের অপরিহার্য আবশ্যকতার ফলে পাঠক-সাধারণের মধ্যে বহুল প্রসার লাভ করেছে, সেগুলি হ'ল অর্থনীতি ও রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজনীতি ও বিজ্ঞান। আমরা যে যুগে বাস করছি, সেটি সর্ব্বতো-ভাবে বৈজ্ঞানিক যুগ। সুতরাং পাঠ্য বিষয় থেকে বিজ্ঞানচর্চাকে কোনো মতেই নিরাকৃত করা যায় না। বিজ্ঞান কথাটির প্রসারিত অর্থ—সম্যক্ জ্ঞান। এই জ্ঞানের ঐশ্বর্য যেখানে অসীম, বিভাগ যেখানে অসংখ্য, সেখানে আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে শুধু বই পড়েই কি আমরা সর্ব বিষয়ে সুপণ্ডিত হয়ে উঠব? কেবল বইয়ের সাহায্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করা যেতে পারে, কিন্তু সে পাণ্ডিত্যের মূল্য কী— যার প্রয়োগ অস্পষ্ট, যা আত্মরতির নামান্তর, যা সমাজ ও জীবনগণ্ডীর বাইরে? কিন্তু তবু বই না পড়লে চলে না, মনকে তাজা রেখে এবং জীবনের দাবিকে স্বীকার করে বই পড়তেই হবে এবং নানা বিষয়ের বই, যাতে আমাদের চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ ও সংস্কৃত হয়। জ্ঞানের সীমা বেড়েই চলেছে, অতএব প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে আমাদের কিছু না কিছু পরিচয় থাকা দরকার। "We range wider, last longer and escape more and more from intensity towards understanding." এইখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার। যে কোনো শিক্ষনীয় বস্তুই হোক, আমাদের কিছু পরিমাণে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও মনোভাবের প্রয়োজন। আমাদের একটা অপবাদ আছে যে আমরা ভাববিলাসী, অবাস্তব কল্পনারাজ্যে সঞ্চরণে উন্মুখ। এর মধ্যে সত্যের আভাস আছে, কারণ দেশের অগ্রণী মনীষীদের মধ্যেও কিছুটা অসংযত চিন্তার চিহ্ন রয়েছে। অথচ মানুষকে উন্নত হতে হলে দূর করতে হবে অসংলগ্ন, মূল্যহীন আবর্জনা। এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মনোভাব দিয়ে চিত্তকে সরল, শুদ্ধ ও কঠিন করতে হবে।

অবশ্য একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে। মন অতিমাত্রায় নিঃসম্পৃক্ত হলে অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কমে যেতে বাধ্য। যেমন, আমরা নিরুদ্দেশ্য হয়ে পড়ার জন্যেই পড়ে থাকি। ছাত্রাবস্থা থেকে

বিশ্ববিদ্যালয়ের দৌলতে আমরা অনেক বিখ্যাত-অখ্যাত গ্রন্থকারের বই মুখস্থ করে এসেছি। অনেক থিওরি শিখেছি কিন্তু ভুলেছি বুদ্ধিমান্ বিচারে প্রয়োগেই তার সার্থকতা। আমরা টাউসিগ্ পড়ি, মার্শাল মুখস্থ করি, অন্যান্য মতবাদ সযত্নে উদ্ধৃত করি, কিন্তু আমাদের দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক অথবা ঐতিহাসিক গড়নের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী, এ কথা ভাববার অবসর পাইনি। পাঠ্যপুস্তক আর পাঠ্য এক জিনিস হলেও দুটোর মধ্যে মন ও দৃষ্টিভঙ্গীর অনেকখানি পার্থক্য। আমাদের উচিত বই পড়বার সময়ে এই ঐক্য ও বিরোধের সূত্রগুলি মনে রাখা। তবেই পড়া সার্থক। কেবল নতুন নতুন একরাশ বই পড়ে আমাদের যথার্থ আত্মিক উন্নতি হবে না, যদি না আমাদের মন সজাগ থাকে। এটুকু মনে রাখতে হবে—যে সব বিদেশী মনীষীর লেখা ও চিন্তার সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়তই পরিচিত হচ্ছি, তাঁদের দান কতখানি, তার কতটুকু আমরা আত্মসাৎ করতে পারি, কতটা আমাদের আত্মোপলব্ধির সহায় হতে পারে,—আর কতটাই বা আমাদের নিজস্ব ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রযুজ্য এবং উপকারী।

একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। দার্শনিক বিচারে হয়তো কোনো মতবাদ খাঁটি বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। তর্কের ক্ষেত্রে তার নির্ভুল প্রমাণ অনেক উদ্ধৃত করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশিষ্ট শিক্ষা- ও দীক্ষা-সম্পন্ন অথচ অশিক্ষিত অদীক্ষিত দেশে তার স্থান, প্রয়োগ এবং সার্থকতা কোথায় ও কিসে সেটাও অনুধাবনের বস্তু। নইলে আমাদের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলো জড়পিণ্ডের মতো অসংস্কৃত অবস্থায় পড়ে রইল আর আমরা বিদেশী কয়েকটি মন্ত্রের দাসত্ব করে চললুম, এর চেয়ে অযৌক্তিক কাজ আর কিছু নেই। ধনিক ও শ্রমিক তন্ত্রের মধ্যে যে বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ, তার সঙ্গে সকল দেশের রাষ্ট্রচেতনার ঘনিষ্ঠ সংযোগ। এবং আমাদের বাঁচতে হলে কী ভাবে সেই শ্রেণীসাম্যের সূত্রে সংঘবদ্ধ হতে হবে, সেটা শুধু বই পড়ার চেয়ে ও দরকারী। অবশ্য, এ কথা বলা বাহুল্য যে না পড়লে আমরা কিছুই জানতে পারব না যে দেশ-বিদেশে সযত্নরচিত, আরামপ্রদ, সুবিধাজনক জীবনযাপন-প্রক্রিয়ায় কী রকম ভাঙন ধরেছে।

আমার বক্তব্য এই যে যিনি জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রকৃত ছাত্র তিনি হবেন এক কথায় আন্তরিক।

সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায় যে পুঁথিবাদ পুঁজিবাদের মতই ভুয়ো, অন্তঃসারশূন্য, নিরর্থক— যদি না সে মানুষকে নতুন চিন্তার খোরাক সরবরাহ করে, নতুন কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। টি এস্ এলিয়ট্-এর ঐতিহ্যবাদ তাঁর দেশবাসীরই কাছে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য। বেলক্-চেষ্ট্যর্টন্-এর মধ্যযুগ-প্রীতিও নঙর্থক ; যেহেতু য়ুরোপে বর্তমান-নামক একটা যুগ আছে এবং সে যুগের রীতি-নীতিতে অনাস্থাবান্ হয়েই এঁরা মরিস্-এর Earthly Paradise-এর মতো একটা অতীত আদর্শের অনুসন্ধান করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে মৌর্য-কুষাণ-গুপ্তযুগের কার্যকরী অনুশীলন নিয়ে জীবন কাটানো মানে, জীবনের আলোর পথ বন্ধ করে দেওয়া। অথবা মধ্যযুগে পাঠান সাম্রাজ্যে কিংবা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিজয়নগর সাম্রাজ্যে আধুনিক আদর্শ অনুসন্ধান করতে গেলে একটা বিশ্রী সামন্তপদ্ধতির অন্ধকার-কঠিন দেয়ালে মাথা ঠুকে মরতে হবে। ভারতীয় ঐতিহাসিকরা যাই বলুন না কেন, ভারতের প্রকৃত অতীত কী ও কেমন— সেটা অনেকখানিই বিশুদ্ধ আন্দাজ। তা নিয়ে গবেষণা করা চলে, পণ্ডিতমূর্খ হওয়া সাজে, কিন্তু অতীতের ভূতকে স্কন্ধ থেকে নামানো যায় না। আর ভারতের বর্তমানই বা কী এবং ভবিষ্যৎই বা কোথায়, তারও কোনো হদিস মেলে না।

যেখানে তুলনামূলক বিচারের অবকাশ, সেখানেই সত্যিকারের জ্ঞান-চর্চা, সমালোচনা। এই সূত্রে একটা বড় দৈন্যের কথা স্বতঃই মনে উদয় হয়। আমাদের দেশে প্রবন্ধ, সমালোচনা খুব কম লোকেই পড়ে। সমালোচনার ক্ষেত্র আমাদের সাহিত্যে এখনো অনেকখানি অকর্ষিত, যদিও এখানেই প্রতিভার পরিচয়, জাতীয় সংস্কৃতি-সাধনের প্রচুর অবসর। ক্ষমতাবান্ লেখক বাংলা সাহিত্যে নেই— একথা মেনে নিতে মন সায় দেয় না। হয়তো কোনো পণ্যজাতীয় গূঢ় অর্থনৈতিক কারণ আছে, তবে এই বিভাগটিতে পূর্ণ মনঃ-সংযোগ আজও হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ও বীরবল মিষ্ট-শাণিত ভাষায় আমাদের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন বটে, কিন্তু কঠোর ও কঠিন সমালোচকের প্রয়োজন আজও সবিশেষ। এই প্রসঙ্গে বিদেশী সমালোচক প্রবন্ধলেখকদের কথা মনে পড়ে যাঁদের লেখনীর তীব্র অতর্কিত আক্রমণে দেশবাসীর চোখ ফুটেছে, অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণপ্রবৃত্তি অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে।

বিজ্ঞান সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সকল তত্ত্বের কথাই আমরা চিন্তা করে থাকি, কিন্তু ধর্ম আমাদের কাছে বহিরঙ্গ-স্বরূপ দাঁড়িয়েছে। অথচ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, এর প্রয়োজন অবিসংবাদিত। ধর্ম অর্থে আমরা কোনো সংকীর্ণ মনোবৃত্তিকে ইঙ্গিত করছি না। কারণ, সে স্থলে ধর্ম মানুষকে উন্নত না ক'রে সংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের নাগপাশে বাঁধে। রাষ্ট্রজীবনে ধর্মের স্থান না থাকাই ভালো— নইলে দেশের ইতিহাস ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে রুষের শোচনীয় আভ্যন্তরীণ অবস্থার মতোই হয়ে পড়বে। আর সাম্প্রদায়িক মতানৈক্য যে অকারণে জাতীয় শক্তিস্ফুরণের প্রধান অন্তরায়, সপ্তদশ শতাব্দীর য়ুরোপের ইতিহাস তারই জাজ্বল্য প্রমাণ। কিন্তু তত্ত্ব ও পঠিতব্য হিসাবে ধর্মতত্ত্বের মূল্য আছে। এতদিন ধরে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে এত মনীষী যে বিষয়কে বোঝবার ও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তার নিশ্চয়ই একটা মূল্য ও চরিত্র আছে যা নিতান্তই সাময়িক ও ব্যবহারিক নয়। যা মানুষের সত্তাকে ধারণ করে আছে, সমগ্র মানবত্বকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে, তার প্রতি জ্ঞানগত কৌতূহলও থাকা উচিত। উদার ধর্ম মানুষের চিন্তা ও ব্যক্তিত্বকে কতখানি উদ্দীপিত করে এবং জাতীয় সাহিত্যে ও সংস্কৃতিকে প্রাণবান্ করে তোলে, বর্তমান যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রাষ্ট্রচেতনার পক্ষেও সংস্কারমুক্ত ধর্মের ঐক্যবোধে সকল রকমেই কামনার বস্তু।

উপসংহারে একটি কথা বলে শেষ করি। পাঠ্যনির্বাচনে বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় জ্ঞানেরই উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল সাহিত্য ছাড়া। জ্ঞানের দুটি রূপ আছে— একটি হ'ল বুদ্ধিগত, অপরটি রসবস্তু-সম্পর্কিত। এই শাশ্বত রসের সন্ধান কাব্যে ও সাহিত্যে— যা আমাদের জীবনকে আনন্দময়, সুসংস্কৃত করে তোলে। মানুষের ভাবজীবনে কাব্যের স্থাননির্ণয় নিয়ে অনেক পণ্ডিতী তর্ক হয়ে গিয়েছে, তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। শুধু একটা কথা এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কবিতা কেবল একটা শৌখিন উপকরণ নয়; জাতীয় তথা ব্যক্তিগত জীবনেও কবিতার সার্থকতা ও উপকারিতা স্বীকৃত হয়েছে সব চেয়ে প্রগতিপরায়ণ ও বৈজ্ঞানিক দেশে। কাব্যচর্চার কথা উঠলেই আমরা ভয় পাই বুঝি বা ভাবরাজ্যের সঙ্গে বুদ্ধিরাজ্যের একটা ভয়াবহ বিরোধ সংঘটিত হ'ল। কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা উপভোগের সঙ্গে পরিমার্জিত অনুভূতির কি সত্যি-

কারের অহিনকুল সম্পর্ক বিদ্যমান? আমার ধারণা, বিশুদ্ধ আবেগ কেবল একটি মস্তিষ্কাশ্রয়ী প্রক্রিয়া নয় আর আমাদের মননক্রিয়ায় বুদ্ধিবিচারের প্রামাণ্য থাকলেও সৌন্দর্য-উপভোগের অবসর আছে।

আর-একটি কথা— সাহিত্যের অঙ্গ নানাবিধ। বিশদ আলোচনায় না প্রবেশ করে এটুকু বলা চলে যে কেবল উপন্যাস— যা বাংলা দেশের লাইব্রেরি-গুলোকে মরিয়ে-বাঁচিয়ে রেখেছে— সাহিত্যের শোভন বিকাশ নয়। অবশ্য উৎকৃষ্ট উপন্যাসে মানুষ অনেক চিন্তার খোরাক পায়, একথা বলা বাহুল্য। দেশের চেতনাকে সজোরে নাড়া দিয়েছে এমন কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের নাম প্রত্যেক সাহিত্যসেবীই জানেন। উপন্যাসের রচনাপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তর বাদবিতণ্ডা হয়ে গিয়েছে, কি দেশে কি বিদেশে। বিশুদ্ধ শিল্প বলে যে বস্তুটি নিয়ে তর্কজালের বিস্তার হয়ে থাকে, সেটি বিশুদ্ধ কল্পনা অথবা অস্তিত্ববান্ পদার্থ তা নিয়ে আলোচনার অন্ত পাওয়া ভার। তবে যুগধর্মের ফলে উপন্যাসের সংজ্ঞা আধুনিক কালে যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে, এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। উপন্যাসের ক্ষেত্র আজকাল অবাধ, সুপরিসর। জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রকে, চিন্তার অখণ্ড পরিধিকে সে স্পর্শ করতে ভয় পায় না; আবার ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্রতম জটিল সমস্যার সমাধানেও সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উলফ্-এর একটি চমৎকার উক্তি আছে—

"Nothing is more fascinating than to be shown the truth which lies behind those immense facades of fiction—if life is indeed true and if fiction is indeed fictitious......"

প্রবন্ধ সাহিত্যের একটি মুখ্য অংশ। জ্ঞানরাজ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করা যায়, কিন্তু উপলব্ধ জ্ঞানের পরিচয় দিতে গেলে যে সংযম, সাবলীল ভঙ্গী এবং সরস ভাষার প্রয়োজন, তার নমুনা খুব অল্পই মেলে। বেশির ভাগ প্রবন্ধই হয়ে ওঠে নীরস ফিরিস্তি, পাণ্ডিত্যে ও পাদটীকায় কণ্টকিত। বিদেশী সমালোচনা-প্রবন্ধের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে— নানা চর্চায় নানা ভঙ্গিমায় প্রবন্ধ সেখানে উচ্চাঙ্গের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। একটি ভালো প্রবন্ধ লেখা একটি ভালো গল্প কিংবা একটি সার্থক কবিতা রচনার চেয়ে কম মূল্যবান্ প্রচেষ্টা নয়।

তালিকা দীর্ঘ হয়ে গেল। পরিশেষে বক্তব্য এই যে আধুনিক কালে

আমাদের পাঠ্য হবে উদার মনোবৃত্তির পরিচয়। দেশ-কাল-পাত্র অথবা ব্যক্তিগত ইচ্ছার মধ্যে তা আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। সকল বিষয়ের আংশিক অনুশীলন, এটা সব যুগেই বৈদগ্ধ্যের নিদর্শন। জ্ঞানার্জনের প্রথম ধাপ সাধনার; তার পরে প্রশ্ন আসে নির্বাচনের, স্বেচ্ছা-অনুকরণের। মননশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই পথে অগ্রসর হয়েছেন। যৌবনের স্বপ্নমগ্ন কবিও কেমন করে তত্ত্বসাধনা করেছেন তার পরিচয় রয়েছে "ছিন্নপত্রে"।

পত্রাবলী

সম্ভবত কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মনকে লিখিত —

বোলপুর

ওঁ

প্রিয়বরেষু

আজ এইমাত্র তোমার চিঠি পাইলাম ও পড়িয়া সুখী হইলাম। তোমার প্রতি বিশ্বাস দূর করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন—সেই জন্য ত্রিপুরারাজ্যের মঙ্গলসাধনের জন্য আমি বারম্বার তোমার দিকে তাকাই। এই রাজ্যের সঙ্গে আমার যেন ধর্ম্মের সম্বন্ধ বাধিয়া গেছে— আমি যতই ইচ্ছা করি ইহার সম্বন্ধে আমি মনকে উদাসীন করিতে পারি না। এক এক সময় অভিমান করিয়া তোমাদের সংস্রব হইতে একেবারে দূরে সরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে—কারণ রাজামাত্রেরই চারিদিকের আবহাওয়া এমনতর, এত চক্রান্ত ও চক্রীদের দ্বারা রাজাকে সর্ব্বদা বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয় যে তাহার মধ্যে দুর্দ্দৈববশত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলে মনের মধ্যে বারম্বার গ্লানি জন্মিতে থাকে। কিন্তু বিধাতা কেন আমাকে এখানে টানিয়াছেন জানি না— মহারাজের সঙ্গে তিনি আমার একটি মঙ্গলসম্বন্ধ বাঁধিয়া দিয়াছেন। এখন আর আমার দ্বারা তো মহারাজের বিশেষ কোনো উপকারের সম্ভাবনা দেখি না— আমার সাধ্যও নাই, সময়ও নাই, সুযোগও নাই— তোমাদের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই নিজের কোনো দুর্ব্বলতাবশত তোমাদের রাজ্যের হিতসাধনে নিজেকে অক্ষম করিয়ো না। তোমার উপর যে মহৎ দায়িত্ব আছে তাহা ঠিকমত সাধন করিয়া যাইতে পারিলে তুমি জীবন সার্থক করিবে। সার্থকতার এত বড় ক্ষেত্র ও অবসর সকলের জীবনে ঘটে না— ঈশ্বর তোমাকে যথেষ্ট বুদ্ধি ও ক্ষমতা দিয়াছেন

এবং তোমার মনে একটা উচ্চ আদর্শও আছে।···অতএব তোমাদের রাজ্যের মঙ্গলব্রত তোমাকে গ্রহণ করিতেই হইবে— তাহা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য কিন্তু যদি নিজের লাভ ক্ষতি ও আরামের দিকে লেশমাত্র না তাকাইয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে পার তবে কিছুই অসাধ্য নহে।···তোমার ছেলেকে আমি বিলাসের নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া পুরুষোচিত গুণে ভূষিত করিতে চাই যাহাতে বড় হইয়া সে নিজের অভ্যাস ও সংস্কারে পদে পদে জড়িত হইয়া কর্ত্তব্যের পথে নিজেকে অচল করিয়া না ফেলে। আশা করি সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তোমাদের রাজ্যের পক্ষে একটি লাভস্বরূপে গণ্য হইবে ইতি ৬ই চৈত্র।···?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে লিখিত —

ওঁ

জোড়াসাঁকো

বহুল সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

অনেকদিন পরে মহারাজের প্রণয়লিপি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আগামী কল্য আমার কন্যাকে মজঃফরপুরে তাহার পতিগৃহে পৌঁছাইয়া দিতে যাত্রা করিব— সেজন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি।

মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি শাস্ত্রে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পরিচ্ছেদ আছে তাহাতে হিন্দুরাজার কর্ত্তব্যের আদর্শ দেওয়া আছে। ঐশ্বর্য্য ও সিংহাসন অধিকার যে রাজার চরম কর্ত্তব্য নহে তাহা সংহিতা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়— আমাদের রাজার রাজত্ব কর্ত্তব্যের অধিকার, ঐশ্বর্য্যের অধিকার নহে—প্রাচীন বয়সে পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনের প্রথার দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। জীবনের এক এক ভাগে রাজার কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে— রাজত্বভার কেবল তাহার প্রকাশ মাত্র। য়ুরোপে রাজত্বই রাজার সমস্ত। প্রাচীন ভারতে ভোগ এবং ক্ষমতার হিসাবে না দেখিয়া রাজত্বকে সামাজিক

ও ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য হিসাবে দেখা হইত। নিজের ঐশ্বর্য্যকে নহে, পরন্তু সমাজবিহিত ধর্ম্মকে সকল প্রকার আক্রমণ ও ব্যভিচার হইতে রক্ষা করিবার জন্যই রাজা দুর্ভর রাজদণ্ডভার গ্রহণ করিতেন। সম্প্রতি বিদেশী সম্রাট ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছেন বলিয়াই স্বদেশী সমাজের আদর্শ উন্নত ও সবল করিয়া রাখা দেশীয় রাজন্যবর্গের পক্ষে দ্বিগুণতর কর্ত্তব্য হইয়াছে। এখন হিন্দুসমাজ বাহিরের আক্রমণের দ্বারা জড়ভাবে তাড়িত ও চালিত হইতেছে। কোন্ ধ্বংসের পথে যাইতেছে তাহার স্থিরতা নাই। রাজারা যদি জাগ্রত থাকেন ও দেশের জ্ঞানী মনীষীবর্গকে জাগ্রত করিয়া রাখেন তবেই সচেতন ভাবে হিন্দুসমাজ উন্নতির পথে চলিতে পারে। রাজারাই দেশের বুধমণ্ডলীকে রাজসভায় আকর্ষণ করিয়া লইয়া মনুষ্যত্বের হিতসাধনকল্পে সকল প্রকার ধর্ম্মালোচনাকে সজীব করিয়া রাখিবেন— এবং হিতকর প্রথা সযত্নে প্রচলিত করিয়া স্বরাজ্যে এবং চতুর্দ্দিকে সামাজিক উচ্চ আদর্শ প্রবর্ত্তন করিবেন। মহীশূরে কতকটা এরূপভাবে কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এবং পরলোকগত বম্বাইবাসী মহাত্মা রাণাড়ের প্রবন্ধাদি পাঠে জানা যায় যে মারাঠি পেশোয়াগণ সমাজের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। শ্রাবণ মাসের আগামী সংখ্যক বঙ্গদর্শনে "হিন্দুত্ব" প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি সমাজই হিন্দুর হিন্দুত্ব-এবং রাজা ব্রাহ্মণ বণিক্ শূদ্র সেই সমাজকেই নানাদিক্ হইতে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য। এই কারণেই প্রথম বয়সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কঠোর শিক্ষায় স্ব স্ব কর্ত্তব্যের আদর্শ গ্রহণ ও পালন করিবার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া প্রস্তুত হইতে হইত। আমাদের স্মৃতিসকল হইতে সারোদ্ধার করিয়া তাহার সাময়িক অংশ বর্জ্জন ও নিত্যকালীন্ অংশ গ্রহণ করিয়া "হিন্দুর রাজধর্ম্ম" সম্বন্ধে মহারাজ যদি কিছু আলোচনা করেন ত সে অত্যন্ত উপাদেয় হইবে। আশা করি মহারাজের কুশল। শ খানেক আম ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছিলাম মহারাজের ভোগে আসিয়াছে কি?

চিরানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন —

অনেকদিন পরে মহারাজের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্ম্মের মূল্য থাকে না— আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব। এবারে জগদীশবাবুর পত্র পড়িয়া এই বিষয়ে আমি মনে মনে বল লাভ করিয়াছি— জগদীশবাবুর প্রতিভায় পাণ্ডিত্য এবং সহৃদয়তার আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে বলিয়া এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত আমার কাছে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনি লিখিয়াছেন :—

'তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর, সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। এতদিন পরে যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমরা আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বুঝিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই অভিপ্রেত হইতে পারে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়। আর, তুমি যে সব দুরূহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ তাহা যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হও। আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এ সব দেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন জাতি অনার্য্যকে আর্য্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পুণ্য এরূপ প্রসারিত হইয়াছে। তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যাসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ তোমরা কেবল নকল করিতে পার ইত্যাদি কথা বিদেশী কেন, স্বদেশীয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে

আমার অনেক অযথা প্রশংসা করিয়াছ। যদি কিছু প্রশংসার থাকে তবে এই যে আমি এই মন্ত্রপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি যে, অন্যে যাহা করিয়াছে তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমি যেন সেই Eternal life, যাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উৎসাহ নির্ম্মূল হইয়াছে— সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।"

জগদীশবাবুর এই পত্র আমার পক্ষে পারিতোষিক। আমি যাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। হিন্দুর যথার্থ গৌরব কি, এবং হিন্দুর উন্নতি সাধনের প্রকৃত পথ কোন্ দিকে বঙ্গদর্শনে তাহাই সম্যক্ আলোচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। হিন্দুত্ব কি তাহাই আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাইতেছি যে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় যাহাকে ন্যাশানাল মহত্ত্ব বলে তাহাই মহত্ত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। এই আদর্শকে যদি জড়ত্ববশত আমরা নষ্ট হইতে দিই তবে য়ুরোপীয় মতে নেশন্‌ও হইব না অথচ আত্মপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল হইব।

জগদীশবাবুর জন্য কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত করিলে আমাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি— আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনাদোষে ঋণজালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশবাবুর জন্য আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী তাঁহার সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুরবস্থায় পড়িয়া আমার সর্ব্বপ্রধান আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্য্যের জন্য পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়, লোকহিতৈষা মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক— এজন্য আমি আগরতলায় যাইতে প্রস্তুত। ·· আমি মহারাজের নির্জ্জন খাস্ দরবারের মধ্যে

প্রবেশ করিবার প্রত্যাশী— আমি মহারাজের প্রতি নিতান্তই উপদ্রব করিব, মন্ত্রীবর্গ দ্বারা প্রতিহত হইব না। মহারাজের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে, কিন্তু আমি তাহা শিরোধার্য্য করিব। মহারাজের নিকট পূর্ব্ব হইতেই আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আছে বলিয়াই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম। যদি ধৃষ্টতা হইয়া থাকে তবে মার্জ্জনা করিবেন। এবং আমাকে ব্যক্তিগত হিসাবে মার্জ্জনা করিয়া আমার একান্ত আন্তরিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।

আজ আমার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী রেণুকার বিবাহ। পাত্রটি মনের মত হাওয়ায় দুই তিন দিনের মধ্যেই বিবাহ স্থির করিয়াছি। ঠিক দিনেই মহিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।…

আশা করি মহারাজের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০৮

চিরানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুঃ ডাকযোগে একটি ইংরাজী কাগজ পাঠাইতেছি তাহাতে প্যারিসের কয়েকজন সুবিখ্যাত শিল্পীর সোনার কাজের নকসা দেখিতে পাইবেন।

ত্রিপুরার রাজপ্রতিনিধি শান্তিকেতনে আসিয়া গুরুদেবকে ভারতভাস্কর উপাধি প্রদান করার পর ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য-বাহাদুরকে লিখিত—

ত্রিপুরার রাজবংশ থেকে একদা আমি যে অপ্রত্যাশিত সম্মান পেয়েছিলেম, আজ তা' বিশেষ করে স্মরণ করবার ও স্মরণীয় করবার দিন উপস্থিত হয়েছে। এ রকম অপ্রত্যাশিত সম্মান ইতিহাসে দুর্লভ। যেদিন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য এই কথাটি আমাকে জানাবার জন্য তাঁর দূত আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন-যে তিনি আমার তৎকালীন রচনার মধ্যেই একটি বৃহৎ ভবিষ্যতের সূচনা দেখেছেন সেদিন এ কথাটি সম্পূর্ণ আশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। আমার তখন বয়স অল্প, লেখার পরিমাণ কম, এবং

দেশের অধিকাংশ পাঠক তাকে বাল্যলীলা বলে বিদ্রূপ করত। বীরচন্দ্র তা জানতেন এবং তাতে তিনি দুঃখ বোধ করেছিলেন। সেইজন্য তাঁর একটি প্রস্তাব ছিল এই লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র নতুন ছাপাখানা কিনবেন এবং সেই ছাপাখানায় আমার অলঙ্কৃত কবিতার সংস্করণ ছাপানো হবে। তখন তিনি ছিলেন কার্শিয়াং পাহাড়ে, বায়ুপরিবর্তনের জন্য। কলকাতায় ফিরে এসে অল্প কালের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। আমি মনে ভাবলুম এই মৃত্যুতে রাজবংশের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে তা হয়নি। কবি বালকের প্রতি তাঁর পিতার স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা মহারাজ রাধাকিশোরের মধ্যেও সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেল। অথচ সে সময়ে তিনি ঘোরতর বৈষয়িক দুর্যোগের দ্বারা দিবারাত্রি অভিভূত ছিলেন। কিন্তু আমাকে একদিনের জন্যও ভোলেন নি। তারপর থেকে নিরন্তর তাঁর আতিথ্য ভোগ করেছি। এবং আমার প্রতি তাঁর স্নেহ কোনোদিন কুণ্ঠিত হয় নি। যদিচ রাজসান্নিধ্যের পরিবেশ নানা সন্দেহ বিরোধের দ্বারা কণ্টকিত। তিনি সর্বদা ভয়ে ভয়ে ছিলেন পাছে আমাকে কোনো গোপন অসম্মান আঘাত করে। এমন কি তিনি নিজে স্পষ্টই আমাকে বলেছেন— আপনি আমার চারিদিকের পারিষদের ব্যবহারের বাধা অতিক্রম করেও যেন আমার কাছে সুস্থ মনে আসতে পারেন, এই আমি কামনা করি। এ কারণে যে, অল্পকাল তিনি বেঁচেছিলেন কোনও বাধাকেই আমি গণ্য করিনি। যে অপরিণতবয়স্ক কবির খ্যাতির পথ সম্পূর্ণ সংশয়সঙ্কুল ছিল তার সঙ্গে কোনো রাজত্বগৌরবের অধিকারীর এমন অবারিত ও অহৈতুক সখ্য সম্বন্ধের বিবরণ সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। সেই রাজবংশের সেই সম্মানের মূর্ত পদবী দ্বারা আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুর দিগন্তকে আজ দীপ্যমান করেছে। আমার আনন্দের একটি বিশেষ কারণ ঘটেছে—বর্তমান মহারাজা অত্যাচারপীড়িত বহুসংখ্যক দুর্গতিগ্রস্ত লোককে যে রকম অসামান্য বদান্যতার দ্বারা আশ্রয় দান করেছেন তার বিবরণ পড়ে আমার মন গর্বে এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। বুঝতে পারলুম তাঁর বংশগত রাজ-উপাধি আজ বাংলা দেশের সর্বজনের মনে সার্থকতর হয়ে মুদ্রিত হোল। এর সঙ্গে বঙ্গলক্ষ্মীর সকরুণ আশীর্বাদ চির-কালের জন্য তাঁর রাজকুলকে শুভ শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত করে তুলেছে।

এ বংশের সকলের চেয়ে বড় গৌরব আজ পূর্ণ বিকসিত হয়ে উঠল এবং সেইদিনে রাজহস্ত থেকে আমি যে পদবী ও অর্ঘ্য পেলেম তা সগৌরবে গ্রহণ করি, এবং আশীর্বাদ করি এই মহাপুণ্যের ফল মহারাজের জীবনযাত্রার পথকে উত্তরোত্তর নবতর কল্যাণের দিকে যেন অগ্রসর করতে থাকে। আজ আমার দেহ দুর্বল, আমার ক্ষীণ কণ্ঠ সমস্ত দেশের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর জয়ধ্বনিতে কবি-জীবনের অন্তিম শুভকামনা মিশ্রিত করে দিয়ে মহানৈশঃব্দ্যের মধ্যে শান্তি লাভ করুক।

উত্তরায়ণ

১৪।৫।৪২, সকাল

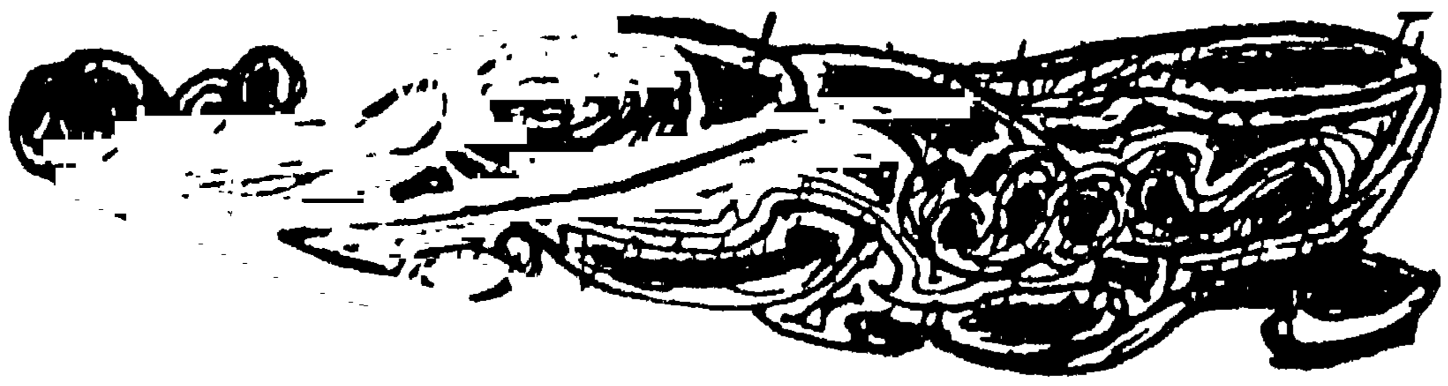

রামমোহন রায়

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১৮৩৩ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহন রায় বিলেতের ব্রিস্টল শহরে তাঁর দেহরক্ষা করেন। কিন্তু তাঁর আত্মার আলোকে আমরা বাঙালীরা আজ পর্যন্ত জীবনধারণ করছি।

আমরা জানি আর না জানি, তিনি যে পথে স্বজাতিকে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন, আমরা জানি আর না জানি সেই পথে আমরা আজও চলছি।

আমরা বাঙালীরা শিক্ষিত বলে অহংকার করি। যে শিক্ষায় আমরা শিক্ষিত, সে শিক্ষার প্রবর্তন করেন রাজা রামমোহন রায়। আজকের দিনে বেদান্ত আমাদের যুগপৎ ফিলজফি এবং থিয়লজি। এ বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্গে রামমোহন রায় প্রথম বাঙালী জাতির পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর সমসাময়িক ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা উপনিষদের নাম পর্যন্ত জানতেন না। এবং তিনি যখন খানকতক উপনিষদের বাংলায় অনুবাদ করেন, তখন পণ্ডিতমণ্ডলী সেগুলিকে রামমোহন রায়ের স্বকপোলকল্পিত বলে অগ্রাহ্য করেন।

আমরা এখন ঘোর পোলিটিকাল হয়ে উঠেছি। এবং কংগ্রেসে আমাদের মনোভাব দানা বেঁধেছে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায় বিলেতে পার্লামেন্টে যে সাক্ষ্য দেন, আমার মতে তাতেই পরবর্তীকালের কংগ্রেসের বেশির ভাগ দাবি উত্থাপন করা হয়েছিল।

ইংরিজীতে যাকে বলে freedom of the press, আমরা তাকে একটা বহুমূল্য অধিকার বলে গণ্য করি। রামমোহন রায় এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা ৪র্থ জর্জ্‌কে যে পত্র লেখেন, ইংলণ্ডের বেন্থাম প্রভৃতি অগ্রগণ্য মনীষীরা সে পত্রকে দ্বিতীয় Areopagetica বলতে কুণ্ঠিত হননি। যে-সকল বিধিনিষেধ চিরাগত, এবং যে-সকল বিধিনিষেধ ইংরেজ সরকার দ্বারা নবপ্রবর্তিত আর আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জড়তার মূল কারণ, সেই সব অভ্যুদয়ের বাধা থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়াই ছিল রামমোহন রায়ের প্রধান কাজ।

২

ব্যক্তিগত হিসেবে বালককালে আমি রামমোহন রায় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম। আমি ব্রাহ্মপরিবারে জন্মগ্রহণ করিনি। এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের পরিবার অনুকূল ছিল না। তাঁর নাম আমি অবশ্য শুনেছিলুম। আমার বয়স যখন ৭ বৎসর, তখন আমি "দিবা অবসান হল" এই পূরবীর গানটি শুনি এবং একজন আমাকে বলেন যে ওটি রামমোহন রায়ের রচনা— যদিও পরে শুনেছি কথাটা ঠিক নয়। গানটি শুনে আমার মন দমে যায়। তার ভাব ও সুর দু'ই আমার মনকে একটু চেপে দেয়। আমি আজ পর্যন্ত পূরবী রাগিণীর ভক্ত নই।

সে যাই হোক, এর অনেক পরে রামমোহন রায়ের ইংরিজী ও বাংলা গ্রন্থাবলী থেকে আমি তাঁর পরিচয় লাভ করি এবং তাঁর মহা ভক্ত হয়ে উঠি। বোধহয় বিলেত থেকে ফিরে আসবার পর আমি প্রথম তাঁর কতকগুলি ইংরিজী লেখা পড়ি। তারপরে তাঁর বাংলা লেখার সঙ্গে পরিচিত হই।

আমার লেখায় রামমোহন রায়ের কথা ছড়ানো রয়েছে। আমি রাজশাহীতে "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনে"র সভাপতি হিসেবে যে প্রবন্ধ পড়ি, তাতে অনেক স্থলেই তাঁর দোহাই দিই। (নানা কথা)।

এর কিছুদিন পরে Prof. Geddes-এর অনুরোধে Story of Bengalee Literature নামে ইংরিজী ভাষায় একটি পুস্তিকা দার্জিলিঙে পাঠ করি, তাতে আমি রামমোহনকে এ যুগের অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলি। তার কিছুদিন পূর্বে সবুজ পত্রে বাংলা ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে আলোচনা করি, সেই সূত্রে বলি যে রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ বাংলা ভাষার প্রথম এবং শেষ ব্যাকরণ। এ ব্যাকরণ আজ পর্যন্ত আমার মতে বাংলা ভাষার অদ্বিতীয় ব্যাকরণ।

এর পরে আমি যখন "রায়তের কথা" লিখি, তখন রামমোহন রায়ের Permanent Settlement-এর প্রতিবাদ এবং প্রতিকারের বিষয় উল্লেখ করি। এরও কিছুকাল পরে আমি তাঁর সম্বন্ধে একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লিখি, সেটি এখন আবার পড়ে দেখলুম তাঁর প্রতিভার নানা দিক আমি তাতে আলোচনা করেছি।

আমার মতে এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি যে মন্ত্রের সাধনা করেছিলেন, এবং

স্বজাতিকে যাতে দীক্ষিত করবার আজীবন প্রয়াস পেয়েছিলেন, তার বিলিতী নাম হচ্ছে Liberty। এই liberty শব্দের অর্থ কী? গত শতাব্দীর একটি ইতালীয় মহামনীষী এই শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছেন, আমার উল্লিখিত প্রবন্ধে সেটি অনুবাদ করে দিই। সেটি আমি আবার এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"প্রাচীন কালে liberty শব্দের অর্থে লোকে বুঝত শুধু দেশের গভর্নমেণ্টকে নিজের করায়ত্ত করা। বর্তমানে liberty বলতে শুধু রাজনৈতিক নয়, সেই সঙ্গে মানসিক ও নৈতিক স্বাধীনতার কথাও বোঝে, অর্থাৎ এ যুগে liberty-র অর্থ— চিন্তা করবার স্বাধীনতা, কথা বলবার স্বাধীনতা, লেখবার স্বাধীনতা, নানা লোক একত্র হয়ে দল বাঁধবার স্বাধীনতা, বিচার করবার স্বাধীনতা, নিজ মত গড়বার এবং সে মত প্রকাশ করবার, প্রচার করবার স্বাধীনতা। মানুষমাত্রেই এসকল ক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতার স্বভাবতই অধিকারী। এ স্বাধীনতা কোনো church (ধর্মসংঘ) কর্তৃকও দত্ত নয়, কোনো রাজশক্তি কর্তৃকও দত্ত নয়। এর উল্‌টো মত হচ্ছে এই যে, হয় ধর্ম-সংঘ নয় রাজশক্তি সর্বশক্তিমান, অতএব ব্যক্তির ব্যক্তি হিসেবে কোনোই স্বাধীনতা নেই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একটা জাতীয় সমূহের অন্তরে লীন হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়, সে সমূহ রাজাই হোক্ আর রাজ্যই হোক্, church-ই হোক্ আর Pope-ই হোক্।"

রামমোহন রায়ের তিরোধানের এক শো বছর পর liberty শব্দের অর্থ অপদস্থ হয়েছে। এবং উক্ত উল্‌টো মতই প্রভুত্ব লাভ করেছে,— যার বিলিতী নাম হচ্ছে totalitarianism। ভবিষ্যৎ খুব সম্ভবতঃ হবে আলোর নয়, অন্ধকারের যুগ।

স্বরলিপি

"সকল কলুষ তামসহর"

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

II সা সা সা। রা রা রসা I রা -ণধা ণধা। ধা ণা পমা I
স ক ল ক লু ষ০ তা ০০ ম০ স হ র০

I পা পর্সা র্সা। -া ণা ধা I ণা -পা -া। -া -া -া I মা পা পা।
জ য়০ হো কৃ ত ব জ য়্ ০ ০ ০ ০ অ মৃ ত

। পা -মা পমা I পমা -ণা ণা। ধা ণা পা I মা পা পা।
বা ০ ণী০ সি ন্ চ ন ক র নি খি ল

। পধা মা পা I মা -জ্ঞা -া। -া -া -া I সা সা -া। রা -পা পা I
ভু০ ব ন ম য় ০ ০ ০ ০ ম হা ০ শা ন্ তি

I পমা মা -গা। মা -রা সা I ন্‌া সা -া। রা -জ্ঞা জ্ঞা I রা সা -া।
ম হা ০ ক্ষে ০ ম ম হা ০ পু ০ ণ্য ম হা ০

। পরা -ন্‌সা সা I {মা -া পা। ণদা -া ণা I ণা র্সা র্সা।
প্রে ০০ ম জ্ঞা ০ ন সূ০ ০ র্য উ দ য়

। র্সা -ণা র্সা I ণর্সা -ণা র্সণা। র্সণা র্রা র্সা I ণা র্সণা র্সণা।
ভা ০ তি ধ্বং০ ০ স০ কং০ রু ক তি মি০ র০

। ণদা -ণা -পা } I র্সা -া র্রা। র্রা র্মজ্ঞা -া I জ্ঞা -র্মা র্মা।
রা০ ০ তি দুঃ ০ স হ দুঃ ০ স্ব প্ ন

। র্রা -া র্সা I না রা র্সা। ণা ণা ধা I ণপা -া -া। -া -া -া I
ঘা ০ তি অ প গ ত ক র ভয় ০ ০ ০ ০ ০

I পা র্সা র্সা। -ণা ণা ধা I ণপা -া -া। -া -া -া I সা সা -া।
জ য় হো কৃ ত ব জয় ০ ০ ০ ০ ০ ম হা ০

। রা -পা পা I
শা ০ স্তি ..."মহা প্রেম" পর্যন্ত পূর্বের ন্যায়।

{সা -া -সা। রা রা রা I সা রা মজ্ঞা। -া জ্ঞা মা I
মো ॰ হ ম লি ন অ তি দু র্ দি ন

I মা -পা পা। পা পা পা I পধা -মা -া। পা -া -া I মা পমা পা।
স ঙ্ কি ত চি ত পা ন্ ॰ থ ॰ ॰ জ টি ল

। পণা ণধা ণা I ধা ণা ধা। -ণা ধা ণা I ধা -র্সা ণা। ধা পা -া I
গ॰ হ॰ ন প থ স ঙ্ ক ট সং ॰ শ য় উ দ্

I পধা -মা -া। পা -া -া} I {মা পা ণদা। -া দা ণা I ণা র্সা র্সা।
ভ্রা॰ ন্ ॰ ত ॰ ॰ ক রু ণা॰ ॰ ম য় মা ॰ গি

। র্সণা র্সণা র্সা I ণর্সা -ণা র্সণা। র্সা র্সর্রা র্সা I ণা র্সর্রা র্সা।
শ॰ র॰ ণ দু॰ র্ গ॰ তি ভ॰ য় ক র॰ হ

। ণধা ণা পা} I র্সা -া র্রা। র্মজ্ঞা -া র্জ্ঞা I র্জ্ঞর্মা -া র্রা। র্রা র্সা র্সা I
হ॰ র ণ দা ॰ ও দুঃ॰ ॰ খ ব॰ ন্ ধ ত র ণ

I র্সা -ণা র্রা। র্সা ণা ধা I ধণা -পা -া। -া -া -া I পর্সা র্সা র্সা।
মু ক্ তি র প রি চ॰ য়্ ॰ ॰ ॰ ॰ জ॰ য় হো

। -া ণা ধা I ধণা -পা -া। -া -া -া I সা সা -া। রা -পা পা I
ক্ ত ব জ॰ য়্ ॰ ॰ ॰ ॰ ম হা ॰ শা ন্ তি

I মা মা -গা। গমা -রা সা I ন্া সা -া। রা -জ্ঞা জ্ঞা I রা সা -া।
ম হা ॰ ক্ষে॰ ॰ ম ম হা ॰ পু ॰ ণ্য ম হা ॰

। সরা -ন্সা সা II
প্রে ॰ ॰ ম

[গত মার্চ মাসে রেডিওতে চীনা-দিবস অনুষ্ঠান-উপলক্ষ্যে এই গানটি শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী দ্বারা গীত হয়। কেউ কেউ শেখবার ইচ্ছে প্রকাশ করায় এই অপ্রকাশিত গানটির স্বরলিপি করে দেওয়া গেল]

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১৮ই সেপ্টেম্বর ঘুম থেকে উঠেই শুনলুম যে, আমার আকৈশোর অন্তরঙ্গ বন্ধু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু হয়েছে।

এ সংবাদ শুনে অবধি আমি অত্যন্ত মুষড়ে গিয়েছি। কোনো সংস্কৃত কবি বলেছেন যে, এক স্তবকের নানা ফুলের মধ্যে একটি খসে পড়লে, তার পাশের ফুলের কোনোরূপ ব্যথা লাগে না; কিন্তু মানুষের পার্শ্ববর্তী কোনো ব্যক্তি খসে পড়লে মন কাতর হয়।

আমি যখন ১৪ পেরিয়ে ১৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছি, তখন হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তখন তাঁর বয়স ১৬ বৎসর। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের মাঠে একটি যুবককে দেখি—দীর্ঘাকৃতি, সুপুরুষ ও সুবেশ,—অর্থাৎ তার সেই জাতীয় চেহারা যা কারও চোখ এড়িয়ে যায় না। আমার সহপাঠী একটি ছাত্র আমাকে বললে যে, ইনি হিন্দু ইস্কুল থেকে খুব ভালো পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে এসে যোগ দিয়েছেন।

তার পর থেকেই ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠি। আর এই গত ৬০ বৎসরের ভিতর জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তাঁর পাশাপাশি চলেছি। কিন্তু এই দীর্ঘকালের ভিতর একদিনও তাঁর কোনো কথা বা ব্যবহারে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হারাইনি। আমি প্রথম থেকেই আবিষ্কার করি যে, আমি তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। তা সত্ত্বেও আমাদের এই পরিচয় কি করে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ল, তা বলতে গেলে আমার নিজের জীবনেরই অনেক কথা বলতে হয়, যা আজকের দিনে বলা সংগত মনে করিনে।

৺হীরেন দত্ত যে একটি অসামান্য বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সুবক্তা ব্যক্তি ছিলেন, তা সর্বলোকবিদিত। কিন্তু তিনি তা ছাড়াও কিছু ছিলেন। যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে শিক্ষিত হয়েছেন, এবং ইস্কুলকলেজ থেকে বেরিয়ে সংসারের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের ভিতর একদল যুবক ছিলেন, যাঁরা আমাদের জাতীয় দুর্দশায় পীড়িত বোধ করতেন। তাঁরা ভারতবর্ষের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারের

বিষয় দিবাস্বপ্ন দেখতেন ; এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার কার্যে নিজেদের নিয়োগ করবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছিলেন।

এই দলের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথকে এক হিসেবে অগ্রগণ্য বলা যায়। তাঁর একাগ্রতা ও চরিত্রবল ছিল অসাধারণ। তাঁর দুটি কীর্তি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ ও জাতীয় শিক্ষাপরিষদ্ (National Council of Education) তিনিই গড়ে তুলেছেন বললে অত্যুক্তি হয় না।

প্রথমটির প্রতিষ্ঠাকল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহায় ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয়টির রক্ষা এবং উন্নতিসাধনের গৌরব হীরেন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। তার জন্য তাঁকে কত ভীষণ আপদবিপদ অতিক্রম করতে হয়েছে, তা অনেকে হয়তো জানেন না। বাংলার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ে এ-দু'টি প্রতিষ্ঠান যদি সহায় হয়ে থাকে, তার জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অধ্যবসায় এবং অক্লান্ত যত্ন চিরস্মরণীয়।

হীরেন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনের ব্রত উদ্‌যাপন করে গেছেন। আমি তাঁকে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

সঞ্চয়ন

রবীন্দ্র-প্রতিভা

কিছুদিন পূর্বে বিলেতে দু'খানি পৃথক সাময়িক পত্র ছিল। তার একখানির নাম London Mercury, আর-একখানির নাম Bookman। এই যুদ্ধের ধাক্কায় সে দুয়ে মিলে এক হয়ে গেছে; এবং তার নাম হয়েছে Life & Letters To-day।

এই পত্রিকার গত মার্চ মাসে India নামক একটি সংখ্যা বেরিয়েছে, যার লেখক অধিকাংশই ভারতবর্ষীয়। সম্পাদক লিখেছেন যে পূর্ব পূর্ব সংখ্যার মতো এ সংখ্যা ততটা স্পষ্টবাদী হবে না। কারণ, এই জাতীয় কৃষ্ণপক্ষের দিনে নতুন বিপদ নিজের ঘাড়ে টেনে আনতে এবং পরের মনের শান্তিভঙ্গ করতে প্রবৃত্তি হয় না।

এ সংখ্যায় ইকবাল সিং-এর লেখা রবীন্দ্রনাথের পরিচয় বিশেষ করে চোখে পড়ে। লেখক বোধহয় পাঞ্জাবী। এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে স্বল্পপরিচিত। আমি সেই প্রবন্ধের কিঞ্চিৎ বিচার এখানে করতে উদ্যত হয়েছি। সেটির প্রথম ছত্র এই :—

"Monumental is the term that best fits the character of Tagore's genius."

এই 'monumental' বিশেষণটি আমার মতে অসংগত। Monument যতই উচ্চ হোক না কেন, তা একমুখী, উর্ধ্বমুখী; সংকীর্ণ, বিস্তীর্ণ নয়। বিলেতের Nature পত্রিকার গত মার্চ সংখ্যায় এ যুগের অদ্বিতীয় গণিতশাস্ত্রী শ্রীনিবাস রামানুজনের গগনস্পর্শী প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ প্রতিভাকে monumental বলা চলে। কারণ একমাত্র গণিতবিদ্যা ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মন ছিল না। মনোরাজ্যের অপর সব বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, এমন কি অন্ধ ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। অপর পক্ষে ইকবাল সিং-এর বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা শতমুখী। মনোরাজ্যের এমন কোনো বিষয় নেই যা তাঁর প্রতিভা দ্বারা উদ্ভাসিত হয় নি। ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের নূতন করে পরিচয় দেবার আবশ্যক কী? — তিনি তো সে দেশে সুপরিচিত। যে সব বই থেকে ইকবাল সিং তাঁর প্রতিভার পরিচয় লাভ করেছেন, সে সবই তো ইংরিজী ভাষায় লিখিত। লেখকের নিজভাষায় তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে— "to clear the debris of uncritical

adulation and equally critical disregard, in order to see him in his true proportions."

Uncritical adulation অর্থাৎ নির্বিচার স্তুতি যে বিচারসহ নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই-জাতীয় সাহিত্যিক জঞ্জাল আমাদের দেশে যত আছে, বিলেতে বোধহয় তার সিকির সিকিও নেই। এবং বিলেতের গুণী সমালোচকরা রবীন্দ্রসাহিত্যের যে বিচার করেছেন, সে বিচার সুবিচার কি না, তাই আলোচনা করাই ইক্‌বাল সিং-এর উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রাচুর্য অসাধারণ। এই প্রাচুর্য একটি মহাগুণ হলেও, দোষও হতে পারে। হেগেলের লজিকে বলে যে, প্রতি গুণের অন্তরে তার বিরোধী দোষও থাকতে বাধ্য। অবশ্য যে প্রাচুর্য স্বতঃউৎসারিত এবং লেখকের আত্মবশ নয়, তার অনেক দোষ আছে। বিলেতী সমালোচকরা এই দোষই দেখেছেন। তাঁরা রবীন্দ্ররচনাবলীর quantity-ই দেখেছেন, quality দেখেন নি। তার কারণ আমার মনে হয়, স্থূলদৃষ্টিতে quantity এক নজরেই ধরা পড়ে এবং তার মাপজোখ করা যায়। অপরপক্ষে quality মনোগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। তা ছাড়া এ প্রাচুর্য কেবলমাত্র ভাষার প্রাচুর্য নয়। বাংলাভাষার শব্দসম্ভার অতি কম এবং ঐশ্বর্যবঞ্চিত। রবীন্দ্রনাথকে এ রোগা ভাষার কান্তিপুষ্ট করতে হয়েছে। তিনি এ ভাষাকে বেলুনের ভিতর হাওয়া পুরে ফাঁপিয়ে তোলেন নি। তাঁর ভাষা শূন্যগর্ভ নয়, অর্থপূর্ণ। আমাদের বাঙালীর কাছে এইটেই তাঁর প্রতিভার একটি অপূর্ব কীর্তি।

রবীন্দ্রনাথের বিলিতী সমালোচকদের মতে তাঁর কাব্য romantic। বিলেতে এখন romantic কাব্যমাত্রই অতি হেয় বলে গণ্য। এই সমালোচকের দল আজও classical সাহিত্যের মায়া কাটাতে পারেন নি। অবশ্য, তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথ অল্পবয়সে অত্যন্ত খেলো রোম্যান্টিক কবিদের—যথা Mooreএর—কবিতার সঙ্গে পরিচিত এবং তাদের দ্বারা অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। ইক্‌বাল সিং বলেন, তাঁর বেশি বয়সের কবিতা এ দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এবং তিনি কাব্যজগতের খুব উচ্চস্তরে উঠেছেন। তাঁর মতে বাংলা কবিতা ইংরিজীতে তর্জমা করা যায় না। কারণ, কবি বাংলায় যে ভাবোদ্রেক করেন, ইংরিজী অনুবাদে সে ভাব উদ্রিক্ত হয় না। হয়তো তাঁর ভাবের অনুবাদের পক্ষে ফরাসী ভাষা বেশি অনুকূল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ইংরিজীভাষায় অনূদিত বই গীতাঞ্জলি প্রথম প্রথম বিলিতী পাঠকদের যত চমক লাগিয়েছিল, এখন আর ততটা করে না। তাঁর কবিতা নাকি সবই mystic, এবং কিছুদিন য়ুরোপীয় সমাজ mysticism-এর প্রতি অনুকূল হয়েছিল; কিন্তু আজকাল আর সে ভাব নেই। আর-এক কথা, রবীন্দ্রনাথের কবিতা গানের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয়। য়ুরোপে এ দুই art সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে গেছে; সুতরাং তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সংগীতধর্মী কবিতার আর তেমন আবেদন নেই। বিলেতে য়ুরোপীয় সমালোচকের দল mysticism-এর নাম শুনলে ভয় পায়। ও যেন মানবসমাজের সঙ্গে

সম্পর্কহীন মনোভাব। কিন্তু অপর mystic-দের সম্বন্ধে যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের mysticism একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে, সে হচ্ছে পুরো humanism।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা নাকি অগভীর। ইক্‌বাল সিং বলেন তাঁর কবিতার অপূর্ব স্বচ্ছতাই এই ভ্রমের কারণ। তিনি আরও বলেন—"the remarkable thing about Tagore was that he could express himself through media of utmost diversity with equal facility. He took up painting for instance when he was over seventy।" অনেকে মনে করেন যে, তাঁর চিত্র প্রকৃতি কিম্বা মানুষের প্রতিকৃতি নয়; বিকৃতি মাত্র। ইকবাল সিং-এর মতে—"they possess one supreme value—they embody vision, not merely memory।"

"There are in every age individuals whose cultural contribution extend into a kind of fourth dimension which cannot be measured in terms of their tangible achievement. Tagore's belongs to that category : he is greater than his work।" এই কারণেই তিনি এসিয়ার symbol হয়ে দাঁড়িয়েছেন।—কারণ, "He summed up in himself a whole epoch. His was not merely a decorative, but vital and dynamic personality।" আমার মতে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র এসিয়ার symbol না হলেও, ভারতবর্ষের যে তিনি symbol, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এসিয়ার ও য়ুরোপের যে ধীরে ধীরে মিলন হবে, এ ভুল রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে করেছিলেন। কিন্তু শেষ বয়সে এ ভ্রান্তি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছিলেন। যেমন এখন আমাদেরও সকলেরই এ ভুল ভেঙেছে।

—প্র. চৌ.

আর্টের একটা দিক

ছবি আঁকার প্রণালী সম্বন্ধে এবং তার ভালোমন্দ বিচার নিয়ে আর্টিস্ট নিজেরা বেশি কিছু বলতে বা লিখতে সহজে চান না। তার কারণ, তাঁরা ভাষার অবলম্বনে আত্মপ্রকাশ করায় অভ্যস্ত নন। রেখা ও রঙের ভিতর দিয়ে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ও সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের সাহায্যে তাঁরা তাঁদের অনুভূতিকে রূপ দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া আর্টিস্ট কেন, কারো পক্ষেই ছবির গূঢ়ার্থ কথা দিয়ে ব্যক্ত করা কখনোই সম্ভব নয়। ছবি যে কথা কয় তা আমাদের মুখের বা লেখার কথা নয়, তার ভাষা এখনো সৃষ্টি হয় নি।

এই অসুবিধার কথা গোড়াতেই বলে নিয়ে Cedric Morris গত মে মাসের Studio-তে ফুল আঁকা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ফুল যেমন কবিদের প্রিয়, এমন আর্টিস্টও খুব কম আছেন যিনি ফুল আঁকতে চেষ্টা করেন নি। কিন্তু আর্টিস্ট মাত্রই জানেন ফুল আঁকা কত কঠিন। তাই Morris-এর মতো একজন ফুল-আঁকিয়ে এ-বিষয় কী বলেছেন, সে কথা হয়তো অনেকেরই জানবার কৌতুহল হোতে পারে।

ফুল আঁকার কতকগুলি বিশেষ কায়দা আছে। এমন কি, এ সম্বন্ধে কতকগুলি বাঁধা রীতিও প্রচলিত হয়ে গেছে। তার সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যেই শিল্পীকে তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ফলাতে হয়। বেশির ভাগ আর্টিস্টই তাঁদের নিজের পছন্দসই কয়েকটি ফুল বাছাই করে নিয়ে তার ভিতর দিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ফোটাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা এই ফুলগুলিকে যে ভালোবেসেছেন ও অন্তরঙ্গভাবে বুঝেছেন তা তাঁদের ছবি থেকে বেশ উপলব্ধি হয়। আফিম-ফুলের গালভরা অথচ ধরাছোঁয়া-না-দেওয়া ভাবটুকু কেবল Jan von Huysman-এর ছবিতেই রূপ নিয়েছে দেখতে পাই। চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ বা ডালিয়ার পোশাকী বাহার তেমন করে আর কেউ দেখাতে পারেন নি যেমন দেখিয়েছেন Breughel। এই সব আর্টিস্টকে প্রত্যেকটি ফুলের চেহারার বৈশিষ্ট্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লাইনের পরস্পরের যোগ, বিভিন্ন দেহাংশের নানাবিধ স্পর্শগুণ, রঙের বহুরূপী খেলা প্রভৃতি কত-না বিষয় খুঁটিয়ে দেখতে হয়। এইরকম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বোঝবার চেষ্টা প্রাচীন চীনা আর্টিস্টদের মধ্যে বিশেষ করে দেখা যায়। গাছপালা-ফুলপাতা তাঁরা যা কিছু এঁকেছেন, তার সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় দেখে বিস্ময় বোধ হয়—মনে হয় যেন সেই গাছপালা-ফুলপাতার সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হয়ে গেছেন। ছবির বিষয়বস্তুর সঙ্গে আর্টিস্ট যতক্ষণ না অভেদাত্মা হন ততক্ষণ তাঁর সত্যিকার দেবার মতো কিছু থাকে না, তাঁর আঁকা ছবিতে সত্য ফুটে ওঠে না। কেবল তাই নয়। যিনি আর্টিস্ট তাঁকে বাস্তব ছাড়িয়ে অধ্যাত্মজগতে দর্শকদের পৌঁছে দিতে হয়। সেই অধ্যাত্মবোধকেই আমরা শিল্পীর 'দৃষ্টি' বলি। কেবলমাত্র বাস্তব ও প্রকৃত সত্যের মধ্যে এইখানে অনেকখানি তফাত। জ্ঞানের উপর সত্যের প্রতিষ্ঠা, আর আমরা যাকে বাস্তব বলি তা জ্ঞানের বাহ্যরূপমাত্র।

ফুলকেই কেবল আঁকবার বিষয়বস্তু করার পুরাকালে চলন ছিল না, অন্তত য়ুরোপে নয়। এ বিষয় চীনাদের কাছে অবশ্য আমরা সকলেই হার মানি। ইউরোপে Giotto থেকে আরম্ভ করে Botticelli-র আমল পর্যন্ত ফুলকে তার নিজের গৌরবে গরীয়ান করবার চেষ্টা হয় নি। কেবলমাত্র অলংকার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইরান, ভারতবর্ষ ও জাপানের আর্টিস্টরাও এইভাবে অবান্তর পরিসজ্জা হিসাবেই ফুলকে তাঁদের ছবিতে স্থান দিয়েছেন, তাকে তার নিজস্ব মর্যাদা দেন নি। চীনের কথা বাদ দিলে, আঁকার বিষয় হিসাবে ফুল সত্যিকার সম্মান পেতে আরম্ভ করেছে আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য আর্টিস্টদের হাতে। নাম করতে গেলে Courbet, Delacroix, Cezanne, Van Gogh, Gaugin, Renoir,

Augustus John, Duncan Grant প্রভৃতি অনেকেরই নাম করা যেতে পারে।

সব শেষে বলবার কথা—ভালো আর্টিস্ট হোলেই ভাল ফুল-আঁকিয়ে হয় না। ইচ্ছা করলেই যে-কোনো নিপুণ শিল্পী ফুল হয়তো এঁকে দিতে পারেন, কিন্তু সে ছবির আর্ট হিসাবে প্রকৃত মূল্য হয় না যদি না শিল্পী ফুলের অন্তরে প্রবেশ করে তার সত্যিকার রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারেন ও ফুলের প্রতি তাঁর ভালবাসা তার ভিতর ঢেলে দিতে পেরে থাকেন।

—র. ঠা.

কিপলিংয়ানা

Life & Letters To-day পত্রিকার যে সংখ্যার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেই সংখ্যাতেই ঔপন্যাসিক মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ একখানি নবপ্রকাশিত পুস্তক উপলক্ষ্য করে কিপলিং সম্বন্ধে দু'এক কথা বলেছেন। পুস্তকখানি টি-এস্ এলিয়টের লেখা এবং তাতে কিপলিং-এর কবিপ্রতিভা ও তথাকথিত ইম্পিরিয়্যালিস্‌ম্ তথ্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে। কিপলিং-এর ইংরাজী সাহিত্যজগতে স্থাননিরূপণে এলিয়টের মতো কবি এবং বিজ্ঞ সমঝদারের নির্দেশ আমাদের যে অনেকটা সাহায্য করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুল্‌ক্‌রাজের মতো বিদেশীর পক্ষে সে-চেষ্টা ধৃষ্টতা না হলেও অসমীচীন। অন্তত তিনি যা করেছেন, সেরূপ দু'এক কথায় কিপলিং-এর সাহিত্যক প্রতিভার যাচাই হতে পারে না, এটা ঠিক। রুচির দিক থেকে "কিম্" শুধু আমাদের কেন ইংরাজদেরও অনেকের ভালো না লাগতে পারে। কিন্তু "কিম"-এর চারদিকে কিপলিং যে মায়ার জগৎ রচনা করেছেন, তার মধ্যে যে সৃজনী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তার আকর্ষণ বড় কম নয়। তার দ্বারা মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দও যে কতটা আকৃষ্ট হয়েছেন তা তাঁর নিজের রচিত উপন্যাসগুলির চরিত্রচিত্রনে ও ভাষণে যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাস্তবতার নামে রুচির জঘন্যতায় ও চরিত্রচিত্রনের অযথার্থতায় তিনি কিপলিংকেও ছাড়িয়ে গেছেন। বাস্তবতা অনেক-কিছু প্রকাশের ছলে অনেক-কিছু গোপন করে, কিন্তু প্রতিভার স্বভাব ও অভাব কোনোটাই গোপন করতে পারে না। কিপলিং-এর ক্ষেত্রে তার প্রথমটা করেনি এবং মুল্‌ক্‌রাজের ক্ষেত্রে তার দ্বিতীয়টা পারে নি।

সে যাই হোক কিপলিং-এর ইম্পিরিয়্যালিস্‌ম্ সম্বন্ধে মুল্‌ক্‌রাজ যা বলেছেন, সে বিষয়ে কারুরই মতভেদ থাকতে পারে না। White Man's Burden, Men of lesser breed, God's chosen people—কিপলিং-প্রবর্তিত এ সব মন্ত্রের সাধনা এখন আলোচনার বাইরে

চলে গেছে এবং এর সিদ্ধি বা অসিদ্ধি যে কী রূপ নেবে তারও এখন আলোচনার সময় নেই।

এই ইম্পিরিয়্যালিস্‌মের প্রভাব ভারতসাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল তারও আলোচনা করবার এখানে প্রয়োজন নেই। তা রাজনীতিজ্ঞেরা যথেষ্ট করেছেন এবং করছেনও—দু'দেশই। তবে ভারতীয় চরিত্রব্যাখ্যায় তার প্রভাব যে কী বিশ্রীভাবে কিপলিংকে আচ্ছন্ন করেছিল, তার একটু আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতীয়দের তিনি সাধারণ ভাবে এঁকেছেন half-devil half-child রূপে—যাদের ভালও বাসতে হবে, শাসনেও রাখতে হবে। কিন্তু বাঙালীরা, বিশেষ করে বাঙালীরাই, সেই ইম্পিরিয়্যাল তুলির মুখে একেবারে কৃষ্ণ মসীলিপ্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন। অঙ্কনভঙ্গীতেও যথেষ্ট শয়তানী প্রভাব দেখা যায়। শিখ ও পাঠানের মুখে বাঙালী জাতি বর্ণিত হয়েছে sons of no fathers রূপে এবং ইংরাজী কাগজের বাঙালী সম্পাদক—মাত্র a hireling on thitry rupees। ভীরু কাপুরুষ বাঙালী সিভিলিয়ান কমিশনারের মুণ্ডপাত করানো হয়েছে ইংরাজের নিমকহালাল দুর্ধর্ষ পাঠানের হাতে। বিলাতপ্রবাসী শিক্ষিত বাঙালী যাদু ও অভিচার ক্রিয়াসক্ত; "Hurry Chunder Mookerjee" কখনো কংগ্রেসওয়ালা, কখনো "Barrishter-at-Lar", কখনো বা ইংরাজসরকারের স্পাই—ভারতীয় অন্যান্য জাতির হাতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, নিহত। মুল্‌কৃরাজের মতে কিপলিং-এর এই বিদ্বেষ সেকালের য়ুরোপীয় Club-talk সঞ্জাত। এ কথাটা অনুমানমূলক হলেও কতকটা সত্য হতে পারে। সে সময়টা ছিল কংগ্রেসের অভ্যুত্থানের যুগ এবং বাঙ্গালীরাই তখন সমস্ত প্রদেশে জাতীয়তাবাদ প্রচারে অগ্রণী। বাঙালীদের এ প্রচেষ্টা শাসক সম্প্রদায় কোনোকালেই ভালো চোখে দেখেন নি। তাঁদের মনে হিন্দু বাঙালী-বিদ্বেষ প্রথম এই সময়েই উপ্ত হয়েছিল। তবে একজন ইংরাজ সমালোচকের মতে কিপলিং-এর সে যুগের Club-land-এ প্রবেশাধিকার ছিল না এবং সেই জন্যই, তাঁর মতে, কিপলিং সিমলার ইঙ্গ-ভারতীয় সমাজের বিকৃত চিত্র এঁকে গায়ের ঝাল মিটিয়েছিলেন।

কিপলিং-এর বাঙালী-বিদ্বেষের মূল কোথায়, তার একটা বিস্তৃত আলোচনা প্রায় আট বছর আগে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার পুনরালোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। টি-এস্‌-এলিয়টের পুস্তকে কিপলিং-এর ইম্পিরিয়্যালিস্‌ম্‌ কী ভাবে আলোচিত হয়েছে, ত জানতে পারা যাবে, এবং তার বিশদ আলোচনা সম্ভব হবে তাঁর বইখানি এদেশে এসে পৌছবার পর। সেটা যে কবে সম্ভব হবে, তা কেউ বলতে পারে না।

—কা. চ. ঘো.

জাতিতত্ত্ব

আমরা কথায় বলি ছত্রিশ জাত; কিন্তু এ ছত্রিশে ৩৬ বোঝায় না, বোঝায় অসংখ্য। ভারতবর্ষে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে, সম্ভবত এ ভূভাগে তত বিভিন্ন জাতের পশুপক্ষী নেই। সুতরাং বিদেশীরা এ দেশের জাতিভেদের কোনও হিসেব পায় না।

কিন্তু এ প্রভেদের মূল অন্বেষণ করতে গেল দেখা যায় যে, আদিতে ভারতবর্ষে মোটে দুটি পৃথক জাত ছিল, 'আর্যবর্ণ' ও 'শূদ্রবর্ণ'। এ দুই জাতের ভিতর অবশ্য 'বর্ণের' অর্থাৎ চর্ম-বর্ণের বিস্তর প্রভেদ ছিল। আর্যরা সব ছিলেন শ্বেতাঙ্গ আর শূদ্ররা ছিল সব কালা-আদমি। কালক্রমে জলবায়ুর গুণেই হোক বা পরস্পরের মিশ্রণের ফলেই হোক, এই প্রত্যক্ষ প্রভেদ প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে। আর আর্যদের চামড়ার রঙ যে বহুকাল পূর্বে জ্বলে গিয়েছে তার প্রমাণ মেধাতিথি তাঁর মনুভাষ্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কালেও কে ব্রাহ্মণ আর কে শূদ্র তা একমাত্র চোখের সাহায্যে ধরবার জো ছিল না। এই কারণে তিনি বলেছেন বর্ণ মানে রঙ নয়—শ্রেণী।

রং ছাড়াও এ দুই জাতের আর-একটি প্রধান প্রভেদ ছিল। আর্যরা সব ছিলেন দ্বিজ আর অন্-আর্যরা অদ্বিজ; অর্থাৎ আর্যপুত্রেরা বাল্য অতিক্রম করবার পর দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করতেন, শূদ্রেরা তা করত না। "জন্মনা জায়তে শূদ্র সংস্কারাৎ ভবেৎ দ্বিজ", এই সংস্কৃত বচন থেকে পাওয়া যায় যে, শূদ্রে ও দ্বিজে আসল প্রভেদের জন্ম হয়েছে উক্ত সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন থেকে। তাই অদ্যাবধি এ দুই জাতের পার্থক্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন হচ্ছে উপবীত—ভাষায় যাকে বলে পৈতা। বর্ণ লোপ পেলে অথচ পৈতা যে টি'কে গেল, তার কারণ বর্ণের পরিবর্তন ঘটিয়েছে প্রকৃতি, আর প্রকৃতির উপর মানুষের হাত নেই; অপরপক্ষে পৈতার উপর মানুষের সম্পূর্ণ হাত আছে। আমাদের চামড়ার রঙ বদলায় প্রাকৃতিক নিয়মে, কিন্তু পৈতা রাখা কি ফেলা সম্পূর্ণ আমাদের ইচ্ছাধীন। এই উপবীত এ দেশে আমাদের মূল জাতিভেদের একটা বাহ্য লক্ষণমাত্র নয়। ওরি সঙ্গে আমাদের শত সংস্কার শত বিধি-নিষেধ জড়িয়ে রয়েছে। এককথায় ঐ তিনদণ্ডী সুতোয় সমগ্র হিন্দুসমাজ বাঁধা রয়েছে। যেদিন আমাদের মাথা কামিয়ে কান বিঁধিয়ে গলায় ন-গাছি সুতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, সেদিন আমরা যে ব্রাহ্মী তনু লাভ করি শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে আমরা ব্রাহ্মী মেজাজও লাভ করি।—পৈতা পরবার সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের মনে এ ধারণা শিকড় গাড়ে যে, যাদের গলায় পৈতা নেই তাদের সঙ্গে আমাদের জীবনের কিম্বা মনের কোনোরূপ সম্পর্ক নেই; কেননা আমরা হচ্ছি তাদের অপেক্ষ ঢের শ্রেষ্ঠ জীব, কেননা আমরা শতকোটি যোনিভ্রমণ করে

তবে উপবীত ধারণের উচ্চ অধিকার লাভ করেছি। এ যুগের ইংরাজি শিক্ষা আমাদের এই আজগুবি ধারণার গোড়া যতই আলগা করে দিক্ না, সে ধারণা আমাদের মন থেকে একেবারে উপড়ে ফেলতে পারে না। যাঁর মনের কোনও কোণে ব্রাহ্মণশূদ্রের ভেদজ্ঞান তিলমাত্র নেই, এ হেন ব্রাহ্মণসন্তান কোটিকে গোটিক মেলে। এর জন্য দোষী ব্রাহ্মণসন্তান নয়,—হিন্দুসমাজ। উপনয়ন হবামাত্রই আমাদের প্রথম শিক্ষা হয়,—অন্তত তিনদিনের জন্যও শূদ্রের মুখদর্শন না করা। যার গলায় পৈতা নেই তাকে চোখ দিয়ে স্পর্শ করাও পাপ; এই ধারণা যে সমাজ 'মানবকের' মনে পুরে দেয়, সে সমাজ যখন পলিটিক্সের রঙ্গ-মঞ্চে চড়ে বড় গলায় ইংরাজি ভাষায় untouchability দূর করবার প্রস্তাব করে, তখন আমার হাসিও পায় কান্নাও পায়। পৈতা রাখব কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূর করব, এ প্রস্তাব করাও যা, আর ভিতরে রোগের মূল পুরো বজায় রাখব কিন্তু তার একটিমাত্র বাহ্য লক্ষণ দূর করব—এ প্রস্তাব করাও তাই। তার পর, ইংরাজিশিক্ষিত কংগ্রেসওয়ালারা রামচন্দ্র নন্ আর ভারতবর্ষের বিপুল শূদ্রসমাজও অহল্যা নয় যে, তাঁদের স্পর্শে এরা সব শাপমুক্ত হয়ে যাবে। আমাদের সামাজিক মনোভাবের সঙ্গে আমাদের পলিটিকাল মনোভাবের এই ষোল-আনা গরমিলটা যে আমাদের মনের কথার সঙ্গে আমাদের মুখের কথার সম্পূর্ণ গরমিল ঘটায়, তা কি আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে? অপরপক্ষে যাঁরা ধর্মবুদ্ধির দিক থেকে জাতিভেদ দূর করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা পৈতায় হস্তক্ষেপ করেছেন; ব্রাহ্মসমাজ পৈতা ত্যাগ করেছিলেন, আর্যসমাজ ছত্রিশ জাতকে পৈতা দিতে চেয়েছিলেন। এক সমাজ ভারতবাসীকে এক জাত করতে চেষ্টা করেছেন সকলকে অদ্বিজ করে; আর্যসমাজ ভারতবাসীকে এক জাত করতে চেষ্টা করেছেন সকলকে দ্বিজ করে। কার চেষ্টা কতটা সফল হয়েছে, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু উভয়েই আমাদের জাতিভেদের মূল কারণে হাত লাগিয়েছেন।

—বীরবল

সত্যং ব্রূয়াৎ

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্ম সনাতনঃ॥"—এ কথাটা পুরোনো কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেটিকে আমাদের নূতন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে আমাদের মধ্যে অনেকে যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এ তো হবারই কথা। ইংরাজিতে বলে' "তলোয়ারের চাইতে কলমের ধার বেশি।" এই মত

অনুসারে বাঙলার সমালোচক-বীরেরা লেখনীকে গুপ্তি হিসেবে ব্যবহার করাই সঙ্গত মনে করেন। এ ক্ষেত্রে, সমালোচনার থোঁতা মুখ ভোঁতা করবার উদ্দেশ্যেই যে পূর্বোক্ত প্রাচীন উপদেশ অনুসারে লিখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সমালোচকদের মনে এরূপ সন্দেহ হওয়া একান্তই সম্ভব; এবং সাহিত্য সম্বন্ধে সংস্কৃত মত যে বাংলা-সাহিত্যে খাটে না, একথা অস্বীকার করাও কঠিন। একটি জানা উদাহরণ দেওয়া যাক। পূর্ব্বাচার্য্যেরা বলে গেছেন যে, মধুমিচ্ছন্তি ষটপদাঃ।" একথা একালের সমালোচকদের সম্বন্ধে খাটে না এবং খাটবার কথাও নয়। কেননা, বাক্যের মধুচক্র রচনা করা কাব্যের উদ্দেশ্য হতে পারে, কিন্তু সমালোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বোলতার চাক তৈরী করা। এর থেকে প্রমাণ হয় সেকালের আলঙ্কারিকেরা নিতান্ত স্থূলদর্শী লোক ছিলেন। তাঁরা খুঁজতেন রূপ, আমরা খুঁজি ছিদ্র। কাজেই তাঁদের লক্ষ্য ছিল ফুল-ফোটানোর দিকে, আমাদের লক্ষ্য হুল-ফোটানোর দিকে।

তারপর, মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই ঘাত-প্রতিঘাতের বলে যে সুফল ফলে, এ সত্য অবশ্য আমাদের পূর্বপুরুষদের জানা ছিল না।—সেকালে জ্ঞান থাকলেও বিজ্ঞান ছিল না। আমরা কিন্তু জ্ঞানী না হলেও সকলেই বিজ্ঞানী। এও আমরা জানি যে, আমরা যদি আঘাত না করি তাহলে প্রতিঘাত আসবে না। সুতরাং সমালোচকদের পক্ষে লেখকদের আঘাত দেওয়া কর্তব্য। জীব-জগতের ধর্ম্ম রেশারেশি এবং কর্ম্ম পেষাপেষি—সুতরাং লেখকেরা পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি না করে পরস্পরকে গালাগালি করলে সাহিত্যের ইভলিউসন্ হতে বাধ্য।

এ সব কথাই সত্য। তবে উক্ত সংস্কৃত রচনাটি যে অতি সুন্দর, তা আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। এমন কি, কোন-কোনও ইউরোপীয় পণ্ডিত উক্ত বাক্যটিকে এদেশের প্রাচীন সভ্যতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনস্বরূপ পৃথিবীর লোকের চোখের সুমুখে তুলে ধরেছেন। সুতরাং ও উপদেশটিকে আমরা হেলায় হারাতে প্রস্তুত নই। অতএব উক্ত বাক্যটির বর্ত্তমান যুগেও কোন স্বার্থকতা আছে কিনা, তার বিচার করা আবশ্যক।

প্রথমত এই আপত্তি অনেকে তুলতে পারেন, যে যেহেতু ও বাক্য সুন্দর সেই কারণে তা অকেজো। বাক্যের সৌন্দর্য্য জিনিসটে তা অশিব, এ বিষয়ে তো পণ্ডিত-অপণ্ডিত সকল-সমালোচক একমত। Utilitarianism আমাদের একেবারে মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে; সুতরাং উক্ত বাক্যের কোন utility আছে কিনা তাই অবশ্য বিচার্য্য। আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে, ও-বাক্য মান্য করাতে সাহিত্যের কোনও লাভ না হোক, কোনও ক্ষতি হবে না।

বিচার্য্য শ্লোকের প্রতি ঈষৎ মনোযোগ দিলেই দেখা যায় যে, তার প্রথম-অংশে দুটি

বিধি এবং শেষ-অংশে দুটি নিষেধ আছে। আচার্য্য আদেশ করেছেন যে "সত্য কথা বলিয়ো, প্রিয় কথা বলিয়ো।" এ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিধি। "প্রিয়সত্য বলিয়ো"—এ আদেশ তিনি করেন নি। অতএব যে-সত্য উক্ত হলে শ্রোতা প্রীত হবেন, সে-সত্য গোপন করার স্বাধীনতা আমাদের সম্পূর্ণ বজায় থাকল। সুতরাং উক্ত বচন অনুসারে যে বস্তু সত্যসত্যই প্রশংসার যোগ্য, তার প্রশংসা করতে আমরা বাধ্য নই—অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিভার প্রশ্রয় দেওয়াটা আমাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। সমালোচকেরা প্রিয় সত্য সম্বন্ধে মৌনব্রত অবলম্বন করাতে সাহিত্যের যে উপকার হয়, সে উপকার সাধন করা আমাদের আয়ত্তের ভিতরেই থেকে গেল। উপরোক্ত বিধি দুটি যে সম্পূর্ণ পৃথক, তার প্রমাণ—সত্য বলবার বিধি থাকলেও যখন প্রিয়সত্য বলবার বিধি নেই এবং অপ্রিয় সত্য বলবার নিষেধ আছে, তখন বুঝতে হবে এ-সত্য সেই সত্য যা প্রিয়ও নয় অপ্রিয়ও নয়—অর্থাৎ নিরুপাধিক সত্য। এ-সত্য দর্শনের অধিকারভুক্ত। অতএব "সত্য বলিয়ো"—এ-বিধি দার্শনিকের প্রতিই প্রযোজ্য—সাহিত্যিকের প্রতি নয়। অপর পক্ষে "প্রিয় বলিয়ো" এ বিধি সাহিত্যিকের পক্ষেই প্রযোজ্য, দার্শনিকের প্রতি নয়। তারপর "অপ্রিয় সত্য কহিয়ো না"—এ নিষেধের দ্বারা যে বাক্য মুখ্যত অপ্রিয় তাই বাধিত হয়েছে, যা গৌণত তা নয়। উক্ত বিধি শিরোধার্য্য করে সমালোচকেরা যদি এমন কথা বলেন যার মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা জনসাধারণের মনোরঞ্জন করা এবং সে কথা যদি গৌণভাবে কারও পক্ষে অপ্রিয় হয়, তাহলে তাতে করে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা হয় না। অতএব উক্ত বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেও সমালোচকেরা যথেষ্ট অপ্রিয় কথা বলতে পারেন।

তারপর দেখা যাচ্ছে যে অপ্রিয় সত্য বলাই শাস্ত্র সম্মতে নিষিদ্ধ, কিন্তু অপ্রিয় মিথ্যা বলা সম্বন্ধে কোনই নিষেধ নেই। এ-বিষয়ে সমালোচকদের অবাধ স্বাধীনতা আছে। সুতরাং সমালোচনার হালফ্যাশান বজায় রাখবার জন্য উক্ত শাস্ত্রবচন অগ্রাহ্য করবার কোনোই প্রয়োজন নেই। অতএব রবীন্দ্রনাথ নববর্ষের পয়লা বৈশাখ এই পুরোনো কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে সমালোচনার স্বাধীনতা অপহরণ করবার চেষ্টা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য উক্ত বাক্যটির আবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হন নি, সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন যে শিশুসাহিত্যের পক্ষে শাসনের চাইতে লালন-পালন বেশি কল্যাণকর। বড়র পক্ষে ছোটর উপর হাত চালানো অকর্ত্তব্য, একথা বলায় এ বোঝায় না যে ছোটর পক্ষে বড়র উপর হাত-চালানো অকর্ত্তব্য। সুতরাং সমালোচকদের পক্ষে কৃতী লেখকদের প্রতি ধৃষ্ট তাড়না করবার অধিকার রবীন্দ্রনাথ কেড়ে নিতে চাননি। যে-সব সমালোচকদের motto এই—"মারি ত রাজা, লুঠি ত ভাণ্ডার," রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বীরত্ব খর্ব্ব করবার প্রস্তাব করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেন নি যে, একের লেখার জন্যে অপরকে গালিগালাজ করা অন্যায়। সুতরাং দেখা গেল যে, রবীন্দ্রনাথ এমন কথাও বলেননি যার দরুন সমালোচকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন। কেননা হালফ্যাশানের সমালোচনা তাঁর নিষেধের অধিকার-বহির্ভূত। একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম—একের লেখার জন্যে অপরকে প্রশংসা করতেও রবীন্দ্রনাথ কাউকে বারণ করেন নি।*

আশ্বিন, ১৩২৩

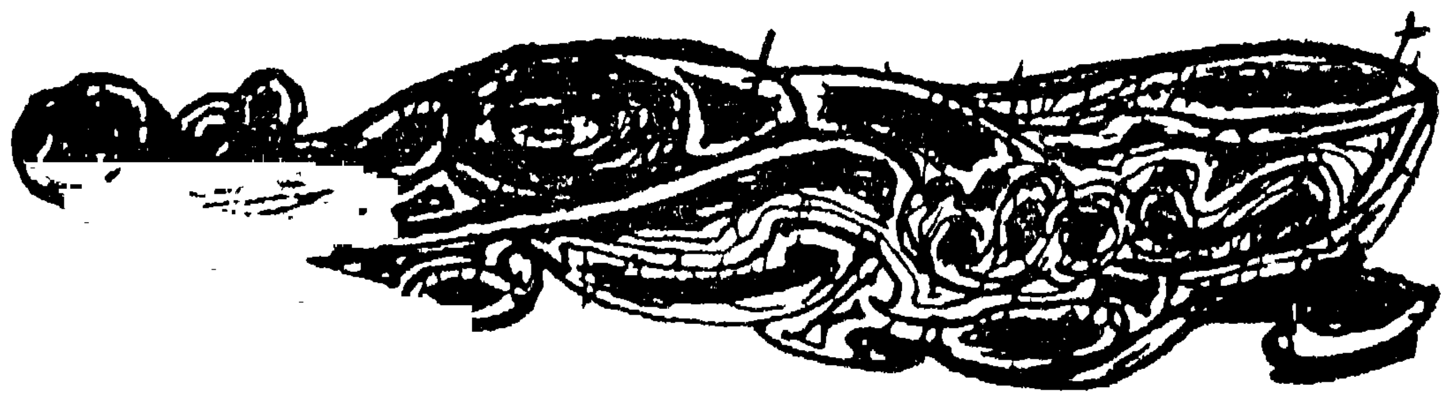

* এ লেখা দুটি বীরবলের পুরাতন অথচ এযাবৎ অপ্রকাশিত রচনাবলী থেকে সঞ্চয়ন করা।

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

কার্তিক ১৩৪৯

ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ

প্রবোধচন্দ্র সেন

যে-সকল ক্ষণজন্মা পুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হ'য়ে মানুষকে ইতিহাসের মহাযাত্রাপথে তার শেষ লক্ষ্যের অভিমুখে পরিচালিত ক'রে যান সেই সমস্ত মানবপ্রেমিকদের জীবনব্রতের চরম মূল্য নির্ণয় করার একমাত্র অধিকারী মহাকাল। সমগ্র মানবের অখণ্ড ইতিহাসের বিশাল পটভূমির উপরে তাঁদের জীবন-চিত্র গতিশীল কালের তুলিতেই মোটা রেখায় ও অক্ষয় বর্ণে অঙ্কিত হ'য়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ-জীবনের মহৎব্রত উদ্‌যাপন ক'রে অনন্ত কালের অদৃশ্য পথে মহাপ্রয়াণ করেছেন। বিশ্বমানবের জন্যে তাঁর জীবন যে বাণী বহন ক'রে এনেছিল বৃহৎকালের ব্যবধানে তার অর্থ ক্রমশ পরিস্ফুট হবে। বর্তমান কালের অনতিব্যবধান থেকে তাঁর সমুন্নত বিরাট্ ব্যক্তিত্বকে সমগ্রভাবে দৃষ্টিগোচর ও উপলব্ধি করা স্বভাবতই অসম্ভব। কিন্তু তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্বকে সর্বকালের বিশাল ভূমিকায় স্থাপন ক'রে পরিমাপ করার অধিকার আধুনিক কালের না থাকলেও বর্তমান যুগের যে বাণী ও ব্রত তাঁর মধ্যে মূর্তিপরিগ্রহ করেছিল তার স্বরূপনির্ণয়ের শুধু অধিকার নয়, দায়িত্বও

আধুনিক কালেরই। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যুগপ্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও বাণীর বৈশিষ্ট্য কোথায়, তা নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

প্রথমেই ব'লে রাখা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের পর্বে পর্বে একেকটি জাতির মধ্যে যে-সব মহাপুরুষ আবির্ভূত হন তাঁরা সকলেই একাধারে যুগপ্রতীক ও যুগপ্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও এই সত্যের ব্যতিক্রম ঘটেনি। যে-কালে তিনি আমাদের মধ্যে এসেছিলেন সে-কালের বিশ্ববাণী তাঁর মধ্যে সংহত হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শুধু তাই নয়, সে-কালের অন্তরে নূতন প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার ক'রে তাকে নবতর সার্থকতার অভিমুখে প্রেরণা দান করেছিলেন। স্বীয় কালের যে অভিপ্রায় ও সংকল্পকে তিনি আমাদের কাছে বহন ক'রে এনেছিলেন, তাঁর জীবনের ব্রতকে আমাদের মধ্যে পূর্ণতর রূপে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সেই যুগাভিপ্রায় ও সংকল্পের বাণীকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথের জীবনকাল বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি পরম যুগসন্ধিক্ষণ। এই সন্ধিক্ষণে বিচিত্র রকমের দানবীয় ও দৈব শক্তির সংঘাতে কালসমুদ্র যেমন প্রবলভাবে মথিত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে তেমনটি আর কখনো ঘটেনি। ওই মন্থন আসলে মানুষের চিত্তসমুদ্রেরই মন্থন। সেই উন্মন্থনের ফলে যে অমৃতরাশি উত্থিত হয়েছে তারই বাহকরূপে তিনি সমগ্র জীবনকাল বিশ্বজগতের কাছে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আর, যে আপাত-মনোরম তীব্র হলাহল উদ্‌গত হয়ে জনচিত্তকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করেছে, তাঁর সদাসতর্ক কণ্ঠ কঠিন ধিক্কারধ্বনিতে ওই হলাহলকে নিন্দিত ক'রে বিশ্বজগতের বিশেষত ভারতবর্ষের হৃদয়কে তার প্রতি বিমুখ ক'রে তুলতে চিরপ্রয়াসী ছিল। তাঁর জীবনের শেষ মহাবাণী 'সভ্যতার সংকট'-নামক রচনাটিতেই এ-কথার প্রমাণ জ্বলন্ত অক্ষরে দীপ্যমান হ'য়ে রয়েছে। যে-অমৃতের পাত্র তিনি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বহন ক'রে নিয়ে গিয়েছেন সে-অমৃত যে ভারতেরই অমৃত এ-কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। কাশীরাম দাসের গ্রন্থের যে বাণীটি আমাদের কানে এবং প্রাণে সব চেয়ে বেশি ক'রে ধ্বনিত হয় সেটি হচ্ছে,—'মহাভারতের কথা অমৃত-সমান'। গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথেরও জীবনসাধনার মূলবাণী হচ্ছে—'মহা-ভারতের কথা

অমৃত-সমান'। কিন্তু ওই বাণীকে তিনি নূতন অর্থে উদ্দীপ্ত এবং নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত ক'রে তুলেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী বাণীসাধনার মূল লক্ষ্যই হচ্ছে একটি বিরাট্ অখণ্ড অথচ বিচিত্র মহা-ভারত রচনা। যে মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ তিনি ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই রূপটি একই কালে ভৌমণ্ডলিক রূপ এবং মানস রূপ। ভারতবর্ষের মনকেই তিনি দেখেছিলেন তাঁর নিজের মনের মধ্যে। এই দৃষ্টিতে লক্ষ করলে তাঁর সমগ্র রচনাবলীকে আধুনিক কালের উপযোগী একখানি বিপুলকায় ও বহুপর্বিক মহাভারত ব'লেই স্বীকার করতে হবে। আপাত-দৃষ্টিতে প্রাচীন মহাভারত ও আধুনিক রবীন্দ্ররচনার মধ্যে শুধু যে অপরিমেয় পার্থক্যই লক্ষিত হবে তা নয়, এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যস্থাপনের প্রয়াসটাই নিরর্থক ব'লে মনে হবে। কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে বোঝা যাবে, উভয়েরই মর্মবস্তু এক; উভয়ের হৃৎপিণ্ড একই বিরাট্ ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে এবং সে ছন্দ হচ্ছে মহান্ ভারতবর্ষের মহত্তর আদর্শ ও অভিপ্রায়ের ছন্দ। রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় বলতে গেলে তখন ভারতবর্ষ "আপন বিরাট্ চিন্ময়ী প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষরূপে সমাজে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করতে উৎসুক হ'য়ে" উঠেছিল; দেশের বিদ্যা, মননধারা ও চিৎপ্রকর্ষের যুগব্যাপী ঐশ্বর্যকে একত্র সংহত ক'রে সুস্পষ্টরূপে নিজের গোচর ক'রে তোলার নিরতিশয় আগ্রহ জেগেছিল সমস্ত দেশের মনে। তখনকার কালের ওই অভিপ্রায় এবং সমস্ত দেশের ওই ঔৎসুক্য ও আগ্রহই রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তৎকালীন ভারতসংহিতার মধ্যে। আধুনিক কালেও সমগ্র দেশব্যাপী অভিপ্রায় এবং আত্মপ্রকাশের আগ্রহ রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় ক'রে তাঁর বিপুল রচনারাশির মধ্যেই মূর্ত ও স্থিরপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে, এ-কথা বললে কি অন্যায় হবে? মহাভারতকার কাশীরাম দাসকে লক্ষ্য ক'রে কবি মধুসূদন যে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তাকে ঈষৎ রূপান্তরিত ও অর্থান্তরিত ক'রে আমরা রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য ক'রেও বলতে পারি—

মহা-ভারতের কথা অমৃত-সমান,
হে রবি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

মহা-ভারতের বাণী-বাহক রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ সম্যক্ উপলব্ধি করা চাই; নতুবা ভারতবর্ষের মর্মনিহিত অভিপ্রায় ও আধুনিক কালের নির্দেশ আমাদের কাছে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ভৌগোলিক ভারতবর্ষের বিরাট্ পটভূমিরূপ হিমালয় পর্বতের বর্ণনার সূচনাতেই বলেছেন,—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।

নগাধিরাজ হিমালয়কে 'দেবতাত্মা' না ব'লে যদি 'ভারতাত্মা' নামে অভিহিত করা হ'ত তা-হ'লে শুধু যে কাব্যের ছন্দ-সংগতি অব্যাহত থাকত তা নয়, তার ভাবসংগতিও অধিকতর সুরক্ষিত হ'ত ব'লেই আমার বিশ্বাস। কেননা, ওই মহাগিরির বিরাট্ রূপের মধ্যে ভৌগোলিক ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা যে সত্যই অচলপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, এ-কথা বলাই বাহুল্য। আর, ভাবরূপী ভারতবর্ষের আত্মা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার মহাকবিদের রচনাবলীতে—ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের বাণীসংহিতাতে। বস্তুত এই ভারতাত্মা মহাকবিদের কাব্যসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত না হ'য়ে ভারতীয় আত্মার প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে', এই জনবাদের সার্থকতা শুধু যে ব্যাসের গ্রন্থ সম্বন্ধেই প্রযোজ্য তা নয়; অন্য তিনজন মহাকবির রচনাবলী সম্বন্ধেও এ-কথা সমভাবেই সার্থক। ভারতাত্মা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের আধুনিক যুগ যে অপূর্ব রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে, তাকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে রবীন্দ্রনাথকেও ঠিকমতো জানা যাবে না, আধুনিক যুগও আমাদের কাছে অচেনাই থেকে যাবে।

পূর্বেই বলেছি যে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ এ-দেশের আলোতে প্রথম নয়ন উন্মীলন করলেন সেটি বিশ্বের তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি মহাযুগ-সন্ধিক্ষণ। ইতিহাসের বহুবিচিত্র শক্তি সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের দেশে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল এবং ওই শক্তিসংঘাতের জটিল আবর্তের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল। সিপাহি-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাঁর জন্ম। আর ওই সিপাহি-যুদ্ধের অগ্নিশিখাতেই ভারতের পূর্বতন রাষ্ট্রশক্তিকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার সমস্ত আশা নিঃশেষে ভস্মীভূত হ'য়ে গিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য সংঘশক্তি ও অস্ত্রশক্তির নিকট ভারতীয় রাষ্ট্রশক্তি সম্পূর্ণরূপে পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হ'ল। শুধু রাষ্ট্রশক্তি নয়, চিত্তশক্তির ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্যের জয়ধ্বজা

ভারতভূমিতে সগর্বে প্রোথিত হ'ল। ইউরোপীয় বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রভৃতি তীব্র রশ্মিতে ভারতের চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়ে তার চিত্তকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। কিন্তু সুখের বিষয় প্রাচ্য আত্মাকে একান্ত পরাভবের গ্লানি থেকে বাঁচাবার রক্ষামন্ত্রটিও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ওই চিত্তসংঘাতের মধ্যেই নিহিত ছিল। শুধু তাই নয়, দুইটি অরণিকাষ্ঠের সংঘর্ষণে যেমন অগ্নি উৎপন্ন হ'য়ে যজ্ঞসমিধ্‌কে প্রজ্জ্বলিত ক'রে তোলে, তেমনি পূর্ব ও পশ্চিমের সংঘর্ষজাত অগ্নিশিখা ভারতীয় চিত্তকে যে উদ্দীপনা দান করল তাই তাকে নূতন সার্থকতার পথে প্রেরিত করেছে। ইউরোপীয় চিৎশক্তির বিদ্যুৎসংস্পর্শে যেন ভারতবর্ষের মুমূর্ষু দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হ'ল এবং সেই নবজাগরিত ভারত যেন চারদিকের পরাভবের অন্ধকারের মধ্যেও নূতন আলোতে নূতন পথের সন্ধানে উৎসুক হ'য়ে উঠল। বাংলাদেশের সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসটাই ওই নব চাঞ্চল্যের স্পন্দনে স্পন্দিত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এই দীর্ঘকালের সন্ধানেও ভারতবর্ষের পক্ষে আপন পথ, তার স্বকীয় সার্থকতার পথ আবিষ্কার করা সহজ হয়নি। ঊনবিংশ শতকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখি দুই দল লোক ভারতের তরণীকে দুইটি বিভিন্ন স্রোতোমুখে পরিচালিত করতে প্রবল প্রয়াস করছে। একদল চাইছে ভারতবর্ষকে অন্তরে-বাহিরে ভাবে চিন্তায় আদর্শে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন ক'রে তুলতে, আরেক দলের ইচ্ছা ভারতকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখা। অবশ্য এ-কথা বলাই বাহুল্য যে, উভয় দলেই আদর্শ ও অভিপ্রায়ের তারতম্য অনুসারে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ও পার্থক্য ছিল। তা-ছাড়া, আরেক শ্রেণীর লোক ছিল যাদের বলা যেতে পারে মধ্যপন্থী; তাদের উদ্দেশ্য প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের মধ্যে অল্পাধিক সমন্বয় স্থাপন করা। এই দলের অনুবর্তীদের সংখ্যাই ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মধ্যপথের রেখা কোথায় টানা হবে, সমন্বয়ের সীমা কোথায় তা নিয়েও মতপার্থক্যের অন্ত ছিল না। এই প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব ছাড়া আরও এক দ্বন্দ্ব তখন দেশে অত্যন্ত উগ্র হ'য়ে উঠেছিল। সে দ্বন্দ্ব হচ্ছে নূতন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব। কারও মতে প্রাচীন ভারতের সমাজ ও ধর্মব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত না করলে বর্তমান ভারতের সার্থকতা লাভের আশা নেই। আরেক দলের মতে ও ব্যবহারে প্রমাণিত হয় যে, তারা বর্তমানের ব্যবস্থাকেই

অল্পাধিক অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়। অবশ্য এ-ক্ষেত্রেও স্বভাবতই মধ্যপন্থাই অধিকাংশের চিত্তকে বেশি ক'রে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু মধ্যপথ কোথায় সে-বিষয়ে মতের একতা দেখা যায়নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তখনকার দিনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং প্রাচীন ও আধুনিক, এই চারটি বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে আমাদের জাতীয় চিত্ত আলোড়িত হচ্ছিল। সূক্ষ্মতর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বিরুদ্ধশক্তি আসলে চারটি নয়, তিনটি। প্রাচ্যপন্থীরাই প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই দলে বিভক্ত ছিল। আধুনিকপন্থীরা মোটামুটি রক্ষণশীল, সর্বপ্রকার পরিবর্তনেরই তারা বিরোধী; প্রাচীনপন্থীরা চান ভারতবর্ষের অতীতকেই ভবিষ্যতে প্রতিফলিত করতে, অর্থাৎ অতীতের আদর্শে ভবিষ্যৎকে গ'ড়ে তোলাই তাদের অভিপ্রায়। আর, প্রতীচ্যপন্থীদের মতে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎকে গড়তে হবে ইউরোপের আদর্শে। বলা বাহুল্য, সমস্যা হচ্ছে ভবিষ্যৎকে নিয়ে; ভারতের ভাবীরূপ হবে কেমন সেইটেই হ'ল মূল প্রশ্ন। রক্ষণশীলদের মতে সেটা হবে বর্তমানেরই অনুবৃত্তিমাত্র; প্রাচীনপন্থীদের মতে অতীতেরই প্রতিরূপ এবং প্রতীচ্যবাদীদের মতে ইউরোপীয় আদর্শের অনুকৃতি বা অনুস্মৃতি। বলা বাহুল্য আদর্শের এই রকম সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছিন্ন বিভাগ থাকা কখনও সম্ভব নয়। সকলেই অল্পবিস্তর সমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ওই সমন্বয়সাধনের উপলক্ষ্যে সকলেরই উক্ত তিন আদর্শের কোনো না কোনোটার প্রতি অল্পাধিক আকর্ষণ প্রকাশ পেত। কিন্তু দেশ তো তিন পথে অগ্রসর হ'তে পারে না। তাকে হয় একটি পথ বেছে নিতে হবে, না-হয় একটি নূতন পথ আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু সে কোন্ পথ? এই সমস্যাই তখন জাতীয় চিত্তকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল। ধর্মে-দর্শনে, সাহিত্যে-শিক্ষায়, সমাজে-রাষ্ট্রে সর্বত্রই এই সমস্যা তখন উদগ্র হ'য়ে উঠেছিল।

এই সমস্যার দিনেই রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন আমাদের জাতীয় সাধনার ক্ষেত্রে। স্বভাবতই তাঁকেও ভারতের যাত্রাপথনির্ণয়ের মহাব্রতে ব্রতী হ'তে হয়েছিল। তাঁকে নানা সময়ে নানা দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল, নানা দ্বিধায় আন্দোলিত হ'তে হয়েছিল। অবশেষে তিনি যে-পথকে ভারতবর্ষের সার্থকতালাভের যথার্থ পথ ব'লে অন্তরে স্থিরভাবে উপলব্ধি করলেন তাকে তিনি 'ভারতপথ' নামেই অভিহিত করেছেন। এই পথের সুস্পষ্ট পরিচয়

পাই তাঁর গোরা উপন্যাসে (১৩১৪-১৬), 'পূর্ব ও পশ্চিম'-নামক প্রবন্ধটিতে (১৩১৫), 'ভারততীর্থ'-নামক বিখ্যাত কবিতাটিতে (১৩১৭) এবং রামমোহন-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পঠিত অভিভাষণদ্বয়ে (১৩৪০)। তিনি নিজেও ছিলেন এই ভারতপথেরই পথিক এবং তাঁর স্বজাতিকেও ওই নির্দিষ্ট যাত্রাপথেই আহ্বান ক'রে গিয়েছেন। এই ভারতপথের বৈশিষ্ট্য কী, তা বিচার ক'রে দেখা অবশ্যকর্তব্য।

গোরা যখন নিজের জন্মগত পরিচয় লাভ করল তখনই সে বহু অনুসন্ধানের পর নিজের সত্যকার আত্মার পরিচয়ও লাভ করল। তখনই বলতে পারল, আজ আমি "সম্পূর্ণ অনাবৃত চিত্তখানি নিয়ে একেবারে ভারতবর্ষের কোলের উপরে ভূমিষ্ঠ হয়েছি।" এই আত্মোপলব্ধির ফলেই সে জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছে, "আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।...আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই—যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না—যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"

'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই প্রশ্ন তুলেছেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস"। এই প্রশ্নের আলোচনার গোড়াতেই তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্যই সমাহৃত"। তবে সে ইতিহাস কাদের? রবীন্দ্রনাথের মতে সে ইতিহাস সমস্ত মানবের বা মহামানবের এবং সেই মহামানবের ইতিহাস ভারতবর্ষের আধারে একটি বিশেষ রূপ ও বিশেষ কল্যাণসাধনের মধ্যেই সার্থকতা লাভ করবে। তাই তিনি খুব জোরের সঙ্গেই বলেছেন, "ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।" তাই যদি হয় তবে মহামানবের ভারতীয় ইতিহাসে আমাদের স্থান কোথায়, আমাদের কর্তব্য কী? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, "বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া

তুলিবার জন্যই আমরা আছি, মহা-ভারতবর্ষ গঠনের এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে; একদিন যে ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভবিষ্যতের অভিমুখে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে···সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ। একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড 'আমরা'র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ আরও যে-কেহ আসিয়া এক হউক না—তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।" মহাকালের যে অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আশ্রয় ক'রে অভিব্যক্তি লাভ করছে রবীন্দ্রনাথের মতে তার লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীর সমস্ত মানবকে ভারতবর্ষের মধ্যে মিলিত করা এবং ভারতবর্ষকেও সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে প্রসারিত করা; আমরা সমস্ত পৃথিবীর, সমস্ত পৃথিবীও আমাদের; আমাদের জন্যে বুদ্ধ খ্রীস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করেছেন। এই ব্যাপক বিশ্ববোধের ভিত্তির উপরেই তিনি পূর্ব ও পশ্চিমকে ভারতবর্ষের ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কেননা, "ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনা" করাই ভারতীয় ইতিহাসের বর্তমান যুগের অভিপ্রায়। এই যুগাভিপ্রায়কে সার্থক ও সফল ক'রে তোলারই মহৎ ব্রত ধারণ করেছেন ভারতের নবযুগ-প্রবর্তক মহামনীষীরা—রামমোহন রায়, রাণাড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। "যখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির যোগসাধন হইবে, তখন ভারত-ইতিহাসের যে-পর্বটা চলিতেছে সেটা শেষ হইয়া যাইবে এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।" ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিকে বিশ্বাভিমুখী ক'রে তোলার দ্বারাই, পূর্ব ও পশ্চিমের যথার্থ মিলনের দ্বারাই আমরা নিজেরা সার্থক হব এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের অভিপ্রায়কেও সফল করতে পারব। ভারতীয় ইতিহাসের এই বিশ্বমিলনাভিমুখী পথকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতপথ নামে অভিহিত করেছেন। আর 'ভারততীর্থ'-নামক যে বিখ্যাত রচনাটির মধ্যে তাঁর এই সত্যোপলব্ধি সংহত ও উজ্জ্বল হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে, সে কবিতাটিকেও তিনি "ভারতপথের গান" নামে অভিহিত করেছেন। "ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানাজাতি ও নানা শক্তির সমাগম" হয়েছে তাদের সকলের সম্মিলিত ঐক্যের

মধ্যেই ভারত-ইতিহাসের নবতর ও উজ্জ্বলতর উদ্বোধন ঘটবে। সেই প্রদীপ্ত প্রভাতের প্রত্যাশাতেই কবি বিশ্বের সমস্ত জাতিকে ভারতবর্ষের মহামানবের মিলনতীর্থে আহ্বান করেছেন।—

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসে এসো খ্রীস্টান।

ভারতের ব্রত হ'ল ঐক্যসাধনা এবং যত বড়ো বিরাট্ দেশ এই ভারতবর্ষ তত বড়োই তার এই ঐক্যের সাধনা। প্রাচীনকালের ইতিহাসে দেখা যায়—

কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হ'তে সমুদ্রে হ'লো হারা।

এইটেই হ'ল ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম প্রবণতা। তাই কবি নিঃসংশয়-চিত্তেই তার ভাবী পরিণতি সম্বন্ধেও বল্‌তে পেরেছেন —

দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।

ভারতের সেই চিরন্তন বিরাট্ ঐক্যের সাধনা এবং ভবিষ্যতের তদ্রূপ বিরাট্ ঐক্যপরিণতির বাণী কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে —

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট্ হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার,
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত-শিরে —
এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।

এই ভারততীর্থ কবিতার প্রায় সমকালে রচিত "জনগণ-মন-অধিনায়ক"-ইত্যাদি জাতীয় সঙ্গীতটিতেও অখণ্ড ভারতের মিলনবাণীর মন্ত্র উদ্গীত হয়েছে।—

অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি' তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রীস্টানী—
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে, ভারত-ভাগ্যবিধাতা।

'পথ ও পাথেয়' (রাজাপ্রজা) নামক প্রবন্ধটিতে (১৩১৫) রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসকে আরও বিস্তৃত ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে তার অন্তরতম প্রবণতা কোন্ দিকে এবং তার সার্থক পরিণতি কোথায় তাই দেখিয়েছেন। "ভারতবর্ষের মতো নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর একটি সুমহৎ কর্মের ভার দিয়াছেন। ... আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড়ো বড়ো শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো না কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।" অতঃপর আর্য-অনার্যের মিলন, বৌদ্ধধর্মের মিলনমন্ত্রের প্রভাবে ভারত ও মঙ্গোলীয় জাতিসমূহের মধ্যে একাত্মতা-স্থাপন, শঙ্করাচার্যকর্তৃক খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়সমূহকে অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা ও ইস্‌লাম ধর্মরূপী ঐক্যমন্ত্রবাহী আরেক মানব-মহাশক্তির আবির্ভাবের কথা উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছেন, "তখন চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য— শাস্ত্রের অনৈক্যকে— ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্মসেতু নির্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনই যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে— রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী—ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের এই একেকটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপমাত্র নহে, ইহারা পরস্পর-গ্রথিত ; ... ইহারা .. বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর আর-কোনো দেশেই এত বড়ো বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই— এত জাতি এত ধর্ম এত শক্তি কোনো তীর্থস্থলেই একত্র হয় নাই— একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। ... ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা

এককে ব্রহ্মকে প্রেমে জ্ঞানে ও কর্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্মশালার কঠোর সংকীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক— ভারত-ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খ্রীস্টান, পূর্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে— ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূর কাল হইতে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ্ এমন আশ্চর্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। ... তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশের মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সংকীর্ণ করিয়া দেখিবেন না। ... যে-ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎ শক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাট মূর্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে, সমস্ত আঘাত-অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরম-প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত ভক্তির সহিত ভারত-বিধাতার পদতলে নিজের নির্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন। ভারতের মহাজাতীয় উদ্বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন, "এখানে নানাজাতের লোক একত্র এসে জুটেছে। পৃথিবীতে অন্য কোনো দেশে এমন ঘটেনি। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতেই হবে, এই হ'লো ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম সমস্যা। এক করতে হবে বাহ্যিক ব্যবস্থায় নয়, আন্তরিক আত্মীয়তায়। ইতিহাস মাত্রেরই সর্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্— এক হয়ে চলব, এক হ'য়ে বলব, সকলের মনকে এক ব'লে জানব। এই মন্ত্রের সাধনা ভারতবর্ষে যেমন অত্যন্ত দুরূহ এমন আর কোনো দেশেই নয়। যতই দুরূহ হোক এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ ছাড়া রক্ষা পাবার অন্য কোনো পথ নেই।...ভারতবর্ষের এই শাশ্বত বাণীকে জয়যুক্ত করতে কালে কালে যে মহাপুরুষেরা এসেছেন... সেই মুক্তিদূতের মধ্যে একজন ছিলেন কবীর, তিনি নিজেকে ভারতপথিক বলে জানিয়েছেন। নানা জটিল জঙ্গলের মধ্যে এই ভারতপথকে যাঁরা দেখতে

পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আরেকজন ছিলেন দাদূ।...সেই পথের পথিক আধুনিক কালে রামমোহন রায়।...তাঁর মৃত্যুর পর একশত বৎসর অতীত হ'লো।...কিন্তু রামমোহন রায় পুরাতত্ত্বের অস্পষ্টতায় আবৃত হ'য়ে যান নি। তিনি চিরকালের মতোই আধুনিক। কেননা, তিনি যে কালকে অধিকার ক'রে আছেন তার এক সীমা পুরাতন ভারতে।...তার অন্য দিক চ'লে গিয়েছে ভারতের সুদূর ভাবীকালের অভিমুখে।...তিনি বিরাজ করছেন ভারতের সেই আগামী কালে, যে-কালে ভারতের মহাইতিহাস আপন সত্যে সার্থক হয়েছে, হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান মিলিত হয়েছে অখণ্ড মহাজাতীয়তায়।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আজীবন সাধনার ফলে আমাদেরকে যে-পথের সন্ধান দিয়েছেন এবং যে-পথে তিনি আমাদের পুনঃপুনঃ আহ্বান ক'রে গিয়েছেন সে হচ্ছে এই মহা-ভারতেরই পথ, এই মহা-জাতীয়তার পথ। ভারতপথিক রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর যে উক্তি উপরে উদ্ধৃত করা গেল, বলা বাহুল্য সেটি তাঁর নিজের সম্বন্ধেও সর্বতোভাবেই প্রযোজ্য। বস্তুত তিনি নিজেই ছিলেন ওই ভারতপথেব সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপথিক।

প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্মের যে শাখাটি বিশ্বমৈত্রীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে প্রায় সমগ্র এসিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তুর্কিস্থান থেকে জাপান ও মঙ্গোলিয়া থেকে যবদ্বীপ পর্যন্ত সর্বমানবকে জাতিবর্ণনির্বিশেষে একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিল, তার নাম মহাযান। যে মহাতরণী তখন উদ্ভাবিত হয়েছিল সে তরণী ছোটো ছিল না; দেশবিদেশের ছোটো-বড়ো উচ্চনীচ সকল নরনারীরই ঠাঁই হয়েছিল সে মহাতরণীতে। গভীর ভাবে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সমগ্র ভারতবর্ষই ওই মহাযানধর্মী; এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস বস্তুত ওই ভারত-মহাযানেরই ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আর্য-অনার্য, গ্রীক-পারসিক, শক-হূণ, আরব-তুর্কি, পাঠান-মোগল, পর্তুগীজ-ইংরেজ প্রভৃতি কত জাতি যে এই মহাতরণীতে আরোহণ ক'রে একই সার্থকতা, একই অখণ্ড মহাজাতীয়তার লক্ষ্যাভিমুখে যাত্রা ক'রে কালসমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বস্তুত ভারত-মহাযানের যাত্রাপথই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারত-মহাপথ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। পূর্বোক্ত বৌদ্ধ মহাযান ধর্মের একটি মতবাদ সর্বাস্তিবাদ নামে

পরিচিত। সর্বাস্তিবাদীদের দার্শনিক দৃষ্টিতে বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত কিছুরই সার্থকতা স্বীকৃত হ'য়ে থাকে, কোনো কিছুরই অস্তিত্ব অস্বীকার্য নয়। ভারত-দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকেও সর্বাস্তিবাদী নামে অভিহিত করলে অন্যায় হয় না। কেননা, ভারতবর্ষকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তাতে মহাভারতবর্ষ-গঠনের উপাদান হিসাবে দেশী-বিদেশী, প্রাচীন-নবীন সমস্ত জাতি, শক্তি ও ধর্ম্মমতেরই সার্থকতা ও উপযোগিতা স্বীকৃত। ভারতবর্ষে তিনি যে মহাজাতি-সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, সেই সমন্বয়ের সাধনায় প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক ধর্ম্মমতেরই সমবেত আত্মোৎসর্গ একান্ত আবশ্যক। "সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীর" ছাড়া যে মা'র অভিষেক সুসম্পন্ন হ'তে পারে না, এ-বাণী তো তাঁরই।

যা-হোক, রবীন্দ্রপ্রদর্শিত এই ভারতমহাপথের সম্যক্ পরিচয় লাভ করা চাই, নতুবা রবীন্দ্রনাথকেই যথার্থ ভাবে বোঝা যাবে না। তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের যে উজ্জ্বল ও পরিপূর্ণ রূপ ফুটে উঠেছিল, ধ্যানী রবীন্দ্রনাথকে সত্যভাবে জানতে হ'লে ভারতবর্ষের সেই রূপটিকেও প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা চাই। কেননা, সাধনা ও ধ্যান-লব্ধ সত্য এবং ধ্যানী সাধকের আত্মস্বরূপ একই প্রতিষ্ঠাভূমিতে অভিন্নরূপে মিলিত হ'য়ে যায়। মহাযানধর্মী ভারতবর্ষের বিশ্বরূপ দর্শন করতে এবং তার ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের লক্ষ্যাভিমুখী মহাপথের সন্ধান পেতে রবীন্দ্রনাথকে দীর্ঘকালব্যাপী সাধনায় রত হ'তে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হ'লে তাঁর ওই সাধনার ইতিহাসটিও বিশদভাবে জানা চাই। সে ইতিহাসটিকে সংহতরূপে দেখা যায় গোরা উপন্যাসে ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের অভিব্যক্তিতে, আর বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় তাঁর সমগ্র রচনা-বলীতে ও তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী কর্মসাধনাতে। কিন্তু সে ইতিহাস বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের যে বিশ্বতোমুখী রূপ দর্শন করেছিলেন তার তিনটি প্রকাশ। প্রথম প্রকাশ ভূগোলগত, দ্বিতীয় প্রকাশ ইতিহাসগত এবং তৃতীয় প্রকাশ আদর্শ বা ভাবগত। কিন্তু এই তিনটি প্রকাশ পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়, বরং কার্যকারণসূত্রে অতি ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপের দ্বারাই তার ঐতিহাসিক রূপ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। ভূগোলের রঙ্গমঞ্চেই

ইতিহাসের নাট্যলীলা চলে, শুধু এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়; কোনো দেশের ঐতিহাসিক নাট্যলীলায় ওই দেশের ভৌগোলিক রূপও অন্যতম শ্রেষ্ঠ অথচ মূক অভিনেতারই কাজ করে, এ-কথা বললেই অধিকতর সত্য বলা হয়। আর কোনো জাতির ইতিহাসকেও কতকগুলি চঞ্চল ও আকস্মিক ঘটনার সমষ্টিমাত্র রূপে দেখাও সত্য দেখা নয়। আপাতচঞ্চল ঘটনাপ্রবাহের অন্তরে থাকে একটি অচঞ্চল প্রতিষ্ঠাভূমি এবং আকস্মিকতার মায়াযবনিকার অন্তরালে দেখা যায় কোনো-একটি বিশেষ পরিণতি ও স্থির লক্ষ্যের অভিমুখে জাতীয় আত্মাভিব্যক্তির অবিচলিত গতি। অপ্রকাশের গুপ্ত গুহা থেকে উৎসারিত হ'য়ে অনন্ত প্রকাশের অভিমুখে জাতীয় আত্মা ও চিত্তাভিব্যক্তির যে প্রবাহ, তারই নাম জাতীয় ইতিহাস। তাই কোনো জাতির আত্মস্বরূপের যথার্থ পরিচয় পেতে হ'লে ওই জাতির ইতিহাসকে সত্যরূপে জানা চাই। কেননা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, "ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়ের চরম কথাটি হচ্ছে, আত্মানং বিদ্ধি" (প্রবাসী—১৩৪৯, আশ্বিন, পৃ. ৫৩৫)।

"নিজের কাছে নিজের পরিচয়টাকে বড়ো করবার চেষ্টাই সভ্যজাতির ইতিহাসগত চেষ্টা।" অর্থাৎ ইতিহাসের ভিতর দিয়েই প্রত্যেক জাতির আত্মোপলব্ধি ঘটে। যা-হোক, ইতিহাসের নিত্য চাঞ্চল্যের অন্তরালে জাতীয় চিত্তের অন্তর্নিহিত যে আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ পরিপূর্ণ সার্থকতার অভিমুখে নিরন্তর প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠছে সেটিই হচ্ছে জাতির ভাবরূপ।

রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রূপ, ঐতিহাসিক রূপ ও ভাবরূপ, এই তিন রূপেরই অপূর্ব পরিচয় পাই। ওই ভাবরূপ আবার সমাজ ও ধর্ম এই দুইটি পৃথক্ অথচ সংশ্লিষ্ট মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমাজের আদর্শ ও ধর্মের আদর্শকে আশ্রয় ক'রেই ভারতবর্ষের ভাবরূপ ব্যক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মতে ভাবরূপী ভারতবর্ষের আত্মা কখনও রাষ্ট্ররূপ বা রাষ্ট্রীয় আদর্শের সাধনায় সিদ্ধিলাভের প্রয়াস করেনি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের ভৌগলিক রূপ, ঐতিহাসিক রূপ এবং সমাজ ও ধর্মগত ভাবরূপের কথা কয়েকটি প্রবন্ধে ক্রমে ক্রমে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্যায়

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

রবীন্দ্রকাব্যের নানা পর্যায়। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে শেষলেখা পর্যন্ত আশ্চর্য পটপরিবর্তন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে তখন মৌমাছির মধু-জোগান নতুন পথ নেয়। কোনো কোনো মধু বিগলিত তার মাধুর্যে, তার রং হয় রাঙা; কোনো পাহাড়ি মধু দেখি ঘন, আর তাতে রঙের আবেদন নেই, সে শুভ্র; আবার কোনো আরণ্য সঞ্চয়ে একটু তিক্ত স্বাদেরও আভাস থাকে।" তাই বারে বারে নতুন নতুন পথে রবীন্দ্রকাব্যের অভিযান। গীতাঞ্জলির পর বলাকা, পূরবীর পর পরিশেষ, শেষসপ্তক পুনশ্চের পর আবার পালাবদল। এর প্রত্যেকটিই আশ্চর্যজনক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থগুলি আবার যে একটী নূতন অধ্যায়ের সূচনা করেছে তার শিল্পকার্য রবীন্দ্রসাহিত্যেও অনন্য। এদের মূলপ্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল; বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তাহলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।" এই হাওয়াবদলের পূর্বাভাস রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনেকদিন হতেই পাওয়া যাচ্ছিল; শুধু কাব্যে নয়, তাঁর গদ্য রচনাতেও। কিন্তু এদের পরিণতি বিশেষ করে তাঁর শেষ চারটি কাব্যগ্রন্থে—রোগশয্যায়, আরোগ্য, জন্মদিনে, শেষলেখা।

রবীন্দ্রকাব্যের এই পর্যায়ের প্রত্যেক দিকেই যে নূতনত্ব সুস্পষ্ট সে নূতনত্ব শুধু যে রবীন্দ্রসাহিত্যেই অভূতপূর্ব তাই নয়, বাংলাসাহিত্যের বর্তমান আদর্শ ও ভবিষ্যৎ বিকাশের দিক্ দিয়ে এর বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্র-কাব্যে ইতিপূর্বে যে পালাবদল দেখা গেছে তার মধ্যে ভাষা ভঙ্গী ও আঙ্গিকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হলেও সে পরিবর্তনও সম্ভবতঃ এত সুদূরপ্রসারী নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সুর বেজেছে, সে সুরের ভঙ্গীও নানাপ্রকারের; কিন্তু তবু হয়তো তাদের মধ্যে কোনো না কোনো আত্মীয়তার

বন্ধন ছিল। কিন্তু শেষের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যা লিখলেন তার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন; মনে হয় এ একেবারেই নতুন সুর, তার ভঙ্গীটাই বদলে গেছে। এই কাব্যগ্রন্থগুলিতে যে যে নতুন লক্ষণ পাওয়া যায় তার কোনো-কোনোটি হয়তো এককভাবে পূর্বে দেখা গিয়েছিল, কিন্তু এগুলির একত্র সমাবেশ সেখানে ছিল না। সেইজন্য পূর্বে তাদের একক প্রকাশের সার্থকতা যাই কিছু থাক, কাব্যের প্রাণের সঙ্গে তাদের এই সর্বাঙ্গীন যোগ ছিল না। কিন্তু এখানে সবই নতুন, কেননা গোড়ার কথাটাই স্বতন্ত্র। সেইজন্য এবারের পালাবদল সম্পূর্ণ, যার ফলে ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক, বিষয়বস্তু, ভঙ্গী, সবই নবরূপ ধারণ করেছে।

এই পালাবদলের দুটি দিক্ আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কাব্যে এই যে হাওয়াবদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক, এমনি স্বাভাবিক যে এর কাজ হোতে থাকে অন্যমনে।" প্রথমেই চোখে পড়ে সৃষ্টিবদল—ভাষা, ভাব, আঙ্গিকের কথা। কিন্তু সেইটেই সব কথা নয়। তার পিছনে আছে হাওয়া-বদল, কবির চারপাশের ও কবির মনের হাওয়াবদল, যার থেকে সৃষ্টিবদল সম্ভব হল। হাওয়াবদলের সঙ্গে সৃষ্টিবদলের এই বিচিত্র সম্বন্ধই একহিসেবে সাহিত্যসৃষ্টির ইতিহাস, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কী এইখানে তার পরিচয় মেলে। এই গ্রন্থগুলির হাওয়াবদল এবং সৃষ্টিবদল বাংলাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় বিস্ময়কর। প্রথমেই বাহ্য লক্ষণগুলির কথা আলোচনা করা যেতে পারে। আঙ্গিকের পরিবর্তন আশ্চর্য। ছন্দের মহোচ্ছ্বাস ঝংকার একেবারেই তিরোহিত। স্বল্পভাষিতায়, বন্ধনে, মিলহীনতায় এদের কাঠিন্য অদ্ভুত। কিন্তু এই আঙ্গিক নানা রসপ্রকাশের উপযুক্ত, এদের ভারবহনের ক্ষমতা অসীম। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্র ফুটে উঠেছে বর্ণবিহীন রেখার টানে। যেমন 'রোগশয্যায়' আট-সংখ্যক কবিতা। হেমন্তের সকালবেলার বর্ণনায় কোয়াসার বর্ণহীন পাণ্ডুতা ভাষায় ছোঁয়াচ লাগিয়েছে, এতই তার নিরাভরণতা। তেমনি যতিচিহ্ন স্বল্পতম, প্রত্যেক অনাবশ্যক যতি সযত্নে পরিহার করা হয়েছে—

মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা পানে,
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।

পাণ্ডুবর্ণ হয়ে আসে সূর্যোদয়
আকাশের ভালে,
লজ্জা ঘনীভূত হয়
হিমসিক্ত অরণ্যচ্ছায়ায়
স্তব্ধ হয় পাখিদের গান।

এ যেন কবিতার সূত্ররূপ, একেবারেই বাহুল্যবর্জিত। প্রথমে ঘটনাটির বিবরণ, পরে কেবলমাত্র দুটি বর্ণনা, তাতেও কবির নিজের মনের খবর নেই, আছে যেন শুধু দুটি সংবাদ। কিন্তু এই নিরাভরণতার উৎপত্তি অনুভূতির অভাব থেকে নয়, তার মূল অনুভূতির তীব্রতাতেই। বরং অনুভব এখানে এতই তীব্র যে এই বাহ্য নিরাভরণতা ছাড়া তার অন্য কোনো আঙ্গিক সম্ভব নয়। এই অনুভূতির মধ্যে গভীরতা আছে, কিন্তু মহোচ্ছ্বাস সমারোহ নেই। সেইজন্য তার প্রকাশভঙ্গীও এখানে সপ্তস্বরে ঝংকৃত নয়, একটি গভীর সুরে অনুরণিত। এই গ্রন্থগুলির নিরাভরণতার প্রকৃত রহস্য এইখানে। পূর্বোদ্ধৃত কবিতাটিতে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় যেন সূর্যোদয় পাণ্ডুবর্ণ হল এইটুকুই যথেষ্ট, আর কিছু বলার নেই। কিন্তু প্রকৃতই কি তাই? এই শান্ত সমাহিত ভাবের পিছনে কী তীব্রতা, কী প্রকাশভঙ্গী, কী উপমা। সত্যি কথা বলতে কি চিত্রার যে কোনো কবিতার অনুরূপ বিষয়ের কুড়ি লাইন বর্ণনার চেয়ে এর যে কোনো একটি লাইনের ব্যঞ্জনা ঢের বেশী, উপমার কঠিন দীপ্তি যেন চোখ ঝলসায়, তার চিত্ররূপ যেন বর্ণবিরলতা সত্ত্বেও উজ্জ্বলতর, চোখ চেয়েও মনের উপর প্রভাব বেশী। এই বিস্ময়কর সংক্ষিপ্তি পদে পদে। কিন্তু এই চিত্র-অঙ্কনেই এদের প্রকাশক্ষমতা শেষ হয়ে যায় নি। আরও গভীর বিষয় বর্ণনার ক্ষমতাও কম নয়, এ আঙ্গিকেই যেন সেগুলি বেশী ফুটেছে। শেষলেখার তের-সংখ্যক কবিতায় কবি বলেছেন তাঁর জীবনের ইতিহাস—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি,
মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি,
পেল না উত্তর॥

জীবনের চিরন্তন রহস্যের কথা এতো ভালো করে বর্ণনা রবীন্দ্রনাথও সম্ভবতঃ আগে করেন নি। ক্ষণে ক্ষণে যেখানে রং বদলায়, যেখানে বর্ণ গন্ধ গানের, সুখের দুঃখের কষ্টের বিচিত্র শোভাযাত্রা চলেছে, তার বর্ণনার রংও ক্ষণে ক্ষণে বদলায় আমরা এই দেখে এসেছি— তার গভীর রহস্য কাব্যকেও রহস্যময় করে তোলে, তার সুরের ওঠানামা ছন্দে স্পন্দিত হতে থাকে। কিন্তু এখানকার রহস্য সেরকম স্বতঃপ্রকাশ নয়, সে বাইরে একরঙা। এ যেন মহাসমুদ্রের গম্ভীরতা, তার বিরাট্ স্তব্ধতার তলায় অতল রহস্য। ঝরনার উচ্ছলতার, তার রামধনু রঙের সন্ধান এ কাব্যে নেই।

সেই সঙ্গে ছন্দের ভঙ্গীও রবীন্দ্রকাব্যে নতুন। অক্ষর বা মাত্রা গুণে সমান ওজনের লাইন গড়ার বন্ধন থেকে ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ মুক্তি দিয়েছিলেন প্রধানতঃ বলাকায়। তারপর হতে এই বন্ধনমুক্ত ছন্দ কখনও ধীরগতিতে কখনও দ্রুততালে চলেছে। তারপরে এল গদ্য কাব্যের যুগ। কিন্তু সে কাব্যে মিল না থাকলেও মীড় ছিল, প্রচলিত অর্থে কবিতার ছন্দ না থাকলেও সে ছন্দের দোলা কখনোই থামে নি। বাস্তবিকপক্ষে তাঁর গদ্য কাব্যগুলিতে বহু সময় মিল না থাকলেও ঝংকারের প্রাচুর্য; গদ্যকাব্যে সাধারণতঃ যে নির্মোহ নিরুচ্ছ্বাস আশা করা হয়ে থাকে, তার সন্ধান অনেক সময়েই মেলে না। কবি যা লিখেছেন সবসময়ে সে যে তাঁর মনের সঙ্গে মেলে নি তার প্রমাণ গদ্য কবিতাগুলির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে, সমাসবদ্ধ শব্দের বাহুল্যে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেটরিকের প্রাদুর্ভাবে। অথচ যখন কবি গদ্যকাব্য লিখছেন না তখন তার মধ্যে এমন ছন্দের এমন বলার ভঙ্গীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে যা কেবল আজকের দিনের পীড়িত সমাজের বেদনা-ব্যথিত কবির পক্ষেই রচনা করা সম্ভব; তার মধ্যে ছন্দদোলা (এবং অন্যান্য লক্ষণও) তিরোহিত হয়ে এমন একটি

নিরাভরণ শুভ্রতা এনে দিয়েছে যে-শুভ্রতার মধ্যে নানা বর্ণের সমাবেশ নেই, কিন্তু তার প্রাখর্যে চোখ ঝলসায়। ছান্দসিকের মতে এই কাব্যগ্রন্থগুলির ছন্দের চাল হয়তো সমমাত্রার কি বিষমমাত্রার। দুইমাত্রা বা তিনমাত্রার চাল এখানেও আছে। কিন্তু সেইটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। লক্ষ করার বিষয় এদের গতি, যা রবীন্দ্রসাহিত্যের পয়ার বা তিনমাত্রার চাল কোনোটিরই সমধর্মী নয়। যেমন এই লাইন ক'টি—

দুঃখরাতের স্বপনতলে
প্রভাতী তোর কী যে বলে
নবীন প্রাণের গীতা,
জানিস নে তুই কি তা॥

যখন রবীন্দ্রনাথ তিনমাত্রার চাল উদ্ভাবন করেন তখন বলেছিলেন এই তিনমাত্রার চালের একটা বড় সুবিধা সে গড়িয়ে চলে, তার মধ্যে ভাব স্বতঃই উচ্ছ্বসিত হতে চায়। কিন্তু উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে তিনমাত্রার চালেও উচ্ছ্বাসের লেশমাত্র নেই; যেন অদৃশ্য যতি আছে, একটানা প্রবাহ নেই; তার গতি অবিরাম নয়। এর চেয়েও স্থিরগম্ভীর যেগুলি দুইমাত্রার চাল—

রৌদ্রতাপ ঝাঁ ঝাঁ করে
জনহীন বেলা দুপহরে।
শূন্য চৌকির পানে চাহি
সেথায় সান্ত্বনালেশ নাহি।

ছোট ছোট বাক্যাংশ, যেন সংবাদ-শিরোনামার ভঙ্গীতে লেখা। কিন্তু এই শিরোনামার তলায় অনেক সংবাদ, অনেক কথা প্রকাশ হবার জন্য ভিড় করছে। সে কথাগুলি ভাষার পোশাকে আত্মপ্রকাশ করে নি, আপাততঃ তারা উহ্য; কিন্তু ঐ সংক্ষিপ্ত লাইনগুলিকে ভর করে তারা আমাদের বুকে লাগে। এদিক দিয়ে দুইমাত্রার চাল সার্থকতর। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার উপরেও দুটি জিনিস সংযোজন করলেন। প্রথম, মিলবর্জন; দ্বিতীয়, অসম পংক্তি ব্যবহার। শেষলেখার তের-সংখ্যক যে কবিতাটি উদ্ধৃত হয়েছে সেটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অসম পংক্তি ব্যবহারেও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ কোনো পংক্তিই বিশেষ দীর্ঘ নয়। সেইজন্য শেষসপ্তক, পুনশ্চের লাইনগুলি যখন দীর্ঘায়িত ভঙ্গীতে

তাদের চড়া সুরের পরিচয় দেয়, এ লাইনগুলির ক্ষুদ্রতা কবিতার ভাষা ও ছন্দের নিরুচ্ছ্বাস সংক্ষিপ্তিকে ফুটিয়ে তোলে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় কি বলাকা-পলাতকায়, কি শেষসপ্তক-পুনশ্চে একটি ছোট লাইনের পরই একটি বড় লাইন,—অন্তত দুই বা কয়েকটি লাইন মিলে একটি পরিপূর্ণ তরঙ্গ। কিন্তু এখানে সব লাইনগুলিই প্রায় ছোট,—সে তরঙ্গ নেই, ওঠা পড়ার সন্ধান এখানে মেলে না। এরকম নিরাভরণতায় ও বাহুল্যবর্জনে কাব্যের মহিমা কতটা বাড়ে তার পরিচয় এর পূর্বে এমন পাওয়া যায় নি। কাব্যের প্রাণধর্মই যদি তার মাধুর্য তবে সেই প্রাণধর্ম ই তার একমাত্র মণ্ডন, তার অন্য অলংকারের প্রয়োজন হয়তো নেই-ই।

সেইসঙ্গে এই কাব্যগ্রন্থগুলির ভাষা লক্ষ্য করার মতো। কিছুদিন পূর্বে 'ছেলেবেলা'র সমালোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন এতদিনে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি ভাষা সৃষ্টি করলেন যাকে বলা চলে basic বাংলা। সেই basic বাংলার ছাপ এই কবিতাগুলিতেও। বরং সংক্ষিপ্তি আরও বেশী, প্রবাহ আরও কম। ভাষার যে উচ্ছলতা, উপমার যে প্রাচুর্য রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদ্য, সে উচ্ছলতা বা সে প্রাচুর্যের কোনো সন্ধানই এখানে মিলবে না। এই অমণ্ডিত পটভূমিকায় উপমাগুলির রূপ স্পষ্টতর। তাদের উজ্জ্বলতা উদ্ভাসিত আলোর উজ্জ্বলতা নয়, অন্ধকার রাতে তারার সূচীমুখ দীপ্তির মতো। "মিলের চুমকি গাঁথি ছন্দের পাড়ের মাঝে মাঝে।" প্রতিদিনের ঘরকন্নার কথা হতে সংগৃহীত, কিন্তু উপমাটির নূতনত্ব অসাধারণ।

গাছে গাছে জোনাকির দল
করে ঝলমল
সে নহে দীপের শিখা, রাত্রি খেলা করে আঁধারেতে—
টুকরো আলোক গেঁথে গেঁথে।

রূপ-নারানের কূলে
জেগে উঠিলাম,
জানিলাম এ-জগৎ
স্বপ্ন নয়।

উপমায় সমারোহ নেই, প্রতিদিনের চলতি পথের বাঁকে বাঁকে যে ঘরোয়া কথা ঘরোয়া দৃশ্য নজরে পড়ে তাদেরই তির্যক্ ব্যবহার। ফলে তাদের এই বিশেষত্ব। উপমার জন্য চাঁদ চকোরে যাবার প্রয়োজন নেই, এ আমাদের চারপাশের দৃশ্য হতে আহরিত ছবি, কিন্তু তা শিল্পীর রেখার টানে নব রূপ ধারণ করে। পুকুরপাড়ে বেতের ঝোপ দেখালো "সবুজের আলপনায় রং দিয়ে লেপে।" এদের অসাধারণত্ব আরও বাড়িয়েছে এদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। অতি সংক্ষিপ্ত অতি সহজ ভাষা ও বর্ণনার মধ্যে ঐ এক-একটি বিস্ময়কর শব্দ ও উপমা। "ওঙ্কারিয়া যায়।" ভাষা যতই সহজ বা সংক্ষিপ্ত হোক, ঐ একটি শব্দের ব্যঞ্জনাই যথেষ্ট, আপাতঃসংক্ষিপ্তির পিছনে যে তীব্রতা ও যে অনুভূতি আছে হঠাৎ তার সন্ধান মেলে। তেমনি উপমাগুলিতে। তারা অপ্রত্যাশিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে, সেইজন্য তাদের এমন সার্থকতা। তির্যক্ ভঙ্গীর জন্য অর্থের ঠোকাঠুকির প্রয়োজন হয় নি, সাধারণ ছবির অসাধারণ ব্যবহারই এ কাব্যরীতির অন্যতম লক্ষণ।

কবির বক্তব্যকে নানা অলংকারে সাজিয়ে তোলাই প্রচলিত কাব্যরীতি। এই অলংকার কখনও সরল কখনও তির্যক্। সাহিত্যের বিভিন্ন যুগে কখনও সরল কখনও বা তির্যক্ ভঙ্গীর প্রাধান্য। একহিসেবে সরল হতে তির্যক্ ভঙ্গীতে যাত্রার ইতিহাসই কাব্যের বিবর্তনের ইতিহাস, এমন কি রবীন্দ্র-কাব্যেরও ইতিহাস। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়ে সেই মূল রীতি সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগল। শব্দের ব্যঞ্জনা, ভাষার তির্যক্ ব্যবহার, নতুনতরো উপমা প্রভৃতি যে অলংকরণগুলি সাম্প্রতিক সাহিত্যের প্রায় প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠেছিল, সেগুলি সম্বন্ধে একটা বড় প্রশ্নচিহ্ন পাওয়া গেল এই কাব্যে। আশঙ্কা ছিল সাম্প্রতিক অলংকরণের ভঙ্গীর পরিণামে আসবে শুধুই একটা কথা বলার ভঙ্গী, যা প্রায় মুদ্রাদোষের মতোও শোনাতে পারে। কিন্তু সাম্প্রতিক সাহিত্যকে এই অপঘাতমৃত্যুর হাত হতে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধার করলেন। এই উদ্ধার সম্ভব হল নতুনতরো অলংকারের মধ্য দিয়ে নয়, একেবারে অলংকার বাদ দেবার চেষ্টায়,—সাহিত্যে প্রাণের কথার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল, শুধু বলার ভঙ্গীটাই প্রধানতম রইল না। আঙ্গিক বক্তব্যের অনুযায়ী, কিন্তু আঙ্গিকের খাতিরে বক্তব্য গড়তে হয় নি। যাঁরা বাংলার আধুনিক কবি তাঁদের পক্ষে বোধ হয় এই দিকটি বিশেষ

ভাবে আলোচ্য, কেননা রবীন্দ্রনাথ আর-একবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন—আঙ্গিকের পরিবর্তনেই কাব্য সফল বা আধুনিক হয় না, তার জন্য মৌলিক পরিবর্তন দরকার।

২

আজকাল বাংলা কবিতায় যে নব ভঙ্গী প্রচলিত হচ্ছে তাকে 'সাম্প্রতিক কাব্য' 'আধুনিক কাব্য' প্রভৃতি নানা আখ্যা দেওয়া হয়। সে কাব্যের গোড়ার কথাটা এই যে চারপাশে যে হাওয়াবদল হচ্ছে তার জন্য সৃষ্টিবদল অবশ্যম্ভাবী, তা না হলে কাব্য স্বধর্মচ্যুত হল। রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্যায়েও এই মতবাদের স্বপক্ষে স্বাক্ষর আছে। তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, কেননা কাব্যের স্বাধর্ম্য চিরকালই এই। অন্যত্র বলবার চেষ্টা করেছি প্রকৃত কাব্যমাত্রই আধুনিক, কেননা তা বর্তমান মানুষেরই মনের অভিব্যক্তি। যে কাব্য আধুনিক নয় সে কাব্য অনাধুনিকও নয়, সে অকাব্য। কিন্তু সে আলোচনা এখানে অবান্তর। তার আগে দেখা প্রয়োজন কবির রচনায় যে সৃষ্টিবদলের কথা উপরে আলোচনা করলুম তার পিছনে কী হাওয়াবদল আছে।

এই শেষপর্যায়ের কবিতাগুলি আলোচনা করলে প্রথমেই মনে হয় এগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গীর সন্ধান দিয়েছেন যা আনন্দ-উচ্ছল কবির স্বত-উৎসারিত গান নয়, যা জগতের বেদনা-ব্যথিত কবির বাণী। পীড়িত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই এর বহু কবিতা লেখা। তার প্রথম স্পষ্ট লক্ষণ কবি বহু কবিতায় সভ্যতার এই অন্ধকার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিজের বেদনার কথা উল্লেখ করেছেন। "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ", কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সভ্যতার সংকট আমাদের সম্মুখীন সে সম্বন্ধে কবির উদাসীন থাকার উপায় নেই, সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস না হারানো ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠছে। কবি চোখের সামনে দেখছেন—"রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের, শত শত নগর-গ্রামের অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে।" এই লোভের বিরুদ্ধে কবির তীব্র ধিক্কার—"সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো, দেশ-বিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত।" তাঁর আশঙ্কা—"আদিম বন্যতা তার উদ্ঘারিয়া উদ্দাম নখর, পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে, ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।" যে কবি চিরদিন মানবের জয়গান

করেছেন তাঁর পক্ষে এই অবস্থা দুর্বিষহ। এ কথা অস্বীকার করা ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠছে যে মানুষ তার জীবনের সার্থকতার দিকে অচেতন, সে আজ "আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে, বিধাতার সংকল্পের নিত্যই করেছে বিপর্যয়, ইতিহাসময়।" কাজেই কালান্তরের ঘোষণা আজ আকাশে বাতাসে মুখর হয়ে উঠল, কবি অনুভব করছেন—"জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা, সুতীব্র অক্ষমা।" এ কথা আজ প্রায় নিশ্চিত যে এই শ্মশানতাণ্ডবের মধ্যেই এ যুগের অবসান ঘটবে, কেননা মানুষ আপন সত্তার বিপর্যয় ঘটাতে ঘটাতে যেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে সেখান হতে তার সহজে উদ্ধার নেই; চিতাভস্মের ভিতর দিয়ে ছাড়া নবযুগের আগমন সম্ভব নয়—

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বী বেশে
চিতাভস্ম-শয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্ত মনে,
আজ সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

কবির এই দৃষ্টিভঙ্গী হতে রচিত কবিতাগুলির রীতি ও প্রকৃতিও সেইজন্য নতুন। পূর্বে এ কবিতাগুলির ছন্দ, ভাষা ও কথনভঙ্গীর যে বিশেষত্বের কথা আলোচনা করেছি তার মূল এইখানে। গোড়ার দৃষ্টিভঙ্গীটাই পৃথক, সেইজন্য তার প্রকাশের ভঙ্গীও অন্যরকম। গীতাঞ্জলির ভাষা ও ছন্দের নিবিড় মৃদু মাধুর্যে এই সুতীব্র অক্ষমা অসন্তোষ প্রকাশ করা চলতো না, এর জন্য চাই স্ফুলিঙ্গ। পূর্বে ভাষার সংক্ষিপ্তি ও তীব্রতা, উপমার দীপ্তি সম্বন্ধে যা উল্লেখ করেছি তা এই স্ফুলিঙ্গের কাজ করে—সংক্ষিপ্ত পরিধিতে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যে গভীর অনুভূতি, তীব্র রোষ, পুঞ্জীভূত অসন্তোষ স্ফুরিত হয়ে উঠছে তা কেবলমাত্র এই আঙ্গিকেই সম্ভব এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই সম্ভব। কিন্তু শুধু তাই নয়, এমন এমন দিকে কবির দৃষ্টি পড়েছে যা সাধারণতঃ তাঁর কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং যা কোনোও আনন্দ-উচ্ছল কবির গানেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের

সমাজ জীবনের নানা অন্তরঙ্গ এবং এ-পর্যন্ত-অনাদৃত চিত্র এ কবিতায় সম্মান পেলে। গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ দূরদেশে চলেছে, প্রাচীন অশথতলায় খেয়ার আশায় লোক বসে থাকে, গঞ্জের টিনের চালাঘরে সারি সারি গুড়ের কলস, সেখানে কুকুর আর মাছির প্রাদুর্ভাব, বলদের পিঠে স্তূপাকার শর্ষে, কাঠি হাতে কৃষাণবালক তরমুজ-লতা হতে ছাগল তাড়ায়, ইঁদারার টানা জল ভুট্টার ফসলে প্রাণ দিতে নালা বেয়ে সারাদিন কুলু কুলু চলে, পিতল-কাঁকন-পরা হাতে ভজিয়া একটানা সুরে জাঁতায় গম ভেঙে চলেছে। আজ জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা কবির মনে এই সব উপেক্ষিত ছবি এনে দিচ্ছে, এগুলি তাঁর চোখে বড় হয়ে উঠেছে। তিনি অনুভব করছেন বিশ্বরাষ্ট্রচক্রে যে নয়ন-স্তম্ভন পরিবর্তন চলেছে তার আড়ম্বর যতই থাক সে সবই অন্তঃসারশূন্য, তার পিছনে আছে প্রকৃত মানুষের দল যারা এই মনুষ্যত্বের অপমান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, যারা এই আড়ম্বরের পিছনে নিজেদের কাজ নিঃশব্দে করে চলেছে।

আরবার সেই শূন্যতলে
আসিয়াছে দলে দলে
লৌহবাঁধা পথে
অনলনিঃশ্বাসী রথে
প্রবল ইংরেজ
বিকীর্ণ করেছে তার তেজ।
জানি তারো পথ দিয়ে বয়ে যাবে কাল
কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশবেড়া জাল।

...

মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কল কলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;

ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।
…
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ 'পরে
ওরা কাজ করে॥

যে সামাজ্যগুলির উত্থানপতনের কথায় আমাদের ইতিহাস মুখর মানব-সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাসে তাদের স্থান নেই। সেখানে প্রয়োজন অনাদৃত উপেক্ষিত সমাজের ছবি, পদদলিত অপমানিতের ইতিহাস। কিন্তু এই ছবি আঁকতে বা এই ইতিহাসরচনায় অনুকম্পার সুর নেই, কারণ দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পার মূলে থাকে ঘৃণা, আত্মম্ভরিতা ও স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্বে অবিচল বিশ্বাস। তাদের এই সম্মান তাদের স্বকীয় অধিকারেই প্রাপ্য। মনুষ্যত্বের এই অপমান যতদিন চলবে ততদিন সাহিত্য সার্থক হয়ে উঠবে না। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে তাঁর নিজের কৃতিত্বেও সন্দেহ করেছেন—

অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
…
আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

খ্যাতি-অখ্যাতির সীমানার পারে এসে কবি নিজের ত্রুটি স্বীকার করছেন কেবল মানবমহিমার প্রকৃত মূল্য দেবার জন্য,—যে গৌরব অত্যাচারিতদের প্রাপ্য সে গৌরবের যথোচিত গান তাঁর পক্ষে গাওয়া হয়তো সম্ভব হচ্ছে না এই আশঙ্কায়। "তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা, আমার সুরের অপূর্ণতা"। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখানে অপূর্ণতা কবির সুরের নয়, প্রকৃত কথা এই যে মানুষকে কবি যে মহৎ সম্মান দিয়েছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথের লেখনীও যথেষ্ট নয়। এই সম্মাননার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের শ্রেণীবিভাগ, মানুষে মানুষে পার্থক্যরচনা। কবিকে বাধা পেতে হয়েছে

তাঁর বিচিত্র অনুভূতির পথে, সম্মানের চিরনির্বাসনে তিনি সমাজের উচ্চমঞ্চে বন্দী। কিন্তু এই ভেদরচনা চিরকাল সম্ভব নয়—

আসিবে বিধির কাছে হিসেব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে॥

৩

এই হ'ল হাওয়াবদলের সামাজিক ইতিহাস। কিন্তু এ ছাড়াও এই হাওয়া-বদলের ফলে রবীন্দ্রনাথের মনে কয়েকটি পরিবর্তন এসেছে যার সুস্পষ্ট ছাপ এই কবিতাগুলিতে। তার বহু বৈচিত্র্যের সব দিক আলোচনা সম্ভব নয়। কিন্তু তার দু-একটি দিকের নবীনতা অনস্বীকার্য।

কিছুদিন হতেই রবীন্দ্র-কাব্যে মৃত্যুর যে ছায়া পড়েছিল তার প্রথম পরিচয় সম্ভবতঃ প্রান্তিকে। সে ছায়া কালো ছায়া, তার মধ্যে যন্ত্রণা আছে কিন্তু সমারোহ নেই। সেইজন্য এ মরণ তাঁর 'শ্যাম-সমান মরণ' হতে পৃথক, এর মধ্যে কবির নবজাতকের দৃশ্যপট উন্মীলিত হচ্ছে না। এই করাল ছায়া প্রসারিত হয়েছে তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থগুলিতে। নানা কবিতায় তার আভাস। "পীড়নের যন্ত্রশালে চেতনার উদ্দীপ্ত প্রাঙ্গণে কোথা শেল শূল যত হতেছে ঝংকৃত, কোথা ক্ষতরক্ত উৎসারিছে।" আরও বিস্ময় মানুষের যন্ত্রণা সহ্যের ক্ষমতায়। "মানুষের ক্ষুদ্রদেহ, যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।" কিন্তু এই যন্ত্রণায় তাঁর অন্তরাত্মা বিচলিত হয় নি ; সেই অন্তরাত্মার একটি দেহবিচ্ছিন্ন আত্মস্বরূপ আছে যাতে দেহের যন্ত্রণা তাঁকে অভিভূত করতে পারে নি।

এমন উপেক্ষা মরণেরে
হেন জয়যাত্রা—
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে—

এই উপেক্ষা সম্ভব হয়েছে কেননা তাঁর মন সত্তার আবরণমুক্ত।

আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে

লয়ে মোর নাম মোর খ্যাতি
কৃপণের সঞ্চয় যা কিছু
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত
গৌরব ও অগৌরব
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যায়
তারে আর পারি না ফিরাতে ;
মনে মনে তর্ক করি আমিশূন্য আমি,
যা কিছু হারাল মোর
সব চেয়ে কার লাগি বাজিল বেদনা।

আমিশূন্য আমির পক্ষেই সম্ভব হয়েছে মৃত্যুর করাল ছায়া সত্ত্বেও নিজের তরী নিজের হাতে সাজানো। কেননা,—

অন্তহীন কালে
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।

আর,

এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদ দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ-পারাবার,
সূর্য যেথা করে সন্ধ্যাস্নান
যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্‌বুদের মতো
উঠিতেছে ফুটিতেছে,
সেথায় নিশান্ত-যাত্রী আমি
চৈতন্যসাগর-তীর্থপথে।

সেইজন্য এখনও তাঁর বিস্ময়, এখনও তিনি বলেন "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি", এখনও "মোর চেতনায়, আদি সমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায়", তিনি যে অপরিমিত দান পেয়েছেন তার জন্য তাঁর অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। পৃথিবীর বর্ণ-সমারোহ ঐশ্বর্য এখনও নিঃশেষ নয়, তাঁর এখনও আক্ষেপ তাঁর "স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক।" বিরাট্ মানবচিত্তের অকথিত বাণীপুঞ্জের প্রকাশ

করার দায় হতে কোনোকালেই তাঁর মুক্তি নেই। কিন্তু এই দায়ভারেও কবি কেন্দ্রচ্যুত হন নি। 'আমিশূন্য আমি' কুহেলিকামুক্ত চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাই সম্ভব হয়েছে চরম মুহূর্তে নিজের জীবনতরী নিজের হাতে সাজানো। তাঁর এই 'আমিশূন্য আমি' তাঁর জীবনবেদের একটি নব পর্যায়। পূর্বে দেখেছি তাঁর জীবনদেবতার নানারূপ, কিন্তু সবসময়েই সেই জীবনদেবতার সঙ্গে তাঁর একটি নিবিড় যোগ বর্তমান। কিন্তু শেষ পর্যায়ের জীবনবেদ সম্পূর্ণ পৃথক্, তার মধ্যে জীবনদেবতা নেই, আছে শুধু চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি। মান অভিমান, দেওয়া নেওয়া, মিলনবিরহের পালা নেই, আছে নির্মোহ স্বরূপবোধ, নিশ্চিন্তে বোঝাপড়া, সশ্রদ্ধ আনন্দস্বীকৃতি। রসের লীলার পরিবর্তে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ। নিজের জীবনের লীলায় কবি নিজেই দর্শক, সেখানে "আমার কীর্তিরে আমি করি না বিশ্বাস", সেখানে "লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে, ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আসে।" তিনি অনুভব করছেন,—

পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল-কিছু মাঝে।

এই নৈর্ব্যক্তিকতার ফল সুদূরপ্রসারী। এমন কি এই কবিতাগুলির যে বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করেছি তাদের মানস-ইতিহাসে এই নৈর্ব্যক্তিকতার একটা বড়ো স্থান আছে, এ কথা বলা সম্ভবতঃ অত্যুক্তি নয়।

৪

রবীন্দ্রকাব্যে জীবনবেদ একটি বিস্ময়কর বস্তু। ক্ষুদ্র পরিসরে তার আলোচনা সম্ভব নয়। তবুও এই শেষ-পর্যায়ের নব জীবনবেদের কথা যে সংক্ষেপে উল্লেখ করলুম তার একটি কারণ আছে। সাহিত্যসৃষ্টির পিছনে দুটি জিনিসের ঘাতপ্রতিঘাত থাকে। যেখানে সাহিত্যসৃষ্টি চলছে সেখানে শিল্পী একা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন।"

এই হল সাহিত্যরচনার ক্রিয়া। কিন্তু এর পিছনে আরও একটি ইতিহাস আছে। "সৃষ্টিকর্তা যে, তাকে সৃষ্টির উপকরণ কিছু বা ইতিহাস জোগায় কিছু বা তার সামাজিক পরিবেষ্টন জোগায়, কিন্তু এই উপকরণ তাকে তৈরি করে না।" এই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা সে আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করে। সেইজন্য যখন সমাজে হাওয়াবদল হল তখন তার অনুভব প্রথম সাড়া তোলে কবির সংবেদনাশীল মনে, তাঁর ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটা তখন বিচিত্র নয়। সেইজন্য হাওয়াবদলের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির উপকরণও পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে হাওয়াবদলের সঙ্গে সৃষ্টিবদলও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওই উপকরণগুলি কবিকে তৈরি করে না, কবিই সেই উপকরণগুলি ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে স্রষ্টারূপে প্রকাশ করেন। সেইজন্য যখন সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে কবির মনের মিল নেই তখন তাঁর শিল্পকার্যে রুচি থাকে না, কেননা তাঁর সৃষ্টির উপকরণ তাঁর মনের মতো নয়। এখানেই সমাজ সাহিত্যের উপর ছায়া ফেলে। যে কবির সঙ্গে তাঁর পরিবেশের মিল হল না তাঁর কাব্যে অদ্ভুত আত্মকেন্দ্রিকতা, দুর্বোধ্য ভাষা ও উপমা দেখতে পাওয়া যায়, যাকে কেউ কেউ বলেন সুর্‌রিয়ালিজম। কিন্তু সেটা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচয় নয়, সেখানে কবির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কবির পরিবেশের সংঘাত চলছে। বর্তমান সমাজব্যবস্থা কোনও সচেতন কবিরই মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়, কেননা মনুষ্যত্বের যে জয়গান কবির প্রাণধর্ম সেই প্রাণধর্মপালনের পথে একালের সমাজব্যবস্থা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীতে সব চেয়ে বেশি কষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক, কারণ তাঁর চেয়ে স্বাধর্ম্যসচেতন কবি দেখা যায় নি। কিন্তু তাঁর কাব্যের শেষ-পর্যায়ে তিনি কবিধর্মের যে জয়গান গাইলেন তার মূলে আছে এই নৈর্ব্যক্তিকতা। মনে হয় কবি সকল সমস্যা সকল ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে থেকেও বিচলিত হন নি, তাঁর আপাতঃ-নির্লিপ্তির মধ্যেই এই ঘাতপ্রতিঘাতের সমন্বয় ঘটেছে। ফলে এই কবিতাগুলিতে এই পরিবর্তন। তারা সকল বাহুল্য ছেঁটে ফেলে দৃঢ় ঋজুতায় প্রতিষ্ঠিত হল। এ কবিতা খাঁটি কবিতা, অর্থাৎ তার মধ্যে কেবল কবিতার প্রাণবস্তুটি আছে, কোনও আবর্জনা নেই। এই আদর্শ শুধু যে কাব্যরচনায় নব রীতির নির্দশক তাই নয়, সমাজে যেমন কাব্যেও তেমন সকল

বন্ধন ভেঙে ফেলার ফলেই সম্ভব হল অনাদৃত অপমানিতের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া, কবিধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। শুধু তাই নয়, একদিকে যেমন এই কারণে কবির পরিবেশের সঙ্গে কবির ব্যক্তিত্বের সংঘাত ঘটে নি', অন্যদিকেও তেমনি বক্তব্যের সঙ্গে আঙ্গিকের অদ্ভুত মিল দেখা গেল। এর প্রত্যেকটিই সার্থক, একটি ছাড়া অপরটির অন্য কোনো উপায়ে সুন্দরতর প্রকাশ সম্ভব হত না।

বাংলার আধুনিক কবিরা যখন রবীন্দ্রনাথের শেষ-পর্যায়ের কবিতাগুলির সমালোচনা করেন তখন তাঁদের উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে প্রায়শঃই ইঙ্গিত থাকে এইবার তাহলে রবীন্দ্রনাথও বাংলার আধুনিক কবিদের দলে, তাঁর পক্ষেও আর এসব এড়িয়ে থাকা চলছে না। নবজাতকের সমালোচনায় কোনো আধুনিক কবি বলছেন, "মানি, কাব্যসমালোচনায় এ-সব প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু এ-সব প্রশ্ন এড়িয়ে কাব্য যে আর চলতে পারছে না, এই 'নবজাতক' গ্রন্থই তার একটি প্রমাণ।" 'কবিতা' পত্রিকায় 'সানাই'-এর যে সমালোচনা হয়েছিল তাতে 'বাদুড়' 'অন্ধকার' প্রভৃতি 'আধুনিক' রূপক রবীন্দ্রনাথ ক'বার ব্যবহার করেছেন সমালোচক উৎসাহসহকারে তার বিবরণ দিয়েছিলেন। কিন্তু এ চেষ্টা বৃথা ও হাস্যকর। আধুনিকতা রূপকের দ্বারা সৃষ্ট হয় না। তার জন্য প্রয়োজন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর—এবং স্বতন্ত্র আঙ্গিকেরও। কিন্তু যারা মনে করেন সোনালি চাঁদের পরিবর্তে সবুজ চাঁদ বললেই চরম আধুনিকতা হল তাঁরা কাব্যের মূল প্রকৃতির অবমাননা করেন। পরিবর্তনটা ভিতরের তাগিদে, বাইরের ফ্যাশানে নয়। সেইজন্য যদি মনুষ্যত্বের অমর্যাদার ফলেই বর্তমান সমাজ ও বর্তমান সাহিত্যের অস্বাস্থ্য তা হলে সে রোগের প্রতিবিধান হচ্ছে মনুষ্যত্বের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া। সেটা কী ভাবে সম্ভব এ যুগে তার আধুনিকতম এবং হয়তো শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের শেষ-পর্যায়ে। কিন্তু যাঁরা আধুনিকতার নামে পূর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কিন্তু ক্ষুদ্রতর গণ্ডীরচনা করে জনসাধারণ হতে নিজেদের আরও দূরে সরিয়ে রাখবেন, সমাজবোধের নামে উৎকট আত্মকেন্দ্রিকতাকে চালাতে সংকুচিত হবেন না, সামাজিক কারণে তাঁদের উৎপত্তিতে বিস্মিত না হলেও এ কথা নিশ্চিত যে তথাকথিত আধুনিকতার আবরণ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। আধুনিক কবিদের প্রতি অনুরোধ,

তাঁরা যেন পুরাতনের পুরাতন এবং নূতনের নূতন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পিঠ-চাপড়ানি সমালোচনা না করেন, কেননা সেটা স্বকীয় ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক হবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর খ্যাতির বোঝা নিঃসংকোচে নামিয়ে রেখে অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছেন সেই আধুনিক কবিকে যে কবি এই কৃত্রিমতার আবরণ থেকে কাব্যকে মুক্তি দেবেন, মানুষ আজ স্বকৃত গণ্ডীর বন্ধনে তার যে সহজ মহিমাকে বিস্মৃত হতে চলেছে সেই মহিমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি বলেছেন,—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে-কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।

রবীন্দ্রনাথের এই মহা-উত্তরাধিকারের দায় কার জানি না, কিন্তু তাঁর সাবধান-বাণী আজ বিশেষভাবে স্মরণীয়,

সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।

পত্রাবলী

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত —

ওঁ

বন্ধু,

আপনি বুঝি আমার পাঠিকাকেও খাটিয়ে নিচ্ছেন? তিনি যে দুটি নাম দিয়েছেন সে ঠিকই হয়েছে কিন্তু তাঁর নালিশ সম্বন্ধে আমার তরফে দুটি একটি কথা বলবার আছে। আমার এই কবিতাগুলি সবই খোকার নামে— তার একটি প্রধান কারণ এই যে ব্যক্তি লিখেছে সে আজ চল্লিশ বছর আগে খোকাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে খুকী ছিল না তার সেই খোকাজন্মের প্রতি প্রাচীন ইতিহাস থেকে যা কিছু উদ্ধার করতে পেরেছে তাই তার লেখনীর সম্বল—খুকীর চিত্ত তার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া আর একটি কথা আছে—খোকা এবং খোকার মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠমধুর সম্বন্ধ সেইটে আমার গৃহস্মৃতির শেষমাধুরী— তখন খুকী ছিল না—মাতৃশয্যার সিংহাসনে খোকাই তখন চক্রবর্ত্তী সম্রাট ছিল সেই জন্যে লিখ্‌তে গেলেই খোকা এবং এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্য্যাস্তের পরবর্ত্তী মেঘের মত নানারঙে রঙিয়ে ওঠে—সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেল্‌বে—তাকে নিবারণ করতে পারিনে।

শিশুখণ্ডের কবিতাগুলি আপনি যে রকম সাজিয়েছেন তথাস্তু। কেবল একটি বক্তব্য আছে। খোকা নিজের জবানীতে যে কবিতাগুলির নায়ক সেগুলিকে ছাড়াছাড়ি করে দেওয়া কি চলে? বস্তুত সেটা একই মানুষের চরিত্র চিত্রাবলীর মত—তারা সবগুলো জড়িয়ে একটি খোকাকে প্রকাশ করবে— সে যে কেবল সাধারণ খোকার type মাত্র তা নয়—সে একটি বিশেষ খোকাও বটে—কাজেই এই কবিতা পর্যায়ের মাঝে মাঝে অন্য কবিতার প্রবেশ কি অনধিকার প্রবেশ হবে না?

আচ্ছা বেশ, "খেলা" না হয় বুড়োদের জন্যেই রইল। মঙ্গলগীতি গ্রন্থশেষে দেবেন।

শৈলেশ যে "মাধুরীবিনিময়" নাম দিতে চেয়েছেন সেটা ঠিক সঙ্গত বলে মনে হয় না। খোকাকে যখন আমরা সমস্ত রঙীন সুন্দর ও মধুর জিনিষ দিয়ে খুসি করি ও খুসি হই তখনি বুঝতে পারি আমাদের জন্যে জগৎটা কেন এমন রঙীন সুন্দর মধুর হয়েছে। জগতের অস্তিত্বের পক্ষে মাধুর্য্যটা সম্পূর্ণ অতিরিক্ত —ওর কোন তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না; কিন্তু আমাদের সব রকম ভালবাসার উপলক্ষেই সৌন্দর্যের বিকাশ আমাদের কাছে চরম আবশ্যক হয়ে ওঠে। ভালবাসা না থাকলে সৌন্দর্যের কোন অর্থই থাকে না—মধুর হওয়া—মধুর করা প্রেমেরই চেষ্টা, স্নেহেরই আবেগ—ওটা শুদ্ধমাত্র সত্যের প্রয়োজনের বাইরে। খাদ্য আমাদের কাছে মধুর না হয়েও ক্ষুধার জবরদস্তিতে খাদ্য হতে পারত—শব্দ আমাদের কাছে সঙ্গীত না হয়েও নিজের গায়ের জোরেই শব্দ হতে পারত—কিন্তু যার এত জোর আছে সে তার সমস্ত জোর লুকিয়ে মধুর হতে চায় কেন? ফুল তার বিপুল প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক শক্তিকে গোপন রেখে এমন কোমল এমন অপরূপভাবে ফুল হয়ে উঠ্‌চে কেন? আমরা যখন নিজে ভালবেসে মধুর হই—মাধুরী দিই—মাধুরী লাভ করি তখনি তার তাৎপর্য্য বুঝতে পারি। এই সমস্ত কথা আপনি কি নামের মধ্যে বাঁধ্‌তে পারেন জানিনে। মোটের উপর, "মধুর কেন?" এই নামটাতেই ঐ কবিতাটির ভিতরের প্রশ্ন ও তারই উত্তরের আভাস কতকটা ধরা দেয়। কি বলেন? আমাকে প্রথম সংস্করণ কড়ি ও কোমল একবার পাঠাতে পারেন? তার থেকে যদি ভেঙেচুরে বদ্‌লেসদ্‌লে আরো দুটো চারটে জিনিস গড়ে তোলা যায় তবে চেষ্টা করতে পারি। ইতি ২৫ শে শ্রাবণ ১৩১০।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

ওঁ আলমোড়া

বন্ধু,

এডিটরের দায়িত্ব আপনার। যখন থাম্‌তে হবে, বলবেন "বাস্‌।" আপনি কল চালিয়েছেন— এখন "furiously rash driving" বলে আমার

নামে নালিশ করতে পারবেন না। ক্রমে উত্তাপ যত বাড়িতে থাকে চাকাও তত ছুটে চলে। যতই লিখ্‌চি নিজের ভিতরে যে বালকাণ্ড আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্চে। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় ত থামা আবশ্যক— সে সম্বন্ধে কিন্তু আমার একলার প্রতি নির্ভর করে থাকবেন না—রাশ টেনে ধরবেন।

শিশুখণ্ডের ছন্দগুলির অংশভাগ করে ছাপাবেন। অর্থাৎ ত্রিপদীকে তিন লাইনে ছড়িয়ে দেবেন—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর" প্রভৃতি কবিতার বড় লাইন গুলোকে দুই লাইনে ভেঙে দেবেন। একটা কবিতা যে পাতায় শেষ হবে সে পাতায় অন্য কবিতা আরম্ভ করবেন না। দুই লাইনের মাঝখানে বেশ একটু ফাঁক রাখ্‌বেন। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় বোধ হয় ১৮ লাইনের বেশি ধরবে না।

এখানে অবিশ্রাম বৃষ্টি—মেঘে চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ। ইতি ২৮শে শ্রাবণ ১৩১০।

আপনার শ্রীরবীন্দ্র

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত—

৪ হেরম্ব দাসের লেন

৩২ এ শ্রাবণ ১৩১০

বন্ধু,

অনেকদিন আপনাকে চিঠি লিখ্‌তে পারি নে। মনটা বড় বিক্ষিপ্ত ও কতকটা বিষণ্ণ হয়েছিল। শরীরের অসুস্থতা বোধ হয় একটা কারণ, কাজের ভিড় ও লোকের ভিড়ও যে ছিল না এমন নয়। সংসার আমাদের হৃদয়ের ভেতর যে ধূলা ঝাড়ে তাতে হৃদয় ছোট হলে বড় বিপদ—কাদায় ভরে ওঠে, শেষে শুকিয়ে যায়।

... ...

শিশুখণ্ডে নূতন কবিতা ত এখন ২৬টি হল। আপনি সচ্ছন্দে লিখ্‌তে থাকুন। আমার হাতে যদি লাগাম থাকে ত আমি এখন বাহক পেলে রাশ

আল্‌গা করে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বারবার ঘুরতে পারি। বাস্তবিক Words-worth সেই যে লিখেছিলেন

"And see the children play upon the shore"

কিন্তু কি খেলা তারা খেল্‌ত তা ত লেখেন নি—এইবার তার বৃত্তান্তটি পাওয়া যাচ্ছে। যতদিন না ছাপা বইখানি ছেলে বুড়োদের হাতে ঘোরে আপনি কেন লিখতে থাকবেন না তার কি কোনো কারণ দেখাতে পারেন?

আপনি আপনার পাঠিকার প্রশ্নের যে জবাবটি দিয়েছেন সেটি একটু নূতন ভাবে আপনার পরিচয় দিয়াছে। নূতন ভাবে বল্‌ছি এই জন্যে যে অনেক সময় আমরা কবি হৃদয়ের গভীরতা, seriousness প্রভৃতির উল্লেখ করে থাকি কিন্তু তার একটি concrete দৃষ্টান্ত দেখ্‌লে তবে কথা সার্থক হয়। আমার সৌভাগ্য এই যে আমি এক কবিকে দেখেছি। অন্য কত যায়গায় কবিকে অনুমান করতে হয়—সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া অন্য জিনিষ।

... .

আপনার
শ্রীমোহিতচন্দ্র

মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত —

ওঁ আলমোড়া

বন্ধু,

বাস্‌ আর নয়। পিণ্ডি না দিলে যেমন ভূতের শান্তি হয় না তেমনি শেষের মত একটা ঠিক কিছু না লিখ্‌লে আইডিয়া থাম্‌তে চায় না। ঠিক যেন একটা গড়ানে জায়গায় বেগে নাবার মত—একটা তলা না পেলে দাঁড়াবার জো নেই। বিদায় কবিতায় সেই তলা পাওয়া গেল—এখন আমি অন্য বিষয়ে মন দিতে পারব। এখন আমার শিশুটির কাছ থেকে বিদায়। শিশুকে উপলক্ষ্য করে ছলনা পূর্ব্বক শিশুর মার সঙ্গ পেয়েছিলেম কিন্তু এমন বরাবর চলে না—পৃথিবীতে আবার আপিস্‌ আছে। আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক—আমি কম লোক নই—অতএব কেবল অন্তঃপুরে কাটালে চল্‌বে না—সাড়ে দশটা বেজেছে—গাড়ি তৈরি চল্লেম। ইতি ৩১শে শ্রাবণ ১৩১০

আপনার শ্রীরবীন্দ্র

সোনার গাছ, হীরের ফুল

[নব রূপকথা]

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

অচিনপুরের রাজকুমারের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হবার পূর্বরাত্রে ঘুম হয় নি। অবশেষে শেষরাত্রে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সে ত নিদ্রা নয়,—সুষুপ্তি। এই সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁর সুমুখে একটি জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হলেন। তিনি অল্পক্ষণ পরেই জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—সে-দেশ কখনো দেখেছ, যে-দেশে সোনার গাছে হীরের ফুল ফোটে?—রাজকুমার বললেন—না।

—দেখতে চাও?

—হাঁ।

—আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।

—কত দূরে সে-দেশ?

—সহস্র যোজন।

—যেতে কতদিন লাগবে?

—চোখের পলক না পড়তে। তুমি যদি এখনই পাত্রমিত্র নিয়ে যাত্রারম্ভ কর, তাহলে এ দীর্ঘ পথ আমি তোমাকে নিয়ে ভোর হতে না হতে উৎরে যাব।

—কী উপায়ে?

—তুমি আর তোমার বন্ধুরা জামাজোড়া পরে হাতিয়ার নিয়ে নিজ নিজ ঘোড়ায় সওয়ার হও; আমি সে-সব ঘোড়াকে পক্ষিরাজ করে দেব; অর্থাৎ তাদের পাখা বেরবে, আর তারা উড়ে চলে যাবে।

রাজকুমার দৌবারিককে ডেকে বললেন—এখনি যাও, মন্ত্রীপুত্র, সওদাগরের পুত্র ও কোটালের পুত্রকে নিজ নিজ ঘোড়ায় চড়ে, জামাজোড়া পরে, হাতিয়ার নিয়ে এখানে চলে আসতে বলো। আমিও রণবেশ ধারণ করছি।

অল্পক্ষণ পরেই রাজকুমার নিচে নেমে এলেন। এসে দেখেন যে মন্ত্রীপুত্র

সওদাগর-পুত্র আর কোটালের পুত্র সব সাজসজ্জা করে এসে উপস্থিত হয়েছেন। রাজপুত্রের কানে হীরের কুণ্ডল, মাথায় হীরকখচিত উষ্ণীষ, গলায় হীরের কণ্ঠী, পরনে কিংখাবের বেশ, পায়ে রত্নখচিত নাগরা। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ পিঙ্গল। মন্ত্রীপুত্রের কানে মুক্তোর কুণ্ডল, মাথায় ধবধবে সাদা পাগড়ি, গলায় মোতির মালা, পরনে শ্বেতাম্বর, পায়ে শ্বেতমৃগচর্মের পাদুকা। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ রূপোর মত। সওদাগরের পুত্রের কানে সোনার কুণ্ডল, মাথায় জরির পাগড়ি, গলায় সোনার কণ্ঠী, পরনে পীতাম্বর, পায়ে সেই রঙের বিনামা। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ তামার মত। কোটালের পুত্রের কানে পলার কুণ্ডল, মাথায় লাল পাগড়ি, গলায় পলার কণ্ঠী, পরনে রক্তাম্বর, পায়ে গণ্ডারের চামড়ার জুতা। আর তাঁর ঘোড়ার রঙ লোহার মত।

যাত্রারম্ভ

রাজপুত্র আসবামাত্র একটি দৈববাণী হল—এখন তোমরা ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা আরম্ভ করো। রাজপুত্র তাঁর ঘোড়ার সোনার রেকাবে পা দিয়ে, মন্ত্রীপুত্র রূপোর রেকাবে, সওদাগরের পুত্র তামার রেকাবে আর কোটালের পুত্র লোহার রেকাবে পা দিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন। অমনি ঘোড়া চারটি আকাশদেশে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেশকে আমরা কাল দিয়ে মাপি। যেখানে কাল বলে কোনো জিনিষ নেই, সেখানে কত পথ অতিক্রম তাঁরা করলেন তা বলতে পারিনে। বোধ হয় সাতসমুদ্র তেরো নদী, নানা মরুকান্তার ও পর্বত ডিঙিয়ে তাঁরা প্রত্যূষে একটি রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই সময় আর একটি দৈববাণী হল—এইখানেই তোমরা আজকের দিনটা বিশ্রাম করো। তোমাদের মধ্যে যিনি এখানে সোনার গাছ ও হীরের ফুলের সাক্ষাৎ পাবেন, তিনি এখানে থেকে যাবেন। বাদবাকি সকলে শেষরাত্রে নিজের নিজের ঘোড়াকে স্মরণ করলে তারা তখনি আবির্ভূত হবে, ও নিজের নিজের সওয়ার নিয়ে দেশান্তরে চলে যাবে।

এই আকাশবাণী শুনে তাঁরা সব ঘোড়া থেকে নেবে পড়লেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের ঘোড়াও অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর চারদিকে মালঞ্চে ঘেরা। সে মালঞ্চের কী বাহার। অসংখ্য ফুল কাতারে কাতারে ফুটে রয়েছে। সে-সব ফুলের রঙ হয় সোনার নয় পিতলের মতো, যথাঃ চাঁপা, সূর্যমুখী, স্বর্ণবর্ণ বড় বড় গ্যাঁদা, হলদে গোলাপ, কল্কে ফুল,—আর কত ফুলের নাম করব। মধ্যে মধ্যে ফলের গাছও আছে,—কলা, কমলালেবু, স্বর্ণবর্ণ আম; সব সাজানো আর গোছানো। বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করে তাঁরা দেখলেন রাস্তাগুলি প্রকাণ্ড চওড়া এবং তাতে একটুকুও ধুলো নেই। রাস্তায় অসংখ্য লোক; সকলের পরনে পীতাম্বর। লোকের রঙ পীতাভ, নাক চোখ অতি সুন্দর, কপালে একটি করে হলদে চন্দনের ফোঁটা, আর স্ত্রীলোকের নাকে রসকলি। স্ত্রীপুরুষের বেশ একই ধরনের; শুধু স্ত্রীলোকের শাড়িতে জরির পাড়।

রাস্তার দু'ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভোজনালয়। বিষ্ণুপুরের লোকের বাড়িতে রন্ধনের কোনো ব্যবস্থা নেই; সকলেই এই-সব ভোজনালয়েই আহার করেন। বিষ্ণুপুরের লোক অতি অতিথিবৎসল; এই চারটি নতুন আগন্তুককে দেখে তারা তাদের একটি ভোজনালয়ে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। সেখানে স্ত্রীপুরুষ সব একত্রে আহার করছে। খাদ্যদ্রব্য সব নিরামিষ এবং অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ স্ফটিকের পাত্রে রয়েছে পানীয়। এ পানীয় জল নয়, সুরা,—স্ত্রীলোকের জন্য হল্‌দে এবং পুরুষের জন্য সবুজ রঙের। এ পোখরাজ-গলানো পান্না-গলানো সুরা পান করে সকলেরই গোলাপী নেশা হয়। পীত সুরায় নেশা কম হয়, এবং হরিত সুরায় বেশি। এর ফলে সকলেই ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে; মেয়েদের রূপের লজ্জৎ বাড়ে, এবং পুরুষরা হয় বাচাল।

বিষ্ণুপুরে পর্দা নেই। স্ত্রীপুরুষ সকলেই সমান স্বাধীন ও সমান শিক্ষিত। দু'দলেরই প্রবৃত্তিমার্গ সমান উন্মুক্ত। ভোজনালয়ে সওদাগরের পুত্রের পাশে উপবিষ্ট একটি তরুণীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন শুরু হল। সওদাগর-পুত্র এ দেশের ঐশ্বর্য দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এত ধন তোমরা সংগ্রহ করলে কোত্থেকে?

—বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী।

—আমিও বণিকপুত্র।

—তুমি ইচ্ছা করলেই এই বণিক সমাজের অন্তর্ভূ্ক্ত হতে পার।

—কী করে?

—আমাকে বিবাহ করে। আমরা স্ত্রীপুরুষ এদেশে সকলেই সমান ধনী।

—বিবাহ কী করে করতে হয়?

—অতি সহজে। শুধু মালা বদল ক'রে।

—আমি বিষ্ণুপুর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় তোমার প্রস্তাবের উত্তর দেব।

আহারান্তে সওদাগর-পুত্র সেই মেয়েটির গাড়িতে শহর প্রদক্ষিণ করতে বেরলেন। সে গাড়ি মানুষে কি ঘোড়ায় টানে না, কলে চলে। তারপর তাঁরা দুজনে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখলেন, সেখানে অসংখ্য অর্ণবপোত রয়েছে; কোনটি থেকে মাল নামাচ্ছে, কোনটিতে তুলছে। রমণী বললেন—এই আমদানি রপ্তানিই হচ্ছে আমাদের ঐশ্বর্যের মূল।

তারপর সূর্য অস্ত যাবার পূর্বেই তাঁরা বিষ্ণুমন্দিরে গেলেন। সে মন্দির অপূর্ব সুন্দর ও বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত। সেখানে গিয়ে সওদাগর-পুত্র দেখলেন যে, মেয়েরা সব কীর্তন গাইছেন। এবং মধ্যে মধ্যে একটু সুরাপান করে নৃত্য করছেন। সওদাগর-পুত্রের সঙ্গিনীটি সব-চাইতে ভাল গাইয়ে ও ভাল নর্তকী। আর সকলেই ভক্তিরসে গদগদ। এই ভক্তিরসই নাকি তাদের সভ্যতার যথার্থ উৎস।

এইসব দেখেশুনে সওদাগর-পুত্র মনস্থির করলেন যে, তিনি এই রমণীটিকে বিবাহ করবেন এবং বিষ্ণুপুরে থেকে যাবেন। সূর্য অস্ত যাবার পরেই তিনি এই মেয়েটির সঙ্গে মালাবদল করলেন। তারপর তাঁর বন্ধুদের গিয়ে বললেন যে,—আমি এইখানেই সোনার গাছ ও হীরের ফুল দেখেছি। আমি আর কোথায়ও যাব না, এইখানেই থাকব। রাজপুত্র বললেন—বেশ, তবে তুমি থাকো, আমরা চললুম। মন্ত্রীর পুত্রও বললেন তাই। কোটালের পুত্র বললেন—আমি কিন্তু আর একদণ্ডও এখানে থাকতে চাইনে। কারণ এখানে সভ্যতার নানা উপকরণ থাকলেও, অস্ত্রশস্ত্র নেই এবং এদের ভাষাতেও

অস্ত্রশস্ত্রের কোনো নাম নেই। সেইদিন শেষরাত্রে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালের পুত্র তাঁদের ঘোড়াদের স্মরণ করলেন, এবং মুহূর্তের মধ্যে তারা এসে আবির্ভূত হল। তাঁরা তিনজন নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলেন, আর তৎক্ষণাৎ আকাশদেশে অদৃশ্য হলেন।

কালীপুর

ভোর হয় হয় এমন সময় তাঁরা একটি নূতন নগরের সাক্ষাৎ পেয়ে ভয় খেয়ে গেলেন। সেখানে উষার চেহারা রক্তসন্ধ্যার মতো। নগরটি দোতলার সমান উঁচু লাল পাথরের প্রাচীরে ঘেরা। আর তার নিচে দিয়ে রক্তগঙ্গার মত নদী বয়ে যাচ্ছে। রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালের পুত্র ঘোড়া থেকে অবতরণ করে দেখেন, সেখানে সব ফুলই লালে লাল। কৃষ্ণচূড়া, বলরামচূড়া এবং পলাশের গাছে যেন আগুন ধরেছে। আর অশোক, শিমুল ও রাঙাজবা অসংখ্য ফুটে রয়েছে। আম জাম প্রভৃতি ফলের গাছও অনেক আছে, কিন্তু তাতে ফল ধরে শুধু মাকাল,—লাল মাটির গুণে কিংবা দোষে।

রাস্তায় অসংখ্য লোক যাতায়াত করছে। সকলেরই পরনে মাল-কোঁচামারা রক্তাম্বর, গায়ে সেই রঙের একটি ফতুয়া, কোমরে লোহার শিকলের কোমরবন্ধ—তার একপাশে একটি মদের বোতল ঝোলানো, অপর পাশে একটি একহাত প্রমাণ ছোরা। মাথা সকলেরই ন্যাড়া। তাদের মুখের রঙ ইটের মতো, মাথারও তদ্রূপ। সকলেই প্রকাণ্ড পুরুষ, যেমন স্থূলকায় তেমনি বলিষ্ঠ। এরা নাকি সকলেই সৈনিক। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনটি সৈনিক এসে রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র ও কোটালপুত্রকে গ্রেপ্তার করলে এবং বললে—এ নগরে বিনা অনুমতিতে বিদেশী প্রবেশ করলে তার শাস্তি হচ্ছে প্রাণদণ্ড। চলো, তোমাদের সেনাপতির কাছে নিয়ে যাই।

সেনাপতির কাছে তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমরা কোন্ দেশ থেকে কী উপায়ে এখানে এলে?

—আমরা আকাশ থেকে পড়েছি। এসেছি সব পক্ষিরাজ ঘোড়ায়।

—সে-ঘোড়া কোথায়?

—আকাশে চরতে গেছে।

—কখন্ আসবে ?

—আজ রাত্রে। যদি না আসে, তাহলে আমাদের প্রাণদণ্ড দেবেন।

—আচ্ছা। আজকের দিন তোমরা নজরবন্দী থাকবে। এবং আমাদের সৈনিকরাই তোমাদের খাবার ও থাকবার সব বন্দোবস্ত করে দেবে।

তারপর সৈনিকরা তাঁদের ভোজনালয়ে নিয়ে গেল। সে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘর। দু'পাশে কাঠের বেঞ্চি পাতা, মধ্যে কাঠের টেবিল। কালীপুরে পর্দা আছে। কুলবধূরা সব পর্দানশীন। কিন্তু এ ভোজনালয়ে খিদ্‌মৎগার, খানসামা সবই স্ত্রীলোক। তারা নাকি সবই গণিকা। তারাও পুরুষদের মতই দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ। সকলেরই পরনে মালকোঁচামারা রক্তাম্বর। পুরুষদের সঙ্গে তাদের বেশের প্রভেদ এইমাত্র যে, স্ত্রীলোকদের মাথায় বাব্‌রিকাটা চুল, আর কোমরে একখানি করে রাম-দা ঝোলানো।

দেওয়ালের পাশে সব বড় বড় মদের পিপের সারি। নিচের একটি চাবি খুললেই সামনের নলমুখ দিয়ে সুরা পড়ে। বলা বাহুল্য, যারা ভোজন করছে তারা সকলেই পুরুষ। এবং বড় বড় গালার রঙকরা, পেট মোটা গলা সরু কাঠের ঘটিতে সেই মদ্য পান করছে। সে মদ্যের রঙ পাটকেলে, আর তার অর্ধেক ফেনা, অর্ধেক তরল। সেই ফেনাসুদ্ধ সুরা গলাধঃকরণ করতে হয় ;— ফেনা যায় মাথায়, এবং তরলাংশ যায় পেটে। আহার্যদ্রব্য পরিমাণে প্রচুর। মাছ মাংস নিরামিষ সবই আছে। মাছের কোপ্তা এক একটি গোলার মতো। মাংসের দোল্‌মা এক একটা কাঁকুড়ের মতো। কালীপুরের লোক তা অনায়াসে গলাধঃকরণ করে। গলায় যদি আটকায় তো এক ঘটি সফেন সুরা দিয়ে তা নাবিয়ে দেয়। মন্ত্রীপুত্র খালি নিরামিষ আহার করলেন। রাজপুত্র ও কোটালের পুত্র মাছমাংস কিঞ্চিৎ আহার করলেন।

তারপর তিন বন্ধুতে ব্যায়ামশালা দেখতে গেলেন। গিয়ে দেখেন যে, হঠযোগ ও ডনমুগুর কুস্তি সবরকমের ব্যায়াম একসঙ্গে করা হয়। তারপর তাঁরা এখানকার বিদ্যালয় দেখতে গেলেন। সেখানে সব মুণ্ডিতমস্তক এবং শিখাধারী অধ্যাপক যুদ্ধবিদ্যার নানারকম কলকৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন।

সন্ধ্যার সময় কোটালের পুত্র তাঁর বন্ধুদের বললেন—আমি এইখানেই থেকে যাই। সোনার গাছ, হীরের ফুল দেখবার কোনো লোভ আমার নেই। হীরের

ফুলের কোনো গন্ধ নেই। আমি এখানে কিছুদিন থাকবার অনুমতি সেনাপতির কাছে পেয়েছি। এই গণিকাদের মধ্যে কাউকে বিবাহ করলেই বিদেশী স্বদেশী হিসাবে গণ্য হয়। বিবাহপ্রথাও অতি সহজ। মেয়ের লোহার কণ্ঠী, ভাষায় যাকে বলে হাঁসুলি, সেইটি বরের গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। আর বর একটি হাঁসুলি এনে কনের গলায় পরিয়ে দেয়। সেই হাঁসুলি খুলে ফেললেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়।

কোটালের পুত্র এইরূপ বিবাহ করে সেখানেই রয়ে গেলেন।

শেষরাত্রে মন্ত্রীপুত্র ও রাজপুত্র তাঁদের পক্ষিরাজ ঘোড়াকে স্মরণ করলেন এবং তাতে চড়ে আর-এক দেশে আকাশপথে চলে গেলেন।

ব্রহ্মপুর

পরদিন উষাকালে দুই বন্ধুতে একস্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। সে স্থানে উষার রঙ ঈষৎ রক্তিমাভ। সে স্থান নগর নয়, পল্লী নয়, একটি অপূর্ব আশ্রম। বাড়িঘরদোর যা দেখতে পেলেন, তা সবই পর্ণকুটীর। স্ত্রীপুরুষের রূপ অলৌকিক। স্ত্রী মাত্রেই তুষারগৌরী এবং পুরুষরা দীর্ঘকেশ ও গুম্ফশ্মশ্রুধারী। এ আশ্রমে ফলফুলের বৃক্ষসকল একরকম স্তিমিত। বাতাস যা বয় তা অতি মৃদু। এখানে গাছপালা লতাপাতা ফুলফলে কোনো বর্ণবিচার নেই। সব রঙেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সব রঙ নিতান্ত ফিকে ও সাদাঘেঁষা। শান্তি এখানে অটুট। কারো কোনোরকম কর্ম নেই। এঁরা সকলে আহার করেন ফল ও মূল, বিশেষতঃ আঙুর; তা'তে তাঁদের ক্ষুধাতৃষ্ণা দুইই দূর হয়। সকলেই সংস্কৃতভাষী।

এ আশ্রমে প্রকৃতি বোবা। চারিপাশে সবই নীরব ও নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে যে ক্ষীণ অস্ফুট নিনাদ শোনা যায় তার থেকে অনুমান করা যায় যে, গাছপাতার গায়ে অতি মৃদুমন্দ বাতাস স্পর্শ করছে। সে প্রকৃতি যেন সমাধিস্থ। পূর্বেই বলেছি যে, এখানকার স্ত্রীপুরুষের কোনো কর্ম নেই—একমাত্র সকালসন্ধ্যা বেদমন্ত্র উচ্চারণ আর মধ্যে মধ্যে সামগান করা ছাড়া।

এখানে ইস্কুল আছে। সেখানে বালকবালিকাদের বেদমন্ত্র মুখস্থ করানো হয়। আর অবসরসময়ে বেদমন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়। এই

বৈদিক ঋষিদের কারো সঙ্গে কারো মতে মেলে না। সুতরাং এ বিষয়ে আলোচনা খুব দীর্ঘ হয়। তাই সেখানে কাজ নেই, কিন্তু কথা আছে।

মন্ত্রীপুত্র এ আশ্রমে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনিও কিছু বৈদিক শাস্ত্র চর্চা করেছিলেন। তিনি বললেন যে, তিনি এইখানেই থেকে বেদ অভ্যাস করবেন। এবং রাজপুত্রকে বললেন—সোনার গাছ আর হীরের ফুল যদি কোথাও থাকে তো এখানেই আছে। আমি যখন বেদাভ্যাস করতে করতে দিব্যদৃষ্টি লাভ করব, তখন তা দেখতে পাব। এই ফলমূলাহারী বল্কলধারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে থাকাই আমি শ্রেয় মনে করি।

রাজপুত্র বললেন—বেশ। আমি কিন্তু আজ শেষরাত্রেই এ আশ্রম ত্যাগ করব। আমি স্বকর্ণে দৈববাণী শুনেছি। দিব্যপুরুষ কখনোই মিথ্যা কথা বলেন না। সম্ভবতঃ তোমরা তিনজনে আমার সঙ্গে ছিলে বলেই দিব্যপুরুষ আমাদের এ অলৌকিক তরু দেখান নি। আমার বিশ্বাস আমি একা গেলেই, যার সন্ধানে আমরা বেরিয়েছি তার সাক্ষাৎ পাব।

অনামপুর

রাজপুত্র সেইদিন শেষরাত্রে ব্রহ্মপুর ত্যাগ করে একাকী হয়মারুহ্য জগাম শূন্যং মার্গং। তাঁর কোনো সঙ্গী না থাকায়, অর্থাৎ কথা কইবার কোনো লোক না থাকায়, তিনি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শেষটা ঘুমিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ জেগে উঠে যেখানে উপস্থিত হলেন, সে স্থানের কোনো নাম নেই, কেননা তার কোনো রূপ নেই। সেখানে চারপাশে যা আছে, তা হচ্ছে নিরেট অন্ধকার। এ স্থানকে বলা যায় অনামপুর। কখন্ গিয়ে সেখানে তিনি পৌঁছলেন তা বলতে পারিনে। কারণ, সেখানে কাল নেই, কাল মাপবার কোনো যন্ত্রপাতিও নেই। কোনো জিনিসের কোনো গতিও নেই। অতএব, পক্ষিরাজ ঘোড়া সেখানে থেমে গেল।

এমন সময়, সেই জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষ রাজপুত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বললেন—সে গাছ এখানে নেই; কোথায় আছে তা তোমাকে পরে বলব।—এই বলে তিনি অন্তর্ধান হলেন।

ঘোড়া অমনি মুখ ফিরিয়ে উলটোদিকে চলতে আরম্ভ করলে।

অন্ধকারের রাজ্য ছাড়িয়ে রাজপুত্র যেখানে গেলেন সে কুয়াশার রাজ্য। সে কুয়াশা শুভ্র, হালকা ও মলমলের মতো পাতলা। রাজপুত্রের হঠাৎ চোখে পড়ল যে, মন্ত্রীর পুত্র এই কুয়াশার দেশ ভেদ করে আসছেন। তাঁর মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ ও বিষণ্ণ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি সোনার গাছ, হীরের ফুলের সাক্ষাৎ পেয়েছ ?

—না। কিন্তু কোথায় আছে তা দিব্যপুরুষ পরে জানাবেন বলেছেন।

—আমি মনতান্ত্রিক ব্রহ্মপুরে থাকতে পারলুম না। সে পুরে সকলে প্রাণকে দমন ক'রে মনকে ঊর্ধ্বলোকে তোলবার চেষ্টা করছেন, একমাত্র মন্ত্রের সাহায্যে। ফলে, তাঁদের মনও সব প্রাণহীন হয়ে পড়ছে।

তারপর তাঁরা দু'জনে একটি দেশে এলেন, যেখানে আকাশে রক্তসন্ধ্যা হয়েছে। সেখানে রক্তাম্বরধারী কোটালের পুত্রের সাক্ষাৎ তাঁরা পেলেন। তিনি বললেন—আমি রণতান্ত্রিক কালীপুরে আর থাকতে পারলুম না। সেখানে লোকের একমাত্র উদ্দেশ্য নরহত্যা। তার ফলে রক্তপাত যে কী নিষ্ঠুর আর কী ভীষণ তা অবর্ণনীয়। কালীপুরের পুরদেবতা হচ্ছেন ছিন্নমস্তা।

তার খানিকক্ষণ পর যেখানে আকাশ পাণ্ডু, সেখানে সওদাগরের পুত্র তাঁদের সঙ্গে এসে জুটলেন। তিনি বললেন—বিষ্ণুপুরের ধনতান্ত্রিক রাজ্যে মোর্যালিটি নেই। প্রতি স্ত্রীলোক বহুবিবাহ করে এবং প্রতি পুরুষ দরিদ্রদের উপর চোরা অত্যাচার করে। অথচ তাদের শ্রমেই এঁরা ধনী হয়েছেন। তাই আমি চলে এলুম।

রাজপুত্র সব শুনে বললেন—এসব দেশের লোকের হৃদয় নেই। দিব্য পুরুষ বলেছেন যে, সোনার গাছ হীরের ফুলের মূল মানুষের হৃদয়ে। এবং যে-সব দেশে তোমরা মানবসমাজের বিকৃতরূপ দেখে এলে, সেই সব বিকার থেকে মুক্ত হলেই তোমরা নিজ নিজ হৃদয় থেকেই সোনার গাছে হীরের ফুল গড়ে তুলতে পারবে। তখন এই অচিনপুর শিবপুরী হয়ে উঠবে।

এইকথা বলবার পরে তাঁরা চারজনই অচিনপুরে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। ভোর হতে না হতেই রাজপুত্র তাকিয়ে দেখেন যে, উষার আলোকে গাছপালা সব স্বর্ণবর্ণ হয়েছে, এবং তাতে বেল যুঁই মল্লিকা প্রভৃতি সাদা ফুল জ্বলজ্বল করছে। তখন তিনি বুঝলেন যে, এতক্ষণ তিনি শুধু স্বপ্ন দেখছিলেন।

বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীত

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

বছর দুই হ'ল বিশুদ্ধভাবে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে "গীতালি" নামে একটি সংগীতসভা কলকাতায় স্থাপিত হয়। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে তার উদ্বোধন ও নামকরণ করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে প্রীতি ও স্নেহের চক্ষে দেখেছেন। দুঃখের বিষয় বর্তমান 'পরিস্থিতি'র জন্য সেটি বন্ধ রয়েছে,—আশা করা যাক্ সাময়িক ভাবে। "গীতবিতান" ব'লে আর একটি সম-উদ্দেশ্যযুক্ত সংগীতসভা কতিপয় রবীন্দ্রসংগীতভক্ত উৎসাহী যুবকের যত্নে স্থাপিত হয়ে এখনো কলকাতায় পরিচালিত হচ্ছে—এবং আশা করি হবে।

ইতিমধ্যে আমি এই বৎসর, অর্থাৎ ১৯৪২-এর প্রথম থেকে নানা কারণে শান্তিনিকেতনে এসে আশ্রয় নিয়েছি, এবং এখানকার সংগীতভবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হয়েছি। তার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদারের দেখলুম রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধ সুর সংগ্রহ, প্রচার ও স্বরলিপি করবার চেষ্টা এবং অধ্যবসায় অসামান্য। তিনি আমাকে পুরোনো গানের সুরের একজন বিশ্বস্ত রক্ষক এবং প্রামাণ্য স্বরলিপিকাররূপে প্রথম থেকেই যে উচ্চপদে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমি নিজে সে-পদ গ্রহণে কুণ্ঠিত,—কেবলমাত্র স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ নয়। গীতালির সভানেত্রী থাকা-কালীন কলকাতায় বিশুদ্ধ রবীন্দ্র সংগীতের শিক্ষাদান সম্বন্ধে আমার মনে যে-সকল সন্দেহ ও প্রশ্নের উদয় হয়েছে, এখানে এসে অনুরূপ ক্ষেত্রে সেগুলি আরো বদ্ধমূল হওয়াই আমার এই সংকোচের কারণ। তাই বিষয়টি পরিষ্কার ক'রে দেখবার ও দেখাবার উদ্দেশ্যে একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখবার আবশ্যকতা অনুভব করছি।

আমরা যে এই তাল ঠুকে বলছি রবীন্দ্রসংগীত বিশুদ্ধভাবে শেখাব—সেই বিশুদ্ধতার প্রমাণ ও মাপকাটি কী? এবং শেষ নিষ্পত্তির বিচারক কে?—স্বভাবতঃই মনে হয় যিনি সুর-রচয়িতা। কিন্তু এইখানেই ত সমস্যার মূল বা গোড়ায় গলদ। য়ুরোপীয় সংগীতে সুরকার এবং স্বরলিপিকার একই ব্যক্তি,

সুর ও সুরলিপি অঙ্গাঙ্গীভাবে একত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে; সুতরাং সে সুর সম্বন্ধে সর্বসাধারণের মতভেদ হবার কোনো অবকাশই থাকে না।—পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে দুটি মস্ত বড় প্রভেদ আছে। একটি হচ্ছে এ দেশে রাগরাগিণীর অস্তিত্ব এবং প্রভাব, যার ফলে মার্গসংগীতে প্রত্যেক গানের সুরের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা অপেক্ষা তার রাগের রূপ দেখাবার দিকেই ওস্তাদের ঝোঁক থাকে বেশী। অথবা আমি অনেক সময় যা বলি, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এক্ষেত্রেও আমরা ব্যক্তির চেয়ে জাতিকেই বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এবং দেশী সংগীতেও বহুকাল সেই ধারা চ'লে এসেছে। দ্বিতীয় বিশেষত্বটি এই যে—আমরা কানে শুনে গান শিখি, চোখে দেখে নয়; শ্রুতিই আমাদের কাছে প্রামাণ্য, লিপি নয়। স্বরলিপির প্রচলন অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অনভ্যস্ত ব'লে এখনো তা তেমন বিস্তার বা প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি।

কিন্তু শ্রুতিকে আমরা যতই মান্য মনে করি না কেন, স্মৃতির উপর তা নির্ভর করতে বাধ্য; এবং দুঃখের বিষয় স্মৃতিবিভ্রম ঘটতেও বাধ্য। তাই সুরের পাখি ফাঁকি দিয়ে এক কান দিয়ে ঢুকে আর-এক কান দিয়ে যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সেইজন্য ডানা একটু ছাঁটতে হলেও আজকাল আমরা তাকে স্বরলিপির খাঁচায় পুরে রাখবার পক্ষপাতী। উপরোক্ত কথাগুলি মনে রাখলে রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধতা রক্ষার সমস্যা ক্রমশ স্পষ্টরূপে বোঝা ও বোঝানো সহজ হবে। বিশুদ্ধতার কথা তুললেই সঙ্গে সঙ্গে অপরপক্ষে অবিশুদ্ধতার অস্তিত্বস্বীকার অবশ্যম্ভাবী। গান ভুল সুরে অর্থাৎ রকমারি সুরে গাওয়া প্রচলিত না থাক্‌লে সেগুলির একমাত্র ঠিক সুর শেখাবার জন্য সভাসমিতির এত মাথাব্যথা হ'ত না। এখন এই ভুল কেন হয় আর তার সংশোধনের উপায়ই বা কী, বর্তমানে সেই সমস্যার সমাধান করতে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্‌।

পূর্বেই বলেছি যে সুরে ভুল হবার মূল কারণ এই যে, আমাদের দেশে বহুকালাবধি শ্রুতিশিক্ষাই ছিল প্রথা, স্মৃতির উপর শ্রুতির নির্ভর অনিবার্য, এবং স্মৃতিবিভ্রম হওয়াও অনিবার্য। সেইজন্য সুর রচনা করবার সঙ্গে সঙ্গেই তা স্বরলিপিতে আবদ্ধ করতে পারলে এ ভুল অতি সহজেই নিবারণ হয়; যেমন য়ুরোপে হয়ে থাকে। এও বলেছি যে, আমাদের সংগীতে আবহমান কাল থেকে রাগরাগিণীর প্রভাব এত বেশী যে, গানবিশেষের

সুরের নির্দিষ্ট স্বরবিন্যাস অবিকৃত রাখার চাইতে তার রাগের রূপ অবিকৃত রাখার প্রতিই আমাদের লক্ষ্য থাকে বেশী। তাতে মূল সুরের ইতরবিশেষ হলে ক্ষতি হয় ব'লে মনে করা দূরে থাক্—প্রত্যেক গায়ককে সে স্বাধীনতা দেওয়াই কর্তব্য এবং সেই স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের উপরে তার গুণপনা নির্ভর করে ব'লে মনে করি।

এখন রবীন্দ্রসংগীতকে এই দুই তত্ত্বের কষ্টিপাথরে কষে দেখলে কী পাই ?— অবশ্য তাঁর জন্মের আগে থেকেই বাংলাদেশে স্বরলিপির প্রচলন হয়েছিল ; সুতরাং তিনি ইচ্ছে করলে সুর রচনা করবার সঙ্গে সঙ্গে যে তা লিখে ফেলতে পারতেন না, তা নয়, এবং তা করলে ভবিষ্যতে অনেক গণ্ডগোলই মিটে যেত। কিন্তু অনভ্যাসবশতঃই হোক, আর অনাবশ্যকবোধেই হোক, আর আমাদের ভাগ্যদোষেই হোক, তিনি সে কাজ করেন নি, তা সকলেই জানি। তবে এও জানি যে ঠিক প্রথম বয়সে না হোক, পরবর্তী জীবনে, বেশ সময় থাকতেই অন্যান্য লোকে তাঁর হয়ে এই অবশ্যকর্তব্য কাজ ক'রে দিয়েছেন। এবং সেজন্য তাঁদের প্রতি আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁরা এই পরিশ্রমটি না করলে কত সুন্দর সুন্দর গানের সুর যে কোথায় ভেসে যেত তার ঠিক নেই ; আর ভারতীর ভাণ্ডারের একটি অপরূপ মণিকোঠা শূন্যপ্রায় প'ড়ে থাকত। কারণ সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। একটি হচ্ছে তাঁর নিজের সুর নিজে ভোলবার অসাধারণ ক্ষমতা। আর একটি হচ্ছে বেশির ভাগ সুরে প্রচলিত রাগরাগিণীর কাঠামো অবলম্বন করলেও প্রত্যেক গানকে স্বাতন্ত্র্য দান করা ; অর্থাৎ পূর্বকথিত পুরাপ্রথার বিরোধে তাঁর গানে রাগের জাতি অপেক্ষা সুরের ব্যক্তিত্বই বেশী পরিস্ফুট। ও সেইজন্যই তাঁর গানের স্বরলিপি এবং বিশুদ্ধ স্বরলিপি থাকা এত অত্যাবশ্যক।

এস্থলে কথা উঠতে পারে যে, যদি তাঁর জীবিতকালে তাঁর অধিকাংশ গানই স্বরলিপিবদ্ধ হয়ে থাকে, তাহলে অন্তত সেগুলি সম্বন্ধে ত কোনো সমস্যা ওঠে না, "যথা দৃষ্টং তথা গীতং" করে গেলেই ত হল, তার জন্য এত মাথা ঘামানো কেন ?— কিন্তু এখানেও একটু সূক্ষ্ম বিবেচ্য আছে ; ব্যাপারটা অত সোজা নয়।

শাস্ত্র এবং লোকাচারের নজির দেখালেই বিষয়টা সহজেই বোধগম্য

হবে। শাস্ত্রবিদ্যা পুঁথিগতভাবে সমান থাকলেও যেমন কালক্রমে ভিন্ন দেশ-কালপাত্রে ভিন্ন আচারে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি মূল স্বরলিপি এক হলেও তাঁর দীর্ঘজীবনের মধ্যেই গায়কীতে ভিন্নতা এসে পড়া আশ্চর্য নয়, এবং তা এসেওছে। তারও প্রধান কারণ, স্বরলিপি থাকা সত্ত্বেও আমাদের সেই সেকেলে কানে শুনে শেখবার অভ্যাস এখনও বলবত্তর। তিনি থাকতে তাঁর কাছে সন্দেহস্থলে সন্দেহভঞ্জন করে নেওয়াই বুদ্ধির কাজ হ'ত। কিন্তু প্রথমতঃ তিনি সুর রচনা ক'রে এবং শিখিয়েই খালাস, মনে ক'রে রাখা তাঁর ধাতে ছিল না, সেকথা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর গানের এবং শিক্ষকের এবং ছাত্রের এবং স্বরলিপিকারের সংখ্যাধিক্যবশতঃ কোনো এক কর্তৃত্বের অধীনে এনে সংশোধনকার্য পরিচালনার সুযোগ ইতিপূর্বে ঘটে নি; কিম্বা হয়ত আবশ্যকতাও অনুভূত হয় নি। এখন যদি হয়ে থাকে ত তার কারণ, রবীন্দ্রসংগীতের ব্যাপক প্রচারের দরুন তার উত্তরোত্তর বিকৃতি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে, এবং তাঁর সংগীত-ভক্তদের তার একটা বিহিত করা কর্তব্য ব'লে বোধ হচ্ছে।

রোগের অস্তিত্ব অর্থাৎ মুখে মুখে সুরের নবজন্মপরিগ্রহসাব্যস্ত এবং তার কারণ মোটামুটি নির্ণয় করা তো হল; এখন তার প্রতিবিধান কী উপায়ে হতে পারে, তাই বিচার্য। তাঁর স্বকৃত স্বরলিপির অভাবে, তিনি সাক্ষাৎভাবে যাদের শিখিয়েছেন তাদের স্মৃতি অথবা লিপিই প্রামাণ্য, সে কথা বলা বাহুল্য। তাঁর প্রথম বা মধ্যবয়সে কলকাতার লোক এবং জীবনের শেষার্ধে শান্তি-নিকেতনের লোককে প্রাধান্য দেওয়া বোধহয় অসংগত হবে না। কারণ কলকাতা ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে তাঁর জীবন প্রায় সমানভাবে আধাআধি বিভক্ত হয়েছিল। প্রথম জীবনের স্বরলিপিকার হিসাবে প্রধানতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; মধ্যবয়সের ব্রহ্মসংগীতের কাঙ্গালীচরণ সেন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য সংগীতের শ্রীমতী প্রতিভাদেবী, সরলাদেবী ও ইন্দিরাদেবী; আর জীবনের শেষার্ধে শান্তিনিকেতনের দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরাদির নাম করা যেতে পারে। এঁদের মধ্যে যে দু'একজন শ্রুতিসাক্ষী এখনো বর্তমান, তাঁদের জবান-বন্দি না নিয়ে পূর্বলিখিত সাক্ষ্য নেওয়াই ভাল; কারণ মজা দেখেছি যে, নিজে যার স্বরলিপি করেছি এমন গানও নিজেই ভুলে যেতে হয় আর প'ড়ে দেখে মনে হয় যেন নতুন কিছু শিখছি। এমনি কানের মাহাত্ম্য আর স্মরণ-

শক্তির মহিমা! তা ছাড়া দুঃখের বিষয় এঁদের অধিকাংশই এখন ইহজগতে নেই; তাই সব হিসেবে লিপিপ্রমাণই প্রশস্ত। এঁদের স্বরলিপি বেশির ভাগ কোন্ কোন্ বইয়ে পাওয়া যাবে, অনুসন্ধিৎসুর জন্য তার একটা ফর্দ নিম্নে দেওয়া গেল:—

স্বরলিপিকার	স্বরলিপিগ্রন্থ
কলকাতা	
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	স্বরলিপি গীতিমালা। সঙ্গীত-প্রকাশিকা। বীণাবাদিনী।
কাঙ্গালীচরণ সেন	ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি—ছয় খণ্ড।
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গীতলিপি—ছয়খণ্ড।
শ্রীমতী প্রতিভাদেবী	ভারতী ও বালক। আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা।
শ্রীমতী সরলাদেবী	শতগান।
শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী	সঙ্গীত প্রকাশিকা। বীণাবাদিনী। আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা। মায়ার খেলা।
শান্তিনিকেতন	
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনাদিকুমার দস্তিদার শান্তিদেব ঘোষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার	বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র-স্বরলিপিগ্রন্থাবলী এবং বহু মাসিকপত্র—সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকাদি।

যে দুই চার জন বিদেশী শিক্ষক ছাত্রের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁদের কার্যক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া সম্ভব নয় বলে এস্থলে নাম করলুম না।

এঁদের লিখিত গান স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রামাণ্য ব'লেই মানতে হবে; কারণ ধরে নিতে হবে এঁরা সকলেই রচয়িতার কাছে স্বকর্ণে গান শুনে স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানেও গোল ওঠে :—

(১) যেখানে এই ক'জনের মধ্যে করা স্বরলিপিতেও প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

(২) যেখানে একই গানের সুর সম্বন্ধে এই ক'জনের মধ্যেও মতভেদ শ্রুত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে পূর্বতর কালের স্বরলিপি এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠের শ্রুতিস্মৃতিকেই বেশী নির্ভরযোগ্য বলে আমি মনে করি। কারণ, মূল উৎসের

যত নিকটতর হয়, জল ততই নির্মল হবার কথা ; তখনো ঘোলা হবার সময় পায় না। যে জন্য ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্মকে শুদ্ধতর হিন্দুধর্ম মনে করেন। অপরপক্ষে প্রচলিত হিন্দুধর্মাবলম্বীগণ সে কথা মানেন না। এস্থলে আবার সেই শাস্ত্র ও লোকাচারের তর্ক উঠে পড়ে। এবং আমি এই জায়গাতেই একটু বিশেষ সতর্ক হয়ে চলা আবশ্যক বোধ করি।

উল্লিখিত গীতালির নিয়মাবলী-গঠনের সময় আমি ১৯১৫-র পূর্ব-প্রকাশিত রবীন্দ্রসংগীতকে সাবেক এবং তার পরবর্তী প্রকাশিত গানকে আধুনিক আখ্যা দিয়েছিলুম। তার একটা প্রধান কারণ এই যে, নোবেল প্রাইজ পাবার পর থেকে, অর্থাৎ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তাঁর গানের যে অফুরান উৎস খুলে গেল, তার স্রোত প্রায় শেষ পর্যন্ত বহমান ছিল ; এবং সুর-প্রাচুর্যে ও বৈচিত্র্যে পূর্বতন রচনাকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে প্রায় ভুলিয়ে দিল। কলকাতার বাস ত্যাগ করে শান্তিনিকেতনে উঠে আসার সঙ্গেও এ ভাগ সম্পূর্ণরূপে না হোক কতকাংশে মেলে ; কারণ যদিও ব্রহ্মাচর্যাশ্রম ১৯০১ সালে স্থাপিত হয়, তবুও কয়েক বৎসর পর পর্যন্তও তিনি নিয়মিত কলকাতায় যাতায়াত করে একরকম দুই দিক রক্ষা করেছিলেন। সুতরাং উভয় দিকেরই সংগীতজ্ঞ আত্মীয়বন্ধু তাঁর নতুন নতুন গান শোনবার ও শেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় কালক্রমে এই যোগাযোগ রহিত হতে হতে শেষে কলকাতা যেন তাঁর অতীত জীবনেরই সাক্ষ্যস্বরূপ স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে রইল এবং শান্তিনিকেতনের বর্তমানেরই জয় হল।

এই জন্যই দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের সুর নিয়ে বচসা হলে আমি বরাবরই বলতুম যে, আধুনিক সুর সম্বন্ধে তাঁর বিচার মানতে রাজী হলেও, পুরোনো গান সম্বন্ধে নিজের মত ছাড়তে আমি মোটেই রাজী নই ; বিশেষতঃ আমার নিজের শেখা হিন্দী গান ভাঙার ক্ষেত্রে। একথা একশোবার স্বীকার করব যে, সংগীতে দিনেন্দ্র স্বাভাবিক সুরজ্ঞান, স্বরজ্ঞান, শিক্ষা ও রুচির সঙ্গে রবীন্দ্রসংসর্গের যেরকম সুযোগ দীর্ঘকাল ধ'রে পেয়েছিলেন, তাতে তাঁকে আধুনিক রবীন্দ্রসংগীতের শ্রেষ্ঠ অধিকারীরূপে মানতে আমরা বাধ্য। তার পর মধ্যম অধিকারীরূপে অনাদিকুমার দস্তিদার, শান্তিদেব ঘোষ, এবং শৈলজারঞ্জন মজুমদারের নাম করা যেতে পারে।

লক্ষ্যের বিষয় এই যে, এঁরা সকলেই স্বহস্তে স্বরলিপি করতে অভ্যস্ত এবং উল্লিখিত দলের মধ্যে যাঁরা জীবিত, তাঁরা এখনো অল্পবিস্তর সেই কার্যে ব্যাপৃত। কিন্তু আরেক দল আছেন যাঁরা কেবলমাত্র গায়ক, স্বরলেখক নন। তাহলেও, রবীন্দ্রসংগীতের সঠিক সুর সম্বন্ধে এঁদের অভিমত বেশ দৃঢ় এবং সে মতকে উপেক্ষা করতে আমি প্রস্তুত নই। এঁদের নামকরণ সম্বন্ধে একটি গল্প করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সম্প্রতি কোনো উপলক্ষ্যে একটি মুসলমান ছাত্রলিখিত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। তাতে লেখক তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থের কথাপ্রসঙ্গে বলেন যে, কোরানই তাঁদের সর্বাপেক্ষা মহামান্য ধর্মগ্রন্থ; তারপরে মোহম্মদের নিজ উক্তি ও ব্যবহার প্রামাণ্য; তারপর তাঁর সাক্ষাৎসঙ্গীদের কথা, তাদের বলে সাহাবী; তারপর তাদের সঙ্গ যারা করেছে, তাদের বলে তাবেয়ুন; তারপর তাবেয়ুনদের সঙ্গ যারা করেছে, তাদের বলে তাবেতাবেয়ুন, ইত্যাদি। সেই হিসেবে এতক্ষণ ধ'রে আমি সাহাবীদের কথাই ব'লে এসেছি; কিন্তু তাবেয়ুনদের কথাও একেবারে ফেল্‌না নয়। তারা যখন বলে, আর বেশ জোরের সঙ্গেই বলে যে 'দিন-দা'র কাছে আমরা এইরকম শিখেছি; তখন আমার পুরাতন স্মৃতি অন্যরকম সাক্ষ্য দিলেও, তাদের জোর ক'রে আমার মতে আনতে বা কোনো উপলক্ষ্যে আমার জানা সুরে গাওয়াতে উভয়তঃই অপ্রবৃত্তি হয়।

তাহলে এতক্ষণ সাতকাণ্ড রামায়ণ প'ড়ে সংগীতসীতার শুচিতা সপ্রমাণ করবার সদুপায় কী স্থির হল?— আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধি অনুসারে সন্দেহস্থলে নিম্নলিখিত অগ্নিপরীক্ষা অবলম্বন করা যেতে পারে:—

(১) স্বরলিপি বা শ্রুতিস্মৃতির সামান্য গরমিল উপেক্ষা করাই শ্রেয়। শুচিতারক্ষার চেষ্টা যেন শুচিবাইয়ে পরিণত না হয়। মানুষের গলা যখন গ্রামোফোন যন্ত্র নয়, আর শুনে-শেখার প্রচলিত দেশীয় পদ্ধতিকে স্বরলিপি দেখে-শেখা ও শেখানোর পরদেশী পদ্ধতি দ্বারা উচ্ছেদ করা যখন বহু বিলম্ব সাপেক্ষ, তখন এক-আধ সুরের ত্রুটি মার্জনীয়। এবং এদেশে গায়কীর চিরাগত স্বাধীনতা একেবারে বর্জনীয় নয়। অপরপক্ষে গাইয়ের আপ-রুচিকে বেশী প্রশ্রয় দিলে গোড়াকার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এই উভয়সংকটের মধ্যে প'ড়ে কর্তাব্যক্তিকে সাবধানে বিচারের পাল্লা ধরতে হবে।

(২) পূর্বেই বলেছি, গানের প্রকাশকাল ১৯১৫-র পূর্ববর্তী হলে কলকাতায় প্রকাশিত উল্লিখিত স্বরলিপিই প্রামাণ্য; এবং যত পূর্ববর্তী, তত বেশী প্রামাণ্য বলে ধরতে হবে। কথার বেলা কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত নবতম সংস্করণের গীতবিতানের গানের কথাই তাঁর অনুমোদিত বলে বুঝতে হবে, তার পরিবর্তিত আকার আমাদের অভ্যস্ত পূর্বসংস্কারে যতই আঘাত করুক না কেন। কারণ কথার রাজ্যে কবির ভোটই একমাত্র গ্রাহ্য; এ স্থলে ত তাঁর স্মৃতি নয়, সৃষ্টি নিয়ে কারবার।

(৩) গানটি ১৯১৫-র পরবর্তী হলে, বিশ্বভারতী প্রকাশিত এবং বিশেষভাবে দিনেন্দ্র-বিরচিত স্বরলিপিই প্রামাণ্য।

(৪) উক্ত শ্রেষ্ঠ অধিকারীর স্বরলিপির অভাবে মধ্যম অধিকারীদের স্বরলিপিই প্রামাণ্য। তাঁদের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হলে দুইপ্রকার সুরকেই সমকক্ষ বা "bracketed" ধরতে হবে; এবং প্রকাশের সময় দুটি স্বরলিপিই বিকল্প সুর হিসাবে প্রকাশিত হবে।

(৫) শাস্ত্র এবং লোকাচার অর্থাৎ পূর্ব্ব স্বরলিপি ও বর্তমান গায়কীর মধ্যে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হলে, শান্তিনিকেতনে প্রচলিত সুরকে প্রাধান্য দিতে হবে; অশাস্ত্রীয় বলে উড়িয়ে দিলে চলবে না। কারণ শান্তিনিকেতনই তাঁর সংগীতসরস্বতীর পীঠস্থান। তবে এখানেও যদি মতভেদ শ্রুত হয়, তাহলে স্থানীয় প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ুনদের একত্র করে তাদের সকলের মতের গ. সা. গু. নিয়ে একটা সুর স্থিরীকৃত হবে, এবং সেইটেই শান্তি-নিকেতনের ছাপমারা বিশুদ্ধ সুর বলে গণ্য হবে। বলা বাহুল্য এই বিচারকালে শ্রুতিমাধুর্যের দাবি উপেক্ষা করা চলবে না।

(৬) যে গানের স্বরলিপি এখনো হয়নি, তারও রচনাকাল অনুসারে সেকালের বা একালের বর্তমান সাহাবীদের উপর লেখবার ভার দিতে হবে। এবং তাঁরাও শ্রুতিস্মৃতি সবদিক সাধ্যমত রক্ষা করে কার্য সম্পন্ন করবেন।

(৭) গ্রামোফোন ও রেডিওতে আজকাল রবীন্দ্র-সংগীতের যেরূপ ব্যাপক চর্চা শুনতে পাওয়া যায়, তা'তে সেগুলির প্রচারকার্যের উপরেও শান্তিনিকেতনের সংগীতভবনের কিছু আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। কী উপায়ে এই কর্তৃত্ব সহজে ও সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থাপিত হতে পারে, সে

বিষয়ে কার্যকর প্রস্তাব ও পরামর্শ পাঠাবার জন্য আমরা বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এবং বাইরের সংগীতভক্তদেরও অনুরোধ জানাচ্ছি। এ বিষয় দু'একখানি চিঠি আমাদের ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে।

মোট কথা, এই শুদ্ধিকার্যে সংগীতভবনকে একটা বিশিষ্ট কর্তৃপদ গ্রহণ করতে হবে। যদিও রচয়িতা এখন সশরীরে এখানে বর্তমান নেই, কিন্তু এখানকার আকাশেবাতাসে এখনো তাঁর প্রভাব পরিব্যাপ্ত, তাঁর সংগীত মুখরিত। তাঁর এমন প্রাণপ্রিয়, এমন মধুরসুন্দর এই যে জিনিসটি তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন, সে উত্তরাধিকারকে বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করা কি আমাদের এই শান্তিনিকেতন-অধিবাসীদেরই বিশেষ কর্তব্য নয়?—আমি এ বিষয়ে সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি বলা বাহুল্য।

আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে এইটুকু বলতে পারি যে, এই সব রবীন্দ্র-সংগীতজ্ঞ সভাসমিতি ও ব্যক্তির সংস্পর্শে যতই আসছি ততই দেখতে পাচ্ছি যে, প্রায় কোনো সেকালের গানই আমরা ঠিক একরকম সুরে জানিনে; যেন পদে পদে হোঁচট খেতে খেতে চলতে হয়। এর একটি সামান্য দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে, এই সেদিন শ্রাবণী পূর্ণিমায় আশ্রমগুরুর বার্ষিকী তিথিরক্ষার্থে যে সংগীত-জল্‌সার আয়োজন করা হয়েছিল, তা'তে অন্যান্যগানের তারতম্যের কথা বাদ দিলেও "বাংলার মাটি বাংলার জল" গানটির সহজ সরল সুরের অন্ততঃ ধুয়োর শেষাংশটি যে আমাদের জানা সুরের তুলনায় মুখে মুখে কত পরিবর্তিত আকার ধারণ করেছে, তা শুনে আশ্চর্য হতে হয়। যতদূর জানি, এই গানটির স্বরলিপি নেই।

এর থেকেই বোঝা যাবে যে, শুধু কানের উপর নির্ভর করলে গানের কতপ্রকার রূপান্তর কালক্রমে হওয়া অনিবার্য। যদি বল—তা'তে ক্ষতি কী?—তার উত্তরে যা বলেছি তার উপর আর আমার কিছু বলবার নেই। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথের সুরের এমন কিছু সুন্দর বৈশিষ্ট্য আছে, যা স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য, তাঁদের সাহায্যকল্পেই এই প্রবন্ধ রচিতং লিখিতং চ। শেষে আবার বলি যে, এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে স্বরলিপি লেখা, শেখা এবং শেখানো অভ্যাস করা খুবই উচিত—নান্যঃপন্থা। এবং আজকাল রবীন্দ্রসংগীতস্বরলিপির ব্যাপক প্রচলনের দিনে, তাঁর গান ভুল

শেখাবার কোনো ওজুহাত কোনো ওস্তাদের নেই। সংগীতভবন যদি রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষকতার পরীক্ষাগ্রহণ ও যোগ্যতার নিদর্শন-পত্র প্রদানের কোনরূপ ব্যবস্থা করেন, তাহলে উপযুক্ত শিক্ষালাভের কিঞ্চিৎ সৌকর্য সাধিত হয়। আজকাল মেয়েদের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সংগীতকে স্থান দেওয়ায় যোগ্য শিক্ষকের অভাব আরো বেশি উপলব্ধি হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং স্বরলিপি শেখানোর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, সে বিষয় আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি। তিনি বলেছিলেন পরের মুখে শুনে নিজের গান বলে এক-একবার চিনতেই পারেন না।—সেই লজ্জানিবারণের আশাতেই এত কথা বলা এবং এই শুভপ্রচেষ্টায় রবীন্দ্র-সংগীতভক্তগণের সহযোগিতা প্রার্থনা করা।

পরিশেষে নিজের লেখার একটু টীকা নিজেই করা আবশ্যক মনে করি, নইলে লোকে আমাকে ভুল বুঝতে পারে। স্বরলিপির আবশ্যকতার উপর জোর দিয়েছি বলে কেউ যেন মনে না করেন যে, একমাত্র স্বরলিপি শিখলেই রবীন্দ্রসংগীতে পারগামী হওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে যে, আমার প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে রবীন্দ্রসংগীতের বিশুদ্ধতারক্ষা, অর্থাৎ ভুল নিবারণের উপায়। তাই যে-সকল স্থলে সুর সম্বন্ধে সন্দেহ বা মতভেদ উপস্থিত হবে, সেই সেই স্থলে কেবল সন্দেহভঞ্জনার্থে স্বরলিপির শরণাপন্ন হতে বলেছি, এবং তার প্রামাণ্যতার দিশারী দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু স্বরশুদ্ধি এক জিনিস, সুরসিদ্ধি বা রসবুদ্ধি আর। সেই রসপূর্ণ গায়কীতে উত্তীর্ণ হওয়াই গায়কের লক্ষ্য ; এবং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য সদ্‌গুরুর দ্বারস্থ হওয়া চাই, নিজ সাধনার দ্বারা স্বরলিপির কঙ্কালে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা চাই।

রবীন্দ্রনাথ নিজে বলে গেছেন, "যুগ বদলায়, কাল বদলায়, তার সঙ্গে সব কিছুই ত বদলায়। তবে সব চেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালিরা, শোকে দুঃখে, সুখে আনন্দে আমার গান না গেয়ে তাদের উপায় নেই। যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবেই।" তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল করতে, এই প্রাণের ইচ্ছে পূর্ণ করতে কি আমরা সাহায্য করব না ?

শান্তিনিকেতন, আশ্বিন, ১৩৪৯

বাংলা ছন্দের মাত্রা

শ্রীরাজশেখর বসু

আমি ছন্দোবিশারদ নই, কিন্তু আমার একটা চলনসই কর্ণেন্দ্রিয় আছে যার দ্বারা বোধ হয় যে অমুক পদ্যের ছন্দটা ঠিক, অমুকটার বেঠিক। হয়তো কানের বা পাঠের বা অভিজ্ঞতার দোষে মাঝে মাঝে ঠিক ছন্দেও ত্রুটি ধরি, বেঠিক ছন্দেরও পতন বুঝতে পারি না। তথাপি নিজের কানের উপর নির্ভর ক'রে যথাবুদ্ধি বাংলা ছন্দ বিশ্লেষের চেষ্টা করছি। অনেকে ছন্দের রহস্য না জেনেও ভাল পদ্য লিখতে পারেন, অনেক সাধারণ পাঠকও ছন্দ বজায় রেখে পড়তে পারেন। আমি সেই সহজ সংস্কারবশেই ছন্দোজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

চিত্রশাস্ত্রকার বিধান দিতে পারেন যে মানুষের মাথার যে মাপ হবে তার সঙ্গে চোখ নাক ধড় হাত পা প্রভৃতির এই এই অনুপাত থাকবে। আরও অনেক নিয়ম তিনি বিজ্ঞানীর মতন সূত্রাকারে বেঁধে দিতে পারেন। ঐসমস্ত নিয়ম অনুসারে কেউ যদি ছবি আঁকে তবে তা শাস্ত্রসম্মত হবে, কিন্তু ভাল নাও হ'তে পারে। যে যে লক্ষণ থাকলে চিত্র উত্তম হয় তার সম্পূর্ণ নির্দেশ দেওয়া শাস্ত্রের সাধ্য নয়। শাস্ত্রকার কেবল স্থূল নিয়ম দিতে পারেন। ছন্দঃশাস্ত্রেও এই কথা খাটে। ছন্দের স্থূল নিয়মের আলোচনাই সুসাধ্য।

'ছন্দ' শব্দের ব্যাপক অর্থ করা যেতে পারে—পর্বে পর্বে বিভক্ত সুপাঠ্য সুশ্রাব্য শব্দধারা। ধারার বিভাগ অর্থাৎ মাঝে মাঝে বিরাম বা একান্বয়ভঙ্গ (break of monotony) চাই, আবার বিভাগগুলির সংগতি বা সামঞ্জস্য (harmony)ও চাই। কেন সুশ্রাব্য হয়, কিসে সংগতি হয়, তা বলা আমার সাধ্য নয়। যে সকল ছন্দ সুপ্রচলিত তাদের স্পষ্ট ও সাধারণ লক্ষণ-গুলিই বিচার ক'রে দেখতে পারি। ছন্দের চরণসংখ্যা, পর্ববিভাগ, যতি, এবং স্থানবিশেষে স্বরাঘাত বা জোর (stress)ও আমার আলোচ্য নয়। বিভিন্ন ছন্দঃশ্রেণীর যা কঙ্কালস্বরূপ, অর্থাৎ মাত্রাসংস্থান বা মাত্রাগণনার রীতি, কেবল তার সম্বন্ধেই লিখছি। মাঝে মাঝে সংস্কৃত রীতির উল্লেখ করতে হয়েছে, কারণ

বাংলা ছন্দের প্রকৃতি আলাদা হ'লেও ক্ষেত্রবিশেষে সংস্কৃতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

প্রথমেই কয়েকটি শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট করা দরকার, নয়তো বোঝবার ভুল হ'তে পারে।

হরফ ও অক্ষর

'অক্ষর' শব্দ সাধারণত দুই অর্থে চলে। প্রথম অর্থ হরফ, যেমন অ ক্ ক কু কে ক্র ৎ ং ঃ। দ্বিতীয় অর্থ—syllable। এই প্রবন্ধে প্রথম অর্থে 'অক্ষর' লিখব না, 'হরফ' লিখব। দ্বিতীয় অর্থেই 'অক্ষর' লিখব। এক শ্রেণীর বাংলা ছন্দকে 'অক্ষরবৃত্ত' বলা হয়, সেখানে 'অক্ষর' মানে হরফ। 'অক্ষরবৃত্ত' নামটি ভ্রান্তিজনক, কিন্তু বহুপ্রচলিত, সেজন্য বজায় রেখেছি।

'অক্ষর' বা syllable শব্দে বোঝায়—শব্দের ন্যূনতম অংশ যার পৃথক্ উচ্চারণ হ'তে পারে। আগে বা পরে স্বরবর্ণ না থাকলে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করা যায় না, সেজন্য কেবল ব্যঞ্জনবর্ণে অক্ষর হ'তে পারে না। র ল শ ষ স স্বরযুক্ত না ক'রেও উচ্চারণ করা যায় বটে, কিন্তু সাধারণ ভাষায় সেরকম প্রয়োগ নেই। প্রতি অক্ষরে থাকে—শুধুই একটি স্বর, অথবা একটিমাত্র স্বরের সঙ্গে এক বা একাধিক ব্যঞ্জন। অনুস্বার বিসর্গও ব্যঞ্জনস্থানীয়। অক্ষরের উদাহরণ—অ তু উৎ কপ্ দ্বী প্রাং স্তঃ। 'জল' সংস্কৃতে ২ অক্ষর —জ-ল, কিন্তু বাংলা উচ্চারণে 'জল' হসন্ত সেজন্য ১ অক্ষর। 'জলছবি' ৩ অক্ষর—জল-ছ-বি, 'জলযোগ' ৩ অক্ষর—জ-ল-যোগ, 'জলকেলি' ৪ অক্ষর—'জ-ল-কে-লি'। 'অন্তঃপাতী'—অন্-তঃ-পা-তী কিংবা অ-ন্তঃ-পাতী। 'অধিষ্ঠাত্রী' —অ-ধিষ্-ঠাৎ-রী কিংবা অ-ধি-ষ্ঠা-ত্রী।

একটিমাত্র স্বর থাকাই অক্ষরের সাধারণ লক্ষণ। শব্দে যতগুলি স্বর ততগুলি অক্ষর। কিন্তু বাংলায় কতকগুলি দ্বিস্বর অক্ষর চলে, যেমন 'এই, বউ, খাও'। এইরকম জোড়াস্বর বা dipthong ঐ ঔ বর্ণের তুল্য এবং অক্ষরে এক স্বর রূপে গণনীয়। অথবা ধরা যেতে পারে যে দ্বিতীয় স্বরটি ব্যঞ্জনধর্মী, কারণ তার টান নেই।

মাত্রা, স্বরের হ্রস্বদীর্ঘ ভেদ, অক্ষরের লঘুগুরু ভেদ

'মাত্রা' র অর্থ—স্বরবর্ণের উচ্চারণকাল। ব্যঞ্জনবর্ণের মাত্রা নেই, ব্যঞ্জন যে স্বরকে আশ্রয় করে তারই মাত্রা আছে। ব্যঞ্জনের মাত্রা আছে মনে করলে অনর্থক বিভ্রাট হয়। সংস্কৃতে স্বরবর্ণের হ্রস্বদীর্ঘভেদ আছে, হ্রস্বস্বরের এক মাত্রা দীর্ঘস্বরের দুই মাত্রা। ছন্দে অক্ষরেরও লঘুগুরুভেদ ধরা হয়। যে অক্ষরের অন্তর্গত স্বর হ্রস্ব তা লঘু, যার স্বর দীর্ঘ তা গুরু। সংস্কৃত ছন্দের নিয়মে হ্রস্ব স্বরও দীর্ঘতা পায়—যদি তার পরে অনুস্বর বা বিসর্গ থাকে অথবা হস্‌চিহ্নিত ব্যঞ্জন বা যুক্তব্যঞ্জন থাকে। তা ছাড়া দরকার হ'লে চরণের শেষের স্বরও দীর্ঘতা পায়—

সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণঃ সংযোগপূর্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা॥

প্রথম ও তৃতীয় চরণের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে পূর্ববর্তী স্বরের উপর তার প্রভাব হয় না। বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের স্বাভাবিক ভেদ নেই, কেবল স্থান বিশেষে ঐ ঔ দীর্ঘ হয়।

উক্ত সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে এইসকল অক্ষরের অন্তর্গত স্বর হ্রস্ব, সেজন্য অক্ষরগুলি লঘু—অ চ কি তু নৃ প্র দ্বি ক্ষু। এইগুলি গুরু, কারণ অন্তর্গত স্বর দীর্ঘ—আ কা কী ভূ সে নৌ কিং নিঃ কিম্ পুর্ ন্যস্ ক্ষিপ্। 'শিল্প' শব্দের ই-কার দীর্ঘ, কারণ পরে যুক্তব্যঞ্জন আছে।

সংস্কৃত নিয়মে 'সূত' আর 'সুপ্ত' দুইএরই আদ্য স্বর দীর্ঘ—এবং অন্ত্য স্বর হ্রস্ব, সেজন্য আদ্য অক্ষর সূ-, সুপ্- গুরু এবং অন্ত্য অক্ষর-ত লঘু। 'কারু, দীন, শৌরি' এবং 'সত্ত্ব, তুষ্ট, দীপ্তি, সৈন্য' সবগুলিই ঐপ্রকার, একটির বদলে অন্য একটি বসালে দোষ হয় না। সূ- আর সুপ্- অক্ষরের যে ঊ উ আছে তাদের উচ্চারণকাল বা মাত্রা সমান। কিন্তু সূ- আর সুপ্- অক্ষরের ধ্বনির ওজনও কি সমান? সূ- এর উচ্চারণে টান আছে, সুপ্- এ ঘাত বা ধাক্কা বা সহসা ধ্বনিরোধ আছে, দুটিই সমান হ'তে পারে না। উক্ত দুরকম অক্ষরের অনুষঙ্গী দুরকম দীর্ঘস্বরের পার্থক্যসূচক পরিভাষা আছে কিনা জানি না। কাজ

চালাবার জন্য নাম দিচ্ছি—'স্বতোদীর্ঘ', অর্থাৎ যে স্বর সংস্কৃতে স্বভাবত দীর্ঘ, যেমন 'সূত'এর উ; 'পরতোদীর্ঘ', অর্থাৎ যে স্বর হ্রস্ব হ'লেও পরবর্তী যুক্ত-ব্যঞ্জনাদির প্রভাবে দীর্ঘ হয়, যেমন 'সুপ্ত'এর উ। অক্ষরের ঐরকম ভেদসূচক নাম—'স্বতোগুরু, পরতোগুরু'। সংস্কৃত ছন্দে এই ভেদ গ্রাহ্য হয় না—

রাগেণ বালারুণকোমলেন
চূতপ্রবালোষ্ঠমলঞ্চকার।

প্রথম পঙ্‌ক্তিতে যুক্তব্যঞ্জন নেই, দ্বিতীয়তে আছে, অথচ ছন্দ একই। বাংলা ছন্দের শ্রেণীভেদে পরতোগুরু অক্ষর মানা হয় কিন্তু ঐ ঔ ছাড়া স্বতোগুরু মানা হয় না, আবার কৃত্রিমগুরুও মানা হয়—সে কথা পরে বলব।

সংস্কৃত ছন্দে উক্ত ভেদের নিয়ম না থাকলেও নিপুণ কবি ধ্বনিবৈচিত্র্যের জন্য স্বতোগুরু বা পরতোগুরু অক্ষর নির্বাচন ক'রে প্রয়োগ করেন। এই নির্বাচনের সূত্র কবির মাথাতেই থাকে, ছন্দঃশাস্ত্রে তা নেই।

অক্ষর ও মাত্রা সম্বন্ধে আর একটু বলবার আছে। কোনও শব্দের অক্ষরগুলি দুই রীতিতে পৃথক্ ক'রে দেখানো যেতে পারে। প্রথম রীতি—শব্দের যুক্তব্যঞ্জন না ভাঙা, যেমন সু-প্ত, শ্র-দ্ধা-বান্। কিন্তু এতে পরতোদীর্ঘতা প্রকাশ পায় না। সু- আর শ্র- এর স্বর পরতোদীর্ঘ, কিন্তু অক্ষরে তার লক্ষণ নেই। দ্বিতীয় রীতি—যথাসম্ভব যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষ করা, যাতে স্বরের পরতোদীর্ঘতা (বা অক্ষরের পরতোগুরুতা) অক্ষর দেখলেই বোঝা যায়, যেমন সুপ্‌-ত, শ্রদ্‌-ধা-বান্। এই প্রবন্ধের উদাহরণে দ্বিতীয় রীতিই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু যে বাংলা ছন্দে যুক্তব্যঞ্জনের জন্য পূর্বস্বর দীর্ঘ হয় না সেখানে প্রথম রীতিতে অক্ষর ভাগ হয়েছে, যেমন জ-ন্মে-ছিস।

সংস্কৃত ছন্দ

বাংলা ছন্দের আলোচনার আগে সংস্কৃত ছন্দের কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক মনে করি, তাতে বাংলা ছন্দের সূত্রগঠন সহজ হবে। সংস্কৃত নিয়ম খুব বাঁধাধরা, পদ্যকারের স্বাধীনতা অল্প, সেজন্য নিয়মের সূত্র সরল। সংস্কৃতে দুই শ্রেণীর ছন্দ বেশী চলে—অক্ষরছন্দ বা বৃত্ত, এবং মাত্রাছন্দ বা জাতি।

অক্ষরছন্দের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা অনিয়ত, অক্ষরসংখ্যা নিয়ত; মাত্রাসংখ্যা নিয়ত, অক্ষরবিন্যাসও নিয়ত, অর্থাৎ লঘুগুরুভেদে অক্ষর সাজাবার বাঁধা নিয়ম আছে। মিশ্র ছন্দও চলে, যেমন ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্রবজ্রার মিশ্রণে উপজাতি ছন্দ। মন্দাক্রান্তা অমিশ্র ছন্দ, সব চরণ সমান। অক্ষর ভাগ ক'রে তার উদাহরণ দিচ্ছি—

কশ্-চিৎ কান্-তা-বি-র-হ-গু-রু-ণা স্বা-ধি-কা-রপ্-র-মৎ-তঃ
শা-পে-নাস্-তং-গ-মি-ত-ম-হি-মা বর্-ষ-ভোগ্-য়ে-ণ ভর্-তুঃ।

প্রত্যেক চরণে অক্ষরসংখ্যা ১৭, মাত্রাসংখ্যা ২৭। উদাহরণের শব্দগুলির যথাক্রম অক্ষরবিন্যাস নীচে দেওয়া হ'ল, লঘু অক্ষরের চিহ্ন ১, গুরু অক্ষরের ২—

২২ ২২১১১১১২ ২১২২১২২
২২২২১১১১১২ ২১২২১ ২২

মাত্রাচ্ছন্দের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা অনিয়ত, অক্ষরসংখ্যা প্রায় অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত, অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত। যথা পজ্ঝটিকা ছন্দে—

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥

যথাক্রমে চার চরণের অক্ষরসংখ্যা ১১, ১২, ১০, ১০। মাত্রাসংখ্যা প্রতি চরণে ১৬। অক্ষরবিন্যাস এইরকম—

২১ ১২১ ১২১১২২
১১ ১১২২ ১১১ ১২২
২১১২ ১১২২২২
২২ ২১ ১২১১ ২২

সংস্কৃত পদ্যে চরণের শেষে মিল কম দেখা যায়। যা আছে তা প্রায়

মাত্রাচ্ছন্দে, যেমন পজ্‌ঝটিকায়, গীতগোবিন্দে, 'কজ্জলপূরিতলোচনভারে' প্রভৃতি স্তোত্রে। কারণ বোধ হয় এই—অক্ষরচ্ছন্দে অক্ষরবিন্যাস লঘুগুরুভেদে নিয়মিত, পর্যায়ক্রমে তার আবর্তন হয়। এমন ছন্দের মাধুর্য মিলের উপর নির্ভর করে না। মাত্রাচ্ছন্দে এই আবর্তনের অভাবে কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা র'য়ে যায়, তার পূরণের জন্যই মিলের চেষ্টা। অথবা এও হ'তে পারে যে চরণের মিল করতে গেলে অক্ষরচ্ছন্দের কড়া নিয়ম মানা শক্ত হয়, তাই পদ্যকার অপেক্ষাকৃত স্বাধীন মাত্রাচ্ছন্দের শরণ নেন।

বাংলা ছন্দ

বাংলা ছন্দের প্রচলিত শ্রেণী তিনটি। সাধারণত তাদের নাম দেওয়া হয়—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। তা ছাড়া সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণও কিছু চলে। বাংলায় স্বতোদীর্ঘ স্বর নেই, কিন্তু ছন্দের শ্রেণীবিশেষে ঐ ঔ দীর্ঘ হয় এবং পরতোদীর্ঘ ও কৃত্রিমদীর্ঘ স্বরও চলে।

বাংলা ছন্দের সাধারণ লক্ষণ—চরণের নিয়ত মাত্রাসংখ্যা, যেমন অধিকাংশ সংস্কৃত ছন্দে। অনেক আধুনিক ছন্দের চরণ অত্যন্ত অসমান, তথাপি তার জন্য সুশ্রাব্যতার হানি হয় না, বরং বৈচিত্র্য হয়। কিন্তু এইসব ছন্দের সূত্র-নিরূপণ অসম্ভব। শুধু বলা যেতে পারে যে অমুক পদ্যের শব্দগুলির মাত্রা অমুক শ্রেণীর রীতিতে ধরা হয়েছে। কিন্তু তাও আবার সর্বত্র স্থির করা যায় না।

অক্ষরবৃত্ত

অক্ষরবৃত্তের উদাহরণ— সাধারণ পয়ার ত্রিপদী ইত্যাদি। এই শ্রেণীর ছন্দের প্রধান লক্ষণ—চরণের নিয়ত হরফ-সংখ্যা, যেমন পয়ারের প্রতি চরণে ১৪ হরফ। স্বরান্ত ব্যঞ্জন, হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন, যুক্তব্যঞ্জন, অনেক স্থলে অনুস্বার পর্যন্ত নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে ধরা হয়, কেবল বিসর্গ ধরা হয় না। 'ঐ' এক হরফ, কিন্তু 'ওই' দু হরফ। 'সর্দার' ৩ হরফ, কিন্তু দরকার হ'লে 'সরদার' লিখে ৪ হরফ করা যায়। 'বাগ্দেবী' আর 'বাগদেবী' একই

শব্দ, অথচ প্রথমটির ৩ হরফ দ্বিতীয়টির ৪ হরফ ধরা হয়। আসল কথা—হরফের হিসাব একটা কৃত্রিম চাক্ষুষ উপায়। ছন্দের ব্যঞ্জনা মুখে, ধারণা কানে। মুখ আর কানের সাক্ষ্য নিয়েই সূত্রনির্ণয় করতে হবে।

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।

যদি প্রত্যেক হরফ স্বরান্ত ক'রে পড়া হয় তবে বলা যেতে পারে—প্রতি চরণে ১৪ হরফ, ১৪ অক্ষর, ১৪ মাত্রা। কিন্তু যদি সহজ রীতিতে পড়া হয় তবে হসন্ত উচ্চারণের উপর নজর রেখে এইরকমে অক্ষর ভাগ করা যেতে পারে—

পা-খি সব ক-রে রব রা-তি পো-হা-ই-ল,
কা-ন-নে কু-সুম-ক-লি স-ক-লি ফু-টি-ল।

প্রথম চরণে ১২ অক্ষর, দ্বিতীয়তে ১৩। হসন্ত উচ্চারণের জন্য 'সব, রব, -সুম' এই ৩ অক্ষর পরতোগুরু হয়েছে, অন্য অক্ষরগুলি লঘু। দুই চরণেই ১৪ মাত্রা। কিন্তু অক্ষরবৃত্তের সূত্র এত সহজে পাওয়া যাবে না। সকল পদ্যই যুক্তাক্ষর-বর্জিত শিশুপাঠ্য নয়।

ব-হু প-রি-চ-র্যা ক-রি' পে-য়ে-ছি-নু তো-রে,
জ-ন্মে-ছিস ভ-র্তৃ-হী-না জ-বা-লার ক্রো-ড়ে।

এখানে 'জন্মেছিস' আর 'জবালা'র এই দুই শব্দের উচ্চারণ হসন্ত, সেজন্য '-ছিস' ও '-লার' এই দুই অক্ষর পরতোগুরু। কিন্তু যুক্তব্যঞ্জনের প্রভাবে 'পরিচর্যা, জন্মেছিস, ভর্তৃহীনা' শব্দে পরতোগুরু অক্ষর উৎপন্ন হয় নি। প-রি-চ-র্যা ৪টিই লঘু অক্ষর। চ-এর অ-কারকে চেপে হ্রস্ব ক'রে রাখা হয়েছে, তার ফলে 'পরিচর্যা'র উচ্চারণকাল 'পেয়েছিনু'র সমান। 'জন্মেছিস, ভর্তৃহীনা'ও এইরকম। উপরের উদাহরণে যথাক্রমে দুই চরণের হরফ-সংখ্যা ১৪, ১৪, অক্ষরসংখ্যা ১৪, ১২, মাত্রাসংখ্যা ১৪, ১৪।

অক্ষরবৃত্তের রীতি—হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন বা পূর্বোক্ত দ্বিস্বর থাকলে অক্ষর পরতোগুরু হয়, কিন্তু যুক্তব্যঞ্জন বা ঐ ঔ থাকলে

হয় না। বিসর্গের জন্যও হয় না, 'দুঃখ'এর দুই অক্ষরই লঘু। শব্দের মধ্যে অনুস্বার থাকলে প্রায় হয় না, কিন্তু শেষে থাকলে হয়। 'সংখ্যা'র দুই অক্ষরই লঘু, কিন্তু 'সুতরাং'এর প্রথম দুই অক্ষর লঘু, শেষ অক্ষর গুরু।

উক্ত রীতির বশে অক্ষরবৃত্তের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা নিয়ত, অক্ষর-সংখ্যা অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত এবং সাধারণত হরফসংখ্যার সমান। অক্ষর-বিন্যাস অনিয়ত।

যুক্তব্যঞ্জনের জন্য অক্ষরের গুরুতা হয় না বটে, কিন্তু তার ঘাত বা ধাক্কা নিপুণ কবিরা উপেক্ষা করেন না, উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ ক'রে বৈচিত্র্য-সাধন করেন। পাঠকও বিশেষ বিশেষ স্বরে জোর দিয়ে ঘাতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করেন।

মাত্রাবৃত্ত

এই শ্রেণীর ছন্দে যুক্তব্যঞ্জন অবজ্ঞাত নয়, সেজন্য পরতোগুরু অক্ষর প্রচুর দেখা যায়। অনুস্বার, বিসর্গ, হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন এবং যুক্তব্যঞ্জনের প্রভাবে অক্ষর পরতোগুরু হয়। যে অক্ষরে ঐ ঔ বা দ্বিস্বর আছে তাও গুরু। কিন্তু শব্দের আদিতে যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তার প্রভাব পূর্ববর্তী শব্দের অন্ত্য স্বরে প্রায় হয় না।

মাত্রাবৃত্তের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা অনিয়ত, অক্ষরসংখ্যা অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত, অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত। যথা—

পল্‌-ল-ব-ঘ-ন আম্‌-র-কা-ন-ন রা-খা-লের খে-লা-গে-হ,
স্তব্‌-ধ অ-তল দি-ঘি-কা-লো-জল নি-শী-থ-শী-তল স্নে-হ।

যথাক্রমে দুই চরণের হরফ-সংখ্যা ১৮, ১৯, অক্ষরসংখ্যা ১৭, ১৬, মাত্রা-সংখ্যা ২০, ২০।

অনেকে বলেন—মাত্রাবৃত্তে যুক্তব্যঞ্জন ২ মাত্রা। তাতে হিসাব মিলতে পারে, কিন্তু উক্তিটি ভ্রমাত্মক। 'পল্লব' শব্দের ল্ল ২ মাত্রা বললে বোঝায় ল্ল-এর অ-কার ২ মাত্রা। কিন্তু তা সত্য নয়, প-এর অ-কারই ২ মাত্রা, কারণ পরে যুক্তব্যঞ্জন আছে। পল্‌-ল-ব এইরকমে অক্ষরভাগ করলে মাত্রাবিপর্যয় ঘটে না। অনুরূপ—উৎ-সা-হ, সং-হ-ত, দুঃ-স-হ।

বাংলা মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দের সাদৃশ্য আছে। প্রভেদ এই— বাংলায় ঐ ঔ ছাড়া স্বতোদীর্ঘ স্বর নেই। মাত্রাবৃত্তে যদি অক্ষরবিন্যাস লঘুগুরুভেদে নিয়মিত করা হয় তবে তার সঙ্গে সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের সাদৃশ্য হয়। উদাহরণ শেষে আছে।

স্বরবৃত্ত

রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর বাংলা ছন্দের নাম দিয়েছেন—'প্রাকৃত ছন্দ'। গ্রাম্য ছড়ায় ও গানে প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। 'স্বরবৃত্ত' নামের উদ্দিষ্ট অর্থ কি ঠিক জানি না। কেউ কেউ বলেন—এতে প্রতি চরণে স্বরবর্ণের (অতএব অক্ষরের) সংখ্যা সমান রাখা হয়। অনেক স্থলে তা হয় বটে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবির লেখাতেও ব্যতিক্রম দেখা যায় এবং তার জন্য ছন্দঃপাত হয় না। অতএব বলা চলে না যে নিয়ত স্বরসংখ্যাই এই শ্রেণীর লক্ষণ। স্বরবৃত্তের বিশিষ্টতা—মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখবার জন্য স্থানবিশেষে কৃত্রিম দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ।

বৃষ্-টি প-ড়ে´ টা-পুর টু-পুর ন-দেয় এ-ল´ বান,
শিব-ঠা-কু-রের বি-য়ে´ হ-বে´ তিন কন্-নে´ দান।

যথাক্রমে দুই চরণের হরফ-সংখ্যা ১৭, ১৬, অক্ষরসংখ্যা ১৩, ১২, মাত্রাবৃত্তের রীতিতে গণিত মাত্রাসংখ্যা ১৮, ১৭। এই হিসাবে দ্বিতীয় চরণে এক মাত্রা কম পড়ে, কিন্তু ´চিহ্নস্থানে প্রথম চরণে ২টি স্বর এবং দ্বিতীয় চরণে ৩টি স্বর প্রসারিত করায় কৃত্রিমগুরু অক্ষর উৎপন্ন হয়েছে, তার ফলে প্রতি চরণে ২০ মাত্রা হয়েছে। এই ছড়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' পুস্তকে লিখেছেন —'তিন গণনায় যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত ক'রে সেই পোড়ো জায়গা দখল ক'রে নিয়েছে।' অর্থাৎ—'বৃষ্টি ৩ মাত্রা; শেষের এ-কার প্রসারিত করার ফলে 'পড়ে'ও ৩ মাত্রা।

দি-নের আ-লো´ নি-বে´ এ-ল´ সুয্-যি ডো-বে´ ডো-বে,
আ-কাশ ঘি-রে´ মেঘ জু-টে-ছে´ চাঁ-দের লো-ভে´ লো-ভে।
মে-ঘের উ-পর মেঘ ক-রে-ছে´, র-ঙের উ-পর রঙ।
মন্-দি-রে-তে´ কাঁ-সর ঘন্-টা বাজ্-ল ঠং´ ঠং।

উপরের ৪ পঙ্‌ক্তিতে যথাক্রমে হরফ-সংখ্যা ১৫, ১৭, ১৯, ১৬, অক্ষরসংখ্যা ১৪, ১৪, ১৩, ১২, মাত্রাবৃত্তানুসারে মাত্রাসংখ্যা ১৬, ১৭, ১৯, ১৮। ´চিহ্নস্থানে চার পঙ্‌ক্তিতে যথাক্রমে ৪, ৩, ১, ২, স্বর প্রসারিত করায় প্রতি পঙ্‌ক্তিতে ২০ মাত্রা হয়েছে। প্রথম 'ঠং' লক্ষণীয়—এখানে প্রসারণ ও অনুস্বার এই দুই কারণে অ-কার ৩ মাত্রা পেয়েছে।

স্বরবৃত্তের সূত্র—চরণের হরফ-সংখ্যা অনিয়ত, অক্ষরসংখ্যা অনিয়ত, মাত্রাসংখ্যা নিয়ত, অক্ষরবিন্যাস অনিয়ত। মাত্রাগণনায় মাত্রাবৃত্তের রীতি অনুসৃত হয়, কিন্তু অতিরিক্ত কৃত্রিমদীর্ঘ স্বরও ধরা হয়। কৃত্রিমদীর্ঘ স্বর (বা কৃত্রিমগুরু অক্ষর) থাকাতেই মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের প্রভেদ হয়েছে।

উল্লিখিত সংস্কৃত ও বাংলা বিভিন্ন ছন্দঃশ্রেণীর লক্ষণ এই সারণীতে সংক্ষেপে দেওয়া হ'ল—

লক্ষণ	সংস্কৃত		বাংলা		
	অক্ষরচ্ছন্দ	মাত্রাচ্ছন্দ	অক্ষরবৃত্ত	মাত্রাবৃত্ত	স্বরবৃত্ত
স্বতোগুরু অক্ষর	আছে	আছে	নেই	অল্প*	অল্প*
পরতোগুরু অক্ষর	আছে	আছে	অল্প ‡	আছে	আছে
কৃত্রিমগুরু অক্ষর	নেই	নেই	নেই	নেই	আছে
হরফ-সংখ্যা	অনিয়ত	অনিয়ত	নিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত
অক্ষরসংখ্যা	নিয়ত	প্রায় অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত
মাত্রাসংখ্যা	নিয়ত	নিয়ত	নিয়ত	নিয়ত	নিয়ত
অক্ষরবিন্যাস	নিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত	অনিয়ত

অসম ছন্দ ও গদ্য ছন্দ

পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর বাংলা ছন্দে দেখা যায় যে একচরণের মাত্রাসংখ্যা পরবর্তী কোনও এক চরণের সমান। এইরকম দু-একজোড়া চরণ মিলিয়ে দেখলেই ছন্দের শ্রেণী ধরা পড়ে। কিন্তু যেখানে চরণগুলি অসমান সেখানে

* কেবল ঐ ঔ থাকলে। ‡ কেবল হস্‌চিহ্নিত বা হসন্তবৎ উচ্চারিত ব্যঞ্জন, দ্বিস্বর, বা শব্দের শেষে অনুস্বার থাকলে।

উপায় কি? শব্দাবলীর মাত্রাভঙ্গী থেকে অনেক স্থলে বলা যেতে পারে যে ছন্দটি অমুক শ্রেণীর। কিন্তু কতকগুলি ছন্দ, বিশেষত গদ্য ছন্দ, তিন শ্রেণীর কোনওটির সঙ্গে খাপ খায় না।

১। আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধির পরে মুষ্টি হানি'
করিবে তাহারে উচ্চকিত
আতঙ্কিত।

২। অধরা মাধুরী পড়িয়াছে ধরা
এ মোর ছন্দ বন্ধনে।
বলাকা পাঁতির পিছিয়ে পড়া ও পাখি,
বাসা সুদূরের বনের প্রাঙ্গণে।

৩। আমার পক্ষে বিয়ে করা বিষম কঠিন কর্ম,
কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হ'লে অপূর্ণ যে রয়,
মনু হ'তে মহাভারত সকল শাস্ত্রে কয়।

উদ্ধৃত উদাহরণগুলির ভঙ্গী থেকে বলা যেতে পারে যে প্রথমটি অক্ষরবৃত্ত দ্বিতীয়টি মাত্রাবৃত্ত, তৃতীয়টি স্বরবৃত্ত। প্রত্যেকটিতে যেন সমান মাত্রার এক একরকম ছন্দ থেকে এক একটি পঙ্‌ক্তি তুলে এনে অসমান মাত্রার গোছা বাঁধা হয়েছে। এরকম ছন্দকে মিশ্রছন্দ বলা যেতে পারে। কিন্তু—

সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে
অস্তসমুদ্রে সদ্য স্নান ক'রে।
মনে হ'ল স্বপ্নের ধূপ উঠছে
নক্ষত্রলোকের দিকে।

এই উদাহরণ একবারে স্বচ্ছন্দ, সাধারণ ছন্দের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ এরকম গদ্য ছন্দের পরিচয় দিয়েছেন—'এতে পদ্যের ছন্দ নেই, এতে জমানো ভাবের ছন্দ। শব্দবিন্যাসে সুপ্রত্যক্ষ অলংকরণ নেই, তবুও আছে শিল্প।'

সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ

সংস্কৃত ছন্দের সমস্ত নিয়ম বজায় রেখে কেউ কেউ বাংলা পদ্য লেখবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সুবিধা হয় নি, কারণ স্বতোদীর্ঘ স্বর বাংলা ভাষার প্রকৃতি-

বিরুদ্ধ, তাতে রচনা কৃত্রিম হ'য়ে পড়ে। বলদেব পালিতের লেখা থেকে উপজাতি ছন্দের নমুনা—

দৈবানুকূলে বলহীন শক্ত,
বলী অশক্ত প্রতিকূল দৈবে।
দৈবে হবে নির্জিত সূতপুত্র
তোমার ভাগ্যে ঘটিবে জয়শ্রী॥

প্রতি চরণে ১১ অক্ষর। প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ ইন্দ্রবজ্রা, ১৮ মাত্রা; দ্বিতীয় চরণ উপেন্দ্রবজ্রা, ১৭ মাত্রা। অনুরূপ সংস্কৃত—

এষা প্রসন্নস্তিমিতপ্রবাহা
সরিদ্ বিদূরান্তরভাবতন্বী।
মন্দাকিনী ভাতি নগোপকণ্ঠে
মুক্তাবলী কণ্ঠগতেব ভূমেঃ॥

রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' পুস্তকে দ্বিজেন্দ্রনাথ-রচিত একটি মন্দাক্রান্তার নমুনা আছে—

ইচ্ছা সম্যক্ ভ্রমণগমনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি,
পায়ে শিক্‌লী মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবেরি শাস্তি।

সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দের রীতিতে বাংলায় অনেক গান রচিত হয়েছে, যেমন 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'জনগণমন অধিনায়ক'। এইসব গানে স্বতোদীর্ঘ স্বর থাকলেও তার ফল ভালই হয়েছে, কারণ গানের তালের সঙ্গে দীর্ঘস্বরের টান সহজেই খাপ খায়।

বাংলা মাত্রাবৃত্তের নিয়মে, অর্থাৎ শুধু পরতোদীর্ঘ স্বর অবলম্বন ক'রে কেউ কেউ সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের অনুকরণ করেছেন। কিন্তু স্বতোদীর্ঘ স্বরের জন্য সংস্কৃতে যে লালিত্য হয় অনুকরণে তা পাওয়া যায় না। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচিত বাংলা মাত্রাবৃত্তে মালিনী ছন্দের নমুনা—

উড়ে চ'লে গেছে বুলবুল, শূন্যময় স্বর্ণপিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্‌গুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

প্রতি চরণে ১৫ অক্ষর, ২২ মাত্রা, অক্ষরবিন্যাস সংস্কৃত অক্ষরচ্ছন্দের রীতিতে, শুধু স্বতোগুরু অক্ষর নেই। অনুরূপ সংস্কৃত—

শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদী মেঘমুক্তং
জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাবতীর্ণা।

সংস্কৃত মাত্রাচ্ছন্দে অক্ষরবিন্যাসের বাঁধাবাঁধি নেই, সেজন্য বাংলায় অনুরূপ রচনা আড়ষ্ট না ক'রেও সংস্কৃত ছন্দের সঙ্গে অল্পাধিক সাদৃশ্য রাখা যেতে পারে। যথা রবীন্দ্রনাথের—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

দুই চরণে যথাক্রমে ২০, ১৪ মাত্রা (চরণের অন্ত্যস্বর দীর্ঘ)। অনুরূপ গীতগোবিন্দে—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম।

'ছন্দ' পুস্তকে সংস্কৃত শিখরিণী অক্ষরচ্ছন্দের রবীন্দ্রনাথ-কৃত বাংলা রূপান্তরের একটি নমুনা আছে। এতে শুধু মাত্রাসংখ্যা ঠিক রাখা হয়েছে—

কেবলি অহরহ মনে মনে
নীরবে তোমা সনে যা খুশি কহি কত;

সংস্কৃত নমুনা—

চলাপাঙ্গাং দৃষ্টিং / স্পৃশসি বহুশো বেপথুমতীং

প্রতি ভাগে যথাক্রমে ১১, ১৪ মাত্রা।

পরিশেষে বাংলা মাত্রাবৃত্ত-মন্দাক্রান্তার একটি উদ্ভট নমুনা দিচ্ছি—

মন্দাক্রান্তায় রচিল কালিদাস কাব্য মেঘদূত চমৎকার,
বাংলায় তদ্রূপ লঘুগুরুবিভেদ নেই ব'লেই শক্ত একটু।
যুক্তাক্ষর তাই যত পার চালাও আর দেদার দাও হসন্ত,
ঠিক ঠিক জায়গায় বসালে পাবে এই তক্রে কিঞ্চিৎ দুধের স্বাদ॥

সঞ্চয়ন

বি-সম দায়

ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রে যে-সব ঘটনাপারম্পর্য দেখা যায় তাদেরকে আজকের দিনে নিছক কষ্টকল্পনা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে প্রতি ঘটনা কর্ম ও কর্মফলের সূত্রে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। কারণ বা হেতু আপাতজ্ঞানের গোচর না হ'তে পারে, তবে 'নিমিত্তের ভাগী' একটা কিছু যে কোথাও আছে, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফরাসী বিপ্লবের কথা ধরা যাক। ভলটেয়র্ ও রুসো এই গণ-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং এই গণসমুদ্র-মন্থনের ফলে আবির্ভাব হয় নেপোলিয়ন-এর। নেপোলিয়ন্-এর দিগ্বিজয়প্রচেষ্টা সূচনা করল জার্মান জাতীয়তার—সেই জাত্যভিমানের প্রত্যক্ষ ফল ১৮৭০ অব্দের যুদ্ধ ও পরোক্ষ ফল হ'ল ১৯১৪-র মহাসমর। অতঃপর এল ভার্সাইচুক্তি, হিট্‌লার এবং আজকের দিনের কুরুক্ষেত্র। এইভাবে কতকগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ কারণসমবায় থেকে মানবসমাজের আধুনিক দুর্গতির জের টানা ও অতীতের ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার মেনে নেওয়া—একই কথা।

সম্প্রতি জ্যাক বারজুঁ নামে একজন ঐতিহাসিক তাঁর একটি গ্রন্থে* প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে জাতি-ও শ্রেণী-গত বিরোধ যে বীভৎস রূপ নিয়েছে তার জন্য দায়ী হলেন ডারউইন, মার্ক্স ও হ্বাগনার। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে এই তিন ব্যক্তি যে মতবাদ প্রচার ক'রে গিয়েছিলেন তারই প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার ফলে সমস্ত মানবসমাজ আজ বিপর্যস্ত—এ প্রকার কথা সহজে বিশ্বাস্য নয় ব'লেই একটু যাচাই ক'রে নেওয়া দরকার।

Nature কাগজের একটি সংখ্যায় এ. উল্‌ফ উপরোক্ত বইটির সমালোচনা-প্রসঙ্গে যা বলেছেন সে কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে বারজুঁর ত্রয়ী কল্পনায় কোথায় যেন একটা খুঁত আছে। আর সত্যই তো, ডারউইন, মার্ক্স ও হ্বাগনার এই তিন বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তির মধ্যে একটা পারস্পরিক সহযোগ অনায়াসে স্থাপন করা যায় কি? বারজুঁ কিন্তু বহু প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে দেখাতে চেয়েছেন যে এই তিন সমকালীন ব্যক্তির মধ্যে স্বভাবগত মিল তো যথেষ্ট ছিলই, উপরন্তু

* **Darwin, Marx, Wagner—Critique of a Heritage, by Jacques Barzun.**

এঁরা ছিলেন সমানধর্মা; জাতিবিরোধ ও শ্রেণীসংঘর্ষের প্রবর্তনা দিয়েছিলেন এঁরাই। ক্ষেত্রভেদ সত্ত্বেও একটি জায়গায় এঁদের মতামতের গভীর সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রকৃতিবিজ্ঞানে ডারউইন, সমাজবিজ্ঞানে মার্ক্স ও সংগীতশিল্পে ভাগনার একটি মতকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন এবং সে মত হ'ল এই যে সভ্যতার ভিত্তিই হ'ল বস্তুতান্ত্রিকতা। সভ্যতার প্রকৃতবিচারে এঁরা যে সমদৃষ্টিবান্ ছিলেন তার একটা প্রধান কারণ এই যে তিন জনই স্ব স্ব ক্ষেত্র অতিক্রম ক'রে বিষয়ান্তর বা প্রসঙ্গান্তর আলোচনায় যত্নবান ছিলেন। মনস্তত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে ডারউইন-এর অনেক বক্তব্য ছিল, মার্ক্স নিজেকে দার্শনিক পদবাচ্য ক'রে সারা তুনিয়ার খবরদারি করেছেন, আর ভাগনার যতটা না সংগীতরচনা করেছেন তার চাইতে পুঁথি লিখেছেন অনেক বেশী এবং নানা বিষয়ে। আরেকটি কথা, যদিচ নিতান্তই আকস্মিক মনে হবে তবু একই বছরে অর্থাৎ ১৮৫৯ অব্দে ডারউইন তাঁর Origin of Species, মার্ক্স তাঁর Critique of Political Economy ও ভাগনার Tristam and Isolde রচনা সম্পূর্ণ করেন।

বারজুঁ এঁদের চারিত্রিক মিলের অনেক সন্ধান দিয়েছেন। তিন জনই ছিলেন আত্মসর্বস্ব, 'গুরুমারা' ছাত্র। স্পষ্ট সমালোচকদের প্রতি তিনজনেই ছিলেন সমান বিরূপ, প্রতিযোগীদের প্রতি এঁদের অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। ডারউইন্-এর বেলা দেখি যে তিনি তাঁর লেখা, আচরণ ও প্রকারান্তরে সর্বদা এই কথা প্রতিপন্ন করতে চাইতেন যে বিবর্তনবাদ যেন তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। সমকালীন বা প্রাক্‌কালীন কোনো মনীষীর ঋণ তিনি স্বীকার করেন নি, যদিচ একথা সুবিজ্ঞাত যে বুফোঁ, লামার্ক ও মালথুস্-এর লেখার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। আর ইরাস্‌মাস্ ডারউইন তো ছিলেন তাঁর নিজেরই পিতামহ। Origin of Species বইটির তৃতীয় সংস্করণে পুস্তক প্রণয়নের একটি যে বৃত্তান্ত আছে, তা থেকে দেখা যায় যে বুফোঁকে ডারউইন কলমের একটি খোঁচায় বাতিল ক'রে দিয়েছেন, মিথ্যাপরিচয়ে লামার্ককে নগণ্য করেছেন ও পিতামহ ইরাস্‌মাস্‌কে যথোচিত ভাবে সমাধি দিয়েছেন পাদটীকার কয়েকটি ছত্রে। অথচ অস্‌বোর্ণ বলেন যে ডারউইন-এর প্রাণীতত্ত্বের ভিত্তি যে-তিনটি মতের উপর প্রতিষ্ঠিত তার তুটি মতই বুফোঁ ও লামার্ক-এর কাছে ধার-করা।

বিবর্তনবাদকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করতে গিয়ে ডারউইন-এর সব চাইতে বড়ো দান হ'ল তাঁর প্রাকৃতিক নির্বাচনের তথ্য। ডারউইন একে বলেছেন যোগ্যতমের উদ্বর্তন অর্থাৎ Survival of the fittest। তিনি বলেন যে জীবনসংগ্রামে তারাই উতরে যায় যারা কোনো একটা বিশেষ গুণের জোরে অন্যদের পরাভূত ক'রে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখতে পারে। সত্তারক্ষার পরিপোষক বিশেষ গুণগুলি বংশানুক্রমে উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে। যে-জাতির মধ্যে এই পরিবর্তন সম্যক্ উৎকর্ষ লাভ করেছে প্রকৃতি তার গলায় বিজয়মাল্য দিয়ে সে-জাতিকে বেছে নেয়। ডারউইন-এর প্রথম

ও প্রধান বক্তব্যই হ'ল এই যে এই পরিবর্তন সাধিত হয় যান্ত্রিক বা স্বভাবজ নিয়মে। এইজন্যই প্রকৃতির রক্তাক্ত নখদন্ত-সংকুল ভয়াল মূর্তি, জীবজগতে প্রাণধারণ ও সত্তারক্ষণের জন্য অশ্রান্ত হিংস্র প্রতিযোগিতা, ডারউইনএর মনে কখনও বীভিষিকার সঞ্চার করতে পারে নি; তিনি বরঞ্চ এর মধ্যেই পেতেন উদ্দীপনার কারণ। তাঁর লেখার এক জায়গায় তিনি বলেছেন, "প্রকৃতির এই যে সংগ্রাম, এই দুর্ভিক্ষ, মহামারী, মৃত্যু এদের মধ্য থেকেই উচ্চতর প্রাণীর গৌরবময় উদ্বর্তন। প্রাণকে যদি এই দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয়, তা হ'লেই তার সত্যকার মহিমা পরিস্ফুট হবে।"

এই ধরনের মতবাদকে অনায়াসে রাজনীতির ক্ষেত্রে আরোপ করা যেতে পারে। প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামই যদি যোগ্যতমের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করার সহায়ক হয়, তবে রক্তারক্তি হানাহানি হ'তে বাধ্য।* তাৎকালিক ঘটনাবলীর নজীরও তাই। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে য়ুরোপের সর্বত্র জাতি ও শ্রেণীগত বিরোধকে কী অস্বাভাবিক মর্যাদাই না দেওয়া হয়েছিল। ১৮৭০ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত কি রাষ্ট্রে, কি সমাজব্যবস্থায়, কি সাহিত্যে—সর্বত্রই সেই এক চীৎকার 'ম্যয় ভূখা হুঁ!' যারা যুদ্ধজীবী তারা চায় প্রচুর ও প্রভূত সমরোপকরণ; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকামীরা চায় নৃশংস প্রতিযোগিতা; সাম্রাজ্যলিপ্সুরা চায় অনুন্নত দেশগুলির উপর যথেচ্ছ অধিকার; সমাজতন্ত্রীরা চায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের শক্তি ও জাতীয়তাবাদীর দল চায় বিজাতীয়দের বহিষ্করণের ক্ষমতা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁর উদ্বর্তন নীতির এই ধরণের অপপ্রকাশ দেখে ডারউইন নিশ্চয় ক্ষুব্ধ হ'য়ে থাকবেন। কিন্তু তা হ'লে হবে কী! জ্যামুক্ত তীর যেমন আর তূণে ফিরে আসে না তেমনি যে মতবাদ লোকের মনে একবার ধরেছে তাকে প্রত্যাহার করা সাধ্যের অতীত। কতকগুলি ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য অবিবেকী লোক চিরকাল বৈজ্ঞানিক তথ্যের অপপ্রয়োগ করেছে ও করবেও। যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতির সুযোগ গ্রহণ ক'রে অনাচার যদি ঘ'টে থাকে তা হ'লে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

মার্ক্স নিজেকে সমাজবিজ্ঞানের ডারউইন মনে করতেন। তিনি ভাবতেন প্রাণীবিজ্ঞানে যেমন ডারউইন সমাজবিজ্ঞানে তেমন তিনি, সভ্যতার বিস্তারে ও ব্যাখ্যানে উভয়ের অবদান অনুরূপ। শোনা যায় যে তাঁর Capital গ্রন্থটি মার্ক্স ডারউইনকে নিবেদন করবেন ঠিক করেছিলেন, যদিচ অবশ্য ডারউইন সে সম্মান গ্রহণ করেন নি। তবে একথা ঠিক যে মার্ক্স-এর ধারণা ছিল এই যে সমাজব্যবস্থার রদবদল ও প্রাণীজগতের উদ্বর্তন হয়

* "এমন কি, একদল সমাজতত্ত্ববিৎ বলেন, ডারউইন তাঁর অভিব্যক্তিবাদে জীবনসংগ্রাম ও যোগ্যতমে উদ্বর্তনের উপর যে ঝোঁক দিয়েছিলেন তারই ফল ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের য়ুরোপীয়ান মহাযুদ্ধ। কে বলতে পারে ১৯৪০-এর জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের পিছনেও এই মতবাদের প্রভাব আছে কি না।"—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাণতত্ত্ব, পৃঃ ১৩৪।

একই যান্ত্রিক নিয়মে। দুজনেই ছিলেন বস্তুবাদী, উভয়ের কাছে ব্যষ্টির নিজস্ব কোনো মূল্য ছিল না, যেটুকু মূল্য সে শ্রেণী বা সমষ্টির সামান্য অংশ হিসাবে। মার্ক্স-এর মতে এই গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়ের রূপ ও গঠন নির্ভর করে বাস্তব কারণের উপর, যথা, প্রাকৃতিক সম্পদ, সেই সম্পদ ব্যবহার করার ব্যবস্থা, ব্যবসাবাণিজ্যের ভৌগোলিক সুবিধা ইত্যাদি। মানুষের এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যে অহর্নিশ দ্বন্দ্ব লেগে আছে। প্রাণীবিজ্ঞানের জীবনসংগ্রাম ও সামাজবিজ্ঞানের শ্রেণীসংঘর্ষ মূলত সেই একই বিরোধের রূপান্তর—অযোগ্য সমাজ বা জাতিকে অপসৃত ক'রে যোগ্যতর শ্রেণী ও সমাজের অভ্যুত্থান। ডারউইন-এর কথার ঠিক যেন প্রতিধ্বনি করেই মার্ক্স বলেছেন যে এই শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন আছে মানুষের গৌরবময় ভবিষ্যের বীজ। তফাত কেবল এক জায়গায়। ডারউইন তাঁর সুযোগ্য সাগরেদ্‌দের ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের হেফাজতে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ন্যস্ত ক'রে সন্তুষ্ট ছিলেন। মার্ক্স কিন্তু ছিলেন একাধারে ডারউইন ও হক্সলি, ধর্মগুরু ও ধর্মপ্রচারক। মার্ক্সবাদ নিয়ে তিনি নিজে এত মাতামাতি করেছিলেন ব'লেই হয়তো ক্রোচে মার্ক্সকে বলেছেন, কিষাণ-মজদুরদের মাকিয়াভেল্লি।

বারজুঁ-বর্ণিত এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে সবার চেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হ্বাগনার-এর। হ্বাগনার আসলে ছিলেন স্বার্থান্বেষী ও সুবিধাবাদী। ছদ্ম ভালোমানুষির মুখোশের তলায় তাঁর আসল স্বরূপটি তিনি ঢেকে রাখতেন। বারজুঁ বলেন একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তথা তাঁর রচিত সংগীতনাট্যগুলিতে একই মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে—কলহপ্রবণতা, শঠতা, লাম্পট্য, নীচতা এইগুলি ছিল তাঁর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। পৌরানিক কাহিনীর বাজে অজুহাত দিয়ে তিনি বৃথা তাঁর দুর্নীতি-পরায়ণ মনটাকে গোপন রাখার প্রয়াস করতেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে নীট্‌শের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাঁর এই ছদ্মভব্যতা লুকানো থাকে নি। কিন্তু তাতে কী আসে যায়। জার্মেনীর মদোদ্ধত ক্ষাত্রজীবির দল হ্বাগনার-এর সংগীতে পেয়েছিল বাহুবলের সমর্থন। তিনি তাদের চোখের সামনে ধরেছিলেন অমানুষ বা অতিমানুষের আদর্শ, জার্মান জাতীয়তার গৌরব ঘোষণা করেছিলেন তিনি, জয়গান করেছিলেন হিংসার, প্রবঞ্চনার, লাম্পের। তিনি তাঁর স্বদেশবাসীদের হৃদয় জয় করেছিলেন শিল্প দিয়ে নয়, চাতুরী দিয়ে। আজ জার্মেনীতে তাঁর এত সম্মান কেন? পৃথিবীজয়ের যে উত্তেজনার ইন্ধন জুগিয়েছিলেন তিনি, আজ তারই আগুনে সারা পৃথিবী ছারখার হবার উপক্রম হয়েছে। বোধ করি হিটলার ও তদীয় সহচরদের হ্বাগনার-পূজার অন্যতম কারণই হল এই।

সমালোচক উলফ্ বলেন বারজুঁর বই যে একেবারে ত্রুটিবর্জিত, তা নয়। এক এক

জায়গায় হয়তো বর্তমানের আলোকে পূর্বগামীদের বিচার করতে গিয়ে তিনি সুবিচার করতে পারেন নি, পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তবু তাঁর বক্তব্য বিষয় এতই কৌতূহল-উদ্দীপক যে যাঁরা মানবসমাজের উপর মতবাদের প্রভাব সম্বন্ধে কিছু জানতে চান বা বুঝতে চান তাঁদের কাছে তাঁর বইটি খুবই চিত্তাকর্ষক হবে। —বাণীকান্ত

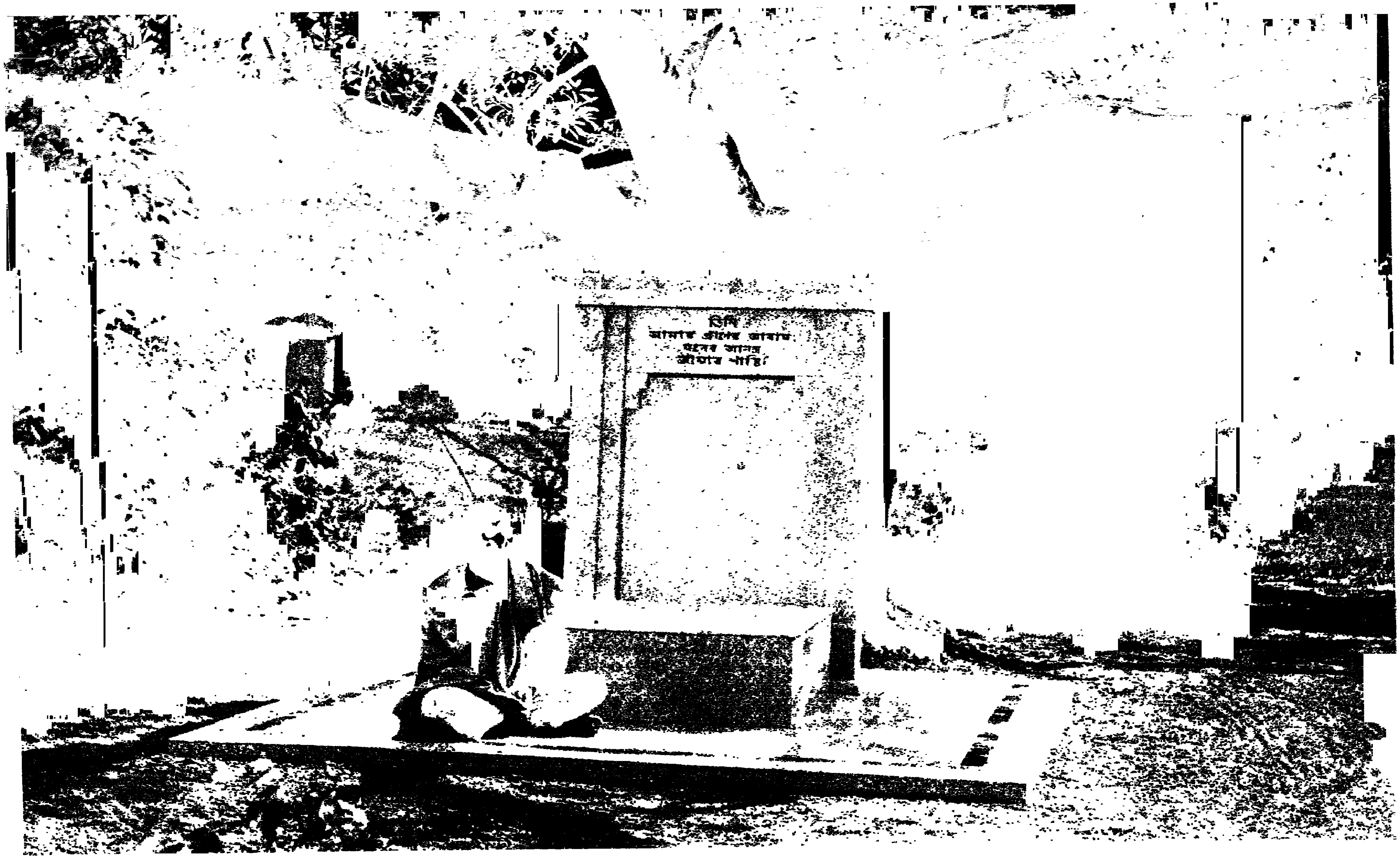

আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন অতিথিভবনের সম্মুখে রবী

আনুমানিক ১৯০১ সালে

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

সম্পাদকের মন্তব্য

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমাদের বিশ্বভারতী পত্রিকা যে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে বিশেষ ভাবে অনুস্যূত, সে কথা আমরা প্রথম সংখ্যাতেই বলেছি। আর এই শান্তিনিকেতনের উদ্দেশ্যই বা কি আদর্শই বা কি, সে কথা রবীন্দ্রনাথ বহু প্রবন্ধাদিতে ব্যক্ত ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি কোনকালেই অনুরক্ত কিম্বা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তার একটি কারণ তাঁর ছাত্রবয়সের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। দেশব্যাপী এ বিরাট সরকারী শিক্ষার ধ্বংস অথবা মেরামত করতে তিনি চাননি; কিন্তু অপরপক্ষে তিনি চেয়েছিলেন একটি ক্ষুদ্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে, যা হবে একসঙ্গে একটি বিদ্যালয় ও আশ্রম। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে নানা সময়ে নানা ব্যক্তিকে—বিশেষ ক'রে শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীদের—যে সব পত্র লিখেছিলেন, সেই সব প্রকাশিত অপ্রকাশিত পত্রের কতকগুলি আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ করলুম। এগুলি এক হিসেবে ঘরোয়া কথোপকথন। এর থেকে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে মনের ক্রমবিকাশ সকলেই দেখতে পাবেন। শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের একটি অপূর্ব কীর্তি। তাঁর প্রতিভার একটি দিক এ প্রতিষ্ঠানে সার্থক হয়েছে। শান্তিনিকেতনকে national education প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস বলা যেতে পারে— যদিচ এই nationalism-এর ভিতর internationalism অন্তর্ভূত ছিল। প্রমাণ বিশ্বভারতী।

শান্তিনিকেতন

আদিপর্ব

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যতদূর স্মরণ হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে আমার শৈশব কালে, তখন আমার সবে নয় বৎসর বয়স। ১৮৯৭ অব্দের কাছাকাছি একটা সময়ে বলুদাদা* নিখিলভারত ধর্মসম্প্রদায় গঠন করার জন্য উঠে-পড়ে লাগেন। বাংলাদেশের আদি, নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, পঞ্জাবের আর্যসমাজ ও বোম্বাইএর প্রার্থনাসমাজ— এই তিন সমাজের সমন্বয় ক'রে একটি Theistic Society গঠন করা— এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। ইতিপূর্বে তিনি পঞ্জাব, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে বিভিন্ন সমাজের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে সহযোগিতার সম্ভাবনা কতখানি আলাপ ক'রে বাড়ি ফিরেছেন। যেমন ভাববিলাসী আদর্শবাদীদের হ'য়ে থাকে তিনি ভাবলেন দলগত মতামত পরিহার ক'রে একটা অসাম্প্রদায়িক ধর্মসম্প্রদায় গঠিত হবে এবং সেই সম্প্রদায়ের মূলে থাকবে একমেবাদ্বিতীয়মের প্রতি বিশ্বাস। কর্তাদাদামশায়ের† কাছে বলুদাদা প্রস্তাব করলেন যে শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সমাজের নেতাদের আহ্বান করা হোক, সেইখানেই আলাপ আলোচনা অন্তে একটা মীমাংসায় পৌঁছানো যাবে।

আমি তখন পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণবের কাছে সংস্কৃত পড়তে সবে শুরু করেছি। একদিন শব্দরূপ মুখস্থ করছি, হঠাৎ পণ্ডিতমশায়ের তলব হ'ল, কর্তাদাদামশায় ডেকেছেন। হুকুম হ'ল যে তিনমাসের মধ্যে আমায় উপনয়নের জন্য প্রস্তুত হোতে হবে আর সে অনুষ্ঠান হ'বে শান্তিনিকেতন আশ্রমে। সেই সুযোগে কেবল বিভিন্ন সমাজের নেতাদের নয়, নামজাদা বৈদিক পণ্ডিতদেরও আমন্ত্রণ করা যাবে। তিনমাস পরে কর্তাদাদামশায় স্বয়ং পরীক্ষা নেবেন আমি শুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শিক্ষা করেছি কি না ও তাঁর সংকলিত ব্রাহ্মধর্ম

* বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

† মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ্রন্থ থেকে উপনিষদের মন্ত্রগুলি স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করতে পারি কি না। পণ্ডিতমশায়ের বেশ ভালোই জানা ছিল তাঁর ছাত্রের বিদ্যার দৌড় কতখানি—তাঁর তো হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। কিন্তু তা হ'লে হবে কি, মহর্ষি-দেবের আদেশ না মেনে উপায় ছিল না, সুতরাং তিনি ও তাঁর অনুপযোগী ছাত্রটি অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হলেন। তিনমাস পরে পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট দিনে কর্তাদাদামশায়ের কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি তাঁর প্রিয় শ্লোকগুলির যথাযথ উচ্চারণ আমার মুখে শুনে বিশেষ সুখী হলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পারিতোষিক পেলেন পণ্ডিতমশায়—বেশ একটা মোটা অঙ্কের চেক।

পণ্ডিতদের কাছে আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হ'ল, আমিও চ'লে গেলাম শান্তিনিকেতনে। সমবেত বৈদিক পণ্ডিতাগ্রগণ্যদের উপস্থিতিতে মহাসমারোহে উপনয়ন অনুষ্ঠান সমাধা হ'ল। সে এক শাস্তিবিশেষ। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে গৈরিকপরিহিত ব্রহ্মচারীর বেশে আমাকে প্রতি অভ্যাগতের কাছে দাঁড়াতে হ'ল, হাতে ভিক্ষাপাত্র ও মুখে উপনিষদের মন্ত্র। মন্দিরের ব্যাপার শেষ হ'লে পর তিন দিন কারাদণ্ড ও গায়ত্রীমন্ত্র অভ্যাস—এ অভিজ্ঞতা আমি সহজে ভুলব না।

এখানেই যদি শাস্তির ছেদ টানা হ'ত তা হ'লে আমার বলবার কিছু থাকত না। অভ্যাগত পণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন কাশীধামের পণ্ডিত-প্রবর ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী, তিনি পিতৃদেবকে জানালেন যে যদিচ উচ্চারণ আমার এমন কিছু খারাপ নয় তবু বৈদিক সূক্তগুলি বিশুদ্ধ বৈদিক মতে উচ্চারণ করাই বাঞ্ছনীয়। তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে আমার শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে নিজের থেকেই রাজী হলেন। প্রণবধ্বনির উচ্চারণ দিয়ে শিক্ষা শুরু হ'ল। দিন যায় কিন্তু উচ্চারণ সন্তোষজনক হয় না, আর ওঁধ্বনির মর্মার্থ গ্রহণ করাও আমার ন'বৎসরের বুদ্ধিতে কুলায় না। সে যাই হোক শিক্ষা চলতে লাগল। আশ্রমের পুরাতন স্মৃতির সঙ্গে আমার মনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত র'য়ে গেছে দুটি কণ্ঠস্বর—আমার বালসুলভ ক্ষীণ কণ্ঠে আর মেদবহুল সামাধ্যায়ী পণ্ডিতের সুগম্ভীর নিনাদে সামবেদ আবৃত্তি।

উপনয়নের পরে প্রায় তিনবছরের অধিকাংশ সময় শিলাইদহে কাটে। বারোবছর বয়সে আবার আশ্রমে ফিরে আসি এবং এবার ঠিক হয় যে

আশ্রমেই আমি থেকে যাব। পিতৃদেব কর্তাদাদামশায়ের অনুমতি অনুসারে ১৯০১ অব্দের ৭ই পৌষে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করলেন। মন্দিরে উৎসব হ'ল। আমরা সকলে চ'লে এলুম পিতৃদেবের সঙ্গে উৎসবের আয়োজন করার জন্য। পুরীর সমুদ্রতীরে যে বাড়ি ছিল সেই বাড়ি বিক্রি ক'রে কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হ'ল, আমাদের সঙ্গে এলেন জগদানন্দ বাবু আর একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার।

যেহেতু অতিথিশালাকে বিদ্যালয় হিসাবে ব্যবহার করার পক্ষে বাধা ছিল তাই আশ্রমের একমাত্র তিনকামরাওয়ালা বাড়িটিকে আমাদের স্কুলে পরিণত করা হ'ল। আমবাগানের দক্ষিণপশ্চিম কোণে এই বাড়িটি এখনকার গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে গেছে যদিচ এখনকার অবস্থা দেখে এর প্রাচীন রূপ ও গঠন অনুমান করা অসম্ভব। তিনটি ঘরের একটিতে রক্ষিত হ'ল পিতৃদেবের পুস্তকসংগ্রহ। আগে ব্যবস্থা হ'ল পুঁথিপুস্তকের, অতঃপর ভাবনা হ'ল ছাত্রদের আবাসগৃহ কোথায় করা যায়। ডাক্তারটি ছিলেন একাধারে সর্বস্ব—ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার, রান্নাঘরের পরিচালক ইত্যাদি অনেক কিছু। তাঁর হেফাজতে গ্রন্থাগারের পাশে একটি মাটির ঘর তোলা হ'ল একটা সরু লম্বা ছাউনির মত। এইখানেই ছাত্র অধ্যাপক সকলে মিলে আশ্রয় নিলেন। এই বাড়ির একটি অংশ এখনো প্রাক্‌কুটীর নামে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটি বাড়ি ছিল সে আমাদের রান্নাঘর, তারই দু একটা দেয়াল খাড়া আছে আজকালকার অপিসবাড়ির অঙ্গ হয়ে।

বন্ধুদের কাছে আবেদন-নিবেদন করে পিতৃদেব বিদ্যালয়ের জন্য গুটিচারেক ছাত্র সংগ্রহ করলেন। আমায় নিয়ে মোট সংখ্যা হ'ল পাঁচ। এই প্রথম সহপাঠীদের কারো নাম আমার মনে নেই, কারণ তারা কেউই দীর্ঘকাল বিদ্যালয়ে বসবাস করেনি। আমরা সবাই ছিলাম গৈরিকপরিহিত ব্রহ্মচারী। বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার দিন আমাদের সকলকে একজোড়া ক'রে লালচেলির ধুতিচাদর পরতে দেওয়া হ'ল। যখন সারবন্দী হ'য়ে এই পাঁচটি মানবক মন্দিরে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন আমাদের সকলের মনেই বেশ একটু গর্বমিশ্রিত আনন্দ হয়েছিল— আমার বেশ মনে আছে। মেজো জ্যাঠামশায়* উপাসনা

* সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

করলেন ও পিতৃদেব আমাদের ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দিলেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি আমাদের নিম্নলিখিতরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন :

"হে সৌম্য মানবকগণ—অনেক কাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে যথার্থ বড়ো ছিল—তখন এখানকার লোকেরা বীর ছিলেন। তাঁরাই আমাদের পূর্ব পুরুষ।

... ...

সেই তখনকার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে শিক্ষা যে ব্রত অবলম্বন করে বড়ো হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্যবাক্য তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব—আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীর পুরুষ হয়ে উঠবে—তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মান হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না ; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জান্‌তে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে এবং বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটে নিশ্চয় জেনে আনন্দ মনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্য কর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্য বোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।"

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে কলকাতা থেকে অতিথি অভ্যাগত যথেষ্ট এসেছিলেন। পৌষ মেলা এখন যেমন হয় প্রায় তেমনই তখনো হোতো—কেবল একদিন মাত্র থাকত, এখনকার মতো তিন দিন ধ'রে থাকত না। আমাদের দেশে মেলা একবার কোথাও প্রতিষ্ঠিত হোলে সে আপনা থেকেই চলতে থাকে।

"মোরা সত্যের পরে মন" গানটি পিতৃদেব রচনা করেছিলেন, এই সময় মন্দিরে উপাসনান্তে সেটি গাওয়া হয়েছিল। অনেক বছর পর্যন্ত এই গানটাই আমাদের আশ্রমের গান ব'লে চলেছিল। "আমাদের শান্তিনিকেতন" গানটি পরে সেই মর্যাদা অধিকার ক'রে বসে, যদিচ প্রাক্তন ছাত্রদের সভায় এখনো পূর্বের গানটিই প্রচলিত আছে।

ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। আমার সংস্কৃত শিক্ষা যাঁর কাছে শুরু সেই পণ্ডিত শিবধন বিদ্যার্ণব কলকাতায় আদিসমাজের পুরোহিতের কাজ ছেড়ে এখানে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন। ইংরেজীর অধ্যাপক হ'য়ে এলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের একজন সিন্ধী শিষ্য রেওয়াচাঁদ। পরে ইনি শান্তিনিকেতনের আদর্শে কলকাতার উপকণ্ঠে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং অণিমানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হন। রেওয়াচাঁদ ছিলেন রোমান ক্যাথলিক; ছাত্রদের শাসনতর্জন ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই কড়া। তথাকথিত ডিসিপ্লিনের চাপে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্ব ও স্বাধীনতার ভাবকে দমিয়ে রাখে; পিতৃদেবের আদর্শের সঙ্গে এই দণ্ডনীতির কোনো সাযুজ্য ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন এই আশ্রমে যেন ছেলেরা কৃত্রিম অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগে বয়স্কদের শাসন এড়িয়ে সহজ প্রাণলীলার অধিকার পায়। সুতরাং রেওয়াচাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হয় ও রেওয়াচাঁদ আশ্রম ত্যাগ করে যান। কিছুদিন পরে আসেন বাংলার অধ্যাপক হিসাবে সুবোধবাবু। ইনি পিতৃদেবের সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের খুড়তুতো ভাই। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসেন আমার প্রথম সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। আমি আর তিনি এই দুজন হলাম এণ্ট্রান্স ক্লাসের অতৃতীয় ছাত্র এবং ফলে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের আরম্ভ থেকেই ছাত্রদের মধ্য থেকে দলপতি নির্বাচনের প্রথা ছিল। যে-পাঁচ বছর আমি ও সন্তোষ বিদ্যালয়ে ছিলাম সে-সময়টা নির্বাচনের রীতিটা খানিকটা লৌকিক প্রথাতেই পর্যবসিত হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে সন্তোষ ও আমি পালাক্রমে দলপতির পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে অন্যান্য ছাত্রদের পরিচালনার ভার নিতাম। দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়টাতে আমাদের আশ্রমবিদ্যালয়ের reformatory হিসাবে একটা দুর্নাম হয়, কাজে কাজেই যে ধরনের ছাত্র তখন

আসত, তাদের অধিকাংশকে আর যাই হোক শিষ্ট শান্ত ব'লে অপবাদ দেওয়া যেত না। এদের দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে আমাদের নেতৃত্বের কর্তব্য ও তার আনুষঙ্গিক উপদ্রব সম্বন্ধে বেশ একটা অভিজ্ঞতা জন্মায়। ভবিষ্যতে কার্যক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা আমাদের দুজনের পক্ষেই বিশেষ কাজে এসেছিল।

সময়ের পারম্পর্য হিসাবে কোন্ অধ্যাপক কখন আসেন সে কথা আমার মত হ্রস্বস্মৃতি লোকের পক্ষে নিশ্চিত ক'রে বলা অসম্ভব। তবে যতদূর মনে পড়ে আশ্রমবিদ্যালয় সূচনার বছর-দুয়েকের মধ্যে আশ্রম-ইতিহাসে প্রখ্যাত-নামা কয়েকজন অধ্যাপক এসে কাজে যোগ দেন, যথা, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায় ও ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। বিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে আসেন রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মীয় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা যখন এণ্ট্রান্সের জন্য তৈরি হচ্ছি, সেই সময়টাতে তিনি এসে যোগ দেন। এখানকার জলহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল না হওয়ায় তিনি যথাসময়ের পূর্বেই কাজ ছেড়ে চলে যান।

ছাত্রদের জীবনযাত্রা ছিল উপকরণবর্জিত—সহজ ও সরল, এমন কি কৃচ্ছ্র-সাধনও আমাদের দৈনিক জীবনের অঙ্গীভূত ছিল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। ব্রহ্মচর্যের আদর্শ ছিল বিদ্যালয়ের আদর্শ। আমাদের পরিধেয়ের অকিঞ্চিৎকরতা গেরুয়া আলখাল্লার তলায় আত্মগোপন ক'রে রাখতে হ'ত। শয্যা ছিল দুটি কম্বল আর আহার ছিল জেলকয়েদীর লবসীর মতো একান্ত একঘেয়ে। জুতো, চটি, ছাতা, মাথায় দেবার সুগন্ধি তেল ইত্যাদি বিলাসিতার অঙ্গ হিসাবে নিষিদ্ধ ছিল। মনে আছে আমার মার মন বেশ একটু খারাপ হয়েছিল যখন পিতৃদেব আদেশ দেন যে আমাকেও অন্যান্য ছাত্রদের মত ছাত্রাবাসে থাকতে হবে। তিনি এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য মাঝে মাঝে সব ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিমন্ত্রণ ক'রে স্বহস্তে রাঁধা উপাদেয় ভোজ্যবস্তু পরিবেশন ক'রে মনকে বৃথা প্রবোধ দেবার চেষ্টা করতেন। তাঁর ভাঁড়ার প্রায়ই লুঠ হ'ত ও সে-উপদ্রব তিনি দেখেও দেখতেন না।

দারিদ্র্য, অভাব, নানা অসুবিধা ও অস্বাচ্ছন্দ্য সত্ত্বেও আমাদের মনে কখনও অনুযোগ ছিল না। আজকের দিনে বললে হয়তো অত্যুক্তি মনে

হবে কিন্তু সত্যিই সেই উপকরণবিরল সহজ জীবন সম্বন্ধে আমাদের একটা আনন্দ ছিল। ছাত্রদের কাছে বেতন নেওয়া হ'ত না, কারণ পিতৃদেব মনে করতেন যে গুরুশিষ্যের মধ্যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ উচিত নয়। সমস্ত প্রয়োজন তিনিই জোগাতেন এবং তাঁরই অতি ক্ষীণ আর্থিক সংগতির উপর ছিল সমস্ত বিদ্যালয়ের নির্ভর। জীবনযাত্রা সরল ছিল ও অধ্যাপকেরাও যৎসামান্য বেতন নিতেন; কিন্তু তাতে হবে কি ক'রে, শান্তিনিকেতন ট্রাষ্টের বারোশো টাকা ছাড়া আশ্রমের নিজস্ব কোনো আয় ছিল না। বাড়তি টাকা সবই পিতৃদেবকে ধার ক'রে সংগ্রহ করতে হ'ত। এই সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে সে-সময় তাঁর আয় ছিল মাসিক দু-শো টাকারও কম। ১৯০৩ অব্দে আমার মায়ের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এক একটি ক'রে তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত অলংকার বিদ্যালয় চালাবার খরচের জন্য দান করেছিলেন।

সে যাই হোক দীনতার এই যে বাইরের ছবিটি দিলাম এইটিই যে আশ্রমের সত্যিকার ছবি ছিল তা নয়। আমরা মোটামুটি বেশ আনন্দেই ছিলাম আর আমাদের জীবনে বৈচিত্র্যেরও অভাব ছিল না। (পিতৃদেব যখনই আশ্রমে উপস্থিত থাকতেন তখনই এর শত কাজে তিনি সমস্ত শক্তি ঢেলে দিতেন। সংগীতে, গল্পে, তাঁর রচিত কবিতার আবৃত্তিতে, অভিনয়ে, ছেলেদের শিশুজনসুলভ খেলার আমোদে প্রমোদে যোগ দিয়ে তিনি সমস্ত বিদ্যালয় প্রাণবন্ত ক'রে রাখতেন। মহাভারত থেকে ছোটদের নানা পৌরাণিক কাহিনী শোনানো, অধ্যাপনা—এসব তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। অধ্যাপকেরাও ছেলেদের সঙ্গে একই ছাত্রাবাসে থেকে তাদের সুখদুঃখ সম্পদবিপদের সমান অংশভাক্ হতেন। বেশ একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্মিলিত জীবনের পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধের মধ্যে দিন কেটে যেত।

অধ্যাপকেরা কখনও গুরুজনোচিত গাম্ভীর্যের অন্তরাল বা আত্মমর্যাদার স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি ক'রে ছেলেদের দূরে সরিয়ে দিতেন না। নবীন ও প্রবীণের প্রাণগত স্পর্শে একটা খুশির আবহাওয়া আপনা হতেই সৃষ্টি হয়েছিল। মাঝে মাঝে এই খুশির প্রাবল্যে কিছু কিছু আতিশয্যদোষ যে না ঘটত তা বলা চলে না। এইরকম একটি ঘটনা আমার মনে পড়ছে। জগদানন্দ বাবু ছিলেন গণিত ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক। যে-পরিমাণ তর্জন গর্জন করতেন সে পরিমাণে

তিনি শাস্তিবর্ষণ করতেন না, তবু ছেলেরা তাঁকে বেশ একটু সমীহ ক'রে চলত অথচ ভালবাসত। তাঁকে নিয়ে একবার ভারি মজা হয়েছিল। গ্রীষ্মের রাত, তিনি ছাত্রাবাসের বারান্দায় নিদ্রামগ্ন। এই অবস্থায় আমরা জন কতক জোয়ান ছেলে খাটসুদ্ধ তাঁকে তো কাঁধে উঠিয়ে সোজা ছুটলাম ভুবনডাঙার বাঁধের দিকে। তখন বাঁধেই প্রতিমা ভাসানাদি হ'ত। মুহুর্মুহু 'হরিবোল' রবে রাত্রের নিস্তব্ধ আকাশ মুখর হ'য়ে উঠল। মাষ্টার মশায় প্রচুর তিরস্কার ভৎর্সনা করতে লাগলেন কিন্তু তা হ'লে হবে কি, আমরা অভয় পেলুম তাঁর রাগের অভিনয়ের পিছনে একটা স্নেহশীল প্রশ্রয়ের হাসি দেখে। যেন এই কৌতুকে তিনিও আমাদের সঙ্গে সমানে যোগ দিয়েছেন।

এককথায় বলতে গেলে আমরা ছিলাম একটি বৃহৎ অথচ সুখী পরিবার। আয়তনে এই পরিবার বড়ো ছিল এবং পরিজনেরাও পাঁচমিশেলী ছিলেন, তবু যথেষ্ট সৌভ্রাত্র ছিল। এই একপ্রাণতার মূলে ছিল পরস্পরের প্রতি সম্মান, ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি একটা স্বাভাবিক ক্ষমাশীলতা ও সবার উপরে ছিল একটা পরিবারিক সম্প্রীতি। এইরকম একটা গোষ্ঠীভুক্ত সমাজের বাঁধুনি ছিল ব'লেই আমাদের আশ্রমবিদ্যালয়ের একটা স্বকীয় রূপ গ'ড়ে উঠেছিল। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রেরা আমাদের বিদ্যালয়ে খুব কমই আসত; কিন্তু এখানকার অতি সাধারণ ছেলেও এমন একটা বিশিষ্ট ছাপ নিয়ে যেত যা থেকে বোঝা যেত যে সে জনতার আর-পাঁচজনের মতো নয়। এই যে বিশিষ্টতা, এর মূলে যে কী সেকথা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে এ বিশিষ্টতার উৎস হ'ল আশ্রমের জীবন—যেখানে পিতৃদেব রচনা করেছিলেন সমগ্রজীবনের একটি সজীব ভূমিকা। *

* বিশ্বভারতী নিউজ-এ প্রকাশিত Looking Back শীর্ষক ইংরেজী প্রবন্ধের শ্রীক্ষিতীশ রায় কৃত অনুবাদ।

আমাদের শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কোনো জিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভ-কালটি রহস্যে আবৃত থাকে। আমি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত পদ্মার বোটে কাটিয়েছি। আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। হয়তো চিরকাল এইভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হোলো, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম।

আমি বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত যে, বড়ো হয়েও সে অন্যায় ভুলতে পারিনি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে মানবজীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হয়। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হোতে থাকে। আমরা নর্মাল ইস্কুলে পড়তাম। সেটা ছিল মল্লিকদের বাড়ি। সেখানে গাছপালা নেই, মার্বেলের উঠান আর ইঁটের উঁচু দেওয়াল যেন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকত। আমরা— যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল, এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাস্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাস্টারেরা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে বিদ্যালাভ করা যায়, এটা কখনো জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয়ে কখনো কখনো বক্তৃতাও দিয়েছিলেম। কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার কথাগুলি শ্রুতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটাকে কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্য আমি কৃতসংকল্প হলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হোলো, আমি ছেলেদের খুশী করব,

প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে—এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণনিকেতন নীড় তৈরি করে তুলব।

তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল, সে-দেনা আমার সম্পূর্ণ স্বকৃত নয়, কিন্তু তার দায় আমারই একলার। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ অতি সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয়নি। কেবল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে পাওয়া গিয়েছিল, তিনি তখনও রাজনীতি ক্ষেত্রে নামেননি। তাঁর কাছে আমার এই সংকল্প খুব ভালো লাগল, তিনি এখানে এলেন। কিন্তু তিনি জমবার আগেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছ-তলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তা করেছি। সেই ছেলেকয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি, তাদের কাঁদিয়েছি, হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানুষ করেছি।

একসময় নিজের অনভিজ্ঞতার থেকে আমার হঠাৎ মনে হোলো যে, একজন হেডমাস্টারের নেহাত দরকার। কে যেন একজন লোকের নাম ক'রে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাঁকে তাঁর পাশের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সে-ই পাশ হয়ে গেছে।' তিনি তো এলেন কিন্তু কয়েকদিন সব দেখেশুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়ায়—এ তো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনো তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন্-না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে—ওরা ওতে চ'ড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই বা।' তিনি আমার মতিগতি দেখে বিরক্ত হলেন। মনে আছে তিনি কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে পড়াবার চেষ্টা করতেন। 'তাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল'—ইত্যাদি পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাশের ধুরন্ধর পণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কর্ণধার। কিন্তু এখানে তাঁর চলল না, তিনি বিদায় নিলেন।

এ সামান্য ব্যাপার নয়, পৃথিবীতে অল্প বিদ্যালয়েই ছেলেরা এত বেশি ছাড়া পেয়েছে। আমি এ নিয়ে মাস্টারদের সঙ্গে লড়াই করেছি, আমি ছেলেদের

বললাম, 'তোমরা আশ্রমসম্মিলনী করো—তোমাদের ভার তোমরা নাও।' আমি কিছুতে আমার সংকল্প ত্যাগ করিনি, আমি ছেলেদের উপর জবরদস্তি হোতে দিইনি। তারা গান গায়, গাছে চড়ে, ছবি আঁকে, পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও বাধামুক্ত সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে আছে।

এখানকার শিশুশিক্ষার আরেকটা দিক আছে। সেটা হচ্ছে জীবনের গভীর ও মহৎ তাৎপর্য—ছোটো ছেলেদের বুঝতে দেওয়া। আমাদের দেশের সাধনার মন্ত্র হচ্ছে, 'যা মহৎ তাতেই সুখ, অল্পে সুখ নেই।' কিন্তু একা রাজনীতিই এখন সেই বড়ো মহতের স্থান সমস্তটাই জুড়ে বসে আছে। আমার কথা এই যে সব চেয়ে বড়ো যে-আদর্শ মানুষের আছে তা ছেলেদের জানতে দিতে হবে।

ভারতের বিরাট সত্তা বিচিত্রকে আপনার মধ্যে একত্র সম্মিলিত করবার চেষ্টা করছে, তার সেই তপস্যাকে উপলব্ধি করবার একটা সাধনাক্ষেত্র আমাদের চাই তো? বিশ্বভারতীতে সেই কাজটি হোতে পারে। বিশ্বের হাটে যদি আমাদের বিদ্যার যাচাই না হয় তবে আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণ হোলো না। ঘরের কোণে বসে আত্মীয়স্বজনের বৈঠকে যে-অহংকার নিবিড় হোতে থাকে সেটা সত্য পদার্থ নয়। মানুষের জ্ঞানচর্চার বৃহৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যোগ হোলেই তবে আমাদের বিদ্যার সার্থকতা হবে। বিশ্বভারতীর এই লক্ষ্য সার্থক হোক।

আমি চাই তোমরা—বিশ্বভারতীর নূতন ছাত্রেরা, খুব উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে এখানকার আদর্শকে সমর্থন করে কাজ করে যাবে, যাতে আমি তোমাদের সহযোগিতা লাভ করি। আমার অনুরোধ যে, তোমরা এখানকার তপস্যাকে শ্রদ্ধা করে চলবে, যাতে এই প্রাণ দিয়ে গড়ে তোলা প্রতিষ্ঠানটি অশ্রদ্ধার আঘাতে ভেঙে না পড়ে।

(বিশ্বভারতীর কয়েকটি নবাগত ছাত্র আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট বিশ্বভারতীর আদর্শ সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিলে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৯ ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত।)

পত্রাবলী

আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্য্যের প্রাচীন আদর্শে আমার ছাত্রদিগকে নির্জ্জনে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্ম্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই—তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই। তুমিও বাহিরে না হৌক অন্তরে সেই দীক্ষা গ্রহণ কর। মনে দৃঢ় রূপে জান যে, দারিদ্র্যে অপমান নাই, কৌপিনেও লজ্জা নাই, চৌকি টেবিল প্রভৃতি আস্‌বাবের অভাবে লেশমাত্র অসভ্যতা নাই। যাহারা ধনসম্পদ বাণিজ্যব্যবসায় আস্‌বাব-আয়োজনের প্রাচুর্য্য যে সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করে তাহারা বর্ব্বরতাকেই সভ্যতা বলিয়া স্পর্দ্ধা করে। শান্তিতে সন্তোষে মঙ্গলে ক্ষমায় জ্ঞানে ধ্যানেই সভ্যতা; সহিষ্ণু হইয়া, সংযত হইয়া, পবিত্র হইয়া, আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়া, বাহিরের সমস্ত কলরব ও আকর্ষণকে তুচ্ছ করিয়া দিয়া পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত একাগ্র সাধনার দ্বারা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম দেশের সন্তান হইতে, প্রথমতম সভ্যতার অধিকারী হইতে, পরমতম বন্ধন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে প্রস্তুত হও। ২৪শে চৈত্র ১৩০৮

(ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ বাহাদুরকে লিখিত।)

প্রত্যেক ছেলের সঙ্গে প্রত্যেক বিষয়েই অর্থাৎ লেখাপড়া, রসচর্চ্চা, অশনবসন, চরিত্রচর্চ্চা, ভক্তিসাধন প্রভৃতি সব তাতেই আপনি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখবেন— আপনি তাদের বিধাতার প্রতিনিধি হবেন, প্রত্যক্ষ আপনার সঙ্গে তাদের সর্ব্বাংশের সম্বন্ধ থাক্‌বে এই আমার ইচ্ছা—বলা সহজ, করা কঠিন, তবু এইটেই আমাদের বিদ্যালয়ের একমাত্র আইডিয়াল। হৃদয়ের সাহায্যে ছেলে মানুষ করতে হয় কলের সাহায্যে নয় এইটে আসল কথা। কলিকাতা, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

(স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত।)

মজঃফরপুর

আমি প্রায়ই মনে মনে ভাবি তোমাদের ত আমি একটা দুরূহ কাজে প্রবৃত্ত করিয়েছি। কিন্তু খাবার যোগাতে পারচি কি ? তোমাদের অন্তঃকরণ ত উপবাসী হয়ে নেই ? তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে রস জোগাচ্ছে কিসে ? কাজের ভিতরকার আইডিয়াতে, না আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রীতির সম্বন্ধে, না তোমার তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক আত্মোৎসর্গপরায়ণ শক্তির প্রাচুর্যে ? আমি তোমাদের যেটুকু দিতে পারি সেটুকু কি যথেষ্ট ? আমি যে নিজেই আমার এই কাজের অভ্যন্তরদেশ থেকে রসাকর্ষণ করবার চেষ্টা করচি আমার কাজই আমাকে খোরাক জোগাবে এই নিশ্চিত আশা নিয়ে বুভুক্ষিত আমি কল্যাণশালার দ্বারে এসেছি আমি বাইরের কোন ভিক্ষাকে বিশ্বাস করিনে নিজের উদ্যমকে জাগিয়ে রাখবার জন্যে আমি বাইরের কোনো উত্তেজনার মুখাপেক্ষা করিনে আমাদের বিদ্যালয় ক্রমশই বিস্তৃতি ও খ্যাতি লাভ করচে ও করবে। এই আমাদের যথার্থ সংকটের সময় এখন কর্মের আয়তন ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধিতে আমাদের সকলের কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে তুলচে। এই মদিরা যখন আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যাবে তখন কাজের মাহাত্ম্য মত্ততার অন্তরালে পড়ে যাবে। আমরা লুব্ধ হয়ে উঠব। আমাদের অনেকের মধ্যেই এই লুব্ধতা আছে—ঈশ্বরের কাছে একান্ত মনে প্রার্থনা এই লুব্ধতার সংক্রামক স্পর্শ থেকে তিনি যেন আমাকে রক্ষা করেন, আমি যেন অত্যন্ত নির্মল, বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত কর্মোৎসাহ রক্ষা করতে পারি, আজকাল মাঝে মাঝে এর থেকে ভ্রষ্ট হচ্চি—মঙ্গলের উৎসাহকে নিজের মর্মস্থিত দেবমন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না করে তাকে বাইরের সমারোহের মধ্যে দেখবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠি। তখনই পথ সংকটাপন্ন হয়ে উঠে তখনই ঐশ্বর্যের মধ্যে আমাদের যথার্থ দারিদ্র্যের সূচনা হয়। তখনি সৎকর্মের বৈষয়িকতা এসে পড়ে। আর একবার বহুযত্নে আমার নিজেকে ক্ষালন করে নিতে হবে। এই জন্যেই মাঝে মাঝে আমাকে দূরে আসতে হয় নইলে অলক্ষিতভাবে দশের জালে জড়িয়ে পড়ি এবং ঠিকানা হারিয়ে যায়।

তোমাকে এত কথা বল্লুম, তার কারণ হচ্চে আমি তোমাকে জানাতে চাই বিশুদ্ধ উৎস যেখানে উৎসারিত হচ্চে সেইখানেই তুমি অঞ্জলি পেতো। আমাদেরও সেইখানেই গতি। নিঃস্বার্থ মঙ্গলই উপায় এবং নিঃস্বার্থ মঙ্গলই

লক্ষ্য—পথও সেই, পাথেয়ও সেই, গম্যস্থানও সেই। ভিক্ষুকের মত আর কারো দিকে তাকিয়ো না। আমরা তোমাকে যেটুকু দিতে পারি সেইটুকুর উপরেই যদি নির্ভর কর তাহলে ঠিক জিনিসটি পাবে না, দুদিন বাদেই দুর্বল ও হতাশ হয়ে পড়বে। ১২ই আষাঢ় ১৩১১

(শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপককে লিখিত।)

এখন কিছুকাল দুঃখ সহ্য করিবেন। কিন্তু চিত্তকে সঙ্কুচিত হইতে দিবেন না—বিদ্যালয়কে খুব বড়ো করিয়া দেখিবেন। নিজের জীবনকেও কেবল কাজ করিবার কল করিয়া ফেলিবেন না। আপনার অন্তরাত্মার উদার জ্যোতি যেন অবাধে আপনার চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতে পারে—ধৈর্য, ক্ষমা, প্রেমের দ্বারা সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া বিদ্যালয়ের মধ্যে মঙ্গলের মূর্তিটিকে আকার দান করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, অধ্যাপকদের মনকে সর্বদা মহত্বের অভিমুখে লক্ষ্যবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, কাহাকেও কোন দিকে ছোট হইতে দিবেন না—আপনার নিকট হইতে আমি এই প্রত্যাশা করিয়া আছি। ইতি ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১৪

(শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত।)

কর্তব্যবায়ুগ্রস্ত লোক জগতে দুর্লভ নয়; কিন্তু যথার্থ ভক্তিসরস গভীর অন্তঃকরণের লোকের জন্য আমি হাৎড়ে বেড়াচ্চি—আপনাকে তেমন লোক আর একটি দিতে পারলে আমার বড় পরিতৃপ্তি হত। একবার যে সেই শরৎ চৌধুরী বলেছিলেন এখানে বাজনাবাদ্য দীপমালা সব আছে কিন্তু বর নেই সেকথা আমি ভুলতে পারিনে। আমাদের বিদ্যালয়ে কাজকর্ম, পড়াশোনা অনুষ্ঠান আয়োজন এবং নীতিশাস্ত্রসম্মত কর্তব্যটার টানাটানি থাকতে পারে কিন্তু মাঝখানে তিনি কোথায় সেই রসস্বরূপ? এই রসের প্রতিষ্ঠা না করলেও কাজ চলে কিন্তু কাজই ত মানুষের শেষ নয়, লক্ষ্য নয় রসং হি লব্ধানন্দী ভবতি —সেই রসকে জান্‌লেই আনন্দ হয়। আনন্দই সকল চেষ্টা সকল কাজের পূর্ণতা। আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের মধ্যে অধ্যাপকদের মধ্যে কাজের মধ্যে

বিশ্রামের মধ্যে সেই আনন্দ কবে দীপ্তি পেয়ে উঠ্‌বেন? যদি আমরা কাজের দিকে তাকাই কাজের পরিণামের দিকে না তাকাই—আকাশে বাতাসে আলোকে, ধূলি হতে নক্ষত্রলোকের মধ্যে সেই নিবিড় রসস্বরূপের দিকে সমস্ত অন্তঃকরণের দৃষ্টিকে না ফিরিয়ে রাখি তাহলে কাজ করে খেটে মরা কেবল কলুর বলদের ঘানিটানা মাত্র হয়। ভূপেনবাবু, মনকে কাজের মধ্যে শুষ্ক হতে দেবেন না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উন্মুক্ত অমৃতসাগরের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে নেবেন তাহলে সমস্তই সহজ হয়ে যাবে—সমস্ত বাধার নৈরাশ্য, সমস্ত ক্ষতির আক্ষেপ দূর হয়ে যাবে—অন্তর বাহির সমস্ত প্রসন্ন হবে। সেই প্রসন্নতাই জীবনের শ্রী—তার অভাব যেখানে সেখানে লক্ষ্মী নেই—সেখানে সমস্তই অপরিচ্ছন্ন এবং দরিদ্র—সেখানে কৃতকার্যতাও লাবণ্যহীন।...১৭ই পৌষ ১৩১৪

(শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত।)

আপনি একে একে ছেলেদের হৃদয়কে উদ্বোধিত করিয়া দিবার যে চেষ্টা করিতেছেন তাহাই বিদ্যালয়ের যথার্থ কাজ। মানুষের কল্যাণ করিতে অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। কাহারো আশা পরিত্যাগ করিবেন না— ফল পাই বা না পাই প্রত্যেক ছাত্রের প্রতিই আমাদের চিত্তকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করিতে হইবে। ইহাই আমাদের তপস্যা ইহার বাধাও আমাদের কল্যাণ সাধন করিবে। খুব করিতেছি এবং খুব পারিতেছি বলিয়া কোনো অভিমান মনে রাখিবার প্রয়োজন নাই। করিব এই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—পারিব এমন সুযোগ নাই বা হইল। সহজে সিদ্ধিলাভ জড়তা ও অহংকারকে প্রশ্রয় দেয়। ২৪শে পৌষ ১৩১৪

(শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যালকে লিখিত।)

শিলাইদহ
নদিয়া

ছুটির পরে বিদ্যালয়ের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারের কথাই চিন্তা কর্‌ছিলাম। অভ্যাসের জড়তায় ভিতরের কথাটা ভুলে গিয়ে অনেক সময় কর্ম্ম নির্জ্জীব হয়ে যায়— আমরাও তার কাছ থেকে কিছু পাইনে তাকেও আমরা কিছু দিতে পারিনে— অন্তঃকরণের সঙ্গে, কাজের সঙ্গে মর্ম্মগত যোগ বিচ্ছিন্ন

হয়ে যায়। এর প্রতিকার করবার চেষ্টা করতে হ'বে নইলে বিদ্যালয় আমাদের পক্ষে কেবল ভার হ'য়েই উঠ্‌বে, আমাদের ভার বহন কর্‌বে না। ঈশ্বর ক্রমেই আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থিমোচন করে' দিয়ে আমাদের যথার্থভাবে সকলের সঙ্গে যুক্ত কর্‌তে থাক্‌বেন, এই আশা আমার মনে দৃঢ় আছে এবং স্পষ্টই দেখতে পাচ্চি আমাদের ভিতরকার তার কেউ একজন বাঁধছেন—বেস্থুর ধীরে ধীরে ক্রমেই স্থুরের দিকে যাচ্চে— ইতিমধ্যে আমরা যে পীড়া অনুভব করে এসেছি সে এই স্থুর বাঁধবারই পীড়া— এখনো অনেক পীড়া সইতে হবে কিন্তু সেটা চরম নয়, সঙ্গীতই চরম, এ আমি বেশ বুঝতে পার্‌চি।
১৫ই কার্ত্তিক ১৩১৫

(স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত।)

আমাদের বিদ্যালয়ের মধ্যে যে সাধারণতন্ত্রের ধুয়া উঠেছে সেটাতে আমার মনে যে কোনো উদ্বেগ জন্মায়নি তা বলতে পারিনে। সাধারণতন্ত্র বাহিরের কর্মের পক্ষে ভাল কিন্তু ভিতরের ধর্মের পক্ষে অসাধারণতন্ত্র একটা আছে। সে ভাবের তার জিনিসটা ত সংগীত নয়, সংগীত জিনিসটার পক্ষে তারগুলো উপলক্ষ্য মাত্র, যে বাজিয়ে তার মনের আনন্দটাই আসল। আমাদের বিদ্যালয়ে যদি তার অভাব ঘটতে থাকে তবে শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থা যতই পাকা হোক আসল জিনিসটারই অভাব ঘটবে। এইখানে তোমাদের সচেতন থাকতেই হবে, আইডিয়াকে আইনের কাছে জবাই কোরো না। সমস্ত কাজের ভিতরে মন জিনিসটাকে নানারকম উপায়ে জাগিয়ে রেখো, কেবল বিধি বিধানকে নয়। দোহাই তোমাদের, ছেলেদের মধ্যে যাতে মনের চর্চা হয়, তারা যাতে অনুভব করতে পারে জগৎ জুড়ে সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা চিত্তশক্তি অহরহ অদ্ভুত সৃজন কাজে নিযুক্ত হয়ে আছে তাই করো— তাদের সমস্ত শক্তি চেতনায় পূর্ণ হোক অভ্যাসে বদ্ধ না হোক। ছাত্রদের যথাসাধ্য কর্তৃত্ব দিয়ো, বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্বন্ধ ভিতরকার সম্বন্ধ যেন হয়ে ওঠে— এতে যদি কিছু অসুবিধাও ঘটে তবে সেও স্বীকার করে নিতে হবে— ছাত্রদের কাজেকর্মে শয়নে জাগরণে চালনাটাই যেন বড় হয়ে না ওঠে, সাধনাটাই বড় হয়, হয়ে ওঠবার জন্যেই যেন তাগিদ থাকে করে তোলবার জন্যে নয়। আমি দেখেছি

অধিকাংশ লোকের মানুষের শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নেই, সেইজন্যেই শক্তিকেই কেবলি দমন করতেই চায়। আমি শক্তির উপরেই সমস্ত শ্রদ্ধা রাখি— আমি জানি একবার মানুষের ঠিক মর্মস্থানটি স্পর্শ করতে পারলেই অসাধ্য সাধন করা যায়। সেইখানেই সোনার কাঠি ছোঁয়াতে হবে, সেইখানকার ঘুম ভাঙাতে হবে, বিশ্বের সঙ্গে সেই জায়গাকার যোগের পথটাকে কেবলি প্রশস্ত করে তুলতে হবে। তোমরা মানুষের মনোলোকটা ছেলেদের কাছে সুপরিচিত করে দাও, এই লোকটা যে একটা সত্যলোক এইটে তারা এখন থেকে প্রতিদিন বুঝতে শিখুক। ১৮ই ফাল্গুন ১৩১৮

(শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপককে লিখিত।)

21, Cromwell Road
South Kensington
London, S. W
২৬শে ভাদ্র ১৩১৯

আমাদের বিদ্যালয়ে আজকাল গানের চর্চাটা বোধ হয় কমে এসেছে সেটা ঠিক হবে না ; ওটাকে জাগিয়ে রেখো। আমাদের বিদ্যালয়ের সাধনার নিঃসন্দেহ ওটা একটা প্রধান অঙ্গ। শান্তিনিকেতনে বাইরের প্রান্তর-শ্রী যেমন অগোচরে ছেলেদের মনকে তৈরি করে তোলে তেমনি গানও জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলবার একটা প্রধান উপাদান। এতে করে ওদের জীবনের প্রাচীরের একটা বড় জানলা খুলে দেওয়া হচ্ছে, সেইখান দিয়ে নন্দনের গন্ধ নিয়ে দক্ষিণের হাওয়া ওদের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করবার পথ পাবে। ওরা যে সকলে গাইয়ে হয়ে উঠবে তা নয় কিন্তু ওদের আনন্দের একটা শক্তি বেড়ে যাবে, সেটাতে মানুষের কম লাভ নয়। কিছু বেতন দিয়ে একজন গাইয়ে যদি তোমরা জোগাড় করতে পার ত মন্দ হয় না।

কতক বা ব্যক্তিগত কতক বা অন্যান্য নানা কারণে অনেকের মনে আমার আদর্শ সম্বন্ধে দ্বিধার লক্ষণ দেখেছিলুম। এ সব কাজে জোর করা চলে না, যার যেটা পন্থা তার সেই দিকেই জীবন নিয়োগ করতে হবে। তোমাদের

সেদিকে যদি বাধা থাকে তাহলে কোনো কথা বলবার নেই। কিন্তু যদি মনে কোথাও কোন ব্যক্তিগত কাঁটা বিঘ্ন ঘটাচ্ছে মনে হয় তাহলে সেটাকে উৎপাটিত করে ফেলাই যথার্থ পৌরুষ হবে। বড় কাজের একটা সার্থকতাই এই তাকে সাধন করতে গেলে পদে পদে নিজের ক্ষুদ্রতাগুলো ধরা পড়ে এবং কেবলমাত্র বড় কাজ করবার বেগেই সেগুলো বিসর্জন দেওয়া যেতে পারে। আমরা নিজের দৈন্য বাইরের অবস্থার উপর আরোপ করি। কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদেই এ পর্যন্ত কোনো মহৎ সঙ্কল্প আপনার সম্মুখে সম্পূর্ণ অনুকূল অবস্থা পায়নি। আমাদের বিদ্যালয়ের ইতিহাসে বার বার আমরা দেখে আসছি, প্রতিকূলতার আনুকূল্যই সব চেয়ে সত্য, যখনই সমস্ত সহজ হয়েছে যখনই মনে করেছি এই বার চোখ বুজে চলব তখনই একটা-না-একটা বড় ঠেকায় ঠেকতে হয়েছে। কিন্তু এ কথাটা অত্যন্ত পুরাতন—এত করে এটা বলবার দরকার নেই। কোনো সঙ্কল্পের মহত্ত্ব যখন আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করি তখন অন্তরের মধ্যে যে আনন্দ পাই সেই আনন্দের প্রবল বেগেই আমাদের পৌরুষ আপনি জাগ্রত হয়ে ওঠে— তখন সামনে ছোট বড় কোনো বাধা দেখে মনের মধ্যে কোনো কুণ্ঠা আসতেই পারে না। সেই আনন্দের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। সেই আনন্দের অভাবেই আমরা আপনাকে প্রচুররূপে দান করতে পারছিনে, ত্যাগ করতে পারছিনে; আমরা সমস্ত বাধাকেই বড় করে দেখছি। দৈন্য আপনার শূন্যতা পূরণ করবার পক্ষে আপনিই সব চেয়ে বড় বাধা—নিজের জীবনে এইটেই বরাবর দেখে আসছি। জীবনের একটা জায়গায় যেখানে ঐশ্বর্যের পথ মুক্ত হয় সব জায়গাতেই সেখানে দৈন্যের বাধা শিথিল হতে থাকে।

(শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপককে লিখিত।)

তোমাদের এক বাক্স বই পাঠিয়ে দিয়েছি। হয়ত এ চিঠি পাবার হপ্তাখানেক পরে পাবে। তার মধ্যে বৈজ্ঞানিক বই অনেক আছে। আমার ইচ্ছা এইগুলো অবলম্বন করে তোমরা ছেলেদের বক্তৃতা দাও। এক সেট বই পাঠিয়েছি তাতে বৈজ্ঞানিক প্রায় সকল বিষয়েই খুব মনোজ্ঞ করে আলোচনা করেছে—তোমরা এক এক জনে তার এক একটা বিষয় নিয়ে ছেলেদের কাছে

যদি আলোচনা কর তাহলে খুব উপকার হবে। আগে আমাদের বিদ্যালয়ে ছেলেদের মনের চর্চ্চা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি হত। আজকাল ক্রমশই বড় বেশি যান্ত্রিক হয়ে পড়চে—ইস্কুলমাষ্টারি মত্তহস্তী সরস্বতীর পদ্মবনে প্রবেশ করেছে—ক্রমশই ওঁর বাসাটা একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। তোমরা ঐ চতুষ্পদটাকে অধিক পরিমাণে প্রশ্রয় দিয়ো না—অন্তত ওর যেখানে স্থান সেইখানেই আলানস্তম্ভে ওকে বেশ ভাল করে বেঁধে রেখো—ওকে জননী বীণাপাণির পদ্মবনের ভ্রমর বলে কোনোদিন যেন ভুল কোরো না।

২রা আশ্বিন ১৩১৯

(স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়কে লিখিত।)

২১ ক্রমোয়েল রোড
সাউথ্ কেন্সিঙটন

আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্ররা একটা বড় জিনিষ লাভ করচে যেটা ক্লাসের জিনিস নয়—সেটা হচ্চে বিশ্বের মধ্যে আনন্দ—প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তার যোগ। সেটাতে যদিও পরীক্ষার সহায়তা করে না কিন্তু জীবনকে সার্থক করে।···চারিদিকের সঙ্গে জীবনের ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়া, আনন্দের ছোট বড় নানা যাতায়াতের পথ খুলে দেওয়া যে কত বড় লাভ তা বলে শেষ করা যায় না। এ যেন জগৎকে দান করা। আমরা হতভাগ্যরা বিদ্যাসাধ্য খ্যাতিমান টাকাকড়ি যত সহজে পাই জগৎকে তত সহজে পাইনে—আমরা যার দ্বারা বেষ্টিত হয়ে রয়েছি তাকেই হারিয়ে বসেছি—ঈশ্বর যা আমাদের দিয়ে বসেছেন তা আমাদের তুলে নেবার শক্তি নেই—এই অসাড়তাটার খোলস ভেঙে ফেলে ছেলেদের মন যাতে ডিমের ভিতর থেকে মুক্ত জগতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে এখানকার মাটিতে জলেতে আলোতে অবাধে সঞ্চরণ করবার অধিকার লাভ করে এইটে আমি একান্তমনে কামনা করি।··· একটি উদার প্রেম থাকা চাই—সেই প্রেমের উৎস যেন কিছুমাত্র শুকিয়ে না যায় এই কথাই আমি বারবার ভাবি।—আমাদের আশ্রমের সেই উৎসটি আমাদের মন্দিরে আছে—সেই-খানকার উৎসের মুখে যেন কোনো বাধা না আসে—বাধা হলেই দেখ্‌তে পাবে যা সবুজ ছিল তা ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে যাবে—যা প্রাণের জিনিষ ছিল,

তা কলের জিনিষ হয়ে উঠ্‌বে। অমৃতনির্ঝরিণী যদি না বয়—তাহলে আমাদের শুষ্কতাকে কেউ দূর করতে পারবে না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতির পার্থক্য, শিক্ষার প্রভেদ, বাধা ব্যবধান এমন কি, বিরুদ্ধতা কিছু না কিছু ছিলই এবং থাক্‌বেই—কিন্তু তৎসত্ত্বেও আশ্রমে সেই জিনিষটাই একান্ত হয়ে ওঠেনি— বেসুরের উপরেও সুর বেজেছে; গ্রন্থি যতই কঠিন হোক তা ক্রমশই শিথিল হবার দিকে গিয়েছে। এখনো সেই অমৃতের ধারাটিকে তোমরা রক্ষা করে চোলো—ছেলেদের হৃদয় প্রত্যহ পূর্ণ হোক, তারা প্রত্যহ আনন্দিত হোক্‌, তারা প্রত্যহই বড়র দিকে তাকাতে শিখুক্‌। তাদের চিত্তের বোধশক্তি বিশ্বজগতে ব্যাপ্ত হতে থাক্‌—তাদের হাসি উজ্জ্বল হোক, তাদের আনন্দ গানের সুরে মুখরিত হয়ে উঠুক্‌। সেই প্রান্তরের মধ্যে ছেলেদের আনন্দসম্মিলনের কলধ্বনি সমুদ্র পার হয়ে আমার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করচে—আনন্দের নির্ম্মল আলোকে তাদের হৃদয়মুকুল পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠুক এই আমি তাদের আশীর্ব্বাদ করচি। ১০ই আশ্বিন ১৩১৯

(স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়কে লিখিত।)

ওঁ

508 W. High Street
Urbana. Illinois.
U. S. A.

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ, অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পাওয়া গেল। তুমি ছেলেদের নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়েছিলে শুনে খুব খুসি হলুম। ছেলের সঙ্গে তোমাদের যোগ যত ব্যাপক হয় ততই ভালো। আমি দূরে এসে আমাদের বিদ্যালয়ের আনন্দচ্ছবি আরো যেন নিবিড় করে দেখতে পাচ্চি। যত দিন যাচ্চে ওখানে মধু জমে উঠ্‌ছে; কারণ মানুষের জীবন আপনার সমস্ত সঞ্চয় আপনার মধ্যেই তো সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ফেলে না; তার উদ্বৃত্ত অনেক; যেখানে সে থাকে সেখানে তো আপনার অনেকটা প্রাণসামগ্রী ছড়িয়ে ফেলে জড়িয়ে তোলে; সে সমস্তই অহরহ জমে জমে ওঠে; বিশেষত মানুষ যখন আনন্দ পায় তখন তার জীবনের এই বাড়তি জিনিষ আরো বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হোতে থাকে।

আমাদের ওখানে দেড়শো দুশো ছেলের প্রাণের আনন্দ প্রতিদিনই নানাভাবে ওখানকার বাতাসের সঙ্গে মাটির সঙ্গে গাছপালার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্চে— ওখানে একটি অদৃশ্য আনন্দনিকেতন সৃষ্টি করে চলেছে— কত তরুণ হৃদয়ের রঙীন সুতোয় ওখানে একটি অপরূপ চাঁদোয়া বুনে চলেছে; তার শোভা যে কী আশ্চর্য্য তা একটু দূরে থেকে আরো স্পষ্ট করে দেখতে পাওয়া যায়। ওখানকার এই সৃষ্টিকার্য্য যে কী সুদূরব্যাপী ও সুমহৎ তা অভ্যাসের জড়ত্ববশত একদিনো যেন তোমরা ভুলে যেয়ো না—তোমরা সত্য হও এবং চারিদিকে উৎসারিত হোতে থাক—প্রতিদিনের সঙ্কীর্ণতার দ্বারা তোমাদের ধ্যানদৃষ্টি যেন আবৃত না হয়—বাধা বিরুদ্ধতাকেই তোমরা যেন বড়ো করে দেখো না। ৭ই পৌষ উত্তীর্ণ হয়েছে—তোমরা নূতন বৎসরে প্রবেশ করেছ—এবার আর একবার তোমাদের সত্যরূপকে মনের সামনে নির্ম্মল করে উজ্জ্বল করে সুস্পষ্ট করে দেখো, তার আনন্দ মূর্ত্তির সামনে প্রণিপাত করে আর একবার নূতন করে তোমাদের জীবনকে উৎসর্গ করো, অন্তরের মধ্যে কোথাও কোনো ভীরুতা কোনো সঙ্কোচ রেখো না, এবং বাইরের দিকে যে সমস্ত কর্ম্মের আবর্জ্জনা জমেছে সেগুলোকে যতদূরে পারো ঝাঁট দিয়ে ফেলে তোমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে মুক্ত করো এবং সুন্দর করে তোলো। ইতি ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১৯

স্নেহাসক্ত

(স্বর্গীয় সন্তোষ কুমার মজুমদারকে লিখিত।) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

508 W. High Street
Urbana. Illinois
U. S. A.

তোমাদের ওখানে দুটি মারাঠি ছাত্র আশ্রয় নিয়েছে এতে আমি বড়ই আনন্দবোধ করচি। তাদের অভিভাবকদের আশাকে তোমরা সর্বাংশে সফল করে তুলো— ছেলে দুটিকে সকল দিক থেকে মানুষ করে তাদের পিতামাতার কাছে ফিরে পাঠিয়ে দিয়ো। এই যে দূর দেশ থেকে ছাত্ররা আমাদের শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয়ে আসচে এর মহৎ দায়িত্ব যেন আমাদের বাঙালী ছাত্ররা

অন্তরের মধ্যে অনুভব করে। তারা এটা যেন বুঝতে পারে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ বাংলাদেশের কাছ থেকে কতখানি আশা করে সেই আশা পূর্ণ করবার ভার তাদের প্রত্যেকের উপর আছে। স্বদেশের মুখের দিকে তাকিয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শকে তারা যেন অক্ষুণ্ণ রাখে। প্রবাস থেকে এখানে সব অতিথিরা আসচে— তাদের উপযুক্ত অন্ন পরিবেশন করতে হবে, সেই আয়োজনের প্রধান ভার আমাদের ছাত্রদেরই উপরে। আমরা বাইরে থেকে যা কিছু চেষ্টা করি সে সব চেষ্টার শক্তি অতি সামান্য, কিন্তু আমাদের ছাত্ররা নিজের জীবনে সাধনাকে যতই সত্য করে তুলবে ততই তারা পরস্পরকে শক্তি দিতে পারবে—তা ছাড়া কখনই যথার্থই মঙ্গল ঘটতে পারে না। আমাদের ছাত্ররাই এই বিদ্যালয়কে সৃষ্টি করে তুলচে—তাদের প্রাণের মধ্যে থেকে যে সুর বেজে উঠচে সেই সুরই এই বিদ্যালয়ের সুর। তাদের উপর এই যে দায়িত্বটি আছে সেটি যে কত বড় সে কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ো। তারা যেন একদিনের জন্যও এ ভ্রম না করে যে আমরা শিক্ষকরা বিদ্যালয়কে চালনা করচি—অবশ্য আমাদের যেটুকু কাজ সেটুকু আমরা করচি, কিন্তু এর প্রধান ভারটি তাদের উপরেই আছে। তারা যেখানে দুর্বল আমাদের বিদ্যালয় সেইখানেই দুর্বল— তারা যেখানে নিষ্ফল হচ্চে আমাদের বিদ্যালয় সেইখানেই ব্যর্থ হচ্চে। আমার ছাত্ররা আমার বিদ্যালয়কে শ্রী দিচ্চে, শক্তি দিচ্চে আনন্দ দিচ্চে আমি তা নিশ্চয় জানি— আমাদের এই নবীন তাপসেরাই আশ্রমের উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আকর্ষণ করে আনচে—আমরা ত কেবলমাত্র নদীর উপকূল, কিন্তু এ নদীর স্রোতের ধারা ত তারাই— এই ধারা প্রাণের ধারা হোক পুণ্যধারা হোক, অমৃতধারা হোক—এই ধারায় দেশ সফল হোক পবিত্র হোক। ১০ই পৌষ ১৩১৯

(স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়কে লিখিত।)

ওঁ

C/o. Messrs Thomas Cook and Son
Ludgate Circus, London
২৩শে বৈশাখ ১৩২০

কল্যাণীয়েষু—

সন্তোষ, তোমরা এখন ছুটি ভোগ করচ। হয়ত ২০শে জ্যৈষ্ঠের কাছাকাছি আমার এই চিঠি পাবে। সেখানকার সেই রৌদ্রদগ্ধ মাঠের উপর খরতর গ্রীষ্মের মূর্ত্তিটি কি রকম তা ঠিকটি এখানে উপলব্ধি করাই শক্ত। কেননা আজ ২৩শে বৈশাখে এখনো আমাদের ঘরে আগুন জ্বলচে। আকাশ প্রায়ই মেঘাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্চে, মোটা কাপড়গুলোর বোঝা এখনো নামাতে পারিনি। এখানে মানুষকে প্রত্যেক বিষয়ের জন্যেই প্রস্তুত হতে হয়, সহজে কিছু হবার জো নেই। আমাদের দেশে প্রস্তুত না হওয়াটাই হচ্চে দরকার, গায়ের চাদরটা পর্য্যন্ত খুলে ফেল্‌লে তবে প্রাণ বাঁচে। সেই অভ্যাসের মানুষকে এ সব দেশে ধরে রাখা বড়ো নাকাল।

ক্ষিতিমোহন বাবুকে এ দেশে আনবার আয়োজন আমি ঠিক করেই রেখেছি। আর একটু হলে এই গরমির ছুটির পরেই তাঁকে আনাবার ব্যবস্থা করছিলুম। কিন্তু আমার হঠাৎ এই সুবুদ্ধি এল যে আমি ফিরে যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁকে বিদ্যালয় থেকে তুলে আনা উচিত হবে না। তোমাদের ওখান থেকে এখন অনেক পুরাতন শিক্ষক চলে এসেছেন, অনেক নূতন লোক নিযুক্ত হয়েছেন। এই নূতন আগত আগন্তুকদের আমাদের আশ্রমের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে নেবার জন্যে পুরাতন ধারাটিকে প্রবল রাখা দরকার। নইলে ইস্কুলের ভাবটিই আশ্রমের ভাবটিকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠ্‌তে চাইবে। ইস্কুলে যাঁরা পড়াচ্চেন তাঁদের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু আশ্রমে যাঁরা সাধনা করচেন তাঁদের প্রয়োজন আরো অনেক বেশি। সে প্রয়োজনটাকে চোখে দেখা যায় না এবং হিসাবের খাতার মধ্যে ধরে দেখানো শক্ত, তাতে তোমাদের এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার ফলের কোনো তারতম্য হবেনা, কিন্তু তার ওজন নেই বলে যে তার প্রয়োজন নেই তা নয়। আমাদের বিদ্যালয়ে যে জিনিষটা দেখা যায় না সেইটেই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। সন্তোষ, সেইটিকে তোমরা

স্পষ্ট করে দেখ, সেইটির প্রতি তোমাদের বিশ্বাসকে অবিচলিত করে ধরে রাখ— এবং তার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবশতই তোমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত ছোট খাটো খিটিমিটিগুলোকে কাঁটাগাছের মত একেবারে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলে দাও। আপনাকে জয় করার দ্বারাই চারিদিকের সকলকে জয় কর। তোমরা সকলে এখনো মনে প্রাণে সম্পূর্ণ মিল্‌তে পারনি এইখানেই তোমাদের গভীর দীনতার পরিচয় রয়ে গেছে।

যখন ক্ষিতিমোহন বাবুকে বিদ্যালয় থেকে কিছুকালের জন্যেও চলে আস্‌তে হবে তখন শাস্ত্রী মশায়কে ফিরে পেতে পারলে আমাদের উপকার হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হয়ত আগামী পূজোর ছুটির পরে তাঁকে দরকার হবে। এখন থেকে এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কতকটা এগিয়ে রেখে দিলে ভাল হয় না? তা হলে আগে থাকতে তিনি প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারবেন।

তোমাদের বিদ্যালয়ের ব্যয় সংক্ষেপের জন্যে যে সতর্কতা অবলম্বন করেছ তাতে খুব উপকার হবে আশা করচি। কেননা, এ উপকারটা ভিতরের দিকের উপকার। ব্যবস্থার শৈথিল্যে যে কেবলমাত্র অপব্যয় ঘটে তা নয় মনের উপর নিয়ত তার দৃষ্টান্তের ফল অত্যন্ত খারাপ। ও জিনিষটা একেবারে বিষের মত চরিত্রের মূলে গিয়ে আঘাত করে। এ দেশে ঘরে দ্বারে পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই সর্ব্বদাই যে একটি জাগ্রত উদ্যোগকে দেখ্‌তে পাই তাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি। কেন না এই শক্তির পিছনেই সৌন্দর্য্য— উদ্যোগিনঃ পুরুষ সিংহমুপৈতী লক্ষ্মীঃ —এরই সহচর হচ্চে সুখ স্বাস্থ্য কল্যাণ। একবার আমাদের দেশের বাবুদের কর্ম্মশালা এবং আমাদের গিন্নিদের ঘরকরনার কথা স্মরণ করে দেখ। সর্ব্বদাই গোলমাল চল্‌চে অথচ শোভা নেই শৃঙ্খলা নেই। যেখানে বাস করচি সেখানে অযত্ন মূর্ত্তিমান, অথচ নাবার খাবার সময় নেই। নাকের সামনেই দুর্গন্ধ, চোখের সামনেই কুদৃশ্য। নিজেকে আমরা যেন চব্বিশ ঘণ্টা অপমান করচি। আমরা পরের কৃত অবমাননায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করি। কিন্তু অহোরাত্র আত্মাবমাননার হাত থেকে যে দিন আমরা নিজেদের উদ্ধার করব সেইদিন আমরা রক্ষা পাব। বিদ্যালয়ে আহারশালায় শয়নাগারে মাঠে ঘাটে আমরা ভদ্রতাকে যে বিধিমতে লাঞ্ছিত করচি সেইটে থেকে যদি বিদ্যালয়কে বাঁচাতে পার তাহলে দেখবে ব্যয় সংক্ষেপও হবে এবং

৪

সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বেরও বিকাশ ঘটবে। বিদ্যালয়ে সম্প্রতি খুব একটা অস্বাস্থ্যের আমদানি হয়েছে এটার সঙ্গে কি কোমর বেঁধে লড়াই করবে না। যেখানে যেখানে একটুও জল জম্‌চে জঞ্জাল জম্‌চে সেখানে দৃষ্টি দাও— তোমরা নিজের হাতে যা করতে পার সেই দিকে চেষ্টা প্রবর্ত্তন কর— আরো বেশি টাকা আরো বেশি সুবিধার জন্যে দুর্ব্বলভাবে অক্ষমভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকোনা। কোমর বেঁধে দাঁড়াও, ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁটাও, কোদাল দিয়ে কোপাও, জল দিয়ে ধোও, আগুন দিয়ে পোড়াও, দুদিনের আকস্মিক উৎসাহ নয় প্রতিদিনের অক্লান্ত উদ্যমকে জাগিয়ে রাখ। তোমরা দুশো লোকে যদি মন দাও তা হলে কি যে না করতে পার তা ত ভেবে পাইনে। তোমরা ভুবনডাঙার উপকার এবং সাঁওতালপাড়ার উন্নতি করতে চাও কিন্তু যখন তোমাদের নিজের শ্রীহীনতার দিকে তাকাও তখন নালিশ করতে থাক যথেষ্ট মালি নেই মজুর নেই টাকা নেই। নেই যেটা সেটা হচ্চে চিত্ত,— বিত্ত নয়, সেই চিত্তকে সম্পূর্ণ সজাগ করে তোলবার জন্যেই বিধাতা তোমাদের দুঃখ দিচ্চেন— সেই জন্যেই তোমাদের তহবিল শূন্য, তোমাদের হাঁসপাতাল পূর্ণ। এ জন্যে তোমরা তোমাদের প্রত্যেককে দায়ী করে প্রত্যেকের উপরে দায়িত্ব দাও— প্রত্যেকে যদি একটুখানি করেও ভার নেয় তাহলে বিদ্যালয়ের প্রকাণ্ড ভার লাঘব হয়। ইতি

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(স্বর্গীয় সন্তোষ কুমার মজুমদারকে লিখিত।)

ওঁ

508 High St.
Urbana, Ill.

কল্যাণীয়েষু

সন্তোষ, ঘোরাফেরা সেরে আবার কাজে বসতে হবে। এবার আমাকে একটু বিশেষ উঠে পড়ে লাগতে হবে— অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করবার আছে। তোমাদের চিঠির বরাদ্দ হয় ত কিছু কমিয়ে আনার প্রয়োজন হবে। দেশে ফিরে গিয়ে বিদ্যালয় সম্বন্ধে কি করা যাবে তারই নানা সংকল্পে মন প্রতিদিন পূর্ণ হয়ে উঠচে। অবশ্য সংকল্পের মুকুল যত ধরে ফল তত ফলে না

কিন্তু তবু এই মুকুল ধরানোর বসন্ত-উৎসবও ত কম আনন্দের নয়। সিউড়ির মেলাতে জয় লাভ করে তোমরা পুরস্কৃত হয়ে এসেছ শুনে আমি খুব খুসি হলুম। তোমার গোপালগুলিও গুণিজনের সম্বর্দ্ধনালাভ করে তোমার গোষ্ঠের মুখোজ্জ্বল করেছে এও শুভ সংবাদ। তোমাদের ছেলেরা সবজির বাগান করেছে এ খবরটি পেয়ে আমি বড় খুসি হয়েছি। আমি যখন ফিরে যাব তখন আশা করচি আমি দেখতে পাব আমাদের বিদ্যালয়ের চারিদিকের ভূমি প্রসন্ন এবং গাছপালা প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে— তখন আশ্রমের কোথাও কোনো অনাদরের চিহ্ন দেখ্‌তে পাব না। ততদিনে তোমাদের রাস্তাগুলি পরিপাটি এবং গাছের তলা পরিষ্কৃত হয়ে গেছে। সব চেয়ে আমি আশা করে আছি আমাদের আশ্রমবাসিদের সমস্ত দৈনিক কর্ত্তব্যগুলি সুবিহিত সুশৃঙ্খল হয়ে এসেছে। ছাত্ররা যাতে নিজের চেষ্টায় সমস্ত কর্ম্মকে প্রণালীবদ্ধ করে তুল্‌তে পারে সেইদিকে তাদের উৎসাহিত কোরো। বাইরের শাসনে নয় কিন্তু নিজের কর্ত্তৃত্বে তারা সকল বিষয়ে শৃঙ্খলা উদ্ভাবন করবে এইটেই সব চেয়ে প্রার্থনীয়। কি করলে সব চেয়ে সুব্যবস্থা হতে পারে এই সমস্যা সমাধানের ভার তাদের উপরেই দাও এবং তাদের ব্যবস্থামত চলবার জন্যে তোমরাও প্রস্তুত হও। সমস্ত জিনিষ গড়ে তোলবার ভার তাদের হাতে দিতে থাক— কেননা এই গড়ে তোলাই যে একটা মস্ত শিক্ষা, এবং এটা বিশেষভাবে ছাত্রদেরই জন্যে আবশ্যক। এ সম্বন্ধে মনে তোমরা কোনো সঙ্কোচ রেখো না— এই ছাত্ররাজক শাসনপ্রণালীকে যদি তোমরা পাকা করে তুলতে পার তবে সে একটি মস্ত জিনিষ হবে। শিবাজি যেমন তাঁর গুরুর প্রতিনিধি হয়ে তাঁর রাজ্যভার ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি আমাদের ছাত্ররা গুরুর প্রতিনিধি হয়ে বিনম্রভাবে যখন শাসন বিস্তার করতে শিখ্‌বে তখন আমরা ধন্য হব। প্রথমে অনেক বাধা ও বিশৃঙ্খলতা ঘট্‌তে পারে কিন্তু তাতে তোমরা ভয় কোরো না— ভুল করতে দাও তাহলেই ভুল সমূলে নষ্ট হবে— ভুল থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে ভুলকেই বাঁচিয়ে রাখা হয় একথা নিশ্চয় মনে জেনো।

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(স্বর্গীয় সন্তোষ কুমার মজুমদারকে লিখিত।)

C/o. Messrs Thomas Cook & Son
Ludgate Circus, London

তোমাকে গতবারের চিঠিতে লিখেচি এবারেও লিখচি বিদ্যালয়ে যে অস্বাস্থ্য দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হও। তোমাদের রান্নাঘরের কাছে যে মলিনতা সঞ্চিত হচ্চে তাকে দূর করে দাও, যাতে মাছি ও মশার আড্ডা কোথাও না জমতে পারে তার জন্যে উঠে পড়ে লাগ। বোলপুর অঞ্চলে ঘুটিং চুন শস্তায় পাওয়া যায়, তাই আনিয়ে পুড়িয়ে চুন করে রান্নাঘরের ড্রেণেজে মাঝে মাঝে ছড়িয়ে দাও। স্নানের জল কোথাও জমতে দিও না। তোমার গোয়াল ভাল রকম পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করো। এই ব্যাপারে সমস্ত মন যদি তীব্র ভাবে লাগাতে পার তবে নিশ্চয়ই ফল পাবে।

কাল আমরা Mrs. Boole নামক একজন বিখ্যাত আঙ্কিকের বাড়ি গিয়েছিলুম। তাঁর বয়স ৮২ বছর। কিন্তু কি সুতীক্ষ্ণ তাঁর মানসিক শক্তি। ইনি বিধবা, এঁর স্বামী একজন বিখ্যাত গণিতবেত্তা ছিলেন। খুব ছোট ছেলেদের মনে সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে জ্যামিতির বোধ সঞ্চার করে দেবার যে উপায় ইনি উদ্ভাবন করেছেন তাই দেখে আমরা ভারি বিস্মিত হয়েছি। এঁর প্রণালী এবং তার সমস্ত উপকরণ আমরা সংগ্রহ করবার চেষ্টায় আছি। সঙ্গে করে নিয়ে যাব। অবশ্য তোমরা যদি এটা ব্যবহারে না লাগাও তাহ্লে সমস্তই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এদেশে সকলেই অধ্যাপনা সম্বন্ধে যথেষ্টভাবে চিন্তা করচে এজন্য শিক্ষাপ্রণালী ক্রমশই যান্ত্রিকতার লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে বেরচ্চে। আমাদের চিত্তবৃত্তির মধ্যে চিরাগত প্রথার অধীনতা স্বীকার করবার একটা মজ্জাগত অনুরাগ আছে— মুক্তির প্রতি আমাদের বিশ্বাস নেই খাঁচার পাখির মত আমরা আকাশকে ভয় করি। এইজন্য আমাদের ছেলেদের মনও জড়বৎ হয়ে যায়। তাদের উদ্ভাবনী শক্তির একেবারে শিকড় পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, এমন করে আর বেশি দিন চলবে না। আমাদের মনকে যদি আমরা যুগযুগান্তর ধরে দাসত্বে দীক্ষিত করি, তাকে কলে ছাঁটি, ছাঁচে ঢালি, জাঁতায় পিষি, মন জিনিসের মর্মস্থলে তার একটি স্বকীয় জীবনীশক্তি আছে একথা যদি কোনোমতেই শ্রদ্ধাপূর্বক গ্রহণ করতে আমরা প্রস্তুত না হই তাহলে আমরা আমাদের দেবতাকে নিয়ে যেমন মাটির প্রতিমা গড়েছি তেমনি

আমাদের ছেলেদের জীবনটাকে নিয়েও কতকগুলো মাটির পুতুল গড়ে তুলব। এখানকার আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা যতই দেখি ততই কেবল আমার মনে হয় আমিও এই রকম করে শেখাবার উপায় করতে চেয়েছিলুম। কিন্তু সেখানে কোনোমতেই এ বীজ অঙ্কুরিত হল না কেন? আমাদের আবার এখান থেকেই সমস্ত নকল করতে হবে। আমরা ভেবেছি কিন্তু গড়ে তুলতে পারিনি—কোনো প্রাণ পদার্থটার পরে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নেই—আমরা কল নামক একটা প্রাণহীন লোহার ঠাকুরকেই মানি। কাল যখন এখানকার ৮২ বছরের বৃদ্ধার সঙ্গে কথা কয়ে এলুম তখন নিজেদের অসহায় দীনতা দুর্বলতা বিশ্বাসহীনতার জন্যে আমার সমস্ত মন পীড়িত হল। এমনি করেই কি চিরদিন চলবে? আমরা নিজেরা কিছু ভাবব না, গড়ব না, জগতের কোনো সমস্যার কোনো মীমাংসা করব না— কেবল টেক্স্ট বুক কমিটির জীর্ণ ভেলা বুকে আঁকড়ে ধরে সমুদ্র পার হবার দুরাশা করব। ইতি ২৯শে বৈশাখ ১৩২০

(স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়কে লিখিত।)

ভারতবর্ষে যারা বাস করবে তাদের আর কোনো সঙ্গতি না থাকে তবে মনটা নিতান্তই থাকা চাই তা যদি থাকে তবে এমন পুণ্যস্থান আর নেই। তাই আমাদের প্রত্যেকের উপরে ভারতবর্ষের এই দাবী যে ভারতবাসীর মনকে জাগাও, প্রাণবান সর্বত্রগামী আনন্দময় মনকে বিশ্বের অভিমুখে পূর্ণ বিকশিত করে তোলো—কারখানা ঘরে তাদের মজুরী যদি না জোটে হাটবাজারে তাদের মূল্য যদি না মেলে বিশ্বে তাদের চেতনা যেন সংকীর্ণ না হয়। ভাগ্য তাদের চারিদিকেই বঞ্চনা করেছে এইজন্যে যাতে তারা নিজের অন্তরতম সহজ সম্পদকে নিজের ভিতর থেকে উদ্ধার করতে পারে এজন্যে তাদের শিশুকাল থেকে উদ্যোগী করতে হবে। আমাদের বিদ্যালয় যেন সেই শুভ চেষ্টার স্থান হয় এই কথা তোমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ওখানকার ছোট বড় প্রত্যেক কাজই যেন জীবনের কাজ হয় এই আমার ইচ্ছা। কল সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে— আমাদের ছেলেগুলোকে পিণ্ড পাকিয়ে সেই কল রাক্ষসের নৈবেদ্যরূপে যেন সাজিয়ে না দিই তাদের বাঁচিয়ে তোল, বাঁচিয়ে

রাখ— বিশ্বজগতে তারা যেন নিজের জীবন দিয়ে গ্রহণ করে জলেস্থলে আকাশে এবং বৃহৎ লোকালয়ে তারা যেন নিজের প্রাণের আলিঙ্গন বিস্তীর্ণ করে দিতে পারে, তাদের অনুভূতির প্রবাহ কোথাও থেকে যেন প্রতিহত হয়ে ফিরে না আসে। তাদের পুড়িয়ে গলিয়ে পিটিয়ে ইস্কুলের ছাঁচে ঢেলে যেন কলের পুতুল ক'রে তুলো না। সে রকম পুতুল তৈরির কারখানা অসংখ্য আছে আমাদের বিদ্যালয় তা নয় বলেই যেন আমরা গৌরব করতে পারি। সভ্যজগতে আজ এই মস্ত একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। একদিকে সজীব মানুষ অন্য দিকে সভ্যতার কল এই দুয়ের মধ্যে কার জিত হবে? এই উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব কিছুতেই মিটছে না। কিন্তু এ কথা তো ভুললে চলবে না যে মানুষই কলকে চালাবে, কল তো মানুষকে চালাবে না। অতএব মানুষের শিক্ষা যদি কলের শিক্ষা হয় তাহলে মনুষ্যত্বের গোড়ায় কোপ মারা হয়। এই বিপদের কথা লোকে বুঝতে পারছে কিন্তু কী করলে এর কিনারা হতে পারে তা কেউ ভেবে পাচ্ছে না।

আমরা ভূমার বক্ষের মধ্যে ছেলেদের মানুষ করে তোলবার আয়োজন করছি এই কথাটা যেন সর্বতোভাবে সত্য হয়— আমাদের তপোবন থেকে কলকে খেদাও, ওখানে প্রাণকে আন। ইতি ৩০শে জানুয়ারি ১৯১৩

(শান্তিনিকেতনের জনৈক অধ্যাপককে লিখিত।)

আমার মনে হচ্চে ছেলেদের মুখরোচক খাবারের জন্যে কিছুমাত্র ভাবতে হয় না যদি তাদের best sauce এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। খুব কসে পরিশ্রম করিয়ে ক্ষুধার মুখে বেশ শাদাসিধা খাবার দিলে সেটা রুচিকর এবং স্বাস্থ্যকর হবেই। পূর্বে ওরা যখন সকালে বিকালে খুব কসে কোদাল পাড়ত তখন খাবার নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করত না এবং মোটা রুটি ও ডাল আশ্চর্য পরিমাণে খেতে পারত। ওদের শরীর তখন এখনকার চেয়ে ভাল ছিল। আমার তাই মনে হচ্চে সকালে কোনো এক সময়ে অন্তত দশ মিনিট কাল সব ছেলেকে মাটি খুঁড়িয়ে নেওয়া উচিত হবে। যাতে সকলে সেটা রীতিমত করে এবং ফাঁকি না দেয় দেখবেন। বিকালে যে সব ছেলে ফুটবল না খেলবে তাদেরও এই রকম ব্যবস্থা করবেন। বৃষ্টি হলেও বাইরে খেলা বা মাটি খোঁড়া বন্ধ রাখবেন না। কারণ পরিশ্রম কালে বা বেড়াতে বেড়াতে বৃষ্টিতে ভিজলে

কোনো অসুখ করে না, বরঞ্চ নিয়মিত ব্যায়ামে ব্যাঘাত হলেই অসুখ করে। তুই একজন ছেলের এক আধদিন একটু আধটু সর্দি হলেই ভয় পেয়ে যাবেন না। বরঞ্চ কড়া রৌদ্রটা খালি মাথায় ভাল নয়, রৌদ্রের সময় সব ছেলে যদি চাদরটা মাথায় পাগড়ি করে বাঁধতে শেখে তাহলে কোনো ভয়ের কারণ নেই, কিন্তু বৃষ্টির সময় বাইরে ব্যায়াম সেরে ঘরে এসে তাড়াতাড়ি গা ভাল করে মুছে শুকনো কাপড় পরলে অসুখের সম্ভাবনা নেই। অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে যাতে খেলে এসে গায়ে জল না বসায়। দু একটি করে ছেলেকে সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে যাবেন, বৃষ্টি হলে বেশ দ্রুতপদ চালনা করে চলবেন, দুচার দিন এমন করলেই রৌদ্রবৃষ্টি বেশ সয়ে যাবে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোটা নানা কারণে বিশেষ হিতকর। ইতি ১৮ই আষাঢ়

(স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত।)

আমাদের বিদ্যালয় দেখবার জন্যে ইংরেজ অতিথির ভিড় হচ্চে। কিন্তু তাঁরা দেখবার চেষ্টা করলেও ত দেখতে পাবেন না। তাঁরা যে এণ্ট্রেন্স স্কুল দেখবার চোখ নিয়ে আসবেন— কিন্তু আমাদের এ ত স্কুল নয়। আশ্রমের ধারণা তাঁদের মনের মধ্যে নেই। তাঁরা আশ্রমকে ইংরেজি ভাষায় hermitage বলে তর্জমা করে থাকেন। তাঁরা জানেন এ সমস্ত সন্ন্যাস ধর্মের উপকরণ— মানবসভ্যতার মধ্যযুগের জিনিস, এখনকার কালে সে সমস্তই ঐতিহাসিক আবর্জনাকুণ্ডের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে,— এখনকার ঝকঝকে নতুন জিনিস হচ্চে প্রায়মারী ইস্কুল সেকেণ্ডারি ইস্কুল, বোর্ড অফ এডুকেশন। এঁরা চিরকালের জিনিসকে সকল কালের মধ্যে অখণ্ড করে দেখতে জানেন না। এঁরা নিজেদের বানানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গবাক্ষের ভিতর দিয়ে শাশ্বতকালকে কৃত্রিমভাগে বিভক্ত করে দেখেন। কিন্তু ইতিহাসের ভিতর দিয়ে মানব জীবনের সমগ্রতাকে দেখাই হচ্চে যথার্থ দেখা। মধ্য যুগ আজও মানুষের মধ্যেই আছে। এক কালে মানুষ যাকে সর্বান্তঃকরণের ব্যাকুলতা দিয়ে স্বীকার করেছে অন্যকালে তাকে অসত্য এবং অপ্রয়োজনীয় বলে বর্জন করবে এ হতেই পারে না। একদিন সে জেগে উঠে দেখে মধ্যযুগের সত্য এ যুগেও আছে, আত্মার যে ক্ষুধা তখন যে অমৃতস্তন্যের জন্যে কেঁদেছিল আজকের দিনের নূতন প্রভাতে

তার সেই কান্না সেই স্তন্যকেই চাচ্চে। বিদ্বান মানুষ বা ব্যবসায়ী মানুষের খাতিরে পরম মানুষের চরম লক্ষ্যকে ত কোনো একটা মধ্য যুগের জীর্ণবস্তার মধ্যে অনাবশ্যক ছাপ মেরে ফেলে রাখা যায় না। এইজন্যে আশ্রমেই মানুষকে শিক্ষা করতে হবে ইস্কুলে নয়।

(স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়কে লিখিত।)

এখনকার ইস্কুল বিদ্যাশিক্ষার কল কিন্তু কলের মধ্যে ত জীবনের সৃষ্টি হয় না,—মানুষের জীবন প্রবাহকে চিরজীবনের পথে পরিপূর্ণ করে তোলাই হচ্চে শিক্ষার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বর্তমান যুগ কিছু কালের জন্য বিস্মৃত হয়েছে বলেই যে সে প্রাচীন যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে এ কথা একেবারেই অগ্রাহ্য। তাকে পুনর্বার বুঝতে হবে তার সেই প্রয়োজন আছে এবং তাকে উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। আমাদের আত্মার সেই নিগূঢ় প্রয়োজন বোধই আশ্রমকে আশ্রয় করেছে এবং নানা প্রকারে এখানে আপনার বাসা বাঁধছে। এই আশ্রমে গুরুর সঙ্গে শিষ্যের গভীর যোগ কেননা এখানে উভয়েই ছাত্র—এখানে বিদ্যার সঙ্গে ধর্মের ভেদ নেই— কেননা উভয়েই এক লক্ষ্যের অন্তর্গত। এখানে জীবনের সাধনা নদীর স্রোতের মত সমগ্রভাবে সচল; স্নানাহার পাঠাভ্যাস খেলা উপাসনা সমস্তই সাধনার পথে প্রবাহিত। এখানে শিক্ষক যে শিক্ষাদান করচেন সে তাঁর ব্যবসায়গত কর্তব্য বা নৈতিক কর্তব্য নয় সে তাঁর সাধনা— তার দ্বারা তিনি তাঁর হৃদয়গ্রন্থি মোচন করচেন, ভূমা উপলব্ধির পথকে প্রশস্ত করচেন। একথা বলতে পারিনে আমাদের আশ্রমে এই সাধনাকে আমরা অবাধ করে তুলেছি কিন্তু আমাদের বীজমন্ত্র এই ভূমাতত্ত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্য—আমরা ভূমাকে জানতে এসেছি, আমাদের সমস্ত জিজ্ঞাসা এই জিজ্ঞাসার অঙ্গ। একথা হঠাৎ কোনো ইস্কুল পরিদর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে না, কিন্তু একথা আমাদের প্রত্যেককে সুস্পষ্ট করে বুঝতে হবে।

(স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়কে লিখিত পত্র।)

আমেরিকার বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার প্রণালী আমি যতটা আলোচনা করে দেখলুম তাতে একটা কথা আমার মনে হয়েচে এই যে আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা বই পড়াবার দিকে একটু ঢিল দিয়েছি। আমরা একদিকে যেমন ইংরেজি সোপান, সংস্কৃত প্রবেশ প্রভৃতি অবলম্বন করে ধীরে ধীরে থাকে থাকে ভাষা শেখাবার চেষ্টা করি তেমনি সেই সঙ্গে উচিত অনেকগুলি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থ একেবারে হুহু করে ছেলেদের পড়িয়ে যাওয়া। সেগুলো খুব বেশি তন্ন তন্ন করে পড়াবার একেবারেই দরকার নেই—তাড়াতাড়ি কোনোমতে কেবলমাত্র মানে করে আবৃত্তি করে পড়ে যাওয়া মাত্র। এ রকম করে পড়ে গেলে সব যে ছেলেদের মনে থাকে তা নয় কিন্তু নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে ভাষার পরিচয়টা মনের ভিতরে ভিতরে গড়ে উঠতে থাকে। যতদিন একজন ছেলে আমাদের ইস্কুলে আছে ততদিনে সে যদি অন্তত কুড়ি পঁচিশখানা বই যেমন করে হোক পড়ে যাবার সুযোগ পায় তাহলে ভাষার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা না ঘটে থাকতে পারে না। যেটুকু পড়বে সেটুকু সম্পূর্ণ পাকা করে পড়ে তার পরে এগতে দেওয়ার যে প্রণালী আছে সেটা স্বভাবের প্রণালী নয়। স্বভাবের প্রণালীতে আমাদের মনের উপর দিয়ে পরিচয়ের ধারা দ্রুতবেগে বহে চলে যাচ্চে। কিছুই দাঁড়িয়ে থাকচে না। কিন্তু সেই নিরন্তর প্রবাহ ভিতরে ভিতরে আমাদের অন্তরের মধ্যে পলি রেখে যাচ্চে। ছেলেরা মাতৃভাষা একটু একটু করে বাঁধ বেঁধে বেঁধে পাকা করে শেখে না—তারা যা জেনেছে এবং যা জানে না সমস্তই তাদের মনের উপরে অবিশ্রাম বর্ষণ হতে থাকে—হতে হতে কখন যে তাদের শিক্ষা সম্পন্ন হয়ে ওঠে তা টেরই পাওয়া যায় না। প্রকৃতির প্রণালীর গুণ হচ্চে এই যে প্রকৃতি তার শিক্ষাকে কিছুতেই বিরক্তিকর করে তোলে না। জীবন জিনিসটা চলতি জিনিস—তাকে জোর করে এক জায়গায় দাঁড় করাতে গেলেই তাকে পীড়ন করা হয়। আমি এটা বেশ বুঝতে পেরেছি ছেলেদের মনকে কোনো একটা জায়গায় ধরে রাখবার চেষ্টা করাই জড়প্রণালী —শিক্ষা ব্যাপারটাকে বেগবান করতে পারলে তবেই জীবনের গতির সঙ্গে তার তাল রক্ষা হয় এবং তখনই জীবন তাকে সহজে গ্রহণ করতে পারে। এই জন্যে অসম্পূর্ণ পড়াকে ভয় করলে চলবে না, আসলে বিলম্বিত পড়াটাই পরিহার্য। মুস্কিল এই যে, আমরা প্রতিদিন পদে পদে পরীক্ষার দ্বারা ফল

দেখে দেখে তবেই আমাদের শিক্ষাপ্রণালীর সফলতার বিচার করি কিন্তু জীবন ব্যাপারের বিকাশ নিত্য দেখা যায় না— তার যে ফলটা অগোচর সেইটেই তার বড় সম্পদ— সেটা ভিতরে ভিতরে জমতে জমতে কাজ করতে করতে একদিন বাইরে অপর্যাপ্ত ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। শীতের সময় যখন গাছপালার পাতা ফুল ফল সমস্ত বিলুপ্ত হয়ে যায় তখন যদি কোনো ইন্‌সপেক্‌টর তাদের কাছ থেকে পরীক্ষাপত্র সংগ্রহ করতে আসে তাহলে অরণ্যকে অরণ্য একেবারে ০ মার্কা পেয়ে মাথা হেঁট করে থাকে কিন্তু বসন্ত জানে পরীক্ষাপত্রের দ্বারা জীবনের বিচার চলে না— প্রশ্ন করলে জীবন ঠিক সময়ে উত্তর দিতে পারে না অনেক সময়ে চুপ করে বোকার মত বসে থাকে কিন্তু একদিনে দক্ষিণে হাওয়ায় যখন তার বুলি ফোটে তখন একেবারে অবাক হয়ে যেতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে শিক্ষা-প্রণালীতে আমরা জড়োপাসক জীবনের গতিকে আমরা দেখতে পাইনে বলে তাকে কোনোমতে বিশ্বাস করতেই পারিনে— এতেই আমরা অন্তরের ক্রিয়াকে পরিহার করে বাহ্য প্রক্রিয়াকেই সার করে বসে আছি। এই অন্ধতায় যে আমরা কত পীড়া ও কত ব্যর্থতার সৃষ্টি করেছি সে কথা বলে শেষ করা যায় না —ফলের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় লোভ করেই আমরা বিফল হচ্চি। যাই হোক তোমাদের সংস্কৃত ও ইংরেজি অধ্যাপনার মধ্যে এখন থেকে সাহিত্যগ্রন্থ পাঠকে খুব বড় স্থান দিতে হবে— বছরের মধ্যে অন্তত দুখানা করে বই পড়ে শেষ করা চাই— সে পড়া যে খুব পাকা গোছের পড়া হবে না একথাও মনের মধ্যে জেনে রাখতে হবে— তাতে দুঃখ পেলে কিম্বা হতাশ হলে চলবে না— এই রকম অনুশীলনের ফলটা তিন চার বৎসর চেষ্টার পরে তোমরা জানতে পারবে।

(স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়কে লিখিত)

চিকাগোয় থাকতে সেখানকার একটি ভালো বিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে দেখবার জিনিস ঢের আছে। কিন্তু তাদের সমস্তই বহুব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা, দেখে আমাদের পক্ষে বিশেষ লাভ নেই। কেবল অঙ্ক শেখাবার একটা যা প্রণালী দেখলুম সেইটে তোমাকে লিখচি। এরা ক্লাসে একটা খেলার মত করে সেটা হচ্চে Banking। তাতে পুরোপুরি ব্যাঙ্কের

কাজের সমস্ত অভিনয় হয়। চেকবই, ভাউচার, হিসাবপত্র সবই আছে। ছেলেদের কারো বা চিনির ব্যবসা, কারো বা চামড়ার— সেই উপলক্ষ্যে বাঙ্কের সঙ্গে তাদের লেনাদেনা এবং তার লাভ লোকসান ও সুদের হিসাব ঠিক দস্তুর মত রাখতে হচ্চে। এতে অঙ্ক জিনিসটা এরা গোড়া থেকেই সত্যভাবে দেখতে পায়। ছেলেরা খুব আমোদের সঙ্গে এই খেলা খেলচে। তোমার মনে আছে কিনা বলতে পারিনে, কিন্তু আমি বহুকাল পূর্বে আমাদের বিদ্যালয়ের অঙ্কের ক্লাসে এই দোকান রাখার খেলা চালাবার চেষ্টা করেছিলুম। গণিতশাস্ত্রে আমার বিদ্যার পরিমাণ গণনায় অতি যৎসামান্য বলেই আমি এ জিনিসটাকে খাড়া করে তুলতে পারলুম না। কিন্তু অঙ্ক জিনিসটা কি এবং তার ভুল জিনিসটা যে কেবল নম্বর কাটার বিষয় নয় সেটা যে যথার্থ ক্ষতির কারণ এটা খেলাচ্ছলে ছেলেদের দেখিয়ে দিলে সেটা ওদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। ছোট ছোট কাপড়ের বস্তায় বালি পুরে অনায়াসে এই খেলার আয়োজন করা যেতে পারে অবশ্য খাতাপত্র ঠিক দস্তুর মত রাখতে শেখাতে হয়। এই জিনিসটাতে ওদের হাত দুরস্ত হলে প্রত্যেক ঘরেই আমরা বিদ্যালয়ের ডিপজিটের কাজ স্বতন্ত্র করে চালাতে পারি। প্রথমটা এটা গড়ে তুলতে একটু ভাবতে এবং খাটতে হয় কিন্তু তার পরে কলের মত চলে যাবে। আতার বীচি তেঁতুল বীচি দিয়ে টাকা পয়সার কাজ চালাতে পার— এতে ওদের আমোদও হবে শিক্ষাও হবে। এই জিনিসটা একটু ভেবে দেখো। এদের ইস্কুলে এই জিনিসটার নূতন প্রবর্তন হয়েছে— আমরা এদের অনেক আগে এই প্রণালীর কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আমরা বাঁধা রাস্তার বাইরে কিছুই করতে পারলুম না— আর এরা অনায়াসে এগিয়ে যাচ্চে— এইটে দেখে আমার মনে দুঃখবোধ হল।

(স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়কে লিখিত)

অকৃত্রিম উৎসবের ক্ষেত্রে যখন বহুলোককে ডেকে আনা হয় তখন তাদের সেবার মধ্যে কৃপণতা বা আড়ম্বর প্রকাশ বা শুধু কেবল দায় মেটাবার নীরসতা থাকে না। তার কারণ লোক সেবার পিছনে সেখানে বড় একটি আনন্দের আশ্রয় আছে। এই আনন্দ আশ্রিত কর্মই হচ্চে কর্মের শ্রেষ্ঠ রূপ। আমরা কর্মের সেই পূর্ণ আদর্শ আশ্রমে স্থাপিত করতে চাই। এখানকার কাজ মুখ্যত

নিয়মের ক্ষেত্রে নয়, আনন্দের ক্ষেত্রে,— নিয়ম সেই আনন্দের অনুগত,— তাই হলেই নিয়ম, নিয়ম থেকেও, আর বন্ধন হয় না; এখানকার কাজ মুখ্যত চারিত্রিক নয় আধ্যাত্মিক, চারিত্র আধ্যাত্মিকতার অনুগত, তাহলেই সে কর্মে মুক্তি আনে। আমাদের আশ্রমে পাশ্চাত্ত্যের চারিত্রিকতা ও প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার যোগ হোক, মানবের সঙ্গে ব্রহ্মের মিলন হোক, নিয়ম বন্ধনের সঙ্গে মুক্তির আনন্দের বাধা দূর হয়ে যাক্‌।

(মন্দির—১৯শে ভাদ্র ১৩৩০)

2970 Groveland Ave.
Chicago

মানুষের চিত্তের গভীর কেন্দ্রস্থলে সহজ জীবনের যে অমৃত উৎস আছে — এ দেশের লোকেরা তাকে এখনো আমল দিতে জানে না। এই জন্যে এদের চেষ্টা কেবলি বিপুল এবং আসবাব কেবলি স্তূপাকার হয়ে উঠছে। এরা লাভকে সহজ করবার জন্যে প্রণালীকে কেবল কঠিন করে তুলছে। তাতে এক-দিকে মানুষের শক্তির চর্চা খুবই প্রবল হচ্চে সন্দেহ নেই এবং সে জিনিসটাকে অবজ্ঞা করতে চাইনে— কিন্তু মানুষের শক্তি আছে অথচ উপলব্ধি নেই এও যেমন আর ডালপালায় গাছ খুব বেড়ে উঠেছে অথচ তার ফল নেই এও তেমনি। মানুষকে তার সফলতার সুরটি ধরিয়ে দেবার সময় এসেছে। আমাদের শান্তিনিকেতনের পাখিদের কণ্ঠে সেই সুরটি কি ভোরের আলোতে ফুটে উঠবে না? সেটি সৌন্দর্যের সুর, সেটি আনন্দের সংগীত, সেটি আকাশের এবং আলোকের অনির্বচনীয়তার স্তবগান, সেটি প্রাণসমুদ্রের লহরী লীলার কলস্বর— সে কারখানা ঘরের শৃঙ্গধ্বনি নয়, সুতরাং ছোটো হয়েও সে বড়ো, কোমল হয়েও সে প্রবল— সে কেবলমাত্র চোখমেলা, কেবলমাত্র জাগরণ, সে কুস্তি নয় মারামারি নয়, সে চেতনার প্রসন্নতা। জীবনের ভিতর দিয়ে তোমরা ফুলের মতো সেই জিনিস ফুটিয়ে তোলো— কেন না সবই যখন তৈরি হয়ে সারা হয়ে যাবে— মন্দিরের চূড়া যখন মেঘ ভেদ করে উঠবে, তখন সেই বিনা মূল্যের ফুলের অভাবেই মানুষের দেবতার পূজা হোতে পারবে না। মানুষের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেই একশো এক পূজার পদ্ম যখন সংগ্রহ হবে,

পূজা যখন সমাধা হবে তখনি সংসার সংগ্রামে মানুষ জয়লাভ করতে পারবে— কেবল অস্ত্রশস্ত্রের জোরে জয় হবে না এই কথা নিশ্চয় জেনে পৃথিবীর সমস্ত কলরবের মাঝখানে আজ আমাদের কাজ নিঃশব্দে করে যেতে পারি।

(স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত)

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবই আমি সব চেয়ে গুরুতর বলে মনে করচি। আপনাকে যেমন করে হোক শিক্ষক তৈরি করে নিতে হবে। আপনার চালনা অনুসারে শিক্ষকেরা কাজ করে যাবে— আপনি তাঁদের কাজ সর্বদাই পরীক্ষা করবেন। পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধেও ভেবে রাখবেন। যে সমস্ত বই তৈরি করা আবশ্যক তার প্রতিও কি দৃষ্টি দেবেন না ?

(স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেনকে লিখিত)

আমাদের আশ্রমে রাজপুরুষদের গতিবিধি হতে চলল সেজন্যে মাঝে মাঝে মন উৎকণ্ঠিত হয় কিন্তু একথাও ভাবি যে আশ্রমের রক্ষাভার যাঁর উপরে আছে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা যেতে পারে। এর থেকে যদি কিছু ফল হয় সে ভাল ফলই হবে। কেবল একটি কথা মনে রাখা দরকার এদের কারো মন জোগাবার ইচ্ছা যেন আমাদের প্রলুব্ধ না করে— আমরা যেন কোনো রকম ছদ্মবেশ ধারণ করবার আয়োজন না করি। আমাদের ভাবে আমাদের কাজ আমরা করে যাব তাতে যদি আপনিই কারো ভাল লাগে ত ভালই যদি না লাগে ত ক্ষতি নেই। কিন্তু তোমরা নিজের আদর্শের উচ্চতা সম্বন্ধে যেন লেশমাত্র সন্দিহান হোয়ো না। আজ যদি বাইরের লোক স্বীকার করে যে তোমাদের কাজের মধ্যে সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যাচ্চে— তাহলে সেইটিকেই অত্যন্ত বেশি মনে কোরো না— তারা ঠিক এর উল্টো কথা বলতেও পারত। তোমাদের অন্তর্যামী যেদিন অন্তরের মধ্যে থেকে লোকচক্ষুর অগোচরে তোমাদের পুরস্কৃত করবেন সেইদিনই তোমরা আনন্দ কোরো। আমাদের চিত্তের মধ্যে দৈন্য আছে কিন্তু আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে নেই— আমাদের পূজার আয়োজনে ত্রুটি আছে কিন্তু আমাদের দেবতার সিংহাসনে যিনি বিরাজ করচেন তিনি পরিপূর্ণ। তাঁকে আমরা যেন ছোট করে না দেখি।

(স্বর্গীয় জগদানন্দ রায়কে লিখিত)

আগামী ৩০শে আশ্বিন তোমরা একটা উৎসব করতে চেয়েছ আমি তাতে সম্মতিও দিয়েছি। একটি কথা বলবার আছে।

ঐদিন সম্বন্ধে সাধারণত আমাদের দেশে যে-ভাবের উত্তেজনা প্রচলিত হয়েছে আমি সেই ভাবটিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের উপযোগী মনে করিনে— বস্তুত সে-ভাবটি ও-জায়গার পক্ষে অসংগত।

ছুটি পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব মনে ছিল। যদি থাকতুম তাহলে ৩০শে আশ্বিনের উৎসবকে আমি একটা বড়ো দিক থেকে সত্য দিক থেকে দেখবার ও দেখাবার বিশেষ চেষ্টা করতুম। আমি কোনো সংকীর্ণ বিরোধের ভাব এবং তৎসংক্রান্ত চিত্তদাহকে প্রশ্রয় দিতুম না, আমার রাখিবন্ধনের মধ্যে কোনো সাময়িকতার ক্ষোভ ও খণ্ডতা থাকতে দিতুম না। যে-রাখিতে আত্মপর শত্রু-মিত্র স্বজাতি বিজাতি সকলকেই বাঁধে সেই রাখিই শান্তিনিকেতনের রাখি। ঈশ্বর শান্তির বীজকে বিরোধের ভিতরেই নিহিত করেন, কিন্তু বিরোধকে ভেদ করে তাকে অতিক্রম করেই সে বড়ো হয়ে ওঠে— বিরোধের মাটির ভিতরেই যদি সে থেকে যায় তবে সে প'চে মরে। আমাদের রাখিবন্ধনের বীজ বিরোধের ভিতর থেকে তাকে ভেদ করেই ছায়াময় বনস্পতি হয়ে উঠবে। বর্তমান ভারতবর্ষে যাদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থের প্রতিকূলতা আছে এ-রাখি তাদের কাছ থেকেও নিরস্ত হবে না। তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে আমরা প্রত্যাখ্যান করব না। আমরা বারংবার সহস্রবার সকলকেই প্রীতির বন্ধনে ঐক্যের বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করব— এইটেই আমাদের একটা দায়— বিধাতা এইটেই আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। পূর্ব-পশ্চিম, রাজাপ্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকল প্রকার বিরুদ্ধতার ভিতরেও এককক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করছে— এই তার ধর্ম, এই তার কাজ, অন্য দেশের পোলিটিকাল ইতিহাস থেকে এ-সম্বন্ধে আমি কোনো শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই— আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে মনুষ্যত্বের একটি অতি উদার অতি বিরাট ইতিহাস সৃষ্টির আয়োজন চলছে এই আমার নিশ্চয় বিশ্বাস— যেমন ইংরেজ পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গকে সত্যই স্বতন্ত্র করে দেবার মালিক নয় তেমনি আমরাও রাখিবন্ধনের গণ্ডির দ্বারা ভারতবর্ষে কেবল আমাদের মনের মতো জাতিকেই

গড়ব এবং অন্যকে বর্জন করব তা চলবে না। যারা আমাদের আঘাত করতেও এসেছে তাদেরও আমরা আত্মসাৎ করব, আমাদের উপর এই আদেশ আছে। এখনকারকালে একথা বললে কারো কাছে উপাদেয় বলে মনে হবে না— অনেকে মনে করবেন এ একটা কাপুরুষতার লক্ষণ, কিন্তু তবু এই সত্য কথাটি বলা চাই। সত্যকে কোনো কারণেই কোনো জায়গাতেই সীমাবদ্ধ করা চলবে না।

তোমাদের আশ্রমে তোমাদের রাখিবন্ধনের দিনকে খুব একটা বড়োদিন করে তুলো। বড়োদিন মানেই প্রেমের দিন, মিলনের দিন— যে-প্রেমে যে মিলনে ভারতের সকলেই আহূত, ভারতবর্ষের যজ্ঞক্ষেত্রে আজ বিধাতা যাদের নিমন্ত্রণ করে এনেছেন আমরা তাদের কাউকেই শত্রু ব'লে দূরে ফেলতে পারব না। আমরা কষ্ট পেয়ে, দুঃখ পেয়ে,আঘাত পেয়ে সর্বস্ব হারিয়েও সকলকে বাঁধব সকলকে নিয়ে এক হব— এবং একের মধ্যে সকলকেই উপলব্ধি করব। বঙ্গবিভাগের বিরোধক্ষেত্রে এই যে রাখিবন্ধনের দিনের অভ্যুদয় হয়েছে এর অখণ্ড আলোক এখন এই ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে সমস্ত ভারতের মিলনের সুপ্রভাত রূপে পরিণত হোক। তাহলেই এই দিনটি ভারতের বড়োদিন হবে। তাহলেই এই বড়োদিনে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদের মিলন হবে। একথা কেউ বিশ্বাস করবে না কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। আমাদের আশ্রমেও যদি ভূমা স্থান না পান— সেখানেও যদি সাময়িক বারোয়ারির ক্ষণকালস্থায়ী মৃন্ময় দেবতার পূজার মত্ততাই সঞ্চারিত হয় তাহলে আশ্রমধর্ম পীড়িত হবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই সাময়িক নেশায় ভোর হয়ে আছি— সেইজন্যে ৩০শে আশ্বিনের মতো দেশব্যাপী উন্মত্ততার দিনে নিত্য সত্যকে অবজ্ঞা করার আশঙ্কা আছে— সেইজন্যই আমি বারবার করে তোমাদের সতর্ক করতে চাই। যা শ্রেষ্ঠ, যা মহত্তম, যা সত্যতম তার থেকে লক্ষ কোনো কারণেই কোনোমতেই ফেরাতে দিয়ো না। যদি লোকের কর্ণ বধির হয় তবু সত্যের মন্ত্রই শোনাতে হবে— অন্তত আমাদের আশ্রমে বেসুর না বাজে, যিনি শান্তং শিবমদ্বৈতং তাঁকে যেন কোনোদিনই কোনোমতেই আমরা না ভুলি— তাঁর চেয়ে আর-কাউকে আমরা যেন বড়ো করে না তুলি। সেদিন তোমরা ছেলেদের ডেকে ভারতবর্ষের সকলের বড়ো যে-বাণী তাই শুনিয়ে দিয়ো

সেদিন সংযম পালন যখন হচ্ছে তখন সেই সংযমের উপযোগী সাধনাও যেন অবলম্বন করা হয়— এই তোমাদের সকলের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ।

(স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত)

Hotel Algonquine
New York

যে শান্তি অন্তরাত্মার, যে সম্পদ নিত্যকালের, তারই প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হচ্ছে ভারতবর্ষের দান। সেই শ্রদ্ধাকে আবার পরিপূর্ণ রূপে জাগিয়ে তোলবার দিন এসেছে। পশ্চিম ভূভাগ কামান বন্দুকের আয়োজন করুক— যে শক্তিতে সেই সমস্ত আয়োজনকে তুচ্ছ করতে পারি আত্মার সেই পরম শক্তিকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের সাধনা। সেই জন্যে আমাদের নিস্পৃহ হোতে হবে, নির্ভয় হোতে হবে এবং বলতে হবে যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্। ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোলবিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ ঘুচে যাক— সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক — সেই জায়গা হোক আমাদের শান্তিনিকেতন। আমাদের জন্যে একটিমাত্র দেশ আছে— সে হচ্ছে বসুন্ধরা, একটিমাত্র নেশন আছে— সে হচ্ছে মানুষ।
১১ ডিসেম্বর, ১৯২০

(স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত)

New York,
November, 4th. 1920

There is one thing about which I wish to speak to you. Keep Santiniketan away from the turmoils of politics. I know that the political problem is growing in intensity in India and its encroachment is difficult to resist. But all the same, we must never forget that our mission is not political. Where I have my politics, I do not belong to Santiniketan.

I do not mean to say that there is anything wrong in politics, but only that it is out of harmony with our Asram.

We must clearly realize this fact, that the name of Santiniketan has a meaning for us, and this name will have to be made true. I am anxious and afraid lest the surrounding forces may become too strong for us and we succumb to the onslaught of the present time. Because the time is troubled and the minds of men distracted, all the more must we, through our Asram, maintain our faith in Shantam, Shivam, Advaitam.

(দীনবন্ধু C. F. Andrews কে লিখিত)

London,
October 18th, 1920

Santiniketan is there for giving expression to the Eternal Man— *asato ma sad gamaya*, the prayer that will ring clearer as the ages roll on, even when the geographical names of all countries are changed and lose their meaning. If I give way to the passion of the moment and the claims of the crowd, then it will be like speculating with my Master's money for a purpose which is not His own.

I know that my countrymen will clamour to borrow from this capital entrusted to me and exploit it for the needs that they believe to be more urgent than anything else. But all the same, you must know that I have to be true to my trust. Santiniketan must treasure in all circumstances that *Santi* which is in the bosom of the Infinite.

(দীনবন্ধু C. F. Andrews কে লিখিত)

একটা কথা মনে রেখো, আমি নন-কো-অপারেশনের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মত প্রচার করতে চাইনে। ও-সম্বন্ধে তোমাদের যদি শ্রদ্ধা থাকে তাতে লেশমাত্র ক্ষতি নেই— কেবলমাত্র কথা এই— আমাদের শান্তিনিকেতন পলিটিক্সের বাইরে। ৬ই মে ১৯২১

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত)

২৬ জুলাই ১৯৩০

আমাদের আশ্রমের কেউ যদি কর্তব্যবোধে দেশের বর্তমান আন্দোলনে যোগ দেন তাতে আমার কোনো আপত্তি হোতে পারে না। কিন্তু শান্তিনিকেতন আশ্রমকে যেন কোনোমতে রাষ্ট্রনীতি স্পর্শ না করে। আমাদের আশ্রমের ধর্ম রাষ্ট্রধর্মের অনেক উপরে।

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করকে লিখিত)

আমি যখন এই শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এখানে ছেলেদের আনলুম তখন আমার নিজের বিশেষ কিছু দেবার বা বলবার মত ছিল না। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে এখানকার এই প্রভাতের আলো শ্যামল প্রান্তর গাছপালা যেন শিশুদের চিত্তকে স্পর্শ করতে পারে। কারণ প্রকৃতির সাহচর্যে তরুণ চিত্তের আনন্দ সঞ্চারের দরকার আছে, বিশ্বের চারিদিককার রসাস্বাদ করা ও সকালের আলো সন্ধ্যার সূর্যাস্তের সৌন্দর্য উপভোগ করার মধ্য দিয়ে শিশুদের জীবনের উন্মেষ আপনা থেকেই হতে থাকে। আমি চেয়েছিলুম যে তারা অনুভব করুক যে বসুন্ধরা তাদের ধাত্রীর মত কোলে করে মানুষ করছে— তারা শহরের যে ইটকাঠ পাথরের মধ্যে বর্ধিত হয় সেই জড়তার কারাগার থেকে তাদের মুক্তি দিতে হবে। ঐ উদ্দেশ্যে আমি আকাশ আলোর অঙ্কশায়ী উদার প্রান্তরে এই শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলুম। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে শান্তিনিকেতনের গাছপালা পাখিই এদের শিক্ষার ভার নেবে। আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু মানুষের কাছ থেকেও এরা শিক্ষালাভ করবে। কারণ বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে যে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে তাতে করে শিশুচিত্তের বিষম ক্ষতি হয়েছে।

তখন আমার নিজের সহায় সম্বল কিছু ছিল না, কারণ আমি নিজে বরাবর ইস্কুল মাষ্টারকে এড়িয়ে চলেছি। বই পড়া বিদ্যা ছেলেদের শেখাব এমন দুঃসাহস ছিল না। কিন্তু আমাকে বাল্যকাল থেকে বিশ্বপ্রকৃতির বাণী মুগ্ধ করেছিল, আমি তার সঙ্গে একান্ত আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। বই পড়ার চেয়ে যে তার কত বেশি মূল্য, তা যে কতখানি শক্তি ও প্রেরণা দান করে তা আমি নিজে জানি। তাই শিশুরা যে এখানে আনন্দে দৌড়াচ্ছে,

গাছে চড়ছে, কলহাস্যে আকাশ মুখর করে তুলছে, আমার মনে হয়েছে যে এরা এমন কিছু লাভ করেছে যা দুর্লভ। তাদের বিদ্যার কি মার্কা মারা হল এটাই সব চেয়ে বড় কথা নয় কিন্তু তাদের চিত্তের পেয়ালা বিশ্বের অমৃত রসে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে আনন্দে উপচে উঠেছে এই ব্যাপারটি বহুমূল্য। এই হাসি গান আনন্দে গল্পে ভিতরে ভিতরে তাদের মনের পরিপুষ্টি হয়েছে। অভিভাবকেরা হয়তো তা বুঝবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা হয়তো তার জন্য পাশের নম্বর দিতে রাজী হবেন না। কিন্তু আমি জানি এ অতি আদরণীয়। প্রকৃতির কোলে থেকে সরস্বতীকে মাতৃরূপে লাভ করা, এ পরম সৌভাগ্যের কথা। এমনি করে আমার বিদ্যালয়ের সূত্রপাত হল।

প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলাম যে বিশ্বপ্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হল যে মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল।

(৭ই পৌষ, উদ্বোধন— শান্তিনিকেতন, মাঘ ১৩৩০)

• •

একদিন আমাদের এখানে যে উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছিল সে অনেকদিনের কথা। আমাদের একটি পূর্বতন ছাত্র সেদিনকার ইতিহাসের এক খণ্ডকালকে কয়েকটি চিঠিপত্র ও মুদ্রিত বিবরণীর ভিতর দিয়ে আমার সামনে এনে দিয়েছিল। সেই ছাত্রটি এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠা থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। কাল রাত্রে সেদিনকার ইতিকথার ছিন্নলিপি যখন পড়ে দেখছিলুম তখন মনে পড়ল, কী ক্ষীণ আরম্ভ, কত তুচ্ছ আয়োজন। সেদিন যে-মূর্তি এই আশ্রমের শালবীথিচ্ছায়ায় দেখা দিয়েছিল, আজকের দিনের বিশ্বভারতীর রূপ তার মধ্যে এতই প্রচ্ছন্ন ছিল যে, সে কারো কল্পনাতেও আসতে পারত না। এই অনুষ্ঠানের প্রথম সূচনা দিনে আমরা আমাদের পুরাতন আচার্যদের আহ্বানমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেম, যে-মন্ত্রে তাঁরা সকলকে ডেকে বলেছিলেন, 'আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা'; বলেছিলেন, জলধারা সকল যেমন সমুদ্রের মধ্যে এসে

মিলিত হয়, তেমনি করে সকলে এখানে মিলিত হোক। তাঁদেরই আহ্বান আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল, কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠে। সেদিন সেই বেদ-মন্ত্র আবৃত্তির ভিতরে আমাদের আশা ছিল, ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আজ যে প্রাণের বিকাশ আমরা অনুভব করছি, সুস্পষ্টভাবে সেটা আমাদের গোচর ছিল না। এই বিদ্যালয়ের প্রচ্ছন্ন অন্তস্তর সত্যের বীজ আমার জীবিতকালের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়ে বিশ্বভারতী রূপে যে বিস্তার লাভ করবে, ভরসা করে এই কল্পনাকে সে দিন মনে স্থান দিতে পারিনি। কোনো একদিন বিরাট ভারতবর্ষ এই আশ্রমের মধ্যে আসন পাতবে; এই ভারতবর্ষ যেখানে নানা জাতি, নানা বিদ্যা, নানা সম্প্রদায়ের সমাবেশ, সেই ভারতবর্ষের সকলের জন্যই এখানে স্থান প্রশস্ত হবে, সকলেই এখানে আতিথ্যের অধিকার পাবে,এখানে পরস্পরের সম্মিলনের মধ্যে কোনো বাধা, কোনো আঘাত থাকবে না, এই সংকল্প আমার মনে ছিল। তখন একান্ত মনে এই ইচ্ছা করেছিলেম যে ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই আমরা বন্ধনের রূপ দেখতে পাই, কিন্তু এখানে আমরা মুক্তির রূপকেই যেন স্পষ্ট দেখি।

তার পর অসংখ্য অভাব দৈন্য বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়ে দুর্গম পথে একে বহন করে এসেছি। এর অন্তর্নিহিত সত্য ক্রমে আপনার আবরণ মোচন করতে করতে আজ আমাদের সামনে অনেকটা পরিমাণে সুস্পষ্টরূপ ধারণ করেছে। আমাদের আনন্দের দিন এল।

এই কর্মানুষ্ঠানটিকে বহুকাল একলা বহন করার পর যেদিন সকলের হাতে সমর্পণ করলুম সেদিন মনে এই দ্বিধা এসেছিল যে, সকলে একে শ্রদ্ধা করে গ্রহণ করবেন কি না। অন্তরায় অনেক ছিল, এখনো আছে। তবুও সংশয় ও সঙ্কোচ থাকা সত্ত্বেও একে সম্পূর্ণভাবেই সকলের কাছে নিবেদন ক'রে দিয়েছি। কেউ যেন না মনে করেন, এটা একজন লোকের কীর্ত্তি, এবং তিনি এটাকে নিজের সঙ্গেই একান্ত করে জড়িয়ে রেখেছেন। যাকে এত দীর্ঘকাল এত করে পালন করে এসেছি, তাকে যদি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধেয় করে থাকি, সে আমার সব চেয়ে বড়ো সৌভাগ্য। সে দিন আজ এসেছে বলিনে, কিন্তু সেদিনের সূচনাও কি হয়নি? যেমন সেই প্রথম দিনে আজকের দিনের সম্ভাবনা কল্পনা করতে সাহস পাইনি, অথচ এই ভবিষ্যৎকে গোপনে সে বহন

করেছিল তেমনি ভারতবর্ষে দূর ইতিহাসে এই বিশ্বভারতীর যে পূর্ণ অভিব্যক্তি হবে তা প্রত্যয় করব না কেন ?

(৯ পৌষ, ১৩৩২, বক্তৃতা)

আপনি শান্তিনিকেতন আশ্রমে গিয়া আমাদের কাজে যোগ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এ প্রস্তাবে আমার সম্মতির অপেক্ষা রাখিবেন না। যিনি আপনার হৃদয়ে এই ইচ্ছা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার সম্মতির উপরে আমি কি কথা কহিতে পারি ? আমাদের সাধনার ক্ষেত্রে আপনাকে আমরা পাইব এবং আপনার সঙ্গে একাসনে বসিতে পারিব ইহাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। আমি একান্ত শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিয়া আপনাকে আমাদের মধ্যে গ্রহণ করিলাম। আমাদের অনেক দৈন্য ও দুর্ব্বলতা দেখিতে পাইবেন—আপনার অন্তরের প্রেমের দ্বারা সমস্ত পূরণ করিয়া লইবেন—সর্বদা আমাদের ক্ষমা করিবেন—যেখানে আমাদের অপরাধ দেখিবেন সেখানে আমাদিগকে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যে শক্তির দ্বারা আপনি পরকে আপন ও বিদেশকে স্বদেশ করিতে পারিয়াছেন সেই শক্তি আমাদের চিত্তে সঞ্চার করিবেন। আমাদের হৃদয়কে আপনি জিতিয়া লইয়াছেন সেই হৃদয়কে আপনার হৃদয়ের সৌন্দর্য দিয়া ভূষিত করিয়া তুলিবেন। তাঁহার পশ্চিম তীরের সেবককে ঈশ্বর পূর্বতীরে পাঠাইয়াছেন, পশ্চিম সাগরের পুণ্য তীর্থজলে আমাদের অভিষেক করিবার ভার আপনি পাইয়াছেন এই কথা স্মরণ করিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ৬ অগস্ট ১৯১৩, লণ্ডন

(W. W. Pearson-কে লিখিত)

Calcutta
November 12th, 1914

Our school is a living body. The smallest of us must feel that all its problems are his own ; that we must give, in order to

gain. Even the little boys should not be kept entirely ignorant of our difficulties. They should be made proud of the fact that they also bear their own share of the responsibility.

(দীনবন্ধু C. F. Andrews কে লিখিত)

Agra, December 5th, 1914

I was surprised to read in the "Modern Review" that our Bolpur boys are going without their sugar and *ghee* in order to open a relief fund. Do you think this is right? In the first place, it is an imitation of your English schoolboys and not their own original idea. In the second place, so long as the boys live in our institution they are not free to give up any portion of their diet which is absolutely necessary for their health. For any English boy, who takes meat and an amount of fat with it, giving up sugar is not injurious. But for our boys in Santiniketan, who can get milk only in small quantities, and whose vegetable meals contain very little fat ingredients, it is mischievous. Our boys have no right to choose this form of self-sacrifice— just as they are not free to give up buying books for their studies. The best form of self-sacrifice for them would be to do some hard work in order to earn money; let them take up menial work in our school— wash dishes, draw water, dig wells, fill up the tank which is a menace to their health, do their building work. This would be good in both ways. What is more, it would be a real test of their sincerity. Let the boys think out for themselves what particular works they are willing to take up without trying to imitate others.

(দীনবন্ধু C. F. Andrews কে লিখিত)

Santiniketan,
October 6th, 1918

All through this last session in the Asram, I have been taking school classes in the morning and spending the rest of the day in writing text-books. It is a kind of work apparently unsuitable for a man of my temperament. Yet I have found it not only interesting but restful. The mind has its own burden, which can be lightened when it is floated on a stream of work. Some engrossing ideas also help us in the same way. But ideas are unreliable ; they run according to no time-table whatever ; and the hours and days you spend in waiting for them grow heavy.

Lately I have come to that state of mind when I could not afford to wait for inspiration of ideas ; so I surrendered myself to some work which was not capricious, but had its daily supply of coal to keep it running. However, this teaching was not a monotonous piece of drudgery for me ; for I have been treating my students as living organisms ; and any dealing with life can never be dull.

(দীনবন্ধু C. F. Andrews কে লিখিত)

Near Paris, August 20th, 1920

We, in India, live in a narrow cage of petty interests ; we do not believe that we have wings, for we have lost our sky ; we chatter and hop and peck at one another within the small range of our obstructed opportunities. It is difficult to achieve greatness of mind and character when our responsibility is diminutive

and fragmentary, where our whole life occupies and affects an extremely limited area.

And yet through the cracks and chinks of our walls we must send out our starved branches to the sunlight and air, and the roots of our life must pierce the upper strata of our soil of desert sands till they reach down to the spring of water which is exhaustless. Our most difficult problem is how to gain our freedom of soul in spite of the cramped condition of our outward circumstances; how to ignore the perpetual insult of our destiny, so as to be able, to uphold the dignity of man.

Santiniketan is for this *tapasya* of India. We who have come there often forget the greatness of our mission, mostly because of the obscurity and insignificance with which the humanity of India seems to be obliterated. We have not the proper light and perspective in our surroundings to be able to realize that our soul is great; and therefore we behave as if we were doomed to be small for all time.

(দীনবন্ধু C. F. Andrewsকে লিখিত)

Villa Dunare
Cap Martin
Alpes Maritimes
28th August, 1920

We must know that only he can teach who can love. The greatest teachers of men have been lovers of men. This fundamental principle of education we must realise in Santiniketan. The real teaching is a gift, it is a sacrifice, it is not a manufactured article of routine work, and because it is a living thing it is the fulfilment of knowledge for the teacher himself. Let us

not insult our mission by allowing us to become mere schoolmasters, the dead feeding bottles of lessons for children who need human touch lovingly associated with their mental food.

We have seen in Tiretta Bazar thirty or more birds packed in one single cage, where they neither can sing nor soar in the sky, but make noise and peck at each other. Such a cage we build for our souls with our petty thoughts and selfish ambitions and then spend our life quarrelling with each other clamouring and scrambling for small advantages. But let us bring freedom of soul into Santiniketan.

(দীনবন্ধু C. F. Andrews কে লিখিত)

New York,
December 13th, 1920

Our Seventh Paus Festival at the Asram is near at hand. I cannot tell you how my heart is thirsting to join you in your festival.

In this country I live in the dungeon of the Castle of Bigness. My heart is starved. Day and night I dream of Santiniketan, which blossoms like a flower in the atmosphere of the unbounded freedom of simplicity. I know how truly great Santiniketan is, when I view it from this land.

(দীনবন্ধু C. F. Andrews কে লিখিত)

New York,
December 13, 1920

Yesterday some Santiniketan photographs came by chance into my hands. I felt as if I was suddenly wakened up from a Brobdingnagian nightmare. I sang to myself "আমাদের শান্তি-

নিকেতন". It is আমাদের because it has not been manufactured by machine. It is truth itself— the truth which loves to be simple because it is great.

(দীনবন্ধু C. F. Andrews কে লিখিত)

New York,
January 23rd, 1921

What has made us love Santiniketan so deeply is the ideal of perfection, which we have tasted all through its growth. It has not been made by money, but by our love, our life. With it we need not strain for any result ; it is fulfilment itself in the life which forms round it, the service which we daily render it. Now I realize more than ever before, how precious and how beautiful is the simplicity of our Asram, which can reveal itself all the more luminously because of its background of material poverty and want.

(দীনবন্ধু C. F. Andrews কে লিখিত)

আজ প্রায় চল্লিশ বছর হোলো শিক্ষা ও পল্লীসংস্কারের সংকল্প মনে নিয়ে পদ্মাতীর থেকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে আমার আসন বদল করেছি। আমার সম্বল ছিল স্বল্প, অভিজ্ঞতা ছিল সংকীর্ণ, বাল্যকাল থেকেই একমাত্র সাহিত্য-চর্চায় সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলেম।

কর্ম-উপলক্ষ্যে বাংলা পল্লীগ্রামের নিকট-পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘটেছিল। পল্লীবাসীদের ঘরে পানীয় জলের অভাব স্বচক্ষে দেখেছি, রোগের প্রভাব ও যথোচিত অন্নের দৈন্য তাদের জীর্ণ দেহ ব্যাপ্ত করে লক্ষ্যগোচর হয়েছে। অশিক্ষায় জড়তাপ্রাপ্ত মন নিয়ে তারা পদে পদে কী রকম প্রবঞ্চিত ও পীড়িত হয়ে থাকে তার প্রমাণ বার বার পেয়েছি। সেদিনকার নগরবাসী

ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন রাষ্ট্রিক প্রগতির উজান পথে তাঁদের চেষ্টা-চালনায় প্রবৃত্ত ছিলেন তখন তাঁরা চিন্তাও করেননি যে, জনসাধারণের পুঞ্জীভূত নিঃসহায়তার বোঝা নিয়ে অগ্রসর হবার আশার চেয়ে তলিয়ে যাবার আশঙ্কাই প্রবল।

একদা আমাদের রাষ্ট্রযজ্ঞ ভঙ্গ করবার মতো একটা আত্মবিপ্লবের দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল। তখন আমার মতো অনধিকারীকেও অগত্যা পাবনা প্রাদেশিক রাষ্ট্রসংসদের সভাপতিপদে বরণ করা হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে তখনকার অনেক রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো প্রধানদের বলেছিলেম দেশের বিরাট জনসাধারণকে অন্ধকার নেপথ্যে রেখে রাষ্ট্ররঙ্গভূমিতে যথার্থ আত্মপ্রকাশ চলবে না। দেখলুম সে-কথা স্পষ্ট ভাষায় উপেক্ষিত হোলো। সেইদিনই আমি মনে মনে স্থির করেছিলুম কবিকল্পনার পাশেই এই কর্তব্যকে স্থাপন করতে হবে, অন্যত্র এর স্থান নেই।

তার অনেক পূর্বেই আমার অল্প সামর্থ্য এবং অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে পল্লীর কাজ আরম্ভ করেছিলুম। তার ইতিহাসের লিপি বড়ো অক্ষরে ফুটে উঠতে সময় পায়নি। সে-কথার আলোচনা এখন থাক্।

আমার সেদিনকার মনের আক্ষেপ কেবল যে কোনো কোনো কবিতাতেই প্রকাশ করেছিলুম তা নয়, এই লেখনীবাহন কবিকে অকস্মাৎ টেনে এনেছিল দুর্গম কাজের ক্ষেত্রে। দরিদ্রের একমাত্র শক্তি ছিল মনোরথ। খুব বড়ো একটা চাষের ক্ষেত্র পাব এমন আশাও ছিল না, কিন্তু বীজবপনের একটুখানি জমি পাওয়া যেতে পারে এটা অসম্ভব মনে হয় নি।

বীরভূমের নীরস কঠোর জমির মধ্যে সেই বীজবপন কাজের পত্তন করেছিলুম। বীজের মধ্যে যে-প্রত্যাশা, সে থাকে মাটির নিচে গোপনে। তাকে দেখা যায় না ব'লেই তাকে সন্দেহ করা সহজ। অন্তত তাকে উপেক্ষা করলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। বিশেষত আমার একটা দুর্নাম ছিল আমি ধনী সন্তান, তার চেয়ে দুর্নাম ছিল আমি কবি। মনের ক্ষোভে অনেকবার ভেবেছি যাঁরা ধনীও নন কবিও নন, সেই সব যোগ্য-ব্যক্তিরা আজ আছেন কোথায়। যাই হোক অজ্ঞাতবাস পর্বটাই বিরাটপর্ব।

বহুকাল বাইরে পরিচয় দেবার চেষ্টাও করিনি। করলে তার অসম্পূর্ণ নির্ধন রূপ অশ্রদ্ধেয় হোত।

কর্মের প্রথম উদ্যোগকালে কর্মসূচী আমার মনের মধ্যে সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট ছিল না। বোধ করি আরম্ভের এই অনির্দিষ্টতাই কবিস্বভাবসুলভ। সৃষ্টির আরম্ভমাত্রই অব্যক্তের প্রান্তে। অবচেতন থেকে চেতনলোকে অভিব্যক্তিই সৃষ্টির স্বভাব। নির্মাণকার্যের স্বভাব অন্য রকম। প্ল্যান থেকেই তার আরম্ভ, আর বরাবর সে প্ল্যানের গা ঘেঁষে চলে। একটু এদিক ওদিক করলেই কানে ধ'রে তাকে শায়েস্তা করা হয়। যেখানে প্রাণশক্তির লীলা সেখানে আমি বিশ্বাস করি স্বাভাবিক প্রবৃদ্ধিকে। আমার পল্লীর কাজ সেই পথে চলেছে, তাতে সময় লাগে বেশি কিন্তু শিকড় নামে গভীরে।

প্ল্যান ছিল না বটে কিন্তু দুটো একটা সাধারণ নীতি আমার মনে ছিল, সেটা একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমার 'সাধনা' যুগের রচনা যাঁদের কাছে পরিচিত তাঁরা জানেন, রাষ্ট্রব্যবহারে পরনির্ভরতাকে আমি কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেছি। স্বাধীনতা পাবার চেষ্টা করব স্বাধীনতার উলটো পথ দিয়ে এমনতরো বিড়ম্বনা আর হোতে পারে না।

এই পরাধীনতা বলতে কেবল পরজাতির অধীনতা বোঝায় না। আত্মীয়ের অধীনতাতেও অধীনতার গ্লানি আছে। আমি প্রথম থেকেই এই কথা মনে রেখেছি যে, পল্লীকে বাইরে থেকে পূর্ণ করবার চেষ্টা কৃত্রিম, তাতে বর্তমানকে দয়া ক'রে ভাবীকালকে নিঃস্ব করা হয়। আপনাকে আপন হ'তে পূর্ণ করবার উৎস মরুভূমিতেও পাওয়া যায়, সেই উৎস কখনো শুষ্ক হয় না। পল্লীবাসীদের চিত্তে সেই উৎসেরই সন্ধান করতে হবে। তার প্রথম ভূমিকা হচ্ছে তারা যেন আপন শক্তিকে এবং শক্তির সমবায়কে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসের উদ্বোধনে আমরা যে ক্রমশ সফল হচ্ছি তার একটা প্রমাণ আছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে সম্মিলিত আত্মচেষ্টায় আরোগ্য বিধানের প্রতিষ্ঠা।

এই গেল এক, আর-একটা কথা আমার মনে ছিল, সেটাও খুলে বলি।

সৃষ্টিকাজে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে

পৃথক এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরি পরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দ-উৎসেরও সেই দশা। সেইজন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসারা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে-প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না— একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়। আমাদের দেশের যে সকল নকল বীরেরা জীবনের আনন্দপ্রকাশের প্রতি পালোয়ানের ভঙ্গীতে ভ্রূকুটি করে থাকেন, তাকে বলেন শৌখিনতা, বলেন বিলাস, তাঁরা জানেন না— সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে-আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীর জাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়, তাদের গৌরব এই যে, অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দরূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি।

আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্ক চিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানাদিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এইরূপ সৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।

একটা দৃষ্টান্ত দিই। কাছের কোনো গ্রামে আমাদের মেয়েরা সেখানকার মেয়েদের সূচিশিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁদের কোনো একজন ছাত্রী একখানি কাপড়কে সুন্দর করে শিল্পিত করেছিল। সে গরিব ঘরের মেয়ে। শিক্ষয়িত্রীরা মনে করলেন, ঐ কাপড়টি যদি তাঁরা ভালো দাম দিয়ে কিনে নেন তাহলে তার উৎসাহ হবে এবং উপকার হবে। কেনবার প্রস্তাব শুনে মেয়েটি বললে, এ আমি বিক্রি করব না। এই যে আপন মনের সৃষ্টির

আনন্দ যার দাম সকল দামের বেশি, একে অকেজো বলে উপেক্ষা করব না কি। এই আনন্দ যদি গভীরভাবে পল্লীর মধ্যে সঞ্চার করা যায় তাহলেই তার যথার্থ আত্মরক্ষার পথ করা যায়। যে-বর্বর কেবলমাত্র জীবিকার গণ্ডিতে বাঁধা, জীবনের আনন্দ প্রকাশে যে অপটু, মানবলোকে তার অসম্মান সকলের চেয়ে শোচনীয়।

আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি, কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা বলে মনে করিনি। আমরা জানি যে-গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চচূড়ায় উঠেছিল, তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসাম্যের অপরূপ উৎকর্ষ কেবল বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে। এখনো আমাদের দেশে অকৃত্রিম পল্লীহিতৈষী অনেক আছেন যাঁরা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লীর প্রতি কর্তব্যকে সংকীর্ণ করে দেখেন। তাঁদের পল্লীসেবার বরাদ্দ কৃপণের মাপে, অর্থাৎ তাঁদের মনে যে-পরিমাণ দয়া সে-পরিমাণ সম্মান নেই। আমার মনের ভাব তার বিপরীত। স্বচ্ছলতার পরিমাপে সংস্কৃতির পরিমাপ একেবারে বর্জনীয়। তহবিলের ওজনদরে মনুষ্যত্বের সুযোগ বণ্টন করা বণিগ্‌বৃত্তির নিকৃষ্টতম পরিচয়। আমাদের অর্থসামর্থ্যের অভাববশত আমার ইচ্ছাকে কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রচলিত করতে পারিনি— তা ছাড়া যাঁরা কর্ম করেন তাঁদেরও মনোবৃত্তিকে ঠিকমতো তৈরি করতে সময় লাগবে। তার পূর্বে হয়তো আমারও সময়ের অবসান হবে, আমি কেবল আমার ইচ্ছা জানিয়ে যেতে পারি।

যাঁরা স্থূল পরিমাণের পূজারী, তাঁরা প্রায় বলে থাকেন যে, আমাদের সাধনক্ষেত্রের পরিধি নিতান্ত সংকীর্ণ, সুতরাং সমস্ত দেশের পরিমাণের তুলনায় তার ফল হবে অকিঞ্চিৎকর। একথা মনে রাখা উচিত— সত্য প্রতিষ্ঠিত আপন শক্তিমহিমায়, পরিমাণের দৈর্ঘ্যে প্রস্থে নয়। দেশের যে-অংশকে আমরা সত্যের দ্বারা গ্রহণ করি সেই অংশেই অধিকার করি সমগ্র ভারতবর্ষকে। সূক্ষ্ম একটি সলতে যে-শিখা বহন করে, সমস্ত বাতির জ্বলা সেই সলতেরই মুখে।

আজকের দিনের প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতনের একটিমাত্র বিশেষ

কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেওয়া হোলো। এই চেষ্টা ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়েছে এবং ক্রমশ পল্লবিত হচ্ছে। চারিদিকের গ্রামের সহযোগিতার মধ্যে একে পরিব্যাপ্ত করতে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে সময় লেগেছে, আরো লাগবে। তার কারণ আমাদের কাজ কারখানাঘরের নয়, জীবনের ক্ষেত্রে এর অভ্যর্থনা। অর্থ না হোলে একে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয় বলেই আমরা আশা করি এই-সকল শিল্পকাজ আপনি উৎকর্ষের দ্বারাই কেবল যে সম্মান পাবে তা নয়, আত্মরক্ষার সম্বল লাভ করবে।

সবশেষে তোমাদের কাছে আমার চরম আবেদন জানাই। তোমরা রাষ্ট্রপ্রধান। একদা স্বদেশের রাজারা দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সহায়ক ছিলেন। এই ঐশ্বর্য কেবল ধনের নয়, সৌন্দর্যের। অর্থাৎ কুবেরের ভাণ্ডার এর জন্যে নয়, এর জন্যে লক্ষ্মীর পদ্মাসন।

তোমরা স্বদেশের প্রতীক। তোমাদের দ্বারে আমার প্রার্থনা, রাজার দ্বারে নয়, মাতৃভূমির দ্বারে। সমস্ত জীবন দিয়ে আমি যা রচনা করেছি, দেশের হয়ে তোমরা তা গ্রহণ করো। এই কার্যে এবং সকল কার্যেই দেশের লোকের অনেক প্রতিকূলতা পেয়েছি। দেশের সেই বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই ব'লে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে-কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি তোমাদের এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো এ-কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা। পরীক্ষায় যদি প্রসন্ন হও তাহলে আনন্দিত মনে এর রক্ষণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো, যেন একদা আমার মৃত্যুর তোরণদ্বার দিয়েই প্রবেশ ক'রে তোমাদের প্রাণশক্তি একে শাশ্বত আয়ু দান করতে পারে।

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(শ্রীনিকেতন শিল্প উদ্বোধনের অভিভাষণ)

একসময়ে আমাদের গ্রামে উচ্চনীচ ছিল, পণ্ডিত মূর্খে, ধনী নির্ধনে, প্রভু ভৃত্যে প্রভেদ ছিল, কিন্তু পরস্পরের সুখদুঃখে পরস্পরের দৃষ্টি ছিল, পরস্পর সম্মিলিত হয়ে একত্রীভূত জীবনযাত্রা যাপন করত— পালপার্বণ পূজার্চনা প্রতিদিন নানারকমে তাঁরা একত্র হতেন— জ্ঞানী-অজ্ঞান ধনীনির্ধনের মধ্যে রাস্তা তখন খোলা ছিল। পল্লীই তখন দেশের সব, শহর নগণ্য ছিল বলতে পারিনে কিন্তু গৌণ ছিল। পল্লীতে পল্লীতে তখন কত ধনী মানী পণ্ডিত বাস করতেন, তাঁরা হয়তো শহরে নবাবের দরবারে যেতেন কিন্তু টাকা এনেছেন পল্লীতে, পণ্ডিত পল্লীতে টোল খুলে বিদ্যাদান করেছেন, ধনী অতিথিসেবা করেছেন, গ্রামের লোক নিয়ে এরকম নানা অনুষ্ঠান হয়েছে, গ্রামেই তখন প্রাণের প্রতিষ্ঠা ছিল।

আজ ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসায় দেশ উচ্ছন্ন গেল, মিথ্যা মোকদ্দমায় দেশকে মেরে ফেললে— আর দুর্নীতির বিষ গ্রামের ভিত্তিতে শিকড় গেড়েছে— যা পুণ্যশক্তি যা মহৎ তা চলে গেছে, ধর্ম যা ধারণ করে শ্রেয়কে প্রকাশ করে তা চলে গেছে। শহরে তবু জীবনযাত্রার কিছু সুবিধা আছে, গ্রামে তাও নেই, সকলের বিপদে আপদে আত্মীয়তাও দূর হয়েছে। জমিদার তখন পরম আশ্রয় ছিলেন, এখন প্রবল শত্রু। কল্যাণের সম্বন্ধ দূর হয়েছে, শহরে বাস করেন, আছেন টাকা নেবার বেলায়। মানুষের হৃদয়ের যোগ লোভে পাপে দুর্বলতায় কলুষিত হয়েছে। গ্রামের লোকদের আজ আর কোনো উপায় নেই। এক-মাত্র বাঁচার উপায় এই কথা জানা যে, বিচ্ছেদেই শক্তিক্ষয়, মানবসম্বন্ধকে স্বীকার করে মিলিত হোতে পারলেই রোগতাপ দৈন্য যাবে। একথা বুঝতে সময় লাগবে, কিন্তু একদিন একথা তোমাদের বুঝতেই হবে। বাইরে থেকে তোমরা কোনো আনুকূল্য প্রত্যাশা কোরো না, তোমাদের মিলিত শক্তি তোমাদের যতক্ষণ না জাগাবে ততদিন এমন শক্তিমান কেউ নেই যে বাইরে থেকে তোমাদের জাগাবে।

এই সাধনা নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, যথাসাধ্য কিছু আয়োজন করেছি। বাইরে থেকে তোমাদের কোনো উপকার করব বলে আসিনি। সে-চেষ্টা যদি করি তবে তোমাদের ক্ষতিই করব, দুর্বল করব। তোমাদের

নিজের শক্তি জাগরূক হোক, এই আমাদের লক্ষ্য। আমরা কে যে তোমাদের উপকার করব? তফাত হয়েই যত অকল্যাণ— যতদিন আমরা উপকার করব তোমরা উপকার নেবে, ততদিনই তফাত থাকবে, ততদিনই অকল্যাণ। একদিন আসবে যখন তোমরাই দেশকে বাঁচাবে— তারি আয়োজন আমরা কিছু করেছি, তোমরা এতে যোগ দাও— প্রার্থীভাবে নয়, কৃতীভাবে, সহযোগী হয়ে, সার্থক হবে তাহলে সকল কর্ম-অনুষ্ঠান। এতে গ্রামে যে শান্তি জাগবে তা সমস্ত পৃথিবীকে ঐশ্বর্যবান করবে! তোমাদের গীতে গানে কর্মে অনুষ্ঠানে শক্তি সম্মিলিত না করলে নয়। দুই পক্ষ মিলে, এক পক্ষকে বাহন করে নয়, রোগতাপ অজ্ঞান অশান্তি দূর করতে হবে। আমরা বলতে এসেছি, তোমাদের সমস্ত শক্তি একত্র করো, তাহলে আমরা ধন্য হব। সমস্ত দেশকে তোমরা ভারগ্রস্ত করেছ— তোমরা যারা আপনাকে প্রকাশিত করতে পারলে না। যতক্ষণ না তোমরা জাগবে ততক্ষণ তোমরা ভার, ভারতবর্ষের বুকে জগদ্দল শিলা। সকলের হয়ে দেশের হয়ে বলি, তোমাদের জাগতে হবে, শক্তিশালী সম্পৎশালী হোতে হবে— আত্মীয়তার যোগে মানুষে মানুষে সম্বন্ধ সত্য হোক, এই আমাদের কামনা।

(নবম বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণ)

বসন্তের বাণী অরণ্যের সব জায়গাতেই প্রবাহিত হচ্ছে দক্ষিণ সমীরণে; যে-গাছের অন্তরে রসের ধারা আছে বসন্তের রস-উৎসবের নিমন্ত্রণে সে পত্রপুষ্পে বিকশিত হয়ে উঠে। বিশ্বপ্রাণের আহ্বানে যখন বিশেষ প্রাণের মধ্যে তরঙ্গ ওঠে তখনই তো উৎসব।

আমাদের দেশেও নিয়ত ডাক পড়েছে, দৈববাণী আকাশে বাতাসে নিয়তই নিশ্বসিত। যেখানে সে-বাণী সাড়া পায়, প্রাণ জেগে ওঠে, সেখানেই আমাদের উৎসবক্ষেত্র রচিত হয়, সৃষ্টিকার্যের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্ত আপনাকে উপলব্ধি করতে থাকে। আমাদের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে এক-দিন এই আহ্বানধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেই আহ্বানকে যে-পরিমাণে স্বীকার করা হয়েছে, সেই পরিমাণে আমাদের সকলকে উপলক্ষ্য ক'রে সৃষ্টির সূচনা হোলো। কোথায় যে তার শেষ, তা কেউ বলতে পারে না।

শান্তিনিকেতনের কাজের মধ্যেও আমার মনে আর-একটি ধারা

বইছিল। শিলাইদা পতিসর এই সব পল্লীতে যখন বাস করতুম, তখন আমি প্রথম পল্লীজীবন প্রত্যক্ষ করি। তখন আমার ব্যবসায় ছিল জমিদারি। প্রজারা আমার কাছে তাদের সুখদুঃখ, নালিশ আবদার নিয়ে আসত। তার ভিতর থেকে পল্লীর ছবি আমি দেখেছি। একদিকে বাইরের ছবি, নদী, প্রান্তর, ধানখেত, ছায়াতরুতলে তাদের কুটির ; আর-এক দিকে তাদের অন্তরের কথা। তাদের বেদনাও আমার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পৌঁছত। তখন আমি যে জমিদারি ব্যবসায় করি, নিজের আয়ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিকবৃত্তি ক'রে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল। তার পর থেকে চেষ্টা করতুম, কী করলে এদের মনের উদ্বোধন হয়, আপনাদের দায়িত্ব এরা আপনি নিতে পারে।

এই সব কথাই যখন ভেবে দেখলুম, তখন এর কোনো উপায় ভেবে পেলুম না। যারা বহু যুগ থেকে এই রকম দুর্বলতার চর্চা করে এসেছে, যারা আত্মনির্ভরে একেবারেই অভ্যস্ত নয় তাদের উপকার করা বড়োই কঠিন। তবুও আরম্ভ করেছিলুম কাজ।

এই কাজে আমার বন্ধু এল্‌ম্‌হার্স্ট আমাকে খুব সাহায্য করেছেন। তিনিই এই জায়গাকে একটি স্বতন্ত্র কর্মক্ষেত্র করে তুললেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে একে জড়িয়ে দিলে ঠিক হোত না। এল্‌ম্‌হার্স্টের হাতে এর কাজ অনেকটা এগিয়ে গেল।

আমি তাই যারা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো ক'রে যা-হয় একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ, একে দূর করে জ্ঞানবিজ্ঞান কি পল্লী কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে, সর্বসাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূত প্রেত ওঝা তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষার একটুখানি যে-কোনো রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এরকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি। এই অসম্মান জন্মায় শিক্ষার ভেদ থেকে, মন অহংকৃত হয়, বলে,— ওরা চালিত হবে, আমরা চালনা করব, দূর থেকে উপর থেকে।

গ্রামের কাজের দুটো দিক আছে। কাজ এখান থেকে করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাও করতে হবে। এদের সেবা করতে হোলে শিক্ষা করা চাই।

বিদেশীদের দোষ দিই বৃথা। দেশের লোককে সম্মান দিতে পারিনি, সেই মূঢ়তাই আমাদের চেপে রেখেছে। একত্র হৃদয় দিয়ে দাঁড়াতে পারলে এ দুর্ভাগ্য হোত না। আজ অবনত কারা ? আমরা কি উন্নত— এই শিক্ষিত-সমাজ আমরা ? বিদেশীর লাথিঝাঁটা কঠোরভাবে আমাদের উপর পড়ছে; ওদের কাছে আমরা অবনত। তাই সকলের সঙ্গে আমরা সমান অনুন্নত, সমান দুঃখ অপমান আমরা পেয়ে এসেছি। আজ সময় এসেছে, যে-অপমান দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পরিব্যাপ্ত, সেই অপমানকে ঝেড়ে ফেলে পরস্পরকে ভাই ব'লে বুকে তুলে নিতে হবে। এসো, একত্রে কাজ করি।

সং বো মনাংসি সংব্রতা সমাকূতীর্ণ মামসি।
অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি॥

এই ঐক্য যাতে স্থাপিত হয়, তারই জন্যে অক্লান্ত চেষ্টা চাই। ঘরে ঘরে কত বিরোধ। বিচ্ছিন্নতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমাদের ঐশ্বর্যকে আমরা ধূলিস্খলিত করে দিয়েছি। সর্বনেশে ছিদ্রগুলোকে রোধ করতে হবে আপনার সব কিছু দিয়ে।

আমরা পরবাসী। দেশে জন্মালেই দেশ আপন হয় না। যতক্ষণ দেশকে না জানি, যতক্ষণ তাকে নিজের শক্তিতে জয় না করি, ততক্ষণ সে-দেশ আপনার নয়। আমার দেশ আর-কেউ আমাকে দিতে পারবে না। নিজের সমস্ত ধন-মন-প্রাণ দিয়ে দেশকে যখনি আপনার ব'লে জানতে পারব, তখনি দেশ আমার স্বদেশ হবে। পরবাসী স্বদেশে যে ফিরেছি তার লক্ষণ এই যে, দেশের প্রাণকে নিজের প্রাণ ব'লেই জানি। পাশেই প্রত্যক্ষ মরছে দেশের লোক রোগে উপবাসে, আর আমি পরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে মঞ্চের উপর চ'ড়ে দেশাত্মবোধের বাগ্‌বিস্তার করছি, এত বড়ো অবাস্তব অপদার্থতা, আর কিছু হোতেই পারে না।

আমরা বিশেষ ক'রে এই ঘোষণা করছি যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে অবিরোধে একব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন, তেমনি আবার

দারিদ্র্যও ব্যাধিকে পালন করে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা যেন সবলে বলতে পারে, আমরা পারি, রোগ দূর আমাদের অসাধ্য নয়। যাদের মনের তেজ আছে তারা দুঃসাধ্য রোগকে নির্মূল করতে পেরেছে, ইতিহাসে তা দেখা গেল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না। আত্মঘাত এবং আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সমস্ত চেষ্টাকে যদি উদ্যত না করি, অত্যকার বহু দুঃখ বহু অবমাননার শিক্ষা যদি ব্যর্থ হয় তবে মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আমাদের জন্য নিত্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে যে-পর্যন্ত আমাদের জীর্ণ হাড়-কখানা ধুলার মধ্যে মিশিয়ে না যায়।

দেশের মধ্যে যে প্রাণশক্তি মূর্ছিত হয়ে পড়েছে, তাকে সতেজ করবার সংকল্প আমাদের। এই প্রাণের দৈন্যই আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো অপমান —বাইরের অপমান তারই আনুষঙ্গিক।

চোখ বুজে অনেক তুচ্ছ বিষয়ে আমরা বিদেশীর অনেক নকল করেছি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড়ো বিষয়ে ওদের অনুবর্তন করতে হবে,— কোমর বেঁধে বলতে চাই কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হোলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব। আমাদের অতি ক্ষুদ্র সম্বল যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবেই। বিদেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে, সব তার ঠেকাবার শক্তি আমাদের হাতে এখন নেই, কিন্তু একান্ত চেষ্টায় যতটা রক্ষা করা সম্ভব তাতে যদি শৈথিল্য করি তবে সে-অপরাধের ক্ষমা নেই।

দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজেরা ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন ক'রে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা।

এখনকার কালের সাধনা লোকালয়কে আবার সমগ্র ক'রে তোলা। বিশিষ্টে সাধারণে, শক্তিতে সৌহার্দে, শহরে গ্রামে মিলিয়ে সম্পূর্ণ করা। নিজেকে পঙ্গু ক'রে ভালো হবার সাধনা কাপুরুষতার সাধনা। মানুষের শক্তি নানাদিকে বিকাশ খোঁজে, তার কোনো একটিকে অবজ্ঞা করবার অধিকার আমাদের নেই।

মানুষ একদিন যেমন হাল-লাঙলকে, চরকা-তাঁতকে, তীর-ধনুককে, চক্রবান যানবাহনকে গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল, আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেইরকম করতে হবে। যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে, যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোনোমতেই পেরে উঠবে না। যে-কারণে চার-পা-ওয়ালা জীব দুই-পা-ওয়ালা জীবের সঙ্গে পেরে ওঠেনি, এও সেই একই কারণ।

আজকের দিনে যন্ত্রের সাহায্যে একজন লোক ধনী, আর হাজার লোক তার ভৃত্য, এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যন্ত্রের দ্বারা একজন লোক হাজার লোকের চেয়ে শক্তিশালী হয়। সেটাতে যদি দোষ থাকে তবে বিদ্যা-অর্জনেও দোষ আছে। বিদ্যার সাহায্যে বিদ্বান অনেক বেশি শক্তিশালী হয় অবিদ্বানের চেয়ে। এ স্থলে এই কথাই বলতে হবে, যন্ত্র এবং তার মূলীভূত বিদ্যায় যে-প্রভূত শক্তি উৎপন্ন হয় সেটা ব্যক্তি বা দলবিশেষে সংহত না হয়ে যেন সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। শক্তি ব্যক্তিবিশেষে একান্ত হয়ে উঠে মানুষকে যেন বিচ্ছিন্ন না করে— শক্তি যেন সর্বদাই নিজের সামাজিক দায়িত্ব স্বীকার করতে পারে।

বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনি সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরম যুগের আবাহন এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে, তোমার এ-শক্তি অক্ষয় হোক, কর্মের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক। মানুষের শক্তি দৈবশক্তি, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নাস্তিকতা। মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই।

এইটেই আমাদের শ্রীনিকেতনের বাণী। আমাদের ফসল-ক্ষেত্রে কিছু বিলিতি বেগুন কিছু আলু ফলিয়েছি, চিরকেলে তাঁত চালিয়ে গোটাকতক শতরঞ্জ বুনিয়েছি,— আমাদের বাঁচবার পক্ষে এই যথেষ্ট নয়। যে বড়ো শক্তিকে আমাদের পক্ষভুক্ত করতে পারিনি সেই আমাদের পক্ষে দানবশক্তি, আজকের এই অল্প কিছু সংগ্রহ যা আমাদের সামনে রয়েছে, সেই দানবের সঙ্গে লড়াই করবার যথোচিত উপকরণ তা নয়।

উপনিষদ বলেন, যিনি এক তিনি 'বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি'—

নানাজাতির লোককে তাদের নিহিতার্থ দান করেন। নিহিতার্থ,—অর্থাৎ প্রজারা যা চায় প্রজাপতি সেটা তাদের অন্তরে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। মানুষকে সেটা আবিষ্কার করে নিতে হয়, তাহলেই দানের জিনিস তার নিজের হয়ে ওঠে। যুগে যুগে এই নিহিতার্থ প্রকাশ পেয়েছে। এই যে নিহিতার্থ তিনি দিয়েছেন, এ 'বহুধা শক্তিযোগাৎ'— বহুধা শক্তির যোগে। নিহিতার্থের সঙ্গে সেই বহুদিকগামী শক্তিকে পাই। আজকের যুগের য়ুরোপীয় সাধকেরা মানুষের সেই নিহিতার্থের একটা বিশেষ সন্ধান পেয়েছেন— তারি যোগে বিশেষ শক্তিকে পেয়েছেন। সেই শক্তি আজ বহুধা হয়ে বিশ্বকে নূতন ক'রে জয় করতে বেরিয়েছে। কিন্তু এই শক্তি এই অর্থ যাঁর, তিনি সকল বর্ণের লোকের পক্ষেই এক, একোঽবর্ণঃ। সেই শক্তির অর্থ যে-কোনো বিশেষ কালে বিশেষ জাতির কাছে ব্যক্ত হোক না কেন, তা সকল কালের সকল জাতির পক্ষেই এক। বিজ্ঞানের সত্য যে পণ্ডিত যখনই আবিষ্কার করুন, জাতিনির্বিশেষে তা এক। অতএব এই শক্তি আবিষ্কার আমাদের সকলকে এক করবার সহায়তা করে যেন। বিজ্ঞান যেখানে সত্য সেখানে বস্তুতই সে সকল জাতির মানুষকে ঐক্য দান করেছে। কিন্তু তার শক্তির ভাগাভাগি নিয়ে মানুষ হানাহানি ক'রে থাকে। সেই বিরোধ সত্যের বা শক্তির মধ্যে নয়, আমাদের চরিত্রে যে-অসত্য যে-অশক্তি তারই মধ্যে। সেইজন্যে এই শ্লোকের শেষে আছে :

সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু— তিনি আমাদের সকলকে, সকলের শক্তিকে, শুভবুদ্ধি দ্বারা যোগযুক্ত করুন।

আমরা নিজেরা অক্ষম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ, তবু সেই স্বল্প ক্ষমতা নিয়েই এই কখানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছি। বহু বৎসর অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকূল করেছি। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে যে বড়ো আদর্শ বড়ো উদ্দেশ্য আছে তার কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই, এই মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখতে পারি।

এই কখানা গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করতে হবে— সকলে শিক্ষা পাবে, গ্রাম জুড়ে আনন্দের হাওয়া বইবে, গানবাজনা কীর্তনপাঠ চলবে, আগের দিনে যেমন ছিল। তোমরা কেবল কখানা গ্রামকে এই ভাবে তৈরি করে

দাও। আমি বলব এই কখানা গ্রামই আমার ভারতবর্ষ। তাহলেই প্রকৃতভাবে ভারতকে পাওয়া যাবে।

(শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের অভিভাষণসমূহ থেকে সংকলিত)

আমাদের শাস্ত্রে বলে ছটি রিপুর কথা— কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য। তাকেই রিপু বলে যাতে আত্মবিস্মৃতি আনে। এমনি করে নিজেকে হারানোই মানুষের সর্বনাশ করে, এই রিপুই জাতির পতন ঘটায়। এই ছটি রিপুর মধ্যে চতুর্থটির নাম মোহ। সে অন্ধতা আনে দেশের চিত্তে, অসাড়তা আনে তার প্রাণে, নিরুদ্যম করে দেয় তার আত্মকর্তৃত্বকে। মানবস্বভাবের মূলে যে সহজাত শক্তি আছে তার প্রতি বিশ্বাস সে ভুলিয়ে দেয়। এই বিহ্বলতার নামই মোহ। আর এই মোহেরই উল্‌টো হচ্ছে মদ— অহংকারের মত্ততা। মোহ আমাদের আত্মশক্তিতে বিস্মৃতি আনে, আমরা যা তার চেয়ে নিজেকে হীন করে দেখি; আর গর্ব, সে আপনাকে অসত্যভাবে বড়ো করে তোলে। এ-জগতে অনেক অভ্যুদয়শালী মহাজাতির পতন হয়েছে অহংকারে অন্ধ হয়ে। স্পর্ধার বেগে তারা সত্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে। আমাদের মরণ কিন্তু উল্‌টো পথে— আমাদের আচ্ছন্ন করেছে অবসাদের কুয়াশায়।

একটা অবসাদ এসে আমাদের শক্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে। এককালে আমরা অনেক কর্ম করেছি, অনেক কীর্তি রেখেছি, সে-কথা ইতিহাস জানে। তারপর কখন অন্ধকার ঘনিয়ে এল ভারতবাসীর চিত্তে, আমাদের দেহে-মনে অসাড়তা এনে দিলে। মনুষ্যত্বের গৌরব যে আমাদের অন্তর্নিহিত, সেটাকে রক্ষা করবার জন্যে যে আমাদের প্রাণপণ করতে হবে, সে আমাদের মনে রইল না। একেই বলে মোহ। এই মোহে আমরা নিজে মরার পথ বাধামুক্ত করেছি; তার পর যাদের আত্মম্ভরিতা প্রবল, আমাদের মার আসছে তাদেরি হাত দিয়ে। আজ বলতে এসেছি, আত্মাকে অবমানিত করে রাখা আর চলবে না। আমরা বলতে এসেছি যে, আজ আমরা নিজের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলেম। একদিন সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেম, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করেছিলেম। তখন

জলাশয়ে জল ছিল, মাঠে শস্য ছিল, তখন পুরুষকার ছিল মনে। এখন সমস্ত দূর হয়েছে। আবার একবার নিজেকে নিজের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে।

কোনো উপায় নেই, এত বড়ো মিথ্যা কথা যেন না বলি। বাহির থেকে দেখলে তো দেখা যায় কিছু পরিমাণেও বেঁচে আছি। কিছু আগুনও যদি ছাইচাপা পড়ে থাকে, তাকে জাগিয়ে তোলা যায়। একথা যদি নিশ্চেষ্ট হয়ে স্বীকার না করি, তবে বুঝব এটাই মোহ। অর্থাৎ যা নয় তাই মনে করে বসা।

একটা ঘটনা শুনেছি— হাঁটুজলে মানুষ ডুবে মরেছে ভয়ে। আচমকা সে মনে করেছিল, পায়ের তলায় মাটি নেই। আমাদেরও সেই রকম। মিথ্যে ভয় দূর করতে হবে ; যেমনি হোক পায়ের তলায় খাড়া দাঁড়াবার জমি আছে, এই বিশ্বাস দৃঢ় করব সেই আমাদের ব্রত। এখানে এসেছি সেই ব্রতের কথা ঘোষণা করতে। বাইরে থেকে উপকার করতে নয়, দয়া দেখিয়ে কিছু দান করবার জন্যে নয়। যে-প্রাণস্রোত তার আপনার পুরাতন খাত ফেলে দূরে সরে গেছে, বাধামুক্ত ক'রে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আমরা এই দেশকে আপনি জয় করিনি। দেশে অনেক জড় পদার্থ আছে, আমরা তাদেরই প্রতিবেশী। দেশ যেমন এই-সব বস্তুপিণ্ডের নয়, দেশ তেমনি আমাদেরও নয়। এই জড়ত্ব— একেই বলে মোহ। যে মোহাভিভূত, সেই তো চিরপ্রবাসী। সে জানে না সে কোথায় আছে। সে জানে না তার সত্যসম্বন্ধ কার সঙ্গে। বাইরের সহায়তার দ্বারা নিজের সত্য বস্তু কখনই পাওয়া যায় না।

রোগপীড়িত এই বৎসরে এই সভায় আজ আমরা বিশেষ করে এই ঘোষণা করছি যে, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনতে হবে অবিরোধে একব্রত সাধনার দ্বারা। রোগজীর্ণ শরীর কর্তব্য পালন করতে পারে না। এই ব্যাধি যেমন দারিদ্র্যের বাহন, তেমনি আবার দারিদ্র্যও ব্যাধিকে পালন করে। আজ নিকটবর্তী বারোটি গ্রাম একত্র করে রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এই কাজে গ্রামবাসীর সচেষ্ট মন চাই। তারা যেন সবলে বলতে পারে, আমরা পারি, রোগ দূর আমাদের অসাধ্য নয়। যাদের মনের তেজ আছে তারা দুঃসাধ্য রোগকে নির্মূল করতে পেরেছে, ইতিহাসে তা দেখা গেল।

আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না।

দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ।

দুর্বলতা অপরাধ। কেননা, তা বহুল পরিমাণে আত্মকৃত, সম্পূর্ণ আকস্মিক নয়। দেবতা এই অপরাধ ক্ষমা করেন না। অনেক মার খেয়েছি, দেবতার কাছে এই শিক্ষার অপেক্ষায়। চৈতন্যের দুটি পন্থা আছে। এক হচ্ছে মহাপুরুষদের মহাবাণী। তাঁরা মানবপ্রকৃতির গভীরতলে চৈতন্যকে উদ্বোধিত করে দেন। তখন বহুধা শক্তি সকল দিক থেকেই জেগে ওঠে, তখন সকল কাজই সহজ হয়। আবার দুঃখের দিনও শুভদিন। তখন বাহিরের উপর নির্ভরের মোহ দূর হয়, তখন নিজের মধ্যে নিজের পরিত্রাণ খুঁজতে প্রাণপণে উদ্যত হয়ে উঠি। একান্ত চেষ্টায় নিজের কাছে কী করে আনুকূল্য দাবি করতে হয়, অন্য দেশে তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাচ্ছি।

ইংলণ্ড আজ যখন দৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত তখন সে ঘোষণা করেছে, দেশের লোকে যথাসাধ্য নিজের উৎপন্ন দ্রব্যই নিজেরা ব্যবহার করবে। পথে-পথে ঘরে-ঘরে এই ঘোষণা যে, দেশজাত পণ্যদ্রব্যই আমাদের মুখ্য অবলম্বন। বহুদিনের বহুঅন্নপুষ্ট জাতের মধ্যে যখনি বেকার-সমস্যা উপস্থিত হ'ল তখনি দেশের ধন নিরন্নদের বাঁচাতে লেগেছে। এর থেকে দেখা যায় সেখানে দেশের লোকের সকলের চেয়ে বড়ো সম্পদ দেশব্যাপী আত্মীয়তা। তাদের উপরে আনুকূল্য রয়েছে সদাজাগ্রত। তাতে মনের মধ্যে ভরসা হয়। আমরা বেকার হয়ে মরছি অথচ কেউ আমাদের খবর নেবে না, এ কোনোমতেই হোতে পারে না—এই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাসে তাদের এত ভরসা। আমাদের ভরসা নেই। মারী, রোগ, দুর্ভিক্ষ জাতিকে অবসন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু প্রেমের সাধনা কই, সেবার উদ্যোগ কোথায়। যে বৃহৎ স্বার্থবুদ্ধিতে বড়ো রকম করে আত্মরক্ষা করতে হয় সে আমাদের কোথায়।

চোখ বুজে অনেক তুচ্ছ বিষয়ে আমরা বিদেশীর অনেক নকল করেছি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড়ো বিষয়ে ওদের অনুবর্তন করতে হবে,— কোমর বেঁধে বলতে চাই কিছু সুবিধার ক্ষতি, কিছু আরামের ব্যাঘাত হোলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব। আমাদের অতি ক্ষুদ্র সম্বল যথাসাধ্য

রক্ষা করতে হবেই। বিদেশে প্রভূত পরিমাণ অর্থ চলে যাচ্ছে, সব তার ঠেকাবার শক্তি আমাদের হাতে এখন নেই, কিন্তু একান্ত চেষ্টায় যতটা রক্ষা করা সম্ভব তাতে যদি শৈথিল্য করি, তবে সে-অপরাধের ক্ষমা নেই।

দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজে ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন করে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা। যথেষ্ট উদ্বৃত্ত অন্ন যদি আমাদের থাকত, অন্তত এতটুকুও যদি থাকত যাতে দেশের অজ্ঞান দূর হয়, রোগ দূর, দেশের জলকষ্ট পথকষ্ট বাসকষ্ট দূর হয়, দেশের স্ত্রীমারী, শিশুমারী দূর হতে পারত তাহলে দেশের অভাবের দিকেই দেশকে এমন একান্ত ভাবে নিবিষ্ট হোতে বলতুম না। কিন্তু আত্মঘাত এবং আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সমস্ত চেষ্টাকে যদি উদ্যত না করি, অদ্যকার বহু দুঃখ বহু অবমাননার শিক্ষা যদি ব্যর্থ হয় তবে মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আমাদের জন্যে নিত্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে যে-পর্যন্ত আমাদের জীর্ণ হাড় কখানা ধুলার মধ্যে মিশিয়ে না যায়।

(শ্রীনিকেতনে বাৎসরিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ। ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২)

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই যে বহুকাল ধরিয়া আধপেটা খাইয়া আসিতেছে, সে-কথা সকলেই জানে। আমরা যতটা খাই তাহাতে না হয় মরণ, না হয় বাঁচন। কেননা, শুধু কেবল নিশ্বাস লওয়াকেই বাঁচা বলে না। শিশুর মৃত্যুসংখ্যা আমাদের দেশে খুবই বেশি। কিন্তু যে শিশু মরে না, সে যে সম্পূর্ণ পরিমাণে বাঁচিয়া থাকিবার মতো আহার পায় না সেইটেই দুঃখ। কেবলমাত্র আর্থিক দিক হইতে যদি ইহার ফল দেখি, তবে দেখা যাইবে সর্বসমেত আমাদের দেশে কর্মশক্তি কম হওয়াতে অধিক মূল্য দিয়া অল্পফল পাই। অন্য দেশে একজন যে-কাজ করে আমাদের দেশে সে-কাজে অন্তত চার জনের দরকার হয়। ইহাতে কেবল কাজের পরিমাণ নষ্ট হয় তাহা নহে, কাজের গুণও নষ্ট হয়। কেননা, কাজের শক্তি থাকিলে সেই শক্তি খাটাইতে আনন্দ হয়, কাজে ফাঁকি দিতে সহজেই ইচ্ছা হয় না। কর্মসম্বন্ধে সেই সত্যপরতাই কাজের নৈতিক গুণ।

দেশের লোক ম্যালেরিয়ায় মরিতেছে এবং জীবন্মৃত হইয়া আছে, তাহার কারণ ঐ; শুধু বেচারা মশাকে দোষ দিলে চলিবে না। কী করিয়া আমরা বাঁচিব এ-কথা ভাবিবার নহে। কেননা কোনোমতে বাঁচার চেয়ে মরাই ভালো। কী করিয়া আমরা পুরাপুরি বাঁচিব, সেইটেই আমাদের ভাবিবার কথা। কৃশতা-বশত জীবনধারণে আমাদের সম্পূর্ণ গা নাই বলিয়া জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা গড়িমসি করিয়া ফাঁকি দিতেছি; এ-সম্বন্ধে আমরা সত্যপর হইতেছি না। ইহাতে সমস্ত দেশের বাহ্যিক ও আন্তরিক যে লোকসান হইতেছে সবসুদ্ধ জড়াইয়া যে কম কাজ হইতেছে, কম ফসল ফলিতেছে, কম বিঘ্ন কাটিতেছে, প্রাণের স্রোত কম করিয়া বহিতেছে, নিজেদের উপর আস্থা কম পড়িতেছে, অঙ্ক দিয়া কি তাহার পরিমাণ পাওয়া যায়। শরীরমনের উপবাসজাত যে অবসাদ, ভীরুতা, ঔদাসীন্য, জড়ত্ব আমাদিগকে ধূলিসাৎ করিয়া রাখিয়াছে তাহার ভার কি সামান্য।

এই-সব বিপত্তি হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য অর্থ কী করিয়া বাড়াইতে পারা যায়, সে-কথা ভাবিবার শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহারা ভাবুন, কিন্তু যতটুকু আহার্য আমাদের ভাণ্ডারে আছে, তাহার পুষ্টিকরতার বিচার করিয়া আহার সম্বন্ধে অবিলম্বে আমাদের অভ্যাস পরিবর্তন করিতে যদি পারি, তাহা হইলে একদমে অনেকটা ফল পাওয়া যাইবে।

(শান্তিনিকেতন, ১৩২৬)

একসময়ে আমি যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম আমার সুযোগ হয়েছিল কিছুকাল এক পল্লীতে এক চাষী গৃহস্থের ঘরে বাস করবার। আমি শহর-বাসী হোলেও সেখানকার পল্লীতে আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, আমি আনন্দেই ছিলুম। সেই সময়ে ইংলণ্ডের পল্লীবাসীদের মধ্যে একটা বিষয় লক্ষ করেছিলুম। দেখেছিলুম তারা সব সময়েই অসন্তুষ্ট, গ্রামের ভিতর তাদের চিত্তের সম্পূর্ণ পুষ্টি নেই, তারা কবে লণ্ডনে যাবে এইজন্য দিনরাত্রি তাদের উদ্বেগ। জিজ্ঞাসা করে বুঝলুম, য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত আয়োজন, শিক্ষা, আরোগ্যবিধান প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা সংহত বড়ো বড়ো শহরে; এইজন্য শহর গ্রামবাসীদের চিত্তকে আকর্ষণ করে, গ্রামে তারা বোধ করে বঞ্চিত।

তবে য়ুরোপে শহর ও গ্রামের এই যে ভাগ তা প্রধানত পরিমাণগত; শহরে যা বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, গ্রামে সেটা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হয় না।

য়ুরোপে নগরই সমস্ত ঐশ্বর্যের পীঠস্থান, এটাই য়ুরোপীয় সভ্যতার লক্ষণ। এইজন্যই গ্রাম থেকে শহরে চিত্তধারা আকৃষ্ট হয়ে চলেছে। কিন্তু এটা লক্ষ করতে হবে যে, শহরে ও গ্রামের চিত্তধারার মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, যে-কেউ গ্রাম থেকে শহরে যাবামাত্র তার যোগ্যতা থাকলে সেখানে সে স্থানলাভ করতে পারে, শহরে নিজেকে বিদেশী মনে করবার কোনো কারণ ঘটে না। এই কথাটা আমার মনে লেগেছিল। আমাদের সঙ্গে এর প্রভেদটা লক্ষ করবার বিষয়।

একদিন আমাদের দেশের যা কিছু ঐশ্বর্য, যা প্রয়োজনীয়, সবই বিস্তৃত ছিল গ্রামে গ্রামে; শিক্ষার জন্য আরোগ্যের জন্য শহরের কলেজে হাসপাতালে ছুটতে হোত না। শিক্ষার যা আয়োজন আমাদের তখন ছিল, তা গ্রামে গ্রামে শিক্ষালয়ের মধ্যে বিস্তৃত ছিল। আরোগ্যের যা উপকরণ জানা ছিল, তা ছিল হাতের কাছে,—বৈদ্য কবিরাজ ছিলেন অদূরবর্তী আর তাঁদের আরোগ্য-উপকরণ ছিল পরিচিত ও সহজলভ্য। শিক্ষা আনন্দ প্রভৃতির ব্যবস্থা যেন একটা সেচনপদ্ধতির যোগে সমস্ত দেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। দেশবাসীর মধ্যে পরস্পর মিলনের কোনো বাধা ছিল না; শিক্ষা, আনন্দ, সংস্কৃতির ঐক্যটি সমস্ত দেশে সর্বত্র প্রসারিত ছিল।

ইংরেজ যখন এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলে, তখন দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক ভাগের সৃষ্টি হোলো। ইংরেজের কাজ-কারবার বিশেষ বিশেষ কেন্দ্রে সংহত হোতে লাগল, ভাগ্যবান কৃতীর দল সেখানে জমা হোতে লাগল। সেই ভাগেরই ফল আজ আমরা দেখছি। পল্লীবাসীরা আছে সুদূর মধ্যযুগে, আর নগরবাসীরা আছে বিংশ শতাব্দীতে; দুয়ের মধ্যে ভাবের কোনো ঐক্য নেই, মিলনের কোনো ক্ষেত্র নেই, দুয়ের মধ্যে এক বিরাট বিচ্ছেদ।

এই বিচ্ছেদেরই নিদর্শন দেখেছিলুম, যখন আমাদের ছাত্রেরা একসময় গোলামখানায় আর প্রবেশ করবেন না ব'লে পল্লীর উপকার করতে লেগে-ছিলেন। তারা পল্লীবাসীদের সঙ্গে মিলিত হোতে পারেনি, পল্লীর লোকেরা

তাদের সম্পূর্ণ করে গ্রহণ করতে পারেনি। কী করে মিলবে। মাঝখানে যে বৈতরণী। শিক্ষিতদের দান পল্লীবাসী গ্রহণ করবে কোন্ আধারে। তাদের চিত্তভূমিকাই যে প্রস্তুত হয়নি। যে-জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত মঙ্গলচেষ্টার বীজ নিহিত সেই জ্ঞানের দিকেই পল্লীবাসীদের শহরবাসীদের থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে। অন্য কোনো দেশে পল্লীতে-শহরে জ্ঞানের এমন পার্থক্য রাখা হয়নি ; পৃথিবীর অন্যত্র নবযুগের নায়ক যাঁরা নিজেদের দেশকে নূতন করে গড়ে তুলছেন, তাঁরা জ্ঞানের এমন পংক্তিভেদ কোথাও করেননি, পরিবেশনের পাতা একই। আমাদের দেশে একই ভাবে যে সমস্ত দেশকে অনুপ্রাণিত করা যাবে এমন উপায় নেই। আমি তাই যাঁরা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী— ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো ক'রে যা হয় একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি। দেশের মধ্যে এই যে প্রকাণ্ড বিভেদ, একে দূর ক'রে জ্ঞান-বিজ্ঞান কি পল্লী কি নগর সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। সর্বসাধারণের কাছে সুগম করে দিতে হবে। গ্রামের লোকেরা থাকুক তাদের ভূতপ্রেত ওঝা, তাদের অশিক্ষা অস্বাস্থ্য নিরানন্দ নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষার একটুখানি যে-কোনো রকম আয়োজন করলেই যথেষ্ট, এরকম অসম্মান যেন গ্রামবাসীদের না করি।

আমাদের শিক্ষিত লোকদের জ্ঞান যে নিষ্ফল হয়, অভিজ্ঞতা যে পল্লীবাসীর কাজে লাগে না, তার কারণ আমাদের অহমিকা, যাতে আমাদের মিলতে দেয় না, ভেদকে জাগিয়ে রাখে। তাই আমি বারংবার বলি, গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না, যে-শিক্ষায় আমাদের প্রয়োজন তা শুধু শহরবাসীদের জন্য নয়, সমস্ত দেশের মধ্যে তার ধারাকে প্রবাহিত করতে হবে। সেটা যদি শুধু শহরের লোকদের জন্য নির্দিষ্ট থাকে তবে তা কখনো সার্থক হোতে পারে না। মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার, গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে এই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। আজ আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য। অর্থের দিক দিয়ে এর ব্যাঘাত আছে জানি কিন্তু এ ছাড়া কোনো পথও নেই। নূতন যুগের দাবি মেটাতেই

হবে। আমরা নিজেরা অক্ষম, আমাদের সাধ্য সংকীর্ণ, তবু সেই স্বল্প ক্ষমতা নিয়েই এই কখানি গ্রামের মধ্যে আমরা একটা আদর্শকে স্থাপনা করবার চেষ্টা করেছি। বহুবৎসরের অভাবের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা গ্রামবাসীদের অনুকূল করেছি। ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত, আমাদের সামনে যে বড়ো উদ্দেশ্য আছে তার কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই, এই মিলনের আদর্শকে যেন আমরা মনে জাগরূক রাখতে পারি।

৬ ফেব্রুয়ারি

(শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে কথিত অভিভাষণের অনুলিপি)

কল্যাণীয়েষু,

নিজেকে হারিয়ে ফেলার দ্বারাই মাঝে মাঝে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হয়। অন্তত আমার সম্বন্ধে এটা সত্য। যখন বিশ্বভারতীর আইডিয়াটাকে নিয়ে পড়েছিলুম, সেই আইডিয়াটা আমার কাছে ক্রমাগতই আকার দাবী করছিল। আমার মনে ছিল শান্তিনিকেতনকে বিশ্বমিলনের তীর্থস্থান করার দ্বারা আমার সেই উদ্দেশ্য সফল হবে। সেজন্যে দেশের লোককে পাব বলেই আশা করেছিলুম। কিন্তু সেই সময়েই পলিটিক্সের ঠুলি চোখের উপর চাপিয়ে ঠিক নিজের দেশের চারদিকে প্রদক্ষিণ করাকেই স্বদেশের প্রতি স্বধর্ম্মপালন বলে ঠিক করা হয়েছিল। অথচ যদি মনোবিকলন* করে দেখা যায় তবে বুঝতে পারি এটা বিকৃতি। অন্তরের গভীরতায় অনেকদিন থেকে আছে য়ুরোপের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা, তার পরিবর্ত্তে কোনো মূল্য না পাওয়াতেই একেবারে উল্টো দিকে দৌড় মেরেছি। মহাত্মাজি নিজেদের ধর্ম্মকেও খর্ব্ব করে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবার জন্য এক সময়ে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। যখন দেখলেন স্বজাতির স্বার্থ-সাধনের বেলায় কোনো জাত ধর্ম্মের দোহাই মানে না, এমন কি, কৃতজ্ঞতার দেয় খুব ওজন করেই দেয়, যদি না দিলে কোনো লোকসান না হয় তাহলে দেয় না, তখন অভিমান করে বললেন ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখব না।

যখন গভীর অন্তরে সম্পর্কের ইচ্ছা প্রবল তখন বাইরে তার প্রত্যাখ্যানের জোর অতিরিক্ত বেশি হয়েছিল। একেই আমাদের প্রণয়তত্ত্বে বলে অভিমান। অর্থাৎ অহঙ্কারের দুঃখ। তখন ক্ষুব্ধ অভিমান সকল দিকেই বিমুখ হয়— বল্লভের সম্বন্ধে বলে বসে ওর বিদ্যে ভালো না, বুদ্ধি ভালো না, চরিত্র ভালো না,— আমাদের যা কিছু সবই ওদের চেয়ে অনেক ভালো।

কোনো একটা জাতের সঙ্গে বৈষয়িক সম্বন্ধ থাক্‌লেই তার বিকারে এইরকম অসত্য বুদ্ধি উগ্র হয়ে ওঠে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অবৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য জাতির সঙ্গে মিলনের পথ উদ্‌ঘাটন করা। আমি য়ুরোপকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। আমি জানি ঐখানেই মানুষের মন সর্ব্বতোভাবে জেগেছে— এইজন্যে ঐখান থেকেই মানুষের সমস্ত কলুষ দূর হবে। যারা আধজাগা, আধমরা তারা নিজের অসাড়তার বোঝায় ধরণীকে ভারাক্রান্ত করে, এবং সজীব পদার্থকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। অথচ আমাদের সুপ্তির তলায় একটা চিত্ত আছে, আমরা বর্ব্বর নই। জাগ্রত জগতের সঙ্গে অন্তরের যোগ হলেই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হবে। তখন আমরা কেবল গ্রহণ করব না, দান করব। জগদীশ আজ বিশ্বকে যা দিচ্চেন তার মধ্যে ভারতের চিত্ত আছে, কিন্তু তার উদ্বোধন য়ুরোপের। তিনি যদি কূপমণ্ডূক হয়ে কেবল সাংখ্যদর্শন মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চর্চ্চা করতেন তাহলে কি হত সবাই জানি। সাংখ্যদর্শন যখন সজীব ছিল তখন ওর মধ্যে থেকে আমাদের চিত্ত প্রাণশক্তিলাভ করতে পারত। কিন্তু এখন ওর প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্রমাত্র হয়ে রয়েচে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে সজীবভাবে জানতে ও গ্রহণ করতে হলে য়ুরোপীয় বিদ্যার সঙ্গে তার সহযোগিতা ঘটাতেই হবে। সুশ্রুত চরক যখন সজীব ছিল তখন সে আমাদের কেবলমাত্র সংবাদ জানাত না আমাদের চিত্তকে তার জীবধর্ম্মের উপাদান জোগাত। আজকের দিনে কেবলমাত্র সুশ্রুত চরক পড়ে কেউ যথার্থভাবে চিকিৎসাতত্ত্বে পারদর্শী হতে পারে না। ঐ সুশ্রুত চরককে য়ুরোপীয় চিকিৎসাতত্ত্বের সহযোগী করতে পারলেই ওরা আবার কথা কয়ে উঠ্‌বে। বাঙলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেও আমরা দেখতে পাই — এ সাহিত্যের চিত্তপদার্থ বাঙালীর হলেও সেই চিত্তের খাদ্যপদার্থ পেয়েছি য়ুরোপ থেকে— তবেই আমাদের চিত্ত সাহিত্যে ফলবান হয়ে উঠেচে। আমাদের

ন্যাশানালিস্ট্‌রা যখন বল্‌তে সুরু করলেন যে, দাসু রায় আধুনিক কবিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যেহেতু তিনি খাঁটি দিশী তখন তাঁরা ঠিক মনের কথাটি সত্য করে বলেননি। রাধিকাও সত্য বলেননি, যখন তিনি বলেছিলেন "কালোমুখ আর দেখব না দূতী"। কোনো কোনো মনের অবস্থায় বল্‌তে ইচ্ছা করে য়ুরোপের সমস্ত সাহিত্যের চেয়ে দাসুরায়ের সাহিত্য বড়ো। কিন্তু সেই চেঁচিয়ে বলার দ্বারা নিজেকেও মানুষ ভোলাতে পারে না। নিজের ঘর থেকে অন্য সাহিত্যের স্থানে দাসুরায়ের সাহিত্যকে ঐকান্ত বা শ্রেষ্ঠ স্থান ঘোরতর ন্যাশ-নালিস্ট্‌ও দিতে পারে না। প্রাচীন সাহিত্যে অনেক ভালো জিনিষ নিশ্চয়ই আছে— তার কোনো কোনোটার সঙ্গে তুলনা করলে য়ুরোপীয় সাহিত্যের কোনো কোনোটাকে হার মানতে হতেও পারে। কিন্তু মস্ত কথাটা এই যে য়ুরোপীয় সাহিত্যে জীবন পদার্থ আছে, তা বেড়ে উঠ্‌চে পরিবর্ত্তিত হচ্চে, সে মানুষের প্রতিদিনের প্রাণের ক্ষেত্রে আপনার প্রকাশ অন্বেষণ করচে। এই কারণেই তার অনুকরণ করার জন্যে নয়, তার থেকে প্রাণের প্রেরণা লাভ করবার জন্যেই তার সহযোগিতা আমাদের প্রয়োজন। যে যব থেকে অঙ্কুর বেরচ্চে তাতে প্রাণিক বস্তু আছে, যার ricket ব্যাধি তাকে সেটাতে সবল করে। ঐ পদার্থটা বাদ দিয়ে যতই আহার করি জীব তাতে সুস্থভাবে বাঁচে না। মরা সাহিত্য খুব সারবান ও সুন্দর হতে পারে কিন্তু একমাত্র তাতেই যারা মানুষ, তাদের চিত্ত রিকেটি হয়ে ওঠে— তারা যে সাহিত্য উৎপাদন করে, তার চলৎশক্তি থাকে না। বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যে যে মুহূর্ত্তে য়ুরোপীয় সাহিত্য থেকে ভিটামিন সংগ্রহ করে তার সুপ্ত প্রাণশক্তিকে জাগ্রত করলেন অমনি দেখতে দেখতে সাহিত্য শাখায় প্রশাখায় পল্লবে বিস্তীর্ণ হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল— এখন একে থামিয়ে রাখা দায়।

আজকের দিনে য়ুরোপের কাজ হচ্চে সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রাণশক্তির সঞ্চার করা। আমরা যদি তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের অসহযোগিতা ঘটাই তাহলে তার কাছ থেকে আমরা কেবল উৎপন্ন দ্রব্য গ্রহণ করব কিন্তু উৎপাদনী শক্তি পাব না। অর্থাৎ পরাশ্রিত হয়ে থাকব।

যাই হোক্ দেশ কোনো মতেই সাড়া দিলে না— আমার সামান্য সম্বলে কুলোলো না। আমি মুখে অনেক বল্লুম, কিন্তু তাকে কাজের আকারে স্পষ্ট করে কিছু দেখাতে পারলুম না।

সমস্ত দেশের লোকের বিদ্রূপ ও বিরুদ্ধতাকে অবিচলিত চিত্তে প্রতিবাদ করতে পারতুম যদি একলা আমার দ্বারা এর আকার দেওয়া সম্ভব হোত। শুধু কোনো কর্ম্মপ্রণালীর দ্বারা আকার না দেওয়াই যে আমার একমাত্র ব্যর্থতা তা নয়, যাঁদের নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছি, তাঁদের সকলেরই মনের মধ্যে যথেষ্ট অনুকূলতা ছিল না। তার কারণ যেখান থেকে পলিটিক্সের কুহেলিকা অতিক্রম করেও অন্যজাতির সত্যরূপ স্বার্থনির্মুক্ত দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় সেই শিখরে তাঁরাও উঠতে নারাজ। এণ্ড্রুজ যদিচ ইংরেজ, কিন্তু তবু তাঁর মন মোহমুক্ত ছিল না। একদিকে তাঁর মন পোলিটিকাল, আর একদিকে সার্ব্বজাতিক। এই বিরোধে পলিটিক্সই বেশি জোর পেয়েছে বলে আমার মনে হয়। সেজন্যে বিশ্বভারতী বলতে ঠিক যেটা বোঝায় সেটাতে তিনি পূরোপূরি সায় দিতে পারেন নি। তিনিও মনকে খদরের ঘেটাটোপ পরিয়ে দৃষ্টিকে সঙ্কুচিত করে রেখেছিলেন। বলা বাহুল্য, এখানে আমি খদরের ইকনমিক দিকটা দেখচিনে, তার মানস্তাত্ত্বিক দিকটা দেখচি। যেমন মুসলমানের ফেজটার মধ্যে কেবল ব্যবহারিক অর্থ নেই মানস্তাত্ত্বিক অর্থ আছে। এক জায়গায় মনের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদকে অতিপ্রত্যক্ষ করিয়ে রেখেচে— সেই বিচ্ছেদের বাণী ফেজের ভিতর থেকে নিয়ত তার মনের মধ্যে কাজ করচে। খদরের ঘেটাটোপে যে আবরণ আছে তা বর্ত্তমানে আমাদের দেশে শুধু দৈহিক বা আর্থিক নয় তা মানসিক— তাতে বিচ্ছেদের বাণী আছে। সেই বাণী এণ্ড্রুজ নিজের অগোচরে মনের মধ্যে গ্রহণ করেছিলেন— বস্তুত এটা যুদ্ধসাজও বটে। যারা যুদ্ধ করবে তারা যুদ্ধসাজই পরবে, তাতে দোষ নেই। অতএব দেশের পোলিটিকাল মনস্তত্ত্ব স্বভাবতই বিচ্ছেদের মনস্তত্ত্ব, এই কারণে পলিটিকস্‌ই যারা প্রধানত জীবনের লক্ষ্য বলে গণ্য করেচে তারা পোলিটিকাল উর্দ্দি পরবে সেইটেই বিহিত। কিন্তু বিশ্বভারতী বিশেষভাবে পোলিটিকাল বিচ্ছেদকে মনের মধ্যে উগ্র করে তুলে পশ্চিম মহাদেশের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার বিচ্ছেদকে কঠিন করে তোলবার বিরোধী। মানুষ মানুষের সঙ্গে যে ক্ষেত্রে মিলতে পারে আমি সেই ক্ষেত্রকেই সব চেয়ে বড় বলে গণ্য করি। সেই ক্ষেত্রেই আমরা সর্ব্বমানবের যোগে বৃহৎ প্রাণে প্রাণবান হয়ে উঠতে পারি— বিদ্বেষের ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে কদাচই নয়। সেই নিখিল মিলনের

ক্ষেত্রই মানুষের তীর্থস্থান— কেননা সেইখানেই সকলপ্রকার প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা ও ব্যর্থতা থেকে তার মুক্তি। যাই হোক আমার এই কথাটা আমার সহযোগীরা কেউ গভীরভাবে সত্যভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। এমন কি, পিয়ার্সনও নয়। অতএব বিশ্বভারতী প্রায় একলা আমার মনে আইডিয়ারূপেই রয়ে গেল। কিন্তু তুমি জানো, আমি রূপকারের জাতি। আকারহীন আইডিয়া আমার কাছ থেকে কেবলি রূপের দাবী করে— যতক্ষণ সেই দাবী ব্যর্থ হতে থাকে ততক্ষণ আমি নিরন্তর দুঃখ পাই। আমার দেশের কত আমার সুহৃৎ আমাকে কেবলি বলেছে আপনি ঐ এক বিশ্বভারতীর ব্যাপার নিয়ে কেন কাল নষ্ট করচেন। তারা বুদ্ধিমান লোক কিন্তু মনোদৃষ্টিবান নয়। তারা চোখে যেটাকে দেখতে না পায় সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারে না— এমন কি, যেটা কোনো একটা আকার নিয়েচে সেটা সত্যহীন হলেও তারা তাকে ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে। আমার সেইরকম অনেক বন্ধু দুঃখ পেয়েচেন। কিন্তু আমার দুঃখ এই যে, আমি মনে স্পষ্টই দেখতে পেলুম, কিন্তু উপাদান জোগাড় হল না বলেই তাকে রূপ দিতে পারলুম না। তখন থেকে যে কষ্ট ভোগ করে এসেছি সে হচ্চে সেই রূপকারের কষ্ট, যার পট কেনবার তুলি রঙ কেনবার সামর্থ্য নেই। অনেক ঘোরাফেরা বলাকওয়া করলুম, শরীরটাকে ভেঙে প্রায় ধূলিশায়ী করা গেল। তখন থেকে থেকে আমার মন আমাকে বল্‌তে লাগল— তুমি তো কবি বটে— তোমার সেই কবিত্ব নিয়েই কোমর বেঁধে বসো না কেন— সেইটেই তোমার স্বধর্ম্ম, সেইটে থেকে বিচ্যুত হয়েচ বলেই তুমি এত দুঃখ পেলে। আচ্ছা ভালো, ঘোরতর অবসাদ ও দুর্ব্বলতার মধ্যেই কবিতায় আর একবার হাত লাগিয়ে দিলুম। তোমরাও তাতে আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলে। বলেছিলে, এইটেই আমার কাজ। একটা প্ল্যান খাড়া করে দিয়েছিলে এতগুলো আমার নাটক চাই গল্প চাই কবিতা চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। আমিও কিছুদিন কলম নিয়েই বসে ছিলুম। কলম চলছিলও কিন্তু দেহ মনের উপরে একটা দুর্ব্বলতার প্রদোষান্ধকার ক্রমাগতই ঘনতর হয়ে উঠ্‌তে লাগল। এমন হল স্বল্পমাত্র নড়াচড়া বা সামান্যমাত্র কোন কাজ করা আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠ্‌ল। দীপহীন ঘরে আমার প্রাণটাকে বন্ধ রেখে কে যেন আমাকে শাস্তি দিতে লাগল। সেই ঘরের মধ্যে বসেও সাহিত্য রচনা করেচি কিন্তু তার মধ্যে তো চিত্ত মুক্তি পেল না।

তার একটীমাত্র কারণ আজ আবিষ্কার করেছি। আমার গাছের শিকড় মাটির থেকে অনেকখানি বিছিন্ন হয়েছিল। দেশের সার্ব্বজনীন বিরুদ্ধতাবশত বিশ্বভারতীর কাজের কাঠামো গড়ে তুলতে পারলুম না। শান্তিনিকেতনের বাকি যা কিছু কাজ ছিল সে আমি তোমাদের কমিটি প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যবস্থার হাতে সমর্পণ করে দিয়েছিলুম। আমার জীবনের গাছে কাব্যের ফুল বা সাহিত্যের ফল বেশিদিন জোর পায় না যদি কর্ম্মের ক্ষেত্রে তার শিকড় পূরোপূরি ও গভীরভাবে আপন স্থান না পায়। তার মজ্জায় মধ্যে উপবাসজনিত ক্ষীণতা এসে পড়ে।

এখানে এসে আমার নিজের কাজ নিজের হাতে নিয়েছি। আমার সমস্ত বিচিত্র শক্তি দিয়ে আমি ছেলেদের মানুষ করে তুলতে চাই। এইখানেই আমার ভেতরকার কবির সঙ্গে কর্ম্মীর যোগ হতে পারবে। তাতে উভয়েরই পুষ্টি, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমারও উদ্ধার।

য়ুরোপের ও এখানকার ডাক্তারেরা আমাকে সকলেই একবাক্যে বিশ্রাম করতে পরামর্শ দিয়েছেন কিন্তু সজীব প্রাণীর বিশ্রাম বলতে এই বোঝায় যে, যে কাজটা নিতান্ত নিজেরই সেই কাজ তাকে করতে দেওয়া, তা ছাড়া অন্য সমস্ত বাজে কাজ থেকে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া। আমাদের দেশে সেইটেই একান্ত দুঃসাধ্য বলে এতটা কষ্ট পাই। আমাদের সজল জমিতে অত্যন্ত বেশি আগাছা বেড়ে ওঠে বলেই অরণ্যকে মারে জঙ্গলে, জীবনকে নিজের সাধনার বাইরে ছোটবড় এত বেশি দাবী আমাদের চারদিক থেকে অভিভূত করে যে নিজের সত্য কাজ করবার শক্তি ও সময় নিঃশেষ হয়ে যায়। অন্য দেশে এই উপদ্রব নেই। যে কোনো সাধক কোনো সাধনা নিয়েচেন সেই সাধনাই তাঁকে আপন বাহুবেষ্টনে রক্ষা করে। কেউ সেখানে মনেই করতে পারে না যে আইন্‌স্টাইনকে দিয়ে কোনো ধনপতির স্মৃতিসভার সভাপতিত্ব করানো বা কোন খবরের কাগজের মেসেজ লেখানোর প্রস্তাব শোভন বা সম্ভবপর। আমাদের দেশে নিজের কাজটাকেই গৌণ করে অন্য হাজার রকমের বাজে কাজ মুখ্য না করলে মানুষের শান্তি নেই এবং তাতে তার নিন্দারও অন্ত থাকে না। দিনের মধ্যে দশবার করে কেবলি না বলবার প্রয়াস সব সময়ে সহ্য হয় না শরীরকেও পীড়িত করি, কাজকেও নষ্ট করি। একেই আমাদের দেশে বলে

ভদ্রতা,—যারা বিষয়কাজে নিযুক্ত অর্থাৎ যাদের আপিস আছে আদালত আছে, তাদের কাছ থেকে কেউ ভদ্রতা প্রত্যাশাই করে না। অর্থাৎ যাদের সময়ের আর্থিক মূল্য আছে তাদের সময়কে দেশের লোক মূল্যবান বলেই জানে। কিন্তু যাদের কাজ অবৈষয়িক, তারা নিজের কাজের দোহাই দিয়ে অতি তুচ্ছ দাবী ঠেকাতে গেলেও আমাদের দেশে সেটাকে অভদ্রতা ও অহঙ্কার বলেই গণ্য করে, অবৈষয়িক কাজ যারা করে আমাদের দেশে তারাও বেকার জাতীয়—এইজন্যে তাদের সময়টাকে সবাই সরকারী সময় বলেই দাবী করে। আজ থেকে আমাকে কোমর বেঁধে অভদ্রতা করতে হবে। কারণ এখন আমার প্রদীপে যেটুকু তেল আছে তাতে আমার কর্ম্মের আলোই জ্বলতে পারে— যদি কেউ বলে বসে যে তারই থেকে তেল নিয়ে কেউ বা গায়ে মাখবে, কেউবা বাইসিকেলের চাকায় লাগাবে কিম্বা নাকে দিয়ে নিদ্রার সাধনা করবে—আমাকে বল্‌তেই হবে, আমি দেব না। তারা বলবে তুমি অভদ্র, তুমি কৃপণ—আমি মেনে নেব, কিন্তু আলো জ্বলবে।

আজ আমি দেখ্‌তে পাচ্চি কাজের ক্ষেত্রে নামবামাত্রই অন্তত আমার মনের অস্বাস্থ্য কেটে গেছে। চলা ফেরা করতে কষ্ট হয়— কর্ম্মের আনুষঙ্গিক সকল বৈষয়িক দায়িত্ব নিতেও মন রাজি হয় না— কিন্তু ঠিক যেটুক কাজ তাতে একটুও দৈন্য বোধ করিনে। আমি আমার এখানকার বালক বালিকাদের অন্তরের সঙ্গে স্নেহ করি— দীর্ঘকাল আমার শক্তি দিয়ে তাদের সেবা করতে পারিনি এতেই আমার গভীর ক্লান্তি ঘটেছিল। আজ এরা প্রতিদিন আমার চারিদিকে আস্‌চে— এদের জন্যে ভাবচি, কাজ করচি, ব্যবস্থা করচি এদের আবদার মেনে নিচ্চি, দেখ্‌চি প্রতিদিন নানা বাধার ভিতর দিয়ে এদের মন বেড়ে উঠ্‌চে— এদের চরিত্রে যে কিছু জটিলতা আছে তার গ্রন্থিমোচনে সহায়তা করচি— শুধু তাই নয়, যে আন্তরিক শ্রদ্ধা মানবসন্তান মাত্রেরই প্রাপ্য সেই শ্রদ্ধা আমি এদের দিতে পাচ্চি—বড়দের কাছ থেকে এরা যে অবিচার যে অবজ্ঞা অনেক সময় পায় তার হাত থেকে এদের রক্ষা করবার জন্যে আমি কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছি এতেই ভিতর থেকে আমার অনেকদিনের রিক্ত পাত্রে শক্তি জমা হয়ে উঠ্‌চে। এক সময়ে বলতে সুরু করেছিলুম, বয়স হয়েচে, আর আমি কিছুই করতে পারব

না আজ এদের মাঝখানে এসে আমার ভিতর থেকে প্রতি মুহূর্ত্তে এই কথা জেগে উঠ্‌চে যে, আমি পারবই। চিরদিন জরাকেই আমি মায়া বলে ঘোষণা করে এসেছি— যখন থেকে কর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে কেবল আকারহীন ভাবের ভূতকে ঘাড়ে করে নিয়েছি তখন থেকে বল্‌তে স্থুরু করেছিলুম যে আমার বয়স হয়েচে। এই মিথ্যাকে যতই প্রশ্রয় দিয়েছি, মিথ্যে ততই আমার ঘাড়ে চেপে ধরেছে। আজ আমি আরো একটা জিনিষ স্পষ্ট করে দেখ্‌তে পাচ্চি চারদিকে অনেক যুবককেই দেখি— তারা জানে না তারা জরাগ্রস্ত — তাদের সময় ফুরিয়ে গেছে— তারা আছে কী নিয়ে? আমাদের আয়ুর শিকড়গুলো রস নেয় সেইখান থেকে যেখানে তার আগ্রহ— আগ্রহ থেকেই প্রাণ গ্রহণ করি। আগ্রহহীন দিনগুলো বাদ দিলে দেখা যায় যুবকটির জীবন চতুর্থ দশায় ডব্‌ল্‌ প্রোমোশন পেতে পেতে উত্তীর্ণ হয়েছে। যাদের নিজের মধ্যে বিশেষ কোনো আগ্রহ নেই তারা অন্যের মধ্যে কেবল যে আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে না, তা নয়, আগ্রহকে তারা মারে। আমাদের দেশে চারিদিকেই এইটে ঘটছে। শিক্ষা বলতে কি বোঝায়? প্রাণকে সম্পূর্ণ জাগানো। প্রাণ বলতেই বোঝায় সত্য আগ্রহের লক্ষ্য ধরে নিরন্তর এগোনো। আমাদের দেশে মানুষ আগ্রহহীন— মানুষের প্রতি তাদের আগ্রহ নেই, জ্ঞানের প্রতিও। এই শূন্যতা ভোলবার জন্যে তারা নিরন্তর নেশা চায়। যে পলিটিকস সৃষ্টিশীল নয়, যার Constructive কর্ম্মের কোন প্ল্যান নেই, সেই হচ্চে মদ। এই মদ আমাদের দেশে দরকার আত্মাবমাননাকে ডোবাবার জন্যে। প্রাণ যেখানে প্রবল সেখানে নেশার দরকার হয় না। শিশুকাল থেকে ছেলেদের মনে আমার শিক্ষনীয় বিষয় ভারী করে চালাই, তাতেই শিক্ষার আগ্রহ মারা পড়ে অর্থাৎ চিত্তকে আমরা বইয়ের শেল্‌ফের মতো দেখি, প্রাণবান জিনিষের মতো দেখিনে। আমাদের দেশে সব চেয়ে দরকার শিশুকাল থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েদের মনে আগ্রহ জন্মিয়ে দেওয়া— চারিদিকে যা কিছু আছে সবতাতেই তাদের আগ্রহ জাগানো চাই— বিচিত্র বিষয়ে— কেননা মনের খোরাক দেহের খোরাকের মতোই বিচিত্র। আমাদের শিক্ষকদের নিজেরই মনে চারদিকের প্রতি ছাত্রদের প্রতি আগ্রহ নেই বলেই তারা কেবল মরামন হয়। সে মন অকর্ম্মক ভাবে বস্তু ধারণ করতেই পারে, কিন্তু রূপ সৃষ্টি করতে পারে না। তারা

বীজের বস্তার মত, বীজকে ফলানো তাদের কর্ম্ম নয়— কারণ বীজের প্রতি তাদের প্রাণগত আগ্রহ নেই। যে শিক্ষক যে বিষয়টি সর্ব্বদাই নিজে পড়ে না, অন্যকে পড়ায় তার শিক্ষকতার অধিকার নেই। যাই হোক্ আমার পণ এই যে, এখানকার ছাত্রদের শুধু বিদ্বান করা নয় আগ্রহবান করব। জীবনের প্রতি জগতের প্রতি তাদের অন্তহীন ঔৎসুক্য যেন থাকে। তা হলেই তারা বেঁচে আছে বলে জানব। হায়রে, ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি মানুষ তেত্রিশ কোটি দেবতার মতোই— তারা নামে আছে বস্তুত নেই। এই জন্যেই এত সহজেই তারা সকল রকম সার্থকতা থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে।

আমি যে কাজের ভার পঁচিশবৎসর পূর্ব্বে সহায়হীন সামর্থ্যহীনভাবে কেবল একলা গ্রহণ করেছিলুম, যাকে নিয়ে সকল প্রকার দুঃখ দৈন্য প্রতিকূল-তাকে নিয়ে লড়াই করতে করতে বন্ধুর পথে যাত্রা করেচি কিছুদিন বিচ্ছেদের পর আবার তার ভার গ্রহণ করলুম। কিন্তু সেদিনকার সঙ্গে এখনকার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেচে— এখন আমার কাজ কেবল আমার একলার কাজ নয়। তোমাদের কাছ থেকেও সকল প্রকার সাহায্য দাবী করব। যদি তোমরাও বলে বস যে উনি যখন নিজে ভার নিয়েচেন তখন আমরা সরে পড়ব তাহলে আমার প্রতি অবিচার করবে। এর মধ্যে অনেক দায় আছে যা এখন একলা বহন করা আমার পক্ষে আজ দুঃসাধ্য। অবশ্য যদি বাধ্য কর তাহলে আমি একলাই বহন করব— আমি যতদিন বেঁচে রণে ভঙ্গ দেব না। তোমরা যদি আমার সঙ্গে অসহযোগিতা কর তাহলে সেটা অহিংস্র অসহযোগিতা হবে না সেটা হবে হিংস্র অসহযোগিতা। আমি তোমাদের সকলকেই আমার পাশে ডাকছি— তবু এটা তোমরা আমাকে বুঝতে দিয়ো কাজটা আমারি। তোমাদের নানা লোকের নানা কাজ আছে কিন্তু এই কাজটা সমস্তটাই আমারি। তাই বলে তোমাদের সকলের সাহায্যকে ঠেকিয়ে রেখে আমার নয়। ইতি ২৮ ভাদ্র ১৩৩৫।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(জনৈক অধ্যাপককে লিখিত)

"আমাদের শান্তিনিকেতন"

আমাদের শান্তিনিকেতন,
আমাদের সব হতে আপন।
তার আকাশভরা কোলে মোদের দোলে হৃদয় দোলে,
মোরা বারে বারে দেখি তারে নিত্যই নূতন॥
মোদের তরুমূলের মেলা, মোদের খোলা মাঠের খেলা,
মোদের নীল গগনের সোহাগমাখা সকাল সন্ধ্যাবেলা।
মোদের শালের ছায়াবীথি বাজায় বনের কলগীতি,
সদাই পাতার নাচে মেতে আছে আমলকীকানন॥
আমরা যেথায় মরি ঘুরে সে-যে যায় না কভু দূরে,
মোদের মনের মাঝে প্রেমের সেতার বাঁধা যে তার সুরে;
মোদের প্রাণের সঙ্গে প্রাণে, সে-যে মিলিয়েছে একতানে,
মোদের ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে-যে করেছে একমন॥

স্বরলিপি

"আমাদের শান্তিনিকেতন"

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার

সা। সা সা -া I ধ্া -সা সা। রা -সা রা I গা -া -া।
আ মা দে র্ শা ন্ তি নি ০ কে ত ০ ০

। -া -া -া II ধা -া -া। -া -পা -ক্সা I -পা -া -া। -া -মা -গা I
০ ০ ন্ আ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I -মা -া গা। রা সা -া I সা -া সা। রা -সা রা I গা -া -া। ॥
০ ০ আ মা দে র্ শা ন্ তি নি ০ কে ত ০ ন্

[পর্সা -া র্সা না -া না ধা -া ধা পা]
। -া গা গা I { গপা -া পা। পা -া পা I পা -া পা। ক্সা পা -া } I
০ সে যে স০ ব্ হ তে ০ আ প ন্ আ মা দে র্

I গা -া রা। সা -া রা I গা -া -া। -া -া -া II
শা ন্ তি নি ০ কে ত ০ ০ ০ ০ ন্

। -া গা -া I { পা পা -া। ক্সা পা -া I ধা ধা -া। পা ধা -া I
০ তা র্ আ কা শ্ ভ রা ০ কো লে ০ মো দে র্
(৩) শা লে র্ ছা য়া ০ বী থি ০ বা জা য়্
(৫) প্রা ণে র্ স ০ ঙ্গে প্রা ণে ০ সে যে ০

I ধর্সা র্সা -া। র্সা র্সা -না I নর্রা র্সা -া। (র্সা র্সা -পা) } I
দো লে ০ হৃ দ য়্ দো লে ০ ও তা র্
(৩) ব নে র্ ক ল ০ গী তি ০ মো দে র্
(৫) মি লি য়ে ছে এ ক্ তা নে ০ মো দে র্

। র্সা র্সা -া I পর্সা র্সা -া। না না -া I ধা ধা -া। পা পা -া I
মো রা ০ বা রে ০ বা রে ০ দে খি ০ তা রে ০
(৩) স দা ই পা তা র্ না চে ০ মে তে ০ আ ছে ০
(৫) মো দে র্ ভাই এ র্ স ০ ঙ্গে ভা ই কে সে যে ০

I ধা -া পা। ধা -া পা I র্সা -া না। ধা পা -া I গা -া রা।
নি ০ ত্য ই ০ ন্ ত ন্ আ মা দে র্ শা ন্ তি
(৩) আ ম্ ল কী ০ কা ন্ ন আ মা দে র্ শা ন্ তি
(৫) ক রে ০ ছে এ ক্ ম ন্ আ মা দে র্ শা ন্ তি

। সা -া রা I গা -া -া। -া -া -া II
নি ০ কে ত ০ ০ ০ ০ ন্
(৩) নি ০ কে ত ০ ০ ০ ০ ন্
(৫) নি ০ কে ত ০ ০ ০ ০ ন্

। সা সা -রা II { গা গা -া । গা গা -া I গা গা -া ।
(২) মো দে র্ ত রু ০ মু লে র্ মে লা ০
(৪) আ ম্ রা যে থা য়্ ম রি ০ ঘু রে ০

। রা গা -া I পা পা -া। মা মা -া I গা গা -া। রা গা -া I
(২) মো দে র্ খো লা ০ মা ঠে র্ খে লা ০ মো দে র্
(৪) সে যে ০ যা য়্ না ক ভু ০ দু রে ০ মো দে র্

I পা -া পা। মা মা -া I গা গা -া। রা রা -া I সা সা -ন্া।
(২) নী ল্ গ গ নে র্ সো হা গ্ মা খা ০ স কা ল্
(৪) ম নে র্ মা ঝে ০ প্রে মে র্ সে তা র্ বাঁ ধা ০

। ধ্া -া রা I ন্া সা -া। (সা সা -রা) } I -া -া -া II
(২) স ০ ন্ধ্যা বে লা ০ মো দে র্ ০ ০ ০
(৪) যে তা র্ সু রে ০ আ ম্ রা ০ ০ ০

বিশ্বভারতী পত্রিকা

প্রথম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা

পৌষ ১৩৪৯

দশকরণের বানপ্রস্থ

শ্রীরাজশেখর বসু

দর্ভাবতীর রাজা দশকরণ একদিন রাজসভায় পদার্পণ ক'রেই বললেন— 'আমার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে, কালই আমি বানপ্রস্থে যাব।'

বৃদ্ধমন্ত্রী আকাশ থেকে প'ড়ে বললেন— 'সেকি মহারাজ, আপনি এখনও যুবা, চুল পাকে নি, দাঁত পড়ে নি, শরীর অজর, বাহু সবল, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কি দুঃখে কালই বনে যাবেন? এখন বিশ বৎসর ও কথা তুলবেন না।'

রাজা ঘাড় নেড়ে বললেন— 'না, আমার যাওয়াই স্থির। কুমারের অভিষেক আজই হয়ে যাক। উৎসবঘটা পরে করলেই চলবে।'

মন্ত্রী বললেন—'হা, কি দুর্দৈব! মহারাজ, হঠাৎ এমন মতি কেন আপনার হ'ল? দর্ভাবতীরাজ্যের অবস্থাটা ভেবে দেখুন। রাজপুত্র এখনও বালক, সবে বাইশ বৎসরে পড়েছেন, আমিও জরাগ্রস্ত। রাজ্যচালনা কি আমাদের কাজ? কুমার, তুমি মহারাজকে বুঝিয়ে বল না।'

কুমার নতমস্তকে উত্তর দিলেন— 'আমি আর কি বলব। পিতা যদি ধর্মার্থে তৃতীয় আশ্রম গ্রহণ করেন তবে আমি তাতে বাধা দিয়ে পাপের ভাগী কেন হব। তাঁর পদানুসরণ ক'রে অগত্যা আমিই রাজ্য চালাব।'

যুবমন্ত্রী বললেন— 'আর আমরাও তো আছি, ভয় কি।'

বৃদ্ধমন্ত্রী তখন হতাশ হয়ে স্থবির রাজপুরোহিতকে বললেন— 'ধর্মজ্ঞ মাণ্ডূক, এই সংকটে একমাত্র আপনিই মহারাজ দশকরণকে সদ্‌বুদ্ধি দিতে পারেন।'

মাণ্ডূক বললেন— 'মহারাজ, পঞ্চাশোর্ধ্বে বনপ্রস্থান নৃপতির পক্ষে অবশ্যকৃত্য নয়। দশরথ অতি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেছিলেন। যযাতি দুবার জরাগ্রস্ত হয়েও সিংহাসন ছাড়েন নি। যদি পরমার্থই আপনার অভিপ্রেত হয় তবে রাজর্ষি জনকের তুল্য নির্লিপ্তচিত্তে প্রজাপালনে নিযুক্ত থেকে মোক্ষানুসন্ধান করুন।'

দশকরণ কিছুতেই সম্মত হলেন না। এদিকে তাঁর বনগমনের সংবাদ কিঞ্চিৎ রঞ্জিত হয়ে অন্তঃপুরে পৌঁছে গেছে। ছোটরানী মহা উৎসাহে সভায় এসে বললেন— 'আর্যপুত্র, আমি প্রস্তুত, দ্বিপ্রহরের মধ্যেই সব গুছিয়ে ফেলব। সঙ্গে বেশী কিছু নেব না, শুধু আমার অলংকার তিন মঞ্জুষা, বসন দশ পেটিকা, এটা-সেটা বিশ পেটিকা। আর তিনজন সখী, আর দশজন দাসী, আর শুকসারী, আর আমার প্রিয়মার্জারী দধিমুখী। আপনি গোটাদশেক বড় বড় স্কন্ধাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করুন, তাতেই আমাদের কুলিয়ে যাবে। উঃ, ভারী মজা হবে, দিনকতক ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে। সঙ্গে আবার ভেজাল জোটাবেন না যেন।'

রাজা বললেন— 'ওসব কিছুই যাবে না। যুবরাজ কাল তোমাকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।'

ছোটরানী রাগে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে চ'লে গেলেন। বড়রানী দেবপূজায় ব্যস্ত ছিলেন, এখন সংবাদ পেয়ে এসে বললেন— 'মহারাজ, একি শুনছি! আমি সহধর্মিণী পট্টমহিষী, আমাকে ফেলে যাবেন না তো?'

রাজা উত্তর দিলেন— 'তুমি এখানেই তোমার পুত্রের কাছে থাকবে। আর ইচ্ছা হয় তো পুণ্যধাম বারাণসীতে বাস করতে পার।'

যুক্তি, ধর্মোপদেশ, অনুনয়, ক্রন্দন, কিছুতেই কিছু হ'ল না। রাজা দশকরণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সভা ভঙ্গ হ'ল।

দ্বিপ্রহরে দশকরণের নিভৃত কক্ষে গিয়ে রাজবয়স্য প্রগল্‌ভক বললেন—'মহারাজ, এতকাল আমার কাছে কিছুই গোপন করেন নি। আজ একবার মনের কথাটি খুলে বলতে আজ্ঞা হ'ক। ধর্মে আপনার বেশী মতি আছে তা তো বোধ হয় না, পরকালের চিন্তাও কখনও করতে দেখি নি। পুত্রকলত্রের উপদ্রব সইতে না পেরে বনে পালাচ্ছেন না তো ?'

রাজা বললেন— 'খেপেছ, তা হ'লে পুত্রকলত্রকেই বনে পাঠাতাম।'

'তবে কিজন্য যাচ্ছেন ?'

দশকরণ একটু হেসে বললেন— 'ফুর্তি করবার জন্য।'

'অবাক করলেন মহারাজ। রাজপদে থেকে ফুর্তি হবে না আর বনে গিয়ে হবে! ফুর্তি চান তো এখানেই তার বাধা কি। আরও গুটিদশেক মহিষী গৃহে আনুন, নৃত্যগীতনিপুণা ভাল ভাল বরাঙ্গনা বাহাল করুন, কাকাক্ষীনদীতটে সুবিশাল প্রমোদকানন রচনা করুন, তাতে মনোরম সৌধ তুলুন। উৎকলিঙ্গ থেকে নিপুণ সূপকার, গান্ধার থেকে পলান্নপাচক, গৌড়ভূমি থেকে লড্ডুকলাবিৎ আনান। আর মলয়াদ্রির গন্ধসম্ভার, সিংহলের রত্নাভরণ, মহাচীনের অংশুক, বাহ্লিকজাত বিচিত্র আস্তরণ, যবনদেশের আসব —'

'থাম থাম, ওসব আমার খুব জানা আছে। শুধু বিলাসসামগ্রীতে কিছু হয় না, ভোগের শক্তি চাই।'

'আপনার শক্তির কমি কি ? আর বনে গেলেই কি শক্তি বাড়বে ?'

'মূর্খ, তুমি এখন বুঝবে না। যদি আবার কখনও দেখা হয় তখন বুঝিয়ে দেব। যাও, এখন বিরক্ত ক'রো না।'

রাজাকে উন্মাদ ভেবে প্রগল্‌ভক বিষণ্নমনে চ'লে গেলেন।

•

পরদিন ভোরবেলা দশকরণ রথারূঢ় হয়ে রাজত্যাগ করলেন। সঙ্গে নিলেন শুধু একটি নাতিবৃহৎ থলি। বহুদূরে এসে রথ আর সারথিকে ফিরিয়ে দিলেন, তারপর থলিটি কাঁধে নিয়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

দশকরণ একটি গাছের তলায় বসে একান্তঃকরণে ব্রহ্মার আরাধনা করতে

লাগলেন। তিন দিন তিন রাত অতিক্রান্ত হ'ল, অবশেষে বিধাতা দর্শন দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন— 'কি চাও বৎস ?'

দশকরণ সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতান্তে বললেন— 'প্রভু, আমার পিতৃদত্ত নামটি সার্থক করুন।'

'তার মানে ?'

'আমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দশগুণ ক'রে দিন। অর্থাৎ বিংশতি চক্ষু, বিংশতি কর্ণ, দশ নাশা, দশ জিহ্বা, দশগুণ বিস্তৃত ত্বক্।'

'আর বাক্ পাণি-পাদাদি কর্মেন্দ্রিয় ? হৃৎ-ক্লোম-জঠরাদি যন্ত্র ?'

'তাও দশ-দশগুণ।'

বিধাতা সবিস্ময়ে বললেন— 'অর্থাৎ তুমি একাই দশজন হ'তে চাও। তোমার মতলবটা কি ?'

'প্রভু, তবে খুলে বলি শুনুন। আমার দেহটা তো মোটে সাড়ে তিন হাত বানিয়েছেন, আর ইন্দ্রিয়াদি যা দিয়েছেন তাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। কতই বা দেখব, কতই শুনব, কতই খাব, কতটুকুই বা ভোগ করব ? আমি মহালোভী পুরুষ, আমার ইন্দ্রিয়বর্ধন ক'রে ভোগশক্তি দশগুণ বাড়িয়ে দিন।'

'বটে! কিন্তু দশ-দশটা আলাদা আলাদা দরকার কি, একটা প্রকাণ্ড দেহ যদি দিই তাতে সব অঙ্গই তো বড় বড় হবে।'

'আজ্ঞে, তা আমি ভেবে দেখেছি, লাভ হবে না। হাতির দেহ প্রকাণ্ড, তার সুখভোগের মাত্রা তো ইঁদুরের চেয়ে বেশি নয়। সংখ্যা না বাড়লে ভোগ বাড়বে না।'

'তুমি খুব হিসাবী দেখছি। আচ্ছা, মন নামে একটা অন্তরিন্দ্রিয় আছে, তা কটা চাও ?'

'সে কথা তো ভাবি নি প্রভু। আচ্ছা, মন একটাই থাকুক।'

'উত্তম প্রস্তাব। এরূপ জীবকল্পনা আমার মাথাতেও আসে নি, তোমার উপরেই পরীক্ষা হ'ক। কিন্তু সামলাতে পারবে তো ? যদি সর্দি হয় তবে দশটা নাক হাঁচবে, যদি জ্বর হয় তবে বিশটা পা কামড়াবে। আরও অসুবিধা আছে— লোকে যদি রাক্ষস ভেবে তোমাকে আক্রমণ করে ?'

'প্রভু, আপনি সুখ দুঃখ দুইই দিয়েছেন, তবু তো লোকে জীবনধারণ

করতে চায়। আমি দশটা জীবন একসঙ্গে ভোগ করতে চাই, দুঃখ যদি বাড়ে সুখও তো বাড়বে। আমার এই বর্তমান দেহ খুব শক্তিমান্, আর আপনার প্রদত্ত অঙ্গগুলির জন্য বলবীর্য দশগুণ বাড়বে। তবে যা দেবেন মজবুত দেখেই দেবেন। আমার সঙ্গে প্রচুর ধনরত্নও আছে, সেই অর্থবলে আর বাহুবলে সকলকেই বশে এনে নবরাজ্য স্থাপন করব।'

বিধাতা বললেন—'তবে তাই হ'ক, তথাস্তু। সার্থকনামা দশকরণ, উত্তিষ্ঠ, ঐ ডোবার জলে তোমার নবকলেবরের প্রতিবিম্ব দেখে নাও, তারপর যথেচ্ছা ভোগের আয়োজন কর।'

এক বৎসর হয়ে গেছে। ব্রহ্মা বেদের পুঁথি নিয়ে কাটাকুটি করছেন এমন সময় সহসা তাঁর চতুর্মুণ্ডের চতুঃশিখা থরথর ক'রে কেঁপে উঠল, যাকে বলে টনক নড়া। ধ্যানস্থ হয়ে বুঝলেন দশকরণ তাঁকে আবার ডাকছেন। অদ্ভুত-দেহধারীর পরিণাম জানবার জন্য তাঁর কৌতূহল হ'ল, আহ্বান পাওয়ামাত্র ভূলোকে অবতরণ করলেন।

দশকরণ সেই গাছটির তলায় বিষণ্ণ হয়ে ব'সে আছেন। বিধাতাকে দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে দণ্ডবৎ হলেন— কিছু কষ্টে, কারণ তাঁর নূতন যৌগিক দেহটি লম্বায় না বাড়লেও বেষ্টনে অনেকখানি।

ব্রহ্মা বললেন— 'ভাল তো সব ?'

'কিছুই ভাল নয় প্রভু। বর তো দিলেন, কিন্তু সুখ পাচ্ছি না। আগে দুই চোখে একই দৃশ্য দেখতাম, এখন কুড়ি চোখে নানাদিকের দৃশ্য মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে— গাছের উপর জল, জলের মধ্যে উড়ন্ত পাখি। ভেবে-ছিলাম দশ রসনায় বিভিন্ন রসের আস্বাদ নিয়ে একসঙ্গে বিচিত্র অনুভূতি পাব, এখন দেখছি কটুতিক্তমধুর মিশে গিয়ে এক উৎকট উপলব্ধি হচ্ছে। দশটি উদর বোঝাই ক'রেও তৃপ্তি বাড়ছে না। দশজোড়া পা থাকলেও দশগুণ পথ চলতে পারি না। সব অঙ্গেরই এই দশা। আচ্ছা, আপনিও তো চতুরানন চতুর্ভুজ, কি রকম বোধ করেন ?'

'কিছুই বোধ করি না, ওসব মাথামুণ্ড আমার নিজের নয়। মানুষ সৃষ্টি করবার পর হঠাৎ একদিন দেখি আমার চারটে মাথা চারটে হাত গজিয়েছে।

এ হচ্ছে মানুষের কাজ, তারা আমার সৃষ্টির শোধ তুলেছে আমারই স্কন্ধে। তা এখন কি চাও বল।'

'আপনিই বলুন কি করলে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

'বাপু, পরামর্শ দেওয়া আমার কাজ নয়। আর তোমার উদ্দেশ্য যে কি তারও স্পষ্ট ধারণা তোমার নেই। যা চাও নিজেই স্থির ক'রে বল।'

'আমার একটা মনই গোলযোগের কারণ। এখন কৃপা ক'রে দশটি মন দিন, তাতে প্রত্যক্ষগুলো আর জট পাকাবে না, আলাদা আলাদা মনে খোপে খোপে থাকবে।'

ব্রহ্মা তথাস্তু ব'লে প্রস্থান করলেন।

আর এক বৎসর কেটে গেছে। ব্রহ্মার আবার টনক নড়ল, দশকরণ ডাকছেন। বিরক্ত হয়ে বললেন— 'আঃ, লোকটা জ্বালিয়ে মারলে। যাই হ'ক, শেষ অবধি দেখতে হবে।'

ব্রহ্মা এসে দশকরণকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'কিহে, এবার সুবিধা হ'ল ?'

দশকরণ কাতরকণ্ঠে বললেন— 'কই আর হ'ল প্রভু, দশটা মনে আরও গোলযোগ বেড়েছে। যতই চেষ্টা করি মনে হয় ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভোগ করছে। একবার বোধ হয় আমি দেবদত্ত— মিষ্টান্ন খাচ্ছি, আবার ভাবি আমি গঙ্গদত্ত— সংগীত শুনছি। তখনই আবার দেখি আমি অনঙ্গদত্ত— প্রেমালাপে মগ্ন, পুনশ্চ আমি ত্রিভঙ্গদত্ত— গেঁটে বাতে কাতর। সমস্ত অনুভূতি কেন্দ্রস্থ করতে পারছি না, কেবলই বিক্ষেপ হয়। আমার মনগুলোও দিয়েছেন হরেক রকমের— চালাক, বোকা, শান্ত, কামী, সহিষ্ণু, রাগী, উদার, হিংসুটে, নিষ্ঠুর, দয়ালু। এই দেখুন না, আপনার কাছে যে মনের কথা জানাব তাতেও বাধা। প্রত্যেক মন চায়— আমি বলব, আমি বলব। কোনও গতিকে রফা ক'রে একটি মন এখন মুখপাত্র হয়েছে।'

'হুঁ, এরকম যে হবে তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। এখন কি চাও ?'

'প্রভু, কিছুই বুঝতে পারছি না, আপনিও তো উপায় বলবেন না।

এখন বরং পূর্বদেহ পূর্বমন ফিরে দিন, দিনকতক প্রকৃতিস্থ হয়ে ভেবে চিন্তে দেখি, তারপর আবার আপনার শরণাপন্ন হব।'

ব্রহ্মা বললেন— 'তথাস্তু।'

তারপর আরও পাঁচ বৎসর কেটে গেছে। ব্রহ্মা দশকরণের কথা ভুলে গেছেন, তাঁর কাছে কোনও ডাকও আর আসে নি। একদিন তিনি সৃষ্টিচিন্তা করছেন, ভাবছেন— বেঁটে শরীরের সঙ্গে পীতচর্ম আর খাঁদা নাক দিসে কেমন হয়, এমন সময় তাঁর তৃতীয় মুণ্ডের দ্বিতীয় কর্ণ সুড়সুড় ক'রে উঠল। হাত দিয়ে পেলেন— একটি ষট্‌পদ সহস্রাক্ষ বিচিত্রপক্ষ পতঙ্গ, যার নাম প্রজাপতি। দেখেই দশকরণকে মনে প'ড়ে গেল।

লোকটার হ'ল কি, আর তো সাড়া শব্দ নেই, মারা গেল নাকি? বোধ হয় হতাশ হয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গেছে। কিন্তু গিয়েই বা কি করবে, এই সাত বৎসর পরে তার ছেলে তো আর দখল দেবে না। ধ্যানস্থ হয়ে দেখলেন— দশকরণ বেঁচে আছেন, দর্ভাবতীর নিকটেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিধাতা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মূর্তিতে তখনই সেখানে নেমে এলেন।

গোপপল্লী। একটা মেটে ঘরের মটকায় চ'ড়ে দশকরণ খড় দিয়ে চাল ছাইছেন, ঘরের সামনে একটি গোপনারী শিশুকে খাওয়াচ্ছে আর হাত নেড়ে দশকরণকে কাজ বাতলাচ্ছে।

ব্রহ্মা ডাকলেন— 'ওহে দশকরণ, হচ্ছে কি?'

দশকরণ নেমে এসে অপরিচিত ব্রাহ্মণকে প্রণাম ক'রে বললেন— 'কে আপনি দ্বিজবর?'

'আরে আমি ব্রহ্মা, তোমার খোঁজ নিতে এসেছি। তারপর, তোমার গবেষণা কতদূর এগল? চেহারাটা চাষাড়ে হয়ে গেছে দেখছি। এখন করা হয় কি, আছ কেমন?'

'খুব ভাল আছি প্রভু। এই গৃহের স্বামী অসুস্থ, অন্য পুরুষ নেই, বর্ষাও আসন্ন, তাই আমিই ঘরের চালটা মেরামত ক'রে দিচ্ছি।'

'সুখ হচ্ছে?'

'পরিশ্রম হচ্ছে, অভ্যাস নেই কিনা। সুখী হবে এই গোপদম্পতি।'

'এখানেই থাকা হয় বুঝি ?'

'না, গ্রামের প্রান্তে থাকি, তবে কাজের জন্য নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়।'

'দর্ভাবতীরাজ্যের সংবাদ কি, তোমার সেই ধনরত্নের থলিটার কি হ'ল ?'

'রাজ্য পুত্রের হাতে, আর ধন যা এনেছিলাম তার কিছু খরচ হয়ে গেছে, অবশিষ্ট রাজকোষে ফেরত দিয়েছি। রাজ্যের লোকে এখন আমাকে চিনতে পারে না, আর দুরভিসন্ধি নেই জেনে কেউ অনিষ্টও করে না।'

'রাজমহিষীরা কোথায় ?'

'জ্যেষ্ঠা পত্নী আমার কাছেই আছেন। কনিষ্ঠা আসতে চান না।'

'তা হ'লে আবার সংসারধর্ম করছ। আমি ভেবেছিলাম বুঝি বানপ্রস্থের অন্তে সন্ন্যাস নিয়েছ। তোমার সেই উৎকট খেয়ালের কি হ'ল— সেই মহাভোগায়তন দশদেহসংঘাত ?'

দশকরণ সহাস্যে বললেন— 'সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে প্রভু। এখন আমি দশকরণ নই, কোটিকরণ, তারও একীকরণ হয়ে গেছে। গোছা-বাঁধা দশটা দেহমনের দরকার কি, দেখছি যত জীব আছে সব মিলে আমি, এখন ভোগের ইয়ত্তা নেই। ভারী সুবিধা হয়েছে, সকলের সুখদুঃখ পৃথক্ ক'রেও বুঝতে পারি, একত্রও বুঝতে পারি।'

'কি রকম ?'

'সেদিন বাঘে একটা গরু মারলে। অবলা গরুর মৃত্যুযন্ত্রণা আর ক্ষুধার্ত বাঘের ভোজনসুখ দুইই বুঝলাম। গ্রামের লোকে মিলে কুঠারাঘাতে বাঘটা মারলে। অসহায় বাঘের আর্তনাদ আর দলবদ্ধ গ্রামবাসীর উল্লাস তাও বুঝলাম।'

'ভাল মন্দ সবই তুমি নির্বিকার সাক্ষী হয়ে দেখ ?'

'তা কেন দেখব। বাঘটাকে প্রথম মার আমিই দিয়েছিলাম, মৃগয়া অভ্যাস ছিল কিনা। আপনি অপক্ষপাতে ভাল মন্দ মিশিয়ে জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার প্রবল স্বার্থবোধও দিয়েছেন। তাই বাঘে গরুমানুষ মারে, মানুষে বাঘ মারে, মানুষকেও মারে। যখন রাজা ছিলাম তখন নিজের

সুখটাই অগ্রগণ্য ছিল। তারপর সুখবৃদ্ধির নূতন উপায় মাথায় এল, আপনার বরে দশকায় দশমনা হলাম। নিজের দশটা অংশের স্বার্থসিদ্ধি তো সব সময় করা যায় না, তাই রফা করতে হ'ল। যথাসম্ভব সব কটাকে সুখে রাখবার চেষ্টা করতাম, না পারলে গোটাকতককে নিগৃহীত করতাম। তারপর স্বার্থবুদ্ধি আরও ব্যাপক হ'ল, বুঝলাম দশটা দেহমন যথেষ্ট নয়, একসঙ্গে জড়িসে থাকাও অনর্থকর, পৃথক্ থেকেও একত্ববোধ হয়। এখন কোটিকরণ হয়েছি, বিস্তর ইন্দ্রিয়, বিস্তর দেহমন। তাই মধ্যমপন্থা আরও বেশী শিখেছি। সর্ব অবয়বের লাভালাভ বুঝে চলতে হয় প্রভু, আপনার মতন নির্মম সাক্ষী হয়ে থাকতে পারি না।'

'লাভালাভ বিচারে ভুল কর না?'

'করি বই কি। সেটা আপনার দোষে— যেমন বুদ্ধি দিয়েছেন তেমনই তো হবে, ঘ'ষে মেজে ঠেকে শিখে আর কতই বাড়বে।'

'আচ্ছা দশকরণ, বুঝলাম তোমার অনেক দেহ, অনেক মন। কিন্তু তোমার আত্মা কটা?'

'সমস্যায় ফেললেন প্রভু। বৃদ্ধ মাণ্ডুক বলতেন বটে— জীবাত্মা, পরমাত্মা, প্রত্যগাত্মা, সর্বভূতান্তরাত্মা— এইসব কটমটে কথা। আমার কটা আছে তা তো জানি না।'

'জানবে। না জানলেও তোমার কাজ আটকাবে না।'

এমন সময় একটি লোক এসে ডাকলে— 'ওহে এককড়ি, আজ যে বুড়ো জরৎখরের কুলত্যাগিনী বউটার একটা গতি করবার কথা, তারপর গ্রামের ছেলেদের ধনুর্বিদ্যা শেখাবে, তারপর সন্ধ্যায় ভরতরাজার উপাখ্যান শোনাবে বলেছিলে। তোমার আর কত দেরি?'

ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা করলেন— 'এককড়ি কে?'

দশকরণ বললেন— 'আজ্ঞে আমি। ওরা কোটিকরণ একীকরণ বোঝে না, সংক্ষেপে এককড়ি বলে। তুমি এগও হে, আমি হাতের কাজটা শেষ ক'রেই যাচ্ছি। প্রভু, আমার একটি শেষ প্রার্থনা আছে। বয়স তো অনেক হ'ল, গবেষণাও ঢের ক'রে দেখলাম। এইবার মুক্তির সন্ধান দিন।'

ব্রহ্মা হেসে বললেন— 'বল কি হে, তোমার এতগুলো সত্তাকে ফাঁকি দিয়ে তুমি একাই মুক্তি নেবে?'

'ঠিক বলেছেন। থাক্ গে, মুক্তির দরকার নেই।'

'দরকার না থাকলেও তুমি পেয়ে গেছ।'

'দোহাই পিতামহ, পরিহাস করবেন না।'

'আরে মুক্তির পথ কি একটা? তোমার রাজবুদ্ধি তোমাকে মুক্তির রাজমার্গ দেখিয়েছে।'

বিধাতা অন্তর্হিত হলেন। দশকরণ আবার মটকায় চ'ড়ে ভাবতে লাগলেন— এ কিরকম মুক্তি, লোকে ছাড়তেই চায় না, নাইবার খাবার অবসর নেই।

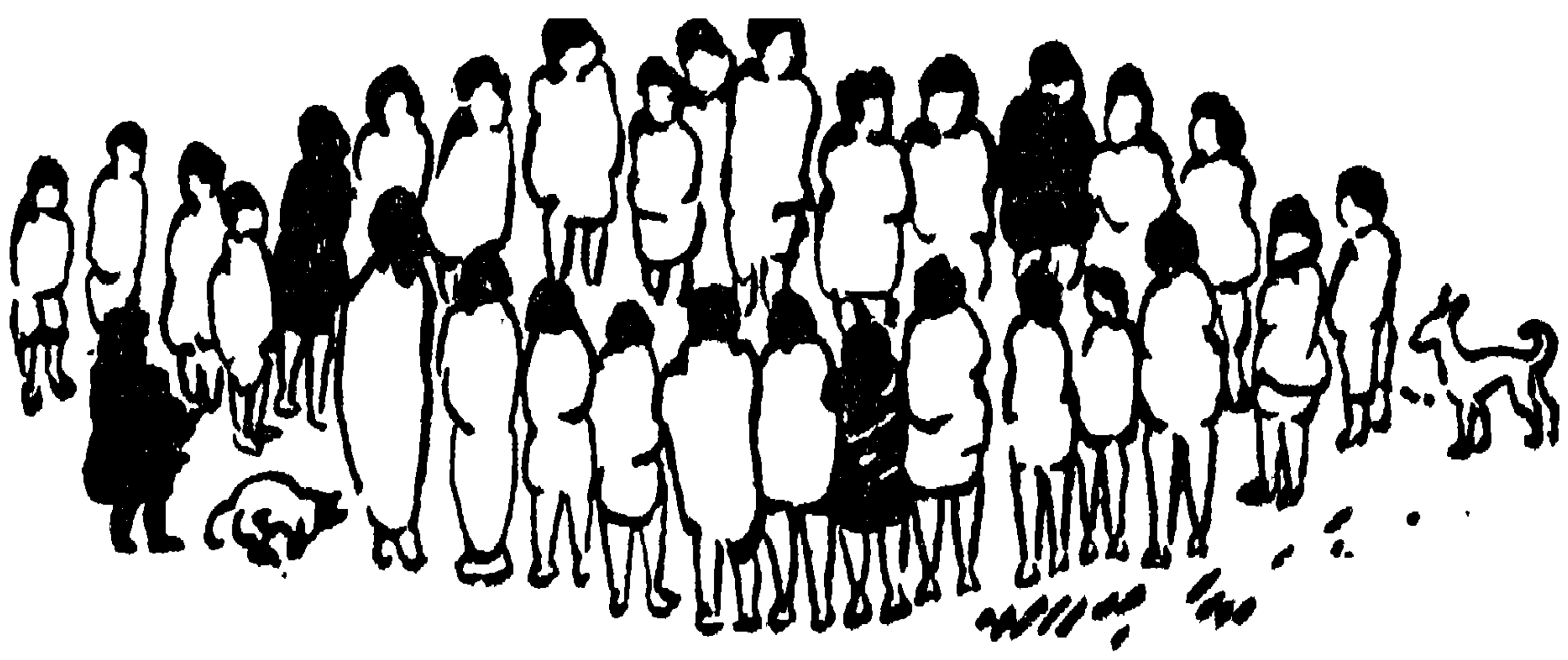

প্রাচীন-ভারতে সাহিত্য-সমালোচনা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

১

ভারতবর্ষে প্রাচীন যুগে সাহিত্য-আলোচনা প্রকাশ পেয়েছিল দুটি ধারার মধ্যে — (১) একটি তার অন্বয়মুখী ধারা অর্থাৎ গুণ-বিচার আর তার সঙ্গে বিষয়, অধিকারী, সম্বন্ধ, প্রয়োজন প্রভৃতির আলোচনা (২) আর দ্বিতীয়টী ব্যতিরেকমুখী অর্থাৎ অভাবমুখে দোষ-বিচার। এই দুই ধারার মিলনের মধ্যেই পুষ্ট হয়ে উঠেছিল সমালোচনা-সাহিত্যশাস্ত্র। কোনও কাব্য বা নাটকের ভাব, রস, বিষয়-বস্তু, প্রকাশ-ভঙ্গী, ছন্দো-বৈচিত্র্য বা ভাবানুযায়ী ছন্দের সামঞ্জস্য, চরিত্র-চিত্রণ ও প্রকার নিরূপণ— এই সবই ছিল সমালোচনার বিষয়।

এই সমালোচনা বহু শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। আখ্যান, আখ্যায়িকা, ব্যাখ্যান, অন্বাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, সূত্র, বৃত্তি, পদ্ধতি, ভাষ্য, সমীক্ষা, টীকা, কারিকা, বার্ত্তিক— এত বিভিন্ন ধরনের আলোচনা থেকেই অনুমান করা যায় যে সমালোচনা-সাহিত্য কত বিরাট ছিল, আর তার প্রকাশ ছিল কেমন বহুমুখী। এমন একদিন এসেছিল যেদিন টীকার টীকা তস্য টীকায় দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। টীকা পরম্পরা অর্থাৎ সমালোচনার সমালোচনা চলেছিল শাখা-প্রশাখার মত। এমন এক একখানি টীকা আছে, যাতে আসল গ্রন্থের চেয়ে টীকারই মূল্য বেশী— একে স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলা চলে। প্রাচীন মূল-গ্রন্থের সাথে জোড়া দিয়ে রাখার মতলব হচ্ছে আপন মতটীকে আর্ষ বা বেদ-সম্মত ব'লে প্রচার করা। আমরা সব রকম সমালোচনাকেই সাধারণতঃ টীকা বলি। কিন্তু এই নানাশ্রেণীর সমালোচনার পার্থক্য আছে। প্রথম যে ব্যাখ্যা তাকে টীকা বলে না। অতি অল্প কথায় ছোট ছোট বাক্যে অধিক অর্থের যে সংক্ষিপ্ত প্রকাশ, তাকে বলে সূত্র— এই সূত্রের সারমর্ম বলে' দেয় বৃত্তি। সূত্র ও বৃত্তিরও পরীক্ষা বা বিচার প্রচলিত ছিল, তাকে বলা হ'ত পদ্ধতি। সূত্র ও বৃত্তি—এই দুই আলোচনার সিদ্ধান্তকে পরিষ্কার করে' সমাধান করাকে বলত

ভাষ্য। ভাষ্যের প্রকৃত-অপ্রকৃত অংশ বিচার করার নাম সমীক্ষা— এই সমস্ত বিষয়ের বিশদ আলোচনা করে' যে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা তাকেই বলতো টীকা। কেবল সিদ্ধান্ত-টুকুর যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, তার নাম কারিকা। মূল-গ্রন্থের উচিত-অনুচিত অংশ নিয়ে যে বিচার-পদ্ধতি, সে হচ্ছে বার্ত্তিক। তাই দেখা যায় যে সূত্রাকার মূল-গ্রন্থের বৃত্তি, পদ্ধতি, ভাষ্য, সমীক্ষা, টীকা, কারিকা, বার্ত্তিক প্রভৃতি বহুপ্রকার সমালোচনার মধ্য দিয়া দোষ-গুণ-বিচার-পদ্ধতি ভারতীয় সাহিত্য-আলোচনার একটী বিরাট্ সুনিয়ন্ত্রিত প্রণালী। এই টীকার প্রাচুর্যের কারণ— সংস্কৃত-সাহিত্য ক্রমে ক্রমে উচ্ছ্বাসের বা স্বতঃ-প্রকাশের পরিবর্তে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছিল। বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারতের সঙ্গে লোক-জীবনের পূর্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, পরবর্তীযুগে ক্রমে সেই যোগ-সূত্র ছিন্ন হওয়ায় সাহিত্য প্রবেশ করছিল এক কৃত্রিম জীবন-লোকে, কল্পিত সংসারের মধ্যে। জ্ঞান-চর্চা প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সংবদ্ধ না হয়ে, পুস্তকে আবদ্ধ হচ্ছিল। তাই স্বাধীন-চিন্তার অভাবের ফলে এত টীকার উৎপত্তি। এ দ্বারা টীকা-টীপ্পনীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করছি, তা নয়। তবে চিন্তাধারার কারণ নির্দেশ করা যায় মাত্র। এই প্রকারের সমালোচনা সাহিত্যই আজ সেই অতীত-যুগের বিচ্ছিন্ন ধারাটী আমাদের কাছে খুলে রেখেছে, নচেৎ অতীত-যুগের জ্ঞান-যজ্ঞে আমাদের প্রবেশ-পত্রিকা তো বাজেয়াপ্তই হয়ে যেত।

আজ-কাল কাব্য-আলোচনা কথাটিকে আমরা সহজেই সাহিত্য-সমালোচনা নামে অভিহিত করি। কিন্তু এর চিরাচরিত নাম অলংকার-শাস্ত্র। তবে খ্রীষ্টীয় নবম শতক থেকে এই অর্থে সাহিত্য-শাস্ত্রের ব্যবহার আছে। কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর বলেছেন— "আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বিদ্যা দণ্ডনীতয়শ্চতস্রো বিদ্যা ইতি কৌটীল্যঃ। পঞ্চমী সাহিত্য-বিদ্যা। শব্দার্থয়োর্যথাবৎ সহভাবেন সাহিত্য-বিদ্যা॥"

এখানে কাব্য-শব্দের পরিবর্তে সাহিত্য-শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কাব্য বা সাহিত্য শব্দটীর পরে অন্য কোনও অংশ যোগ করে' অলংকার-শাস্ত্রের নাম দেওয়ার প্রথা বহুদিন থেকে চলে আসছে, যেমন কাব্যাদর্শ, কাব্য-প্রকাশ, সাহিত্য-কৌমুদী, সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি। কাব্যমীমাংসার এই কথায় এ-ও

প্রমাণিত হয় যে সাহিত্যের ক্ষেত্র ছিল ব্যাপক, সাহিত্য-আলোচনার দৃষ্টিও ছিল সর্ববিষয়ে পারদর্শিতার ফল। এর পরের যুগে সাহিত্য-দর্পণ-প্রণেতা সমালোচক বিশ্বনাথ সাহিত্য-শাস্ত্র বলতে অলংকার-শাস্ত্রকেই বুঝিয়েছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি বলেছেন— "সাহিত্যদর্পণমমুং বিলোক্য সুধিয়ঃ সাহিত্যতত্ত্বমখিলং সুখমেব বিত্ত" অর্থাৎ আমার এই সাহিত্য-দর্পণ পাঠ ক'রে সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি সাহিত্য-বিষয়ক যাবতীয় আলোচনা জানতে পারবেন। সুভাষিতরত্নভাণ্ডাগারে আছে— "সাহিত্যপাথোনিধিমন্থনোত্থং কাব্যামৃতং রক্ষত হে কবীন্দ্রাঃ" অর্থাৎ হে কবিগণ, তোমরা সাহিত্য-সমুদ্র-মন্থনের ফলে যে কাব্য-রূপ অমৃত উঠেছে, তাকে সযত্নে রক্ষা কর। অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন নাম থেকে বোঝা যায় যে সমালোচক রুচকের সময় থেকেই সাহিত্য-শব্দের প্রচলন হয়েছে। প্রায় ত্রিশখানি কাব্য-সমালোচনা-গ্রন্থের নামের পূর্বে সাহিত্য-শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কালক্রমে অলংকার-শব্দটীর অলংকার-রূপ বিশিষ্টার্থক শব্দের অর্থে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে 'অলংকার-শাস্ত্র'-নামের পরিবর্তে ব্যাপক অর্থে সাহিত্য শব্দই প্রচলিত হয়ে এসেছে। যাই হোক, সাহিত্য-আলোচনা প্রাচীন-ভারতে বেশ প্রসার ও আদর লাভ করেছিল। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে ৭০ খানি গ্রন্থেরও উপর। আর বিভিন্ন গ্রন্থালয়ে পাণ্ডুলিপির আকারে প্রায় ৩০০ খানি আলোচনা-গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে— এগুলি সবই মূল গ্রন্থ। এদের টীকা-টীপ্পনী তো আছেই। এ ছাড়া বিভিন্ন আলোচনা-গ্রন্থে ৪০।৪৫ খানি সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থের উল্লেখ আছে; সেই সব গ্রন্থের অনুসন্ধান হয় নি। এই বিরাট আলোচনার উৎপত্তি ও বিকাশ বহু-শতাব্দীর চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল।

ভারতীয়গণের সাহিত্য-সম্পর্কে গভীর মনস্তাত্ত্বিকতার ও অন্তর্নিহিত দৃষ্টির ফল এই অলংকার-শাস্ত্র। ভারতীয়-সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদে এ বিষয়ে সুসংবদ্ধ কোনও আলোচনা নাই— কিন্তু এর কিছু-কাল পরেই এ প্রশ্ন দেখা দিল যে কী-ধরনের কথা শ্রোতা বা পাঠকের মন আকর্ষণ করে, কোন কথা বা শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদন করে। এই থেকেই আরম্ভ হ'ল সাহিত্য-সমালোচনার আদি যুগ। তবে এই আলোচনা একটা

সুশৃঙ্খল শাস্ত্র-রূপ ধারণ করতে অনেক সময় নিয়েছিল। সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে "বাঙ্‌ময় বরবধূর" গল্পটী অনেকেরই পরিচিত। একদিন ব্রহ্মার সভাস্থলে সরস্বতীর পুত্র কাব্যপুরুষ কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে' গৃহত্যাগ করেন ও পরে দেশত্যাগী হন। তাঁর বন্ধু কার্ত্তিকেয়ের অনুরোধক্রমে গৌরী কাব্যপুরুষকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করে' গৃহবাসী করাবার উদ্দেশ্যে "সাহিত্য-বধূ"র সৃষ্টি করেন ও তাঁকে সাজিয়ে দিলেন নানা-দেশীয় বেশ-ভূষায়। তারপর তাঁকে গৌরী বললেন— "তোমার রূপ, গুণ ও অলংকারের মোহে ভুলিয়ে ফিরিয়ে আন ঘরছাড়া কাব্যপুরুষকে"। সাহিত্য-বধূ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, ব্রহ্ম, পুণ্ড্র, পাঞ্চাল, শূরসেন, হস্তিনাপুর, কাশ্মীর, বাহ্লীক, অবন্তী, সুরাষ্ট্র, মালব, মলয়, কুন্তল প্রভৃতি বহুদেশে কাব্যপুরুষকে অনুসরণ করলেন। অবশেষে বিদর্ভদেশে কাব্যপুরুষকে গান্ধর্ববিধি অনুসারে বিবাহ করেন ও হিমালয়ে গৌরী-সরস্বতীর নিকট ফিরে আসেন। সত্য হোক, মিথ্যা হোক— গল্পটী থেকে জানা যায় যে সাহিত্য-বিদ্যার উৎপত্তি দেবযোনি অর্থাৎ সমাজের উচ্চস্তরের বিদ্বান ও জ্ঞানিগণের কাছ থেকে, এর উৎপত্তি সারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-সম্পদ্ থেকে আর এর প্রচার ছিল সারা ভারতব্যাপী। এর উদ্দেশ্য রসিকজনের মনোরঞ্জন ও তৃপ্তিবিধান। আরও একটী প্রবাদ আছে যে জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী কাব্যকে রূপায়িত করলেন কাব্য-পুরুষরূপে, আর স্বয়ং ব্রহ্মার নির্দেশে এই পুরুষ নেমে এলেন মর্ত্যলোকে কাব্যরস-সিঞ্চনের জন্য। তিনি আঠারটী অধ্যায়ে সতের জন শিষ্যের মধ্যে কাব্য-সমালোচনার জ্ঞান ও বুদ্ধি বিতরণ করেন। এঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিদ্যা লিখে ফেললেন গ্রন্থের আকারে। সহস্রাক্ষ কবি-রহস্য, উক্তি-গর্ভ ঔক্তিক, সুবর্ণনাভ রীতি-নির্ণয়, প্রচেতায়ন অনুপ্রাস, চিত্রাঙ্গদ চিত্র এবং যমক, শেষ শব্দ-শ্লেষ, পুলস্ত্য বাস্তব, ঔপকায়ন উপমা, পারাশর অতিশয়, উতথ্য অর্থশ্লেষ, কুবের উভয়ালংকারিক, কামদেব বৈনোদিক, ভরত রূপক, নন্দিকেশ্বর রসাধিকার, ধীষণা দোষ, উপমন্যু গুণ এবং কুচমার ঔপনিষদিক বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কাব্যমীমাংসায় এই বিবরণ দেওয়া আছে— হয়ত, একে আমরা অবাস্তব বলে' উড়িয়ে দিতে পারি; কিন্তু এই পুস্তকগুলির অনেকগুলি লুপ্ত হয়েছে বা অন্য কোন গ্রন্থে রূপান্তরিত হয়েছে, এই কথাই সত্য বলে মনে হয়— কারণ এদের অভিমত পরবর্তীযুগের অনেক

বইয়েই পাওয়া যায়। তবে এটুকু নিশ্চয়ই সত্য যে সাহিত্য-আলোচনার এতগুলি দিক্, এতগুলি বিষয় ভারতে প্রচলিত ছিল।

এই বহুবিধ আলোচনার প্রাচীনতা অনুসন্ধান করতে গিয়ে সংহিতাযুগে কোনও সুসংবদ্ধ আলোচনা পাই না—কিন্তু ভাষার সৌসাম্য ও গুণাবলী সম্বন্ধে এমন কতকগুলি নাম, শব্দ-সমষ্টি বা মন্তব্য আছে, যাতে করে' সমালোচনা-দৃষ্টি ধরা পড়ে। ঋক্-সংহিতা রচনার সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচনার সূক্ষ্ম-দৃষ্টির উদ্ভব হয়। বাক্ বা কথার বিশেষণ দিতে গিয়ে বৈদিক কবি বললেন 'দিবিত্মতা বচঃ' (উজ্জ্বল শোভাযুক্ত কথা), পুরুস্পৃহকারং বিভ্রৎ (এমন শব্দ যা বহুজনের মনের মত), অফলামপুষ্পাং বাচম্ (এমন শব্দ যার ফুলও নাই, ফলও নাই অর্থাৎ দোষাবহ বিফল শব্দ-প্রয়োগ)। বেদের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী-কালে কবি ও কাব্য-শব্দের একত্র প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়। সাহিত্যশাস্ত্রের প্রশংসার মধ্যে আছে— "একঃ শব্দঃ সম্যগ্জ্ঞাতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুক্ ভবতি।" তবে শাস্ত্র হিসাবে সাহিত্যের আলোচনা বেদে নাই।

ব্রাহ্মণ-সাহিত্য প্রায়স্থলেই সংহিতা-সাহিত্যের আলোচনা। অনেকের মতে এগুলি কর্মকাণ্ডের বাদ-প্রতিবাদ। কিন্তু এগুলি বাদ-প্রতিবাদ নয়—এগুলি মন্ত্রের অর্থ-বিচার ও ব্যাখ্যামুখী আলোচনা; কারণ বাদ-প্রতিবাদে একটী অর্থ ঠিক করে' তার অনুকূল বা প্রতিকূল যুক্তি দেখানো হয়; কিন্তু ব্রাহ্মণের মন্ত্রার্থ-বিবেচনে আছে অর্থনির্ণয় নিয়ে পূর্বাপরসংগতিরক্ষা, ঔচিত্যবিচার ও ব্যাখ্যামুখী বিশ্লেষণ। ঐতশ-প্রলাপ প্রভৃতিকে বেদের অংশ বলা নিষ্প্রয়োজন মনে হয়, তবুও পাঠ্য। এ গুলি সাহিত্য-সমালোচনার আদি অবস্থা।

রামায়ণে একটী শ্লোক আছে—

"রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভী রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥"

—এ'থেকে বোঝা যায় সাহিত্যিক-রসের আলোচনা, তার বিভাগ রামায়ণের যুগে বেশ পুষ্টি ও বিকাশের পথে এগিয়েছিল। মহাভারতে বা পুরাণেও ঠিক এমনতর আলোচনা আছে; তবে তাকে আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনার শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশে অলংকার-শাস্ত্র বলতে সাধারণতঃ

যে ধারণা প্রচলিত, সেটা গড়ে উঠছিল। যাস্কও ঠিক এই ভাবের উল্লেখ করেছেন তাঁর উপমা-লক্ষণে।[১] যাস্কের মন্ত্র-ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ-মুখী আলোচনা। অগ্নিপুরাণের কয়েকটী অধ্যায়ে সাহিত্যের দোষগুণ,অলংকার প্রভৃতির আলোচনা আছে। অনেকে এই অংশ প্রক্ষিপ্ত বলে' মনে করেন। কিন্তু কাব্য-প্রকাশের টীকাকার মহেশ্বর বলেন যে নাট্য-শাস্ত্রপ্রণেতা ভরত অগ্নিপুরাণপ্রভৃতি থেকে নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।[২]

যাই হোক, এ পর্যন্ত যে সমস্ত সাহিত্য-আলোচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটল, সে সবার মধ্যে দুইভাবের সমাবেশ রয়েছে— (১) আধ্যাত্মিকতা-প্রবণ আলোচনা, যার ফল উপনিষদ্‌, বৌদ্ধগ্রন্থ, জৈনগ্রন্থ, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা (২) কর্মকাণ্ডপ্রধান আলোচনা, যার ফল ব্রাহ্মণ, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, প্রাচীন স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতির আলোচনার আধিক্য। কিন্তু এমন সময় তুরানীয় আক্রমণের ফলে দেশের প্রায় সব দিক দিয়ে হাওয়া গেল বদ্‌লে— ধর্মে, রাষ্ট্রে, সমাজে, সাহিত্যে লাগল নূতন ঢেউ— সবদিকে একটা পরিবর্তন এল। সাহিত্যেও ঐ আধ্যাত্মিকতা ও কর্মকাণ্ডপ্রবণতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ঐহিকতামুখী সরস কবিত্ব-আলোচনা দেখা দিল আর এখান থেকেই আরম্ভ হোল সত্যকার রসময় অলংকার-শাস্ত্র। প্রথমতঃ এর আরম্ভ প্রাকৃতের মধ্য দিয়ে, পরে সংস্কৃত একে আপন করে' নিল। এ দ্বারা এ কথা বোঝায় না যে, এর পূর্বে ভারতীয় সাহিত্যে ঐহিকতাবাদ বা রসময় চর্চা মোটেই ছিল না। তবে একথা সত্য যে খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর আরম্ভ থেকে এই তথাকথিত রসময় সাহিত্য-সৃষ্টি ও আলোচনা বেশ আধিক্য নিয়ে দেখা দিল ও সাহিত্য-চর্চার এই ধারাই উত্তরোত্তর বেশির ভাগ জায়গা দখল করল। এর নিদর্শন রয়ে গেছে সপ্তশতীতে। এর বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেকটী পদ্য স্বতন্ত্র আর কর্মকাণ্ডগত পরলোক-চিন্তা থেকে মুক্ত (প্রথম বা চতুর্থ শতাব্দী)। সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রেও এই ধারা। এই শাস্ত্রে প্রত্যেকটী শ্লোক বা কবিতা যেন স্বতন্ত্র

১ "অথাত উপমা যদেতৎ তৎসদৃশমিতি গার্গ্যস্তদাসাং কর্ম জ্যায়সা বা প্রখ্যাততমেন বা কনীয়াংসং বা প্রখ্যাতং বা উপমিমীতে; অথাপি কনীয়সা জ্যায়াংসম্।"—যাস্ক

২ "অগ্নিপুরাণাদিভ্য উদ্‌ধৃত্য কাব্যরসাস্বাদকারণং অলংকারশাস্ত্রং ভরতমুনিঃ কারিকাভিঃ সংক্ষিপ্য প্রণিনায়।"

আলোচনার বিষয়। সাংসারিক জীবনের ছোটখাট ঘটনার সাথে একটা নিবিড় সম্পর্কের পরিচয়, প্রেম ও করুণার ভাব, প্রেমিক-প্রেমিকার রসময়ী লীলা, তার ঘাত-প্রতিঘাত, গ্রাম-বধূটীর প্রেমের প্রকাশ-ভঙ্গী ও বিরহিণীর মর্মস্পর্শী চিত্র, বিভিন্ন ঋতুতে নায়ক-নায়িকার ভাবোন্মাদনা— যার সরস-বিন্যাস ও চিত্রাঙ্কন ভারতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপজীব্য, তারই সুসংবদ্ধ সুচিন্তিত ও সুনিপুণ বিশ্লেষণমুখী আলোচনার ফল আলোচনা-সাহিত্য বা অলংকার-শাস্ত্র। ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচক এই ভাবধারাকে আপন ক'রে নিয়ে নিজের আলোচনাকে নূতন ক'রে পুষ্ট করলেন। এই প্রকার সাহিত্য-আলোচনাই আকর্ষণ করল ভারতের সাহিত্যিক মনকে অধিক মাত্রায়— কারণ এই আলোচনার ক্ষেত্রে সমালোচক মুক্তি পেল আধ্যাত্মিক জটিলতা থেকে, কুশ আর বেদিসংস্কার থেকে, স্বর্গ বা মুক্তি-আলোর হাতছানি থেকে। এই থেকে সংস্কৃত কাব্য-আলোচনায় স্থান লাভ করল ভাষাগত ও ভাবগত সামঞ্জস্য ও সতর্কতা।

অলংকার-শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ আলোচনা করলে এই কথাই মনে পড়ে যে, সাহিত্য-আলোচনায় ছিল দুটী ধারা; পরবর্তীযুগে এই দুই ধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে এক হয়ে গেল— একটী ধারা যার প্রধান আলোচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় রস, আর দ্বিতীয় ধারা যার বিবেচ্য বিষয় ছিল অলংকার। প্রথম ধারাটী নাট্য-আলোচনা— এর আলোচনার বিষয় ছিল নাট্য-কলা, নাট্য-সাহিত্য; আর দ্বিতীয় ধারা যে অলংকার-আলোচনা, এর আলোচ্য বিষয় স্বতন্ত্র কবিতা। দুইই এসে কিন্তু শেষে এক হয়ে মিলে গেল। সমালোচকের দল স্বীকার করলেন যে প্রবন্ধ বা নাটকের মতো স্বতন্ত্র কবিতাতেও রস-আলোচনার প্রয়োজন আছে। এই মিলন ঘটালেন আনন্দবর্ধন-প্রতিষ্ঠিত ধ্বনি-সম্প্রদায়ের সাহিত্য-সমালোচকগণ। এর পূর্বে অলংকার-পন্থী সাহিত্য-সমালোচকরা রস-বাদীদের এতখানি আসন দিতে নারাজ ছিলেন— এঁরা ভরতের নাট্যশাস্ত্র রচনার পরবর্তী যুগের। তবে অলংকারের চর্চা তখনও কিছু না কিছু ছিলই। গিরনারে প্রাপ্ত মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের শিলা-লেখে অলংকার শাস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অলংকার-শাস্ত্রের কোনও গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। কারণ হালের সপ্তশতী

ইতিমধ্যে লিখিত ও প্রচারিত হয়েছিল। প্রথমতঃ কাব্য-রচনা, পরে কাব্য-আলোচনা। যেমন স্বতন্ত্র কবিতার বহর বেড়ে চলেছিল, তেমনি অলংকার-শাস্ত্র, নাটক ও স্বতন্ত্র কবিতার আলোচনায় মত্ত হয়েছিল বেশিমাত্রায়— আর সঙ্গে সঙ্গে অলংকারগ্রন্থ রচিত হচ্ছিল। পরিশেষে এই রস-আলোচনা অর্থাৎ একখানি গ্রন্থের আদ্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনা আর পৃথক্ পৃথক্ কবিতার অলংকারপন্থী আলোচনা— এই দুই আলোচনা-সম্প্রদায় যখন ধ্বনি-সম্প্রদায়-রূপে মিলিত-ভাবে আত্ম-প্রকাশ করল, তখন ভারতীয় সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এক প্রভাব-শালী নিরপেক্ষ স্বাধীন-চিন্তার উদ্ভব হল। কালক্রমে এই আলোচনার ধারা কেবল প্রচলিত সাহিত্যের আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয় নি, উপরংতু সাহিত্য-সৃষ্টির পথেও ইঙ্গিত জানিয়েছে। এরই ফলে সংস্কৃত-সাহিত্য-সৃষ্টি দিনে দিনে কাব্য-আলোচনার নির্দেশ-অনুসারী হয়ে পড়ল।

সে যুগে কাব্য-সমালোচনা আধুনিক যুগের এক-একখানি গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ বিষয়বস্তু নিয়ে হয় নি ; তবুও সাহিত্য-আলোচনার সম্পূর্ণ নিপুণতম পরিচয় আছে প্রত্যেক অলংকারগ্রন্থের দোষ-পরিচ্ছেদে। দোষের সাধারণ সংজ্ঞা যদিও রসানুভূতির বিঘ্ন, তবুও বিস্তৃত-ভাবে এই দোষকে তাঁরা ভাগ করেছেন তিন ভাগে— (১) রসদোষ (২) শব্দদোষ (৩) অর্থদোষ। শ্রুতিকটুত্ব, ব্যাকরণগত ভুল, অশ্লীলতা, গ্রাম্যতা, অপ্রচলিত শব্দপ্রয়োগ, বিরুদ্ধমতিত্ব, ছন্দোভঙ্গ, প্রক্রমভঙ্গ, পুনরুক্তি, রুচিবিরুদ্ধতা, আকস্মিক সমাপ্তি, অতিবিস্তার, বিরুদ্ধ-রস-পরিবেশন প্রভৃতি দোষ সর্বদাই বর্জনীয়। এ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, সাহিত্য-আলোচনাতে পাঠক এবং শ্রোতাকেই সম্মুখে রেখে তার মনস্তত্ত্বের দিক্ থেকেই সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার করা হ'ত। গুণ আলোচনায়ও দেখা যায়, কতকগুলো গুণ সাহিত্যে থাকা চাই— যাতে সাহিত্য হবে পাঠকের কাছে সমাদৃত। তবে যেখানেই এই গুণ-দোষের বিচার আছে, সেখানেই যেন এক-একটী স্বতন্ত্র কবিতাই এদের উপজীব্য। তাই ব'লে সমস্ত গ্রন্থ-আলোচনা একেবারে বাদ পড়ে নি। কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণকার প্রবন্ধের মূল-রস অব্যাহত রাখাকেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষ বলেছেন— তবুও একথা সত্য যে একটী একটী শ্লোক কিরূপ শব্দ-বিন্যাসের ফলে, কি ছন্দের প্রবর্তনে, কি ভাবের অনুগ্রন্থনে মনোহারী ও

রমণীয় হয়ে ওঠে, এই কথাই প্রধানতঃ আলোচিত হয়েছে। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন শ্লোক বা কবিতাগুলো মুক্তার মতো সূত্র-সাহায্যে যদি মালার আকারে সুবিন্যস্ত না হয়, তবে মিলিত সৌন্দর্য অসম্ভব। এই আলোচনা কম হলেও একেবারে দৃষ্টি এড়ায় নি। সাহিত্যে কাব্য, খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, গদ্যকাব্য, ঐতিহাসিক কাব্য, কত-প্রকার শ্রেণী আছে। এ সবারই মূলে রয়েছে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত অংশের একত্র সমাবেশ। এই সংহতি বা সমাবেশের মূল-সূত্র কি? ভরতের নাট্যশাস্ত্রে "পঞ্চ-সন্ধি ও সন্ধ্যঙ্গ" অধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তর আছে। তবে ভরতের প্রধান আলোচ্য বিষয় দৃশ্যকাব্য। এই আলোচনার মূল-সূত্র হ'ল ঘটনা-প্রবাহের ঐক্য (unity of action); নায়কের কোন উদ্দেশ্য-সাধনের আরম্ভ অর্থাৎ ইচ্ছা; ঐ বিষয়ে চেষ্টা বা যত্ন; প্রথমতঃ সাফল্যের সম্ভাবনা, প্রাপ্ত্যাশা, পরে একাগ্র নিশ্চয়তা, নিয়তাপ্তি এবং সর্বশেষে সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ ফলাগম। নায়কের এই পাঁচটী মানসিক অবস্থার ক্রম-অনুযায়ী নাটকের ঘটনাবলীর মধ্যেও বিষয়-বস্তু এগিয়ে চলে পাঁচটী সন্ধির মধ্য দিয়ে;— যেমন মুখ অর্থাৎ আরম্ভ, প্রতিমুখ (অগ্রগতি), গর্ভ (বিষয়-বস্তুর বিকাশ), বিমর্শ (জোয়ারের মাঝে হঠাৎ ভাঁটা), নিবর্হণ অর্থাৎ পরিসমাপ্তি। নাটক মানুষের জীবনের ছবি; তাই বাস্তবজীবনে কোনো বিষয় লাভ করতে যেমন তার নানা চেষ্টা, আশা-নিরাশা, সাফল্য, ঠিক তেমনি ঘটে নাটকীয় ঘটনাবলীতে। ভারতীয়গণ সাহিত্যকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখেন নি। এখানেই ধরা পড়েছে সাহিত্যজগতে ঘটনাগত ঐক্য।

সাহিত্য-রচনায় কেবল নাটকের মধ্যেই যে এই মূলসূত্র নিবদ্ধ ছিল, তা নয়। সাহিত্য সমালোচকরা উপলব্ধি করেছেন যে কাব্যজগতেও এই ঐক্য ও সৌসাম্য আছে। ধ্বন্যালোক-রচয়িতা দেখিয়েছেন যে কি ভাবে সমস্ত গ্রন্থে রসের অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা যায়। এর একটী উপায় সন্ধি ও সন্ধির অঙ্গগুলির সংগত সমাবেশ— এর উদ্দেশ্য রসের অভিব্যক্তির সহায়তা। সাহিত্যদর্পণে বিশ্বনাথও এই কথাই বলেছেন যে সমস্ত গ্রন্থে একটী প্রধান রস থাকে; তারই পরিপুষ্টির জন্য বিচিত্র নানারসের অবতারণা। Technique-এর দিক্ থেকে উপায়-নির্দেশ বেশ স্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। নাটকের পতাকাস্থানে, কাব্যের প্রতি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের সূচনায় ঘটনাবলীর

ঐক্য-বিধানের একটি চেষ্টা প্রকাশ পায়। কাব্য-সমালোচকের মতে এই ঐক্য বিষয়-বস্তুর ক্রম-বিকাশ বা কাহিনী-বর্ণনার একটি সৌন্দর্য ও কৌশল। তবেই দেখা গেল যে সমস্ত-গ্রন্থের আলোচনা প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচকদের দৃষ্টি এড়ায় নি। এঁদের মতে আরম্ভের মধ্যে অর্থাৎ বীজের মধ্যেই ফলের পরিণতি, ইংরেজীতে যাকে বলে 'The effect must be present in the cause'। একে আমরা বলতে পারি সাহিত্যিক 'সৎকার্যবাদ'।

২

কাব্য-সমালোচকেরা চিন্তা করেছেন যে কবি কি উদ্দেশ্যে কাব্যরচনা করেন— তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে, যশোলাভ, অর্থলাভ, সংসারের রীতিনীতির জ্ঞানলাভ, অকল্যাণের হাত থেকে মুক্তিলাভ— এই সব সকাম প্রেরণাই কাব্য বা সাহিত্য-রচনার মূল কথা। কিন্তু এর চেয়েও মহদুদ্দেশ্য আছে; সে হচ্ছে আনন্দ-লাভ, আনন্দের অনুভূতি, পাঠক ও শ্রোতাকে আনন্দ-দান। এই উদ্দেশ্যই চরম উদ্দেশ্য।

এ ছাড়াও একটী কঠিন প্রশ্নের সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচকেরা বললেন যে, কাব্য-রচনার মূলে আছে কবির প্রতিভা, নিপুণতা, লোক-শাস্ত্রে গভীর অভিজ্ঞতা, আর কাব্যতীর্থে যাঁরা উত্তীর্ণ বা রচনায় যাঁদের পাকা হাত, যাঁরা কাব্যের ভালো-মন্দ বিচারে পটু অর্থাৎ সমালোচক-সম্প্রদায় তাঁদের নিকট শিক্ষালাভ। প্রশ্নটি আরও জটিলতর হ'ল যে কবির রচনা-শক্তি অর্থাৎ প্রতিভা কি কবির এই জীবনের অর্জিত সম্পদ্ না পূর্ব-জন্মের পুণ্য-ফল। এ বিষয়ে বহু বাদ-বিতণ্ডা আছে। তবে এটুকু সত্যি যে রচনা-শক্তিকে আমরা প্রতিভা বলতে পারি।

রাজশেখরের ন্যায় কাব্যসমালোচক বা সাহিত্যের সমজদার কবি-প্রতিভাকে ভাগ করেছেন দুই ভাগে— (১) কারয়িত্রী প্রতিভা— এই প্রতিভার ফলে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়; এমন প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে বলি কবি বা সাহিত্যিক (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভা হচ্ছে ভাবয়িত্রী প্রতিভা— এর সাহায্যে হয় সাহিত্যের আলোচনা; এইরূপ প্রতিভাবান্ ব্যক্তিকে বলা হয় ভাবক বা সমালোচক। এঁরা উভয়েই আলোচক। স্রষ্টা আর

সমালোচকের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। রাজশেখর বলেন, কবি তাঁর কল্পনার মায়া দিয়ে নিজস্ব মন্তব্যটীকে রূপে ও রেখায়, গল্পে ও গানে প্রকাশ ক'রে অন্যকে আনন্দিত করেন; আর ভাবক অর্থাৎ সমালোচক এই কল্প-সৃষ্টির জগতের সঙ্গে তাঁর দেখা-জগতের তুলনামূলক আলোচনা ক'রে থাকেন। সমালোচক কিছু সৃষ্টি করেন না, বিশেষ বিশেষ সাহিত্য-সৃষ্টিকে সত্যের কষ্টি-পাথরে বিচার ক'রে তার মূল্য নিরূপণ করেন। তাই সাহিত্য-আলোচকের আসন কবিরই সম-পর্যায়ে। ভাবক বা সহৃদয় অর্থাৎ সমালোচক এবং কবির প্রতিভাতে বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। সমালোচকের সম্মান ছিল যথেষ্ট; তাই বিখ্যাত রস-তাত্ত্বিক ও প্রাচীন সাহিত্য-সমালোচক অভিবনবগুপ্ত তাঁর ধ্বন্যালোকলোচনে মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বললেন— "সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যম্" অর্থাৎ কাব্যরস-বোধ কবি ও সমালোচকের অধিকৃত। তাই সাহিত্যের ক্রম-বিকাশের পথে সমালোচনার মূল্য যথেষ্ট। সমালোচনার সহযোগিতায় সাহিত্য-সৃষ্টি এক-ঘেঁয়েমির আবর্জনা কাটিয়ে মুক্ত হ'তে থাকে। এই আলোচনার ফলে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত হয়, তার বিচার-শক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আলোচনার ফলে শ্রোতা এবং পাঠকের মন যখন অধিক পরিমাণে বিকশিত ও বিস্তৃত হয়ে ওঠে, তখনই সেখানে গভীরতর ও বিশালতর সাহিত্য-সৃষ্টির তাগিদ আসে। অভিনবগুপ্ত, বোধ হয়, এই কথাই মনে করেছিলেন যে উন্নতশ্রেণীর পাঠক এবং শ্রোতার অস্তিত্বই সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা জাগিয়ে বড় সাহিত্যিক ও শিল্পীর জন্মকে সম্ভব ক'রে তোলে। এই কথারই সমর্থন করে গেছেন দেড় হাজার বৎসরের পূর্বেকার মহাকবি কালিদাস—

"আ পরিতোষাদ্ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্যপ্রত্যয়ং চেতঃ ॥"—অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।

সমালোচকরাই কাব্যসোনার কষ্টি-পাথর। এই নিকষে ঘ'ষে যাঁদের কাব্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তাঁরাই সত্যিকার কবি। কারণ, তাঁরা সত্যিকার দোষ-গুণের বিচারক। এই সমালোচকদের শ্রেণি-বিভাগ নিয়ে একটী গল্প আছে— এক কবিকে কেউ প্রশ্ন করলেন, আপনি কে; কবি উত্তর দিলেন— "আমি কবি।" "আচ্ছা, একটী নতুন কবিতা পড়ুন না।" কবি বললেন— "আমি কাব্যচর্চা ছেড়ে দিয়েছি।" "কেন?"। কবি উত্তর দিলেন— "শুনুন, যে কবি কাব্যের

দোষগুণ বিচারে সক্ষম, তিনি সৎকবিই, তাঁকে আলোচক বলতে পারি না; আর যদিই বা তিনি আলোচক, তবে তিনি কিছুতেই পক্ষপাতী না হয়ে পারেন না। কারণ সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচক হাজারে মেলে একটী; আবার এমন আলোচক না পেলে কাব্যও নীরস ও নিষ্ফল হয়ে পড়ে। পাঠক তো হাজার হাজার, কাব্যও পাওয়া যায় হাজার-হাজার; কিন্তু সেই কাব্যই কাব্য যা সমজদার পাঠকের মনকে নাড়া দেয়, একটী দাগ কেটে দেয়।"

গল্পের বাদানুবাদ থেকে এটুকু বোঝা যায় যে, কবি ও সমালোচক পরস্পর আশ্রয়ী; সে রূপ রূপই নয়, যদি সেই রূপের দ্রষ্টা না থাকে; তেমন রস-পরিবেশন বা সাহিত্য-সৃষ্টি ব্যর্থ, যদি না থাকে রসিক বা সমালোচক।

একদিন রাজা ভোজের দরবারে একজন কবি আর একজন সমালোচকের মধ্যে বিতর্ক আরম্ভ হয়। সমালোচক বললেন—"সমালোচকরাই কবির কাব্যকে সরস ও চমৎকার ক'রে তোলে।" কবি এ-কথা অস্বীকার করে বললেন—"আসলে যদি কবি কাব্যখানি সরস ক'রে রচনা না করেন, সমালোচক তাতে রসের জোগান দেবেন কোথা থেকে"। সমালোচক উত্তরে বললেন—"আচ্ছা, প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিচ্ছি; যে কোনো একটী কবিতা রচনা ক'রে দিন"। সন্ধ্যাবেলা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে আম্রলতিকা; মৃদু-মন্দ সমীর এসে দুলিয়ে গেল তাকে। এই উপলক্ষ্য ক'রে কবি রচনা করলেন—"বায়ু আম্রলতিকাকে বললে, "সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে; আমি এসেছি দূর মলয়গিরি থেকে; হে লতিকে, আজিকার এই রাত্রি তোমার ঘরে বিশ্রাম করব"[১]। বায়ুর কথা শুনে নব-মুকুলিতা আম্র-লতিকা গ্রীবাদেশ হেলিয়ে বলল—"না, না, না।" সমালোচক কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, আপনি তিনবার না-শব্দটী ব্যবহার করলেন কেন?" কবি উত্তর দিলেন—" 'না' শব্দটী তিনবারই চাই, নচেৎ যে ছন্দ থাকে না"। সমালোচক—"আজ্ঞে, না, তিনবার না-পদ ব্যবহার করাতে কবির এই তাৎপর্য যে, আম্রলতিকা সমীরকে বলেছিল যে তিন

১ ইয়ং সন্ধ্যা দূরাদহমুপগতো হন্ত মলয়াৎ,
তবৈকান্তে গেহে তরুণি বত নেষ্যামি রজনীম্।
সমীরণোক্তৈবং নবকুসুমিতা চ্যূতকলিকা,
ধুনানা মূর্ধানং নহি নহি নহীত্যেব কুরুতে॥

দিন তুমি আমার গৃহে থাকতে পার। এই যদি না হবে, তবে 'নবকুসুমিতা' 'একান্ত' অর্থাৎ নির্জন এই বিশেষণগুলো ব্যর্থ হয়ে যায়।" এই শ্রেণীর যে সমালোচক এঁরা সরস-হৃদয় সমালোচক। এঁদের চেষ্টায় কবির অজ্ঞাতসারেও সাহিত্যে রসের আবিষ্কার ধরা পড়ে। এ ছাড়াও, সমালোচকগণের আরও দুটী শ্রেণী আছে— কাব্য-রসের রসাস্বাদ করেন তাঁরা সবাই, তবে কেউ প্রকাশ করেন, কেউ বা প্রকাশ করেন না।

কবির শিক্ষা কি ভাবে হওয়া উচিত, এই প্রসঙ্গে কাব্যপ্রকাশকার মম্মট বলেছেন যে কবিরা শিক্ষালাভ করবেন 'কাব্যজ্ঞ'দের কাছে। এই কাব্যজ্ঞ কে? কাব্যজ্ঞ তাঁরাই যাঁরা কাব্য-রচনা করতে পারেন ও কাব্য-বিচার করতে পারেন। তাই সাহিত্য-বিচারকের স্থান সমাজে কম উচ্চে নয়।

এই বিচারকের যোগ্যতা অর্জন করা যায় কেমন ক'রে? কবি যে শিক্ষা, যে আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁর কবিত্বশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন বা কবিত্বের প্রকাশ করেন, একজন সাহিত্যসমালোচকের বেলাতেও ঠিক সেই কথা খাটে। কবির মত তাঁরেও শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, তর্কশাস্ত্র, ঔচিত্যবিচার প্রভৃতি যাবতীয় বিদ্যা ও উপবিদ্যায় যথাসম্ভব জ্ঞান রাখা চাই। উপরংতু কবি হয় ত চিন্তা করেন একদিকে, কিন্তু আলোচকের চিন্তা থাকবে সর্বতোমুখী— নচেৎ বিচার-বুদ্ধি সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সমালোচকের মন হবে সর্বদাই জাগরুক, তাঁর দৃষ্টি হবে উদার, দূরদর্শিতা হবে নিপুণ ও গভীর। এক কথায় তিনি হবেন সর্ব-বিষয়ে সদা- জাগরুক গ্রাহিকা-শক্তি ও সারগ্রাহী-দৃষ্টিসম্পন্ন। প্রত্যেক জিনিসের বাস্তব রূপ যেন তাঁর চোখে প্রথম ধরা পড়ে; তিনি যেন আপন-খেয়ালে বস্তুরূপটী বিকৃত ক'রে না দেখেন। এ সবার উপরে সাহিত্য-বিচারের আসনে ব'সে তিনি হবেন পক্ষপাতিত্বহীন— ব্যক্তিগত রুচি, ব্যক্তিগত শিক্ষা, ব্যক্তিগত দেশ, জাতি, কাল, সম্প্রদায় এই সবার প্রভাব থেকে মুক্ত মনে বিচারশক্তির সাহায্যে সম্যক্দৃষ্টি নিয়ে যে আলোচনা তাকেই বলে সত্যিকারের সমালোচনা। সম্যক্দৃষ্টিই সমালোচকের প্রাণ-শক্তি। সমালোচকের কি মূলধন থাকা চাই, যাতে তার আলোচনার ব্যবসা চলবে অটুটভাবে। তার একটী বিশিষ্ট শিক্ষা চাই— এই শিক্ষার ফলে তিনি পাবেন জ্ঞান ও সংযম— জ্ঞানের প্রয়োজন এইখানে যে তাঁদের জ্ঞানের ও দৃষ্টির উদারতা

বাড়ে, বিচারের শক্তি বাড়ে; আর মনঃসংযম চাই ঐ জ্ঞানকে সুপথে কার্যকরী করবার জন্য। তাই ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে সমালোচকের আসন তাঁর, যাঁর আছে সম্যক্ দৃষ্টি ও মনঃ-সংযম।

কাব্যমীমাংসা, ভোজপ্রবন্ধ ও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে কাব্য-গোষ্ঠী, কবি-সমাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এই সব সভায় মৌখিকভাবে সাহিত্য-আলোচনা প্রভৃতি চলত অবাধে; রাজারাই ছিলেন এই সব সাহিত্য-সভার অনুষ্ঠানসম্পাদক ও উৎসাহদাতা। এই অধিবেশনের জন্য একটী সভামণ্ডপ থাকত—ঐ সভামণ্ডপের ষোলটী স্তম্ভ, চারটী দরজা আর আটটী মত্তবারণী। এর সংলগ্ন থাকত খেলা-ঘর। সভার মধ্যস্থলে চারিটী স্তম্ভযুক্ত এক-হাত উঁচু একটী বেদি—এই বেদিই রাজার আসন; কারণ তিনিই সভাপতি। উত্তরদিকে সংস্কৃত-কবিদের পিছনে বেদ-জ্ঞানী, নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, স্মার্ত, চিকিৎসক, জ্যোতিষী; পূর্বদিকে প্রাকৃত-কবিদের পিছনে নট, নর্তক, গায়ক, বাদক, কুশীলব, প্রভৃতি; পশ্চিমদিকে অপভ্রংশ-কবিদের পিছনে চিত্রকর লেপকার, মণিকার, জহুরী, সোনার ইত্যাদি; আর দক্ষিণদিকে পৈশাচী-ভাষার কবির পিছনে বেশ্যা,-লম্পট, বেশ্যা প্রভৃতি। এইরূপ সর্বজনসমবেত সভাস্থলে কাব্যালোচনার মধ্য দিয়ে রাজারা সাহিত্যের পরীক্ষা অর্থাৎ দোষগুণের বিচার করতেন। পারিতোষিকের ব্যবস্থাও ছিল। কাব্য "যদি লোকোত্তরচমৎকারী অর্থাৎ উত্তমশ্রেণীর হ'ত, তবে কবির সম্মানও ছিল সেইরূপ। এই কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ত কিছুদিন অন্তর অন্তর। সম্মেলনে উপস্থিত মত কাব্য-রচনা ও শাস্ত্রবিচারও প্রচলিত ছিল। কাব্য, সাহিত্য ও শাস্ত্রালোচনার পরে আসত বিজ্ঞানীদের পালা। বিদেশীয় পণ্ডিত কেহ উপস্থিত থাকলে, তাঁর সঙ্গে দেশীয় পণ্ডিতগণের শাস্ত্রবিচার ও যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা ছিল—হয় ত তাঁদের মধ্যে কেউ বা রাজার সভাকবির পদলাভ করতেন। বড় বড় শহরে কাব্য বা সাহিত্য আলোচনার জন্য ব্রহ্ম-সভা আহ্বান করা হ'ত। আলোচনায় সব চেয়ে পারদর্শী প্রতিপন্ন হ'তেন যিনি, তাঁর ভাগ্যে জুটত ব্রহ্মরথযান ও পট্টবন্ধ। কালিদাস, মেণ্ঠ, অমর, ভারবি প্রভৃতি এই সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। কবিকে রথে বসিয়ে রাজার নিজহাতে রথ চালিয়ে যাওয়ার নাম 'ব্রহ্মরথযান'

আর স্বর্ণমুকুট ও বহুমূল্য পাগড়ী-বন্ধন হ'ল পট্টবন্ধ। সাহিত্য-আলোচনা যে কত সম্মানের ও আদরের বস্তু ছিল, তা এ থেকে বেশ বোঝা যায়।

মানুষের মনোবৃত্তি প্রাচীন যুগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি। মানুষ বাদলায় নি। তাই হাজার বছর আগেও সাহিত্য-জগতে চুরি-বিদ্যাটা নেহাত অজানা ছিল না— সাহিত্য-জগতে শান্তি-ভঙ্গের এই কারণ সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই তাঁরা কবি ও সাহিত্যিককে সাবধান করলেন যে, তাঁরা যেন অসম্পূর্ণ কাব্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সামনে না পড়েন —নূতন রচনাও যেন মাত্র একজনের সামনে না বাহির করেন ; কারণ ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ রচনাকে জন-সমাজে আপনার ব'লে প্রকাশ করতে পারেন। এই যে অন্যের রচিত শব্দ বা অর্থ আপনার প্রবন্ধে ব্যবহার একে নিশ্চয়ই বলব 'কাব্য-হরণ' বা 'বিদ্যা-চুরি', ইংরেজীতে যাকে বলে 'plagiarism'। শব্দের চুরি পাঁচ-রকম— (১) একটী পদ (২) শ্লোকের এক-চরণ (৩) শ্লোকের দুই-চরণ (৪) সম্পূর্ণ শ্লোক (৫) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ। তবে অন্যের ব্যবহৃত পদ বা শ্লোক ব্যবহার না-করা অসম্ভব। তাই একটী কথা আছে "নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনো নাস্ত্যচৌরো বণিগ্‌জনঃ।" অর্থাৎ এমন বণিক্ নাই যে চোর নয়, এমন কবি নাই যিনি চোর নহেন। কবির মধ্যে কেহ নূতন রচনা করেন, কেউ বা অন্যের রচনার মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন এনে আপনার বলে প্রচার করেন— কেহ বা ভাবের ঘরে চুরি ক'রে বাইরের ভোল বদলে দেন ; আর কেহ বা চুরি না ক'রে দিনে ডাকাতি করেন, অন্যের সম্পূর্ণ কাব্যকে নিজের রচনা বলেন। তবে এইরূপ সদ্যঃ-চোর যে সব সাহিত্যিক তাঁদিগকে সমালোচকের তীক্ষ্ণ-দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে— তাঁরা উচ্ছিষ্ট-ভোজী অর্থাৎ নিকৃষ্টস্তরের জীব— "কৃতপ্রবৃত্তিরন্যার্থে কবির্বান্তং সমশ্নুতে"।

ভারতীয় যে কোনো একখানি সাহিত্য-আলোচনার গ্রন্থ আলোচনা করলে দেখি, তাঁদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে—(১) কাব্য বা সাহিত্যের লক্ষণ অর্থাৎ কাব্য বা সাহিত্যের প্রাণ-ধর্ম বা আত্মা কি, কোথায় এর বৈশিষ্ট্য —এই আত্মা কি রস অর্থাৎ আনন্দানুভূতি, না অলংকার, না রীতি, না ধ্বনি, না অন্য কিছু। একথা সত্যি যে শব্দ ও অর্থ নিয়েই সাহিত্য— কিন্তু শব্দ ও

অর্থকে ছাড়িয়েও অন্য কিছু আছে— সেটা কি, এই নিয়ে আলোচনা (২) শব্দ কি করে' অর্থ প্রকাশ করে, তার কত প্রকার অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতা আছে— এই অর্থগুলির তারতম্য-আলোচনা— এককথায় এই আলোচনাকে শব্দ-দর্শন বলা যায় (৩) সাহিত্যক্ষেত্রে যে বিভিন্ন প্রকৃতির নায়ক-নায়িকা বা চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটে, তাদের পরস্পর সম্বন্ধ, ভাব, আবেগ, রুচি, মানসিক বৃত্তির একটা আলোচনা (৪) রসের অনুভূতি ঘটে কেমন করে— সাহিত্যে রসসৃষ্টির কি প্রয়োজন—রসানুভূতির পূর্বাপর অনুষঙ্গ— রস কি ও কত প্রকারের (৫) কাব্যের দোষ-গুণ বিচার— কাব্যের বিভিন্ন শাখা— নাটক, আখ্যায়িকা, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদ্য, পদ্য প্রভৃতি (৬) নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা— নাটকের পরিবেশ, প্রকার-ভেদ ইত্যাদি (৭) অলংকার আলোচনা। এক কথায়, ভারতীয় সাহিত্য-আলোচনার বিষয়-বস্তু হচ্ছে সাহিত্যের উৎপত্তি, সাহিত্যের প্রাণ-ধর্ম, প্রকারভেদ, দোষগুণ বিচার, সাহিত্যিক রচনা-ভঙ্গী। বিস্তৃতভাবে দেখলে নৃত্য, গীত প্রভৃতিও এর আলোচ্য-বিষয়।

এই বিরাট্-সাহিত্য-সমালোচনা যে নির্বিরোধে গতানুগতিক বাঁধা রেলপথের উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছিল তা নয়— স্বাধীন সাহিত্যিক চিন্তা ছিল এই আলোচনার উন্নতির মূল। তাই সাহিত্যের প্রাণ-বস্তু কি এই নিয়ে আমাদের দেশে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন মত-বাদ ও সম্প্রদায়— এই মতবাদের একটী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার পর যে আর একটীর উদ্ভব হয়েছে সে নয়। এরা পাশাপাশি চলে এসেছে। নামের দিক্ দিয়ে বলা যেতে পারে (১) রস-সম্প্রদায় (২) অলংকার সম্প্রদায় (৩) রীতি সম্প্রদায় (৪) ধ্বনি সম্প্রদায়। কাহারও কাহারও মতে বক্রোক্তি একটী পৃথক সম্প্রদায়— তবে একে অলংকারের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

রস-সম্প্রদায়ের প্রাচীনতম আলোচক বলে' ভরতকেই আমরা জানি— যদিও তিনি প্রধানতঃ নাট্যশাস্ত্রের আলোচক, তথাপি সাহিত্য-সম্বন্ধে তাঁর সাধারণ উক্তি অগ্রাহ্য নয়। ভরত রসের অর্থাৎ আনন্দের অনুভূতি এবং বিভিন্ন উপযোগী ভাবের সমাবেশকেই সাহিত্যের প্রাণ-ধর্ম বলেছেন। তবে রসের স্বরূপ ব্যাখ্যা-কালে ধ্বনি-সম্প্রদায়ের ব্যঞ্জনার কথা তিনি আভাষ দিয়ে গেছেন। ভরত কয়েকটী অলংকারের কথা, গুণের কথাও যে না বলেছেন,

তা নয় ; তবুও তাঁর মতে সাহিত্যে বা কোনও রচনায় গুণ অলংকার প্রভৃতি থাকা সত্ত্বেও যদি রসের অভিব্যক্তি অসম্পূর্ণ থাকে, তবে সে সাহিত্য-রচনা নিরর্থক— রসসৃষ্টিই সাহিত্যের মূল কথা। কিন্তু এই রসসম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী একটী সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠল— ভামহ এঁদের পথ-প্রদর্শক। এঁরা বলেন যে বক্রোক্তিই সাহিত্যের প্রাণ-বস্তু। এই বক্রোক্তিই সকল অলংকারের মূলে— ভরতের রসও এই বক্রোক্তির অন্তর্গত। এই বক্রোক্তি কি ? কল্পলোকে বিহার করেন যিনি তিনিই কবি আর সেই কল্প-লোকের অলৌকিক বস্তুর প্রতি নির্দেশ করে যে অসাধারণ ভাষা তাই কবির ভাষা, তাই সাহিত্য। তাঁদের মতে সাহিত্যের নিরবদ্য আকর্ষণ ও মনোহারিত্ব সেইখানে, যেখানে অতীত ও ভবিষ্যৎ দুইই মনে হয় প্রত্যক্ষ বর্তমান। ইহাই ভাবিক অলংকার। সাহিত্যের এই শক্তি নির্ভর করে ভাষার চাতুর্যের উপর, নব নব ভাবোন্মেষের উপর। রসও এই বক্রোক্তিরই অন্তর্গত। বক্রোক্তির ফলে বিষয়গুলি সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে কল্পনার আলোকে— রসও তাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এঁর পরে বক্রোক্তি-জীবিতকার ধ্বনি অর্থাৎ suggestionকেও বক্রোক্তির (Imaginative speech) অন্তর্গত করেছেন। এর মধ্যেই আর একটী মতবাদ দেখা দিল— এটী হচ্ছে রীতি-সম্প্রদায় (school of style)। এর প্রাচীন লেখক দণ্ডী ও বামন। রীতিসম্প্রদায় ভামহেরও পূর্ববর্তী। তাঁর মতে প্রকাশ-ভঙ্গীই সাহিত্যের প্রাণ— সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গীর মূলেই আছে প্রসাদ, মাধুর্য, ওজস্বিতা প্রভৃতি গুণাবলী।

গুণের দ্বারা প্রকাশভঙ্গী হয় প্রাণ-বান্ আর অলংকারের দ্বারা দেহ হয় সৌন্দর্যমণ্ডিত। এই প্রকাশ-ভঙ্গীর ফলেই সাহিত্য ও দর্শন-শাস্ত্রের ভেদ। বিশিষ্ট পদ-রচনাকে তাঁরা বলেন রীতি। রসানুভূতিকেও তাঁরা বাদ দেন নাই। এই সমস্ত মতবাদ বিবেচনা করে' গড়ে উঠল ধ্বনি-সম্প্রদায়। এঁদের মতে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা অর্থাৎ suggestionই কাব্যের মূলতত্ত্ব। শব্দকে ছাড়িয়েও শব্দ ও অর্থ পাঠকের মনে ধ্বনিত করে অভিনব অর্থ— এই অর্থ রস, অলংকার বা বিষয়বস্তু হ'তে পারে। এই ব্যঞ্জনার উপরই নির্ভর করে কাব্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ।

যাবতীয় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-আলোচনাকে মোটামুটী আটভাগে

ভাগ করা যায়—(১) ভাষার অর্থ প্রকাশিনী শক্তি বিচার ও বিভিন্ন অর্থ-আলোচনা (২) সাহিত্যের প্রাণ-ধর্ম-বিচার ও তার স্বরূপ (৩) রস-মীমাংসা, যাকে পাশ্চাত্ত্য ললিত-কলা-আলোচনার সঙ্গে তুলনা করা যায় (৪) নায়ক-নায়িকাগত বিভিন্ন মানসিকভাব বা মনোবৃত্তির উত্থান, পতন, বিকাশ প্রভৃতির তাত্ত্বিক আলোচনা (৫) ভাষার দোষ, গুণ ও অলংকার বিচার (৬) নাট্যকলার আলোচনা (৭) কাব্যস্বরূপ নির্ধারণমুখী দোষ-গুণ প্রভৃতি বিচার (৮) ললিত-, কলা বা সৌন্দর্যতত্ত্বের বা অনুভূতির মূল মনস্তত্ত্ব।

ভারতীয় সাহিত্য-আলোচনা করে' সমালোচকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, মানুষ শৈশব, বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্যের স্বাভাবিক প্রেরণায় ও শিক্ষা-দীক্ষায় বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশের তারতম্যানুসারে এই প্রসারশীল জগতের অংশরূপে গীতে, নৃত্যে, কবিতায়, কথা-কাহিনীতে চিত্রে নানাভাবে নূতন নূতন সৃষ্টি করছে এবং বহুভঙ্গিমায় অনন্তছন্দে নানা মূর্ছনায় তার বাঙ্ময় প্রকাশ লোকসমাজে উপস্থিত করছে। এর প্রত্যেকটীই ভাবসৃষ্টির বাহকরূপে সাহিত্য ব'লে পরিচিত হবার দাবি রাখে। এঁদের শেষ-সিদ্ধান্ত এই যে, সাহিত্যে, বিশেষভাবে কাব্যে, কবি তাঁর ভাবগভীরতায় ও স্বাভাবিক সৃজনী শক্তির অপূর্ব কৌশলে বিশ্বের মধুর-ভীষণ আনন্দ ও বিস্ময়-সংঘাতের মাঝেই বিশ্বাতীতের সংবাদ ভাষায় রূপায়িত করে তোলেন—এই কাব্য-সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষণ; আর এরই বিশ্লেষণ সাহিত্য-সমালোচকের কর্তব্য। তাঁরাই, জ্ঞানরাজ্যের অগ্রদূত—তাই অভিনবগুপ্ত বলেন—

"সরস্বত্যাস্তত্ত্বং কবিসহৃদয়াখ্যম্"।

পত্রাবলী

শ্রীমতী পারুল দেবীকে লিখিত—

ওঁ

উত্তরায়ণ
শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল

সোনায় রাঙায় মাখামাখি
রঙের বাঁধন কে দেয় রাখি'
পথিক রবির স্বপন ঘিরে।
পেরোয় যখন তিমির নদী
তখন সে রঙ মিলায় যদি
প্রভাতে পায় আবার ফিরে।
অস্ত উদয় রথে রথে
যাওয়া-আসার পথে পথে
দেয় সে আপন আলো ঢালি'।
পায় সে ফিরে মেঘের কোণে
পায় ফাগুনের পারুল বনে
প্রতিদানের রঙের ডালি॥

১২. নভেম্বর
১৯৩৫

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

নাৎনী

যে মিষ্টান্ন সাজিয়ে দিলে হাঁড়ির মধ্যে
শুধুই কি তায় ছিল কেবল শিষ্টতা ?
যত্ন করে নিলেম তুলে গাড়ির মধ্যে
দূরের থেকেই বুঝেছি তার মিষ্টতা।
সে মিষ্টতা নয়তো কেবল চিনির সৃষ্টি,
রহস্য তার প্রকাশ পায় যে অন্তরে।

তাহার সঙ্গে অদৃশ্য কোন্ মধুর দৃষ্টি
মিশিয়ে আছে অশ্রুত কোন্ মন্তরে ।
বাকি কিছুই রইল না তার ভোজন অন্তে,
তবু বহুৎ রইল বাকি মনটাতে,
এম্‌নি করেই দেবতা পাঠান ভাগ্যবন্তে
অসীম প্রসাদ সসীম ঘরের কোণটাতে ।
সে বর তাঁহার বহন করল যাদের হস্ত
হঠাৎ তাদের দর্শন পাই সুক্ষণেই,
রঙীন করে তারা প্রাণের উদয় অস্ত,
দুঃখ যদি দেয় তবুও দুঃখ নেই ।
হেন গুমর নেইকো আমার, স্তুতির বাক্যে
ভোলাব মন ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়
জানিনে তো কোন্ খেয়ালের এক কটাক্ষে
কখন বজ্র হান্‌তে পারো অত্যাশায় ।
দ্বিতীয়বার মিষ্ট হাতের মিষ্ট অন্নে
ভাগ্য আমার হয় যদি হোক্ বঞ্চিত,
নিরতিশয় করব না শোক তাহার জন্যে
ধ্যানের মধ্যে রইল যাহা সঞ্চিত ।
আজ বাদে কাল আদর যত্ন যদিই কম্‌ল
গাছটা শুকোয় থাকে তাহার টবটাতো ।
জোয়ার বেলায় কানায় কানায় যে জল জম্‌ল
ভাঁটার বেলায় শুকোয় না তার সবটাতো ।
অনেক হারাই, তবু যা পাই, জীবন যাত্রা
তাই নিয়ে তো পেরোয় হাজার বিস্মৃতি ।
এই আশা মোর, পূর্ণ থাকুক্ খুসির মাত্রা
যখন হবে চরম শ্বাসের নিঃসৃতি ॥

ইতি ১ জুন
১৯৩৫

দাদু

ওঁ

নাৎনী

আমি আশা করেই ছিলুম যে তুমি আমার উপর খুব রাগ করবে, কেননা রাগটা সকল ক্ষেত্রে মন্দ জিনিষ নয়— না রাগ করা ঔদাসীন্যের লক্ষণ। তোমাকে রাগাব বলেই কবিতাটার শেষ দুটো শ্লোক তোমাকে পাঠাইনি— উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে অতএব এখন পাঠাই। কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ কোরো।

বলবে জানি, 'বালাই, কেন বকচ মিথ্যে
প্রাণ গেলেও যত্নে র'বে অকুণ্ঠা;
বুঝি সেটা, সংশয় মোর নেইক চিত্তে,
মিথ্যে খোঁটায় খোঁটাই তবু আগুনটা।
অকল্যাণের কথা কিছু লিখনু অত্র,
ওটা কেবল বানিয়ে লেখা দুষ্টুমি
তদুত্তরে যখন আমায় লিখবে পত্র
তুমিও তখন বানিয়ে কোরো রুষ্টুমি॥

এই গেল নম্বর এক। তার পরে তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ হচ্চে তোমাকে আসতে বলিনি কেন? অনাহূত কেন আসবে না? সেই আসার মূল্য বেশি জেনে সেই লোভে চুপ করে থাকি। সেটাই যদি দুর্লভ হয় তবে এই রইল নিমন্ত্রণ এখানকার পথঘাট নিঃসন্দেহ তোমার চেনা নেই, মীরা পিসিকে রাজি করে কোনো সুযোগে তাঁর সঙ্গ নিতে পারো। মীরার কাছে শোনা গেল তোমার কাছে আমার প্রেরিত যে আম গেছে কপাল দোষে সেটা টক প্রমাণ হয়েছে। কিন্তু ও আমটা জাত টক নয়, নিশ্চয় কিছু কাঁচা ছিল— আর দুতিন দিন অপেক্ষা করলেই ওর মিষ্ট স্বভাবের পরিচয় পেতে। ইতি

৫ জুন ১৯৩৫

দাদু

সৃষ্টি ও সমালোচনা

শ্রীনবেন্দু বসু

বাঙলা কাব্যসাহিত্যে বিষয় ও রচনাভঙ্গীর বৈচিত্র্য বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে কাব্য-সমালোচনার ধরনও বিচিত্র হয়ে উঠতে পারে আর হচ্ছেও। কিন্তু কাব্যরচনার দেশী বিদেশী অনেক কিছু শাস্ত্র আছে। সেই শাস্ত্রনিয়ম সাধারণতঃ কিছু পরিমাণে পালন ক'রে, কিছু পরিমাণে লঙ্ঘন ক'রে, দেশী বিদেশী কবি কাব্য লেখেন। সমালোচনার নিজস্ব বাঁধাধরা কোন শাস্ত্র নেই। কার্যক্ষেত্রে কবির চেয়ে সমালোচক বেশী স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী; যদিও আজ মনে হয় স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহারে কবি যেন সমালোচককে ছাড়িয়ে চলেছেন।

মনে প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্য সমালোচনার হাত ধ'রে নিয়ে যাবে, তার স্বরূপ আর গতি নির্ণয় করবে, না সমালোচনা সাহিত্যকে ছাঁচে ঢালবে। সাহিত্যের ইতিহাসে দুরকমই ঘটে; আগে পরে বা একসঙ্গে ঘটেছে। ফলাফল সম্বন্ধে ভালমন্দ দুরকমই মতামত হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নি। সাহিত্য আর সমালোচনার প্রকৃতিই এমন নয় যে অকাট্য কোন মূল্যবিচার সম্ভব হয়। ব্যবহারিক জীবনে পদে পদে স্থির মূল্যের দৃঢ় ভূমি মাড়িয়ে চলতে হয় ব'লেই রসক্ষেত্রে পায়ের নীচে মাটি কাঁপলে অভ্যাসের ফলে অস্বস্তি বোধ করি।

কৌতূহলের মধ্যে বাসনা লুকিয়ে থাকে। নির্দিষ্ট উত্তরের আশা না থাকলেও অনুভব করি যে, সাহিত্য আর সমালোচনার পরস্পরকে দিগ্‌দর্শন করানোর প্রশ্নটা চলতি জীবনের অন্যান্য প্রশ্নোত্তরের সঙ্গেই একাঙ্গ। তাছাড়া ও প্রশ্ন আজ একটা জাগ্রত সমস্যা। ওর একটা সামাজিক দিক রয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের ব্যাপক সমালোচনার দিন আসছে। আজকের বাঙলা কবিতায় এমন অনেক কিছু প্রবেশ লাভ করছে যাতে জিজ্ঞাসা ওঠে যে এ কবির রচনা না সমালোচকের কাব্যপ্রচেষ্টা। আগামী দিনের বাঙলা রস-সমালোচনার দায়িত্ব বিপুল। কথাটা তাই মনোযোগ-সাপেক্ষ।

শিল্পীকে রচনায় নিযুক্ত করে তাঁর চেতনা ও বোধ। সে রচনার ভাবরূপ প্রভাবিত করে সমালোচকের অন্তরকে। তাঁর নিজের বোধ জাগে তখন। দুজনের মধ্যে এই কালগত ব্যবধান। স্রষ্টা ও সমালোচকের মধ্যে এই কাল-সূত্র ন্যায়সূত্রই। অর্থাৎ কবির আবেগ সমালোচকে সংক্রামিত হ'য়ে তাঁর চেতনাকে প্রবুদ্ধ করলে; তিনিও আবেগান্বিত হলেন আর তাঁর রচনার উৎস মুক্ত হ'ল। রসসৃষ্টির মূল যে আবেগ, সেই আবেগধর্মই রসসমালোচনারও গোড়া। কতকদূর পর্যন্ত কবি ও সমালোচক দুজনেই সমব্যবসায়ী। এতে রবীন্দ্রনাথের উক্তির সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়— "যথার্থ সমালোচনা, সে ত এক পৃথক সাহিত্য; সেও সৃষ্টিকার্য্য" (মংপুতে দ্বিতীয় পর্ব্ব, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৪৯)।

দ্বিতীয়তঃ, স্রষ্টা আর সমালোচক দুজনেই সমাজভুক্ত জীব। ইতিহাসের ধারা, দেশ কাল সমাজের পরিবেশ, তথ্যের আবিষ্কার, স্রষ্টার রচনার বিষয়, প্রকার, পরিধি, রীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। সৃষ্টির সমালোচনাতেও তাই মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস প্রভৃতি আলোচ্য হ'য়ে ওঠে।

কিন্তু মূলতঃ শিল্পী আর সমালোচকের কাজের প্রকৃতি ভিন্ন। শিল্পী করেন রসরূপের নির্মাণ। অর্থাৎ তাঁর মোহকে রূপ দেন। তথ্য, ইতিহাস, কালপ্রভাব, সমাজমানস সে নির্মিতির উপাদানভুক্ত হয় আর তার প্রক্রিয়াকে কতক পরিমাণে নির্ধারিত করে। এই দু'প্রকারে মোহরূপটিকেই উজ্জ্বল আর স্বতন্ত্র ক'রে ফুটিয়ে তোলা হয়। অপর পক্ষে, রসসমালোচক তাঁর লক্ষ্যস্থাপন করেন এইতে যে, তাঁর রচনা আবেগ-উদ্রিক্ত হ'লেও তাঁর উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি নয়, রসরূপের বিচার। বিচার অর্থে তথ্য অবলম্বন ক'রে কার্যকারণগত আলোচনা। তথ্য আর মনন প্রয়োগ ক'রেও শিল্পীর সৃষ্টি মোহযুক্ত রচনা; আর তথ্য আর মনন প্রয়োগ ক'রেই সমালোচক করেন তার "মোহমুক্ত ভাষ্য"। এইখানেই রবীন্দ্রনাথ-কথিত সমালোচকের "পৃথক সাহিত্য" আরম্ভ হয়।

এই পৃথক সাহিত্য, মোহরূপের এই মোহমুক্ত ভাষ্য, কেন? কিসের প্রয়োজনে? কতটাই বা তা সম্ভব আর তার স্বরূপ কি? সৃষ্টি আর সমালোচনার সম্পর্কবিচারে এইগুলি মূল প্রশ্ন।

রসস্রষ্টার মোহের কথা থেকেই আবার ধরতে হয়। শিল্পীর অন্তরের কোন গূঢ় সংগতিবোধকে যে সৃষ্টি তৃপ্ত করে তাই রসরূপের রচনা। সে সংগতির একটা নিজস্ব ন্যায়শৃঙ্খলা হয়ত আছে যার দরুন রসের সৃষ্টি একটা সম্বন্ধ-বিন্যাস, relation of values, বটেই। রচনাকার্যও আর কিছু নয়, শিল্পীর আবেগানুভূতি আর মননের সহযোগে সেই তৃপ্তিকর সম্বন্ধবিন্যাসটির আবিষ্কার-প্রয়াস। পরীক্ষা করতে করতে বা প্রথম মুহূর্তেই সেটি হাতে ঠেকে ; তখন কবি বা শিল্পীর সন্ধানী চিত্ত তৃপ্তি অনুভব করে। রসরূপ সম্বন্ধবিন্যাসটির ভিতরকার ন্যায়প্রকৃতি যেমনই হোক, আর তার আবিষ্কারে সচেতন বুদ্ধি-প্রক্রিয়ার যতই আর যেভাবেই প্রয়োগ হোক না কেন, তা থেকে সে কি রূপে আবির্ভূত হবে তার নির্দেশ পাওয়া যায় না। এলে পর তবেই বোঝা যায় যে মনোমত হয়েছে। এটা কবি বা শিল্পীর অভিজ্ঞতার কথা ; এর কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না ; দেওয়া সম্ভবও নয়।

এই থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রসের সৃষ্টিতে চিন্তা, বিচার, তথ্য, নিয়মবন্ধন প্রভৃতি নিয়োজিত হ'লেও তার প্রকৃতির নির্ধারণে আর তার রূপগত বিকাশে নিয়মাতীত কিছু আছে যেটাকে তার রহস্যের দিক ব'লে ধারণা করাই ভাল। অলংকারশাস্ত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্র দিয়ে সে রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত হয় না। রচনার এই রহস্যদিকটার সঙ্গেই শিল্পীর তৃপ্তিবোধও যুক্ত। এই দিকটাই পরিণতি লাভ করলে পর তাঁর বাসনা চরিতার্থ হয়। যিনি কবি নন, যিনি শিল্পী নন, তাঁর তুলনায় কবি ও শিল্পীর বিশেষত্ব এইতেই যে শেষোক্তের বোধশক্তি ব্যাখ্যাতীত যে রহস্যরূপ বা প্রভাব তাকে চিনে নিতে পারে আর তার সংস্পর্শে "অকারণ পুলকে" উৎফুল্ল হ'তে পারে।

রসের সমালোচকও এই রহস্যবোধেই উদ্দীপিত হ'য়ে তাঁর কাজে অগ্রসর হন। একথা পূর্বে বলা হয়েছে। আর মানুষ নিজের প্রেরণার অতীত কিছু প্রকাশ করতে পারে না। সে যখন দেয় নিজেকেই দেয়। তাই রস-প্রবুদ্ধ হয়ে যে সমালোচক কাজে লাগেন, তিনি তাঁর রসবোধকেই প্রকাশ করতে বাধ্য। রসের রহস্যরূপের নির্দেশই তাঁর আলোচনার লক্ষ্য হ'তে পারে, ন্যায় অনুসারে তিনি আর কিছু পারেন না। অন্য কোন প্রয়াস তাঁর পক্ষে নিরর্থক।

রসসমালোচকের বিচারভঙ্গী এই পথেই নির্দিষ্ট হবার কথা। তাঁর ন্যায়গবেষণা, বাস্তব পন্থা, তথ্যপ্রয়োগ এই উদ্দেশ্য দ্বারাই চালিত হ'তে পারে। অতএব সে সকল পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে তিনি দেখাবেন যে (১) রসরূপের নির্মাণে যেটা রহস্য, যেটা তার অনির্দিষ্ট অংশ, যেটা তার প্রাণ, রসিকচিত্তে যেটার জাগ্রত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাই শিল্পীর উদ্দেশ্য ও সার্থকতা, সেটার আঙ্গিক গঠনে যা রহস্যময় নয়, যা নির্দিষ্ট, যা বাস্তব, যা ন্যায়বিচারের অধীন, যা নিছক ঐতিহাসিক, পদার্থগত বা বৈজ্ঞানিক তথ্য, এমন অনেক কিছুই নিযুক্ত হয়েছে; (২) কিন্তু সে সবই রচনার উপাদান বা যন্ত্র-স্বরূপ; সে সবই উপকরণ আব প্রণালী মাত্র; (৩) যা রচিত হয়েছে সে আর কিছু; আর তার আর কিছু হবার কারণ এই যে উক্ত উপকরণ আর প্রণালী ছাড়া তাতে অতিরিক্ত কিছুর সংশ্লেষণ আর অবস্থিতি ঘটেছে; (৪) শেষতঃ তথ্য, মনন আর বাইরের প্রভাবরাজি যা রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সে সকলের ফলে রূপের রসমূল্যে প্রতিষ্ঠা পূর্ণতা পেয়েছে বা ব্যাহত হয়েছে।

এক কথায় রচনার রহস্যপরিচ্ছিন্ন অংশের আলোচনা ক'রে রহস্যময় অতিরিক্ত সত্তাটিকে তার নিজস্ব মূল্যে প্রকট করাই সমালোচকের মূল কর্তব্য। তাঁর কাজ সীমা নির্দেশ ক'রে সীমাহীনের আরম্ভ কোথায় তাই ধরিয়ে দেওয়া। এর দ্বারাই রসের প্রকার, উৎকর্ষ আর মর্যাদার বিচার হয়। সমালোচকের ধর্ম স্রষ্টার সেবা, রসিকের সাহায্য, নিজের তৃপ্তি। এ লক্ষ্য না সাধন ক'রে সমালোচনা যদি একটি পণ্ডিতী বিচারপারম্পর্যে আর প্রভূত পরিমাণে তথ্যসংগ্রহ মাত্রেই পর্যবসিত হয়, তাহ'লে সে প্রয়াস হবে ঊষর জমিতে বীজ বপন। রসের ক্ষেত্রে সে কর্ষণ না দেবে ফুল, না দেবে ফল।

ট্রয়নগরীর পতনের পর দশ বৎসর কেটে গেছে। বীর ইউলিসিস্ এখনও দেশে ফেরেন নি। তাঁর পত্নী পেনিলোপি বৃদ্ধ শ্বশুর আর সাবালক পুত্র নিয়ে স্বামীর পথ চেয়ে দিন গুনছেন। ইথাকার ও আশপাশের সম্ভ্রান্ত যুবকসম্প্রদায় এই অবস্থায় সেই সাধ্বীকে প্রেম নিবেদন করতে ব্যস্ত। এইখানে সমালোচক প্রশ্ন তুললেন যে, ইউলিসিসের বিদেশগমনের এতদিন পরেও স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে চোখের সামনে অহর্নিশি দেখেও শোকাতুরা নারীর রূপলাবণ্য কেমন ক'রে অব্যাহত রইল যাতে তাঁর অত

স্তাবক জুটলো। এমনই আর এক সমালোচক কাহিনী-কিম্বদন্তীর তারিখ সাল মিলিয়ে প্রমাণ করলেন যে ট্রয়বিজয়ের সময় সুন্দরী হেলেনের বয়স ছিল্ একশত বৎসর। এই সকল সমালোচনায় শিল্পের বা সমালোচনার কোন্‌টারই বা গৌরব বাড়ে? অথচ তথ্যবাদী সমালোচনা ক'রেই এ সমালোচনার উত্তরও দেওয়া হয়েছে:—

"The heroic legends take no count of years. Woman is there beautiful by divine right of sex ... Nor is there any ground for supposing that the suitors of Penelope ... persisted in attributing to her fictitious charms. She is evidently not less beautiful in the poet's eyes then in theirs...The island queen herself says, indeed, that her beauty had fled when Ulysses left her, and could only be restored by his return; but this disclaimer from the lips of a loving and mourning wife only makes her more charming, and she is not the only woman, ancient or modern, who has borrowed an additional fascination from her tears." (Homer-Odyssey : W. Lucas Collins).

এ সমালোচনার ভিত্তি "the heroic legends take no count of years" কি তথ্যসিদ্ধান্ত নয়? "The island-queen herself says, indeed ··· " ব'লে যখন গাণিতিক অপনয়নপ্রণালীতে যুক্তি খণ্ডন করা হচ্ছে তখন সমালোচনা কি ন্যায়াবলম্বী নয়? অথচ এ আলোচনায় রসরূপের নির্ণয় আর পরিচিতি কি সম্যক হ'য়ে ওঠে না? হেলেন, পেনিলোপি কি শত বৎসরের বৃদ্ধায় পরিণত হচ্ছেন? হোমরের কাব্যরচনার উদ্দেশ্য কি ছিল তাই প্রমাণ করা?

কবিতায় পড়ি:—

The winds come to me from the fields of sleep. সমালোচক বললেন "fields of sleep" পাঠভ্রংশ। কবি লিখেছিলেন "fields of sheep"। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কি উত্তর দিতে পারেন না যে, "কবি তো আমরা নহি তো মেষ"? শিল্পরাজ্যে যেটাই সমালোচকের সমীচীন মনে হয় সেটাই সব সময়ে সিদ্ধ নয়।

ও ক্ষেত্রে logic-প্রয়োগের কতকদূর পর্যন্ত সাধারণ বিধি আছে বটে, কিন্তু তার পর স্বতন্ত্র বিধি।

Impressionism বোঝাতে এতটা বিজ্ঞান প্রয়োগ ভাল যে ছবিতে প্রধান বস্তু আলো; আলো বর্ণমালার (spectrum) একটা সংগঠন; চোখ পরকলা (lens) বিশেষ, যেটা সকল দূরত্বকে সমান স্পষ্টতায় কেন্দ্রীভূত করতে পারে না; ফলতঃ Manet প্রমুখ প্রবর্তকরা এমন একটা অঙ্কনপদ্ধতি উদ্ভাবিত করলেন যাতে তাঁরা তাঁদের মতে এই সকল বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের মূল্য দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আগাগোড়া বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসরণ ক'রে Impressionist ছবির রসবিচার সম্ভব নয়। এর স্থূল প্রমাণ এই যে আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক উক্ত অঙ্কনপদ্ধতিকে বিজ্ঞানের গবেষণা বা আবিষ্কার ব'লে দাবি করেন নি।

রসসমালোচনায় মনোবিজ্ঞান, যৌনতত্ত্ব প্রভৃতির বিভিন্ন গবেষণাসূত্রের প্রয়োগের বহু উদ্ভট ফলাফল চোখে পড়ে। আবার হয়ত বলতেও পারি যে বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাব্যসৌন্দর্যে নানা নাটকীয় চরিত্রমূল্যে সমৃদ্ধ হ'লেও যৌনবোধের অতি ভারে যেন একটু মুহ্যমান।

পুরাণ পণ্ডিতে নাহি শূদ্রের অধিকার
পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার—

এই উক্তির ধুয়া ধ'রে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচারগ্রন্থ ব'লে সমালোচনার অন্ত করে দেওয়া যায় না। এমন ছত্রও তোলা যায় যা কবিতার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়।

যতদূর যায় অক্রূর কানাই লইয়া
ততদূর চাহে গোপী একদৃষ্টি হইয়া।
না দেখিয়া রথখান ধূলামাত্র দেখি
চাহিতে চাহিতে গোপী না নিমিষে আঁখি।

গোপীর এই স্থির অপলক দৃষ্টি আজও কথক পদ্ধতির রাধানৃত্যে পাথর হয়ে আছে। সংহত এর আবেগ।

মুকুন্দরামের চণ্ডী কি কেবল শাক্তের জয়ঘোষণা? মুরারীশীল আর ভাঁড়ুদত্তের চরিত্রকাব্যের মূল্য কি তাতে নেই?

রামায়ণ কি শুধু প্রাচীন ভারতে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাসেরই উপাদান জোগায় ?

জুলিয়াস সীজারের গোড়ায় ঐ প্রাণচঞ্চল পথের দৃশ্যটি অবলম্বন ক'রে কোন কোন সমালোচক শেক্সপীয়রকে গণবিরোধী প্রমাণ করেছেন। আবার সেই দৃশ্যেরই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা ক'রে অপর সমালোচক দেখিয়েছেন যে, শেক্সপীয়র স্বাধীনতাপ্রেমী ও দুর্গতদের দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। সমালোচনা সবই করতে পারে। কি করবে তাই নিয়ে কথা। কাব্যরসধারার গতি মেনে চললেই রসসমালোচকের পক্ষে শুভ।

ডেসডেমনাকে হত্যা করতে গিয়ে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে ওথেলোর স্মরণীয় উক্তি :—

It is the cause, it is the cause, my soul,
Let me not name it to you, you chaste stars !
It is the cause.

ওথেলো-চরিত্রের অভিনেতা (ফেক্‌টার) আরশিতে মুখ দেখলেন। স্থির করলেন যে তার কালো দেহবর্ণের দরুনই শ্বেতাঙ্গী ডেসডেমনা তাঁর প্রতি বিমুখ হ'য়ে অপরের প্রেমে আত্মসমর্পণ করেছেন। অভিনয়শিল্পে এই সাম্রাজ্যবাদী বর্ণসংস্কার কবে থেকে শুভাগমন করলো ? ঐ কয় ছত্রের রসমূল্য কি এই ব্যাখ্যার উপরই এতকাল দাঁড়িয়ে আছে ?

স্থানবিশেষে বোধ করি সমালোচনা নির্বাক থাকলেই সৃষ্টির মর্যাদা রক্ষা করা হয়।

I do not bid the thunder-bearer shoot,
Nor tell tales of thee to high-judging Jove :
Mend when thou caust ; be better at thy leisure :
I can be patient ; I can stay with Regan,
I and my hundred knights.

পিতাপুত্রীর এই কথা পারিবারিক গোপনতার মধ্যেই থাক্‌। আর-এক বৃদ্ধ যখন বলে :—

Vacant shuttles
Weave the wind. I have no ghosts,

An old man in a draughty house
Under a windy knob,

তখন তার নীরবতা কেউ যেন ভঙ্গ না করে।

অনেক নিদর্শন পাওয়া গেল যেখানে সমালোচনা হয় ঘটিয়েছে রসের মহতী বিনষ্টি কিম্বা হয়েছে গঠনমূলক; হয় ভ্রান্তির চোরাবালিতে রসকে বিলুপ্ত করেছে নয় সৌন্দর্যমহিমায় তাকে প্রকট করেছে। রসবস্তুটিই এমন (প্রকৃত পক্ষে সে বস্তু নয়, একটা প্রভাব মাত্র) যে কবিচিত্তের অবিকল উপলব্ধি রসিকচিত্তে সঞ্চারিত হয় না। তাদের বোধ তাদের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী; সেটা কবির বোধ থেকে স্বতন্ত্র। অনুসন্ধান আর গবেষণার ফলে সমালোচক কবির বোধের প্রতিরূপ সৃষ্টি করতে পারেন না। যা তিনি সৃষ্টিও করেন রসিক তাকে কোন্ পথে গ্রহণ করবেন, তাঁর উপলব্ধি কি দাঁড়াবে, তার কোন ঠিকানা নেই। সমালোচক তাই তাঁর নিজস্ব রসবোধকে ব্যক্ত করতে পারলেই তাঁর শ্রমের সফলতা।

এইখানেই সমালোচকের কাজের সামাজিক মূল্যও। রসকে রসরূপেই বিতরণ ও প্রচার করতে পারাতে সমালোচকের অন্যের প্রতি কর্তব্য সাধন করা হয়। রসিকের কাছে রচনাকে রসোত্তীর্ণ করতে পারাতে শিল্পীর প্রতি সুবিচার আর তাঁর সঙ্গে সহযোগ করা হয়।

এই ভাবে স্রষ্টা ও রসিকের বা শিল্পী আর সমাজের যোগশৃঙ্খলে যুক্ত হ'তে হ'লে সমালোচককে তাঁর পদ্ধতিপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পদ্ধতি-নির্বাচনেও ইতিহাস ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে। একদিনের সমাজে মহাকাব্য-রচনায় দণ্ডীর আদর্শ উপযুক্ত ছিল। আজকের কাব্যের সে আদর্শে বিচার ভ্রান্ত হবারই সম্ভাবনা। এই অনুসারে আজ যে মহাকাব্য লেখাই হচ্ছে না, তাতে আশ্চর্য বা চিন্তিত হবার কিছুই নেই। সৃষ্টিচেতনা ও প্রক্রিয়া বিবর্তন মানে। আর সৃষ্টি আগে, সমালোচনা পরে। সাহিত্য ও শিল্পের রূপ বদলালে সমালোচনার আদর্শ আর ধারাও বদলাবে আশা করা যায়। শিল্পী আর সমাজের চলার সঙ্গে পা ফেলে সমালোচক বিচারের মানদণ্ড নির্ধারিত করুন।

সংরক্ষণশীল আর অনর্থক ঐতিহ্যপন্থী না হ'য়ে সমালোচক কালবোধে

অনুপ্রাণিত হ'লে যে রস বিচার সঠিক হবে না এ আশঙ্কা অমূলক। রসের সন্ধানে লক্ষ্য স্থির থাকলে পথভ্রষ্ট হ'তে পারে না। সেটা বিচিত্র হ'য়ে উঠবে বটে যেমন হ'তে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু বিচিত্র হ'লেই ভ্রান্ত হয় না। ভ্রান্তির কারণ অন্য, যা ওপরে বোঝবার চেষ্টা করেছি। সে কারণ সর্বদেশে সর্বকালেই ঘটতে পারে। বরং সেই কথা স্মরণ রেখেই সমালোচকের দৃষ্টি সজাগ ও অন্বীষু হবার কথা ; যাতে তাঁর বিরুদ্ধে (কবি অডেনের ভাষায়) এ অভিযোগ কেউ না উপস্থিত করে— Holders of one position, wrong for years।

ইস্‌লামিক সভ্যতার আদি যুগ

শ্রীবিক্রমজিৎ হসরৎ

মুহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী কাল আরবের ইতিহাসে অজ্ঞানতার যুগ নামে অভিহিত হ'য়ে থাকে; ওই যুগের আরবগণ ছিল অদৃষ্টবাদী এবং তাদের ধর্মের ধারণা ছিল ইস্‌লামিক আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্রহনক্ষত্র ও নানা দেবদেবীর মূর্তিপূজাই ছিল তৎকালীন ধর্মের প্রধান অঙ্গ। তাদের ঈশ্বরের ধারণা ছিল অস্পষ্ট; অথচ তারা যে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব অস্বীকার করত তাও নয়। গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতিও কতকগুলি চিন্ময় শক্তির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে থাকে, এই ছিল তখনকার প্রচলিত বিশ্বাস। ছোটো ছোটো দেবতাদের পূজা করলে তাঁরা উপাসকের হ'য়ে পরমেশ্বরের প্রসন্নতা অর্জন করতে পারেন, এই ধারণার দ্বারা তৎকালীন ধর্মবিশ্বাস অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হ'তো। আর তাদের ধর্মানুষ্ঠানসমূহে ইহুদী, খ্রীস্টীয় ও অন্যান্য নানা ধর্মের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। পূর্বেই বলেছি, তাদের মধ্যে অত্যন্ত অস্পষ্ট রকমের একেশ্বরবাদের ধারণাও ছিল; কিন্তু সে ধারণা এত ক্ষীণ ও দুর্বল ছিল যে প্রচলিত বহুদেববাদকে পরাভূত ক'রে তা কখনও প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি এবং যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীকে আশ্রয় ক'রে একেকটি বিশেষ ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, ওই ক্ষীণ একেশ্বরবাদের মধ্যে সে-সব বিশিষ্ট গুণের একান্তই অভাব ছিল।

তারা যে মূলত একেশ্বরবাদী ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে তৎকালীন উপাসনা-মন্ত্রটির মধ্যেই। মন্ত্রটি হচ্ছে এই— "হে প্রভু, আমি তোমারই সেবায় আত্মোৎসর্গ করছি; তোমার কোনো দ্বিতীয় সঙ্গী নেই; তুমিই তোমার একমাত্র সঙ্গী এবং তুমিই তোমার একমাত্র প্রভু।" কিন্তু এই একেশ্বরবাদ এতই ক্ষীণ ছিল যে, ওই ঈশ্বরের বহু সহচর কল্পনা করতে এবং তাদের পূজা করতেও কারও বাধত না। তাদের মতে আল্লা বা ভগবানই হ'লেন বিশ্বজগতের অধীশ্বর আর ইলাহৎ বা ক্ষুদ্রতর দেবতারা হ'লেন তাঁর আজ্ঞাধীন। যাহোক্, তৎকালীন আরবদের মতে তাদের দেবতারা ও তাদের পূজাবিধি

অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং অন্য সমস্ত সম্প্রদায়কে নিজেদের ধর্মমতাবলম্বী করাই ছিল তাদের অন্যতম চরম কাম্য বিষয়।

এই আরবদের মধ্যে কিছুমাত্র একতা ছিল না এবং নিজেদের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহাদির অন্ত ছিল না। তেমনি মানবাত্মার অতীত ও ভাবী স্বরূপ এবং পুনরাবির্ভাব সম্বন্ধেও তাদের মধ্যে মতের ঐক্য ছিল না। সমস্ত জিনিসেরই উদ্ভব ঘটে প্রকৃতিবশে এবং বিনাশ ঘটে কালধর্মে, এই ছিল তাদের সাধারণ বিশ্বাস। তাদের কতকগুলি সংস্কার ছিল অত্যন্ত অদ্‌ভুত। যেমন একটি দলের রীতি ছিল, যদি কেউ মারা যায় তবে তার উটগুলিকে কবরের নিকটে বেঁধে রাখা হ'তো এবং সেগুলিকে খাদ্য-পানীয় কিছুই দেওয়া হ'তো না। উদ্দেশ্য উটগুলি খেতে না পেয়ে পরলোকেও প্রভুর সহযাত্রী হবে; কারণ পরলোকে ও তৎপরের পুনরাবির্ভাবকালে প্রভুরা উটের অভাবে পায়ে হেঁটে চলবেন, এটা খুবই কলঙ্কের বিষয় ব'লে গণ্য হ'তো। এই সমস্ত ধর্মবিশ্বাসের উপলক্ষ্য ছিল ব্যক্তির কল্যাণ-অকল্যাণ, সংঘগত মঙ্গলামঙ্গল-বিষয়ে ওই ধর্ম ছিল একান্ত উদাসীন। প্রত্যেক গোষ্ঠী বা উপজাতির ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানাদি শুধু যে পৃথক্ ছিল তা নয়, তাদের পারস্পরিক বিরুদ্ধতাও কম ছিল না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাক্-ইস্‌লামিক যুগের আরবে ধর্মের আদর্শ ও ব্যবস্থা ছিল আদিম যাযাবর জাতিরই উপযোগী, অর্থাৎ খুবই অনিশ্চিত ও অনিরূপিত; শুধু তাই নয়, পরস্পর কলহ ও ঈর্ষাপরায়ণ আরব উপজাতিগুলি ধর্মব্যবস্থাকে নিজেদের জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যন্ত গৌণ ব'লেই মনে করত। তাদের জীবনযাত্রা ধর্মের আদর্শের দ্বারা কখনও বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়-নি; ধর্ম সম্বন্ধে তারা কখনও গভীর ভাবে চিন্তাও করেনি। বস্তুত ও-সমস্ত পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানের আবহাওয়ার মধ্যে কোনো সুশৃঙ্খল ধর্মবিধি উদ্‌ভাবিত হবার সম্ভাবনাও খুব কমই ছিল। তৎকাল-প্রচলিত খ্রীস্টীয় ও ইহুদী ধর্মও আরবদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আদিমস্বভাব মনোবৃত্তির উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সেই যুগের খ্রীস্টীয় ধর্মেও মানুষের চিত্তে উদ্দীপনা ও উচ্চ প্রেরণাসঞ্চার করার ক্ষমতার অভাব ছিল। রোমক খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকগণ তখন আদর্শভ্রষ্ট ও স্বার্থপরায়ণ হ'য়ে

উঠেছিল এবং অজস্র মতভেদবাহুল্যে ওই সম্প্রদায় বহুধা বিভক্ত হ'য়ে পড়েছিল। প্রেম, মৈত্রী ও শান্তির যে-আদর্শ খ্রীস্টীয় ধর্মের মর্মবস্তু সে আদর্শই তখন বিনষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল এবং যাজকগণ পরস্পরের সঙ্গে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ও কলহে এমনি মেতে উঠেছিল যে, যথার্থ খ্রীস্টধর্ম তখন বিলুপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে ওই অন্ধকার-যুগে ইহুদীরা ছিল শক্তিমান্ এবং বহু উপজাতির মধ্যে স্বীয় ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতিকে অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু সমরলিপ্সু, স্বাধীনতাপ্রিয় ও যদৃচ্ছাবিহারী আরবদের চিত্তকে কোনো সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত ধর্মব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি।

সুতরাং এই আরব জাতির মধ্যে যখন পয়গম্বর মুহম্মদ তাঁর উচ্চাঙ্গের ধর্মের আদর্শ নিয়ে আবির্ভূত হ'লেন তখন তাঁর কাজ যে সহজ হয়নি, একথা বলাই বাহুল্য। তিনি অবিলম্বেই বুঝলেন যে, ইহুদীদের ধর্ম এত সংকীর্ণ এবং স্বজাতিপ্রীতির গণ্ডীর মধ্যে এমন সীমাবদ্ধ যে, ওই ধর্মের দ্বারা আরবজাতির চিত্ত উদ্বুদ্ধ হবার সম্ভাবনা নেই এবং সে-জন্যেই এতদিন ওই ধর্ম আরব জাতির উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। তিনি আরও দেখলেন যে, সাধারণ আরবেরা ধর্মের প্রতিই সম্পূর্ণ উদাসীন এবং তাদের মধ্যে যারা একটু চিন্তাশীল তারাও সংকীর্ণ ইহুদীধর্মের প্রতি যেমন বিরূপ, ধর্মের তত্ত্ব নিয়ে কলহ ও দ্বন্দ্বময় খ্রীস্টীয় ধর্মের প্রতিও তদ্রূপ উপেক্ষাপরায়ণ। বস্তুত এই উভয় ধর্মই তখন নিজের নিজের দৌর্বল্যবশত জনচিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার ও রক্ষা করতে অক্ষম হ'য়ে পড়ছিল। কিন্তু তথাপি এই ধর্মসম্প্রদায়-দুটি মুহম্মদের বিরুদ্ধতা করতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেনি। এসব কারণে তিনি অবশেষে কার্যত একটি নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠারই সংকল্প করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু একথা বলা প্রয়োজন যে, একটি সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম প্রবর্তন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, আরবদের মধ্যে প্রচলিত মূঢ় পৌত্তলিক আচার-অনুষ্ঠানাদির উচ্ছেদ এবং ইহুদী ও খ্রীস্টীয় সম্প্রদায়ের তদানীন্তন দুর্নীতি ও কুসংস্কারসমূহের বিলোপ সাধন ক'রে একেশ্বরের উপাসনামূলক ওই উভয় ধর্মেরই মূলগত আসল ধর্মটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। মুহম্মদের নিজের ভাষায় বল্‌তে গেলে তিনি

চেয়েছিলেন "আদম, নোয়াহ্, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা প্রভৃতি পূর্বতন পয়গম্বরদের প্রচারিত প্রাচীন খাঁটি ধর্মকে পুনঃস্থাপিত করতে।"

বলতে গেলে আরব জাতির চিত্তভূমিও আরবদেশ এবং তৎপার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডের মতোই মরুময় ছিল। কিন্তু মুহম্মদের আবির্ভাবে তাদের মধ্যে যে ধর্মোদ্বোধন ও নবযুগের সূচনা হ'লো তার ফলে উদ্দীপনাময় ইস্লাম ধর্মের বাণীধারা যেন প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে তাদের ঊষর চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে চলল এবং অচিরকালের মধ্যেই তাকে উর্বর ও শস্যশালী ক'রে তুলল। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ওই প্রাথমিক ধর্মোচ্ছ্বাস আরব জাতির মধ্যে গভীর চিন্তা উদ্রিক্ত করার পক্ষে সহায়ক বা উপযোগী ছিল না। কোরানের বাণী সরল, অকৃত্রিম ও ওজস্বী; এবং তার উপদেশগুলিও এমন সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবিহীন যে তাদের ব্যাখ্যায় সংশয় বা মতভেদের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। বস্তুত স্বপ্রবর্তিত ধর্মের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্যে স্বয়ং মুহম্মদই পরিষ্কার ভাষায় ব'লে গিয়েছেন যে, বিশ্বাসিগণের চিত্তে কোনো বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ থাকা উচিত নয়। "এই গ্রন্থে (অর্থাৎ কোরানে) সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই এবং যারা সর্বপ্রকার অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় এই গ্রন্থ তাদের সকলেরই পথপ্রদর্শক।" যারা সংশয়বাদী তাদের নিরস্ত করার উদ্দেশ্যে কোরানে সুস্পষ্ট ভাষাতেই বলা হয়েছে, "এই গ্রন্থে আমি (আল্লা) আমার সেবকের (মুহম্মদের) নিকট যে বাণী প্রকাশ করেছি সে সম্বন্ধে যদি তোমার কোনো সন্দেহ থাকে তবে তুমি এমন একটি অধ্যায় রচনা কর যা এই গ্রন্থের সমতুল্য ব'লে গণ্য হ'তে পারে।" ইস্লাম ধর্মের মূলনীতি হচ্ছে তিনটি, যথা— ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্ব, ঈশ্বরকর্তৃক সত্যধর্মের প্রকাশ এবং মৃত্যুর পরেও জীবনের অস্তিত্ব। এই তিনটি মূলনীতি কোরানে এমনই স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে যে, কোথাও সন্দেহ বা ভাবনাচিন্তার কিছুমাত্র অবকাশ নেই। এই অতিস্পষ্টতার একটি ফল এই হয়েছিল যে, ইস্লাম ধর্মের আদিযুগে অর্থাৎ মুহম্মদ ও তাঁর সহকর্মীদের প্রভাবের যুগে আরবদের মধ্যে গভীর দার্শনিক তত্ত্বচিন্তার কোনো সুযোগই ঘটেনি। একজন মনীষী (T. J. Boer) বলেছেন, "মুহম্মদ কবিদের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন, আরবদের মধ্যে যদি গ্রীক দার্শনিকদের মতো দার্শনিক থাকতেন তাহ'লে তিনি

তাঁদের বিরুদ্ধেও নিশ্চয়ই অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচার করতেন। কেননা, জনবাদ অনুসারে তাঁর একটি বিশিষ্ট উক্তি হচ্ছে এই যে,'শয়তান নির্জনবাসীদের সন্ধানে থাকে', আর একথা সর্বজনবিদিত যে দার্শনিকরা সকলেই নির্জনতাপ্রিয়।"

পরবর্তী কালেও এ-বিষয়ে গোঁড়া মুসলমানদের মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অল-হুজওয়ারীর মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরও মত এই যে, "প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর পক্ষে জ্ঞানোপার্জন অত্যাবশক বটে, কিন্তু সে জ্ঞান সর্বতোভাবেই শরিয়ৎ অনুযায়ী হওয়া চাই (কাশ্‌ফ্‌-উল্‌-মহ্‌জূর)।" অতএব স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, খাঁটি মুসলমানের পক্ষে জ্যোতিষ, আয়ুর্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞান শিক্ষা অত্যাবশ্যক নয়। তবে ধর্মের জ্ঞান ও আচরণের পক্ষে যতটুকু অনুকূল ততটুকু শিক্ষা করা যেতে পারে; যেমন,— রাত্রিবেলায় নমাজ পড়ার সময় নির্ণয়ের জন্যে খানিকটা জ্যোতিষের জ্ঞান থাকা দরকার; স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর দ্রব্য বা অভ্যাসের থেকে বিরত থাকার উদ্দেশ্যে কিছুটা আয়ুর্বিদ্যা জানা ইস্‌লাম-বিরোধী নয়; তেমনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির বণ্টনব্যবস্থা এবং বিবাহ-বিচ্ছেদও পুনর্বিবাহের মধ্যবর্তী কাল (ইদ্দা) গণনার জন্যে যতটুকু পাটীগণিতের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ততটুকু জ্ঞানলাভ ইস্‌লাম-বিরোধী ব'লে গণ্য হয় না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদিযুগের মুসলমানদের ধর্মজীবনে দর্শনশাস্ত্রের কোনো স্থান ছিল না; কেননা, কোরানোক্ত ভগবদ্‌বাণীর ব্যাখ্যায় যুক্তিতর্ক বা প্রমাণ-অনুমান-প্রয়োগের কোনোই অবকাশ ছিল না। শুধু তাই নয়, যুক্তিতর্কের সাহায্যে ভগবদ্‌বাণীর সমর্থন করাও খাঁটি মুসলমানের অযোগ্য কার্য ব'লে বিবেচিত হ'তো।

সীতাপতি রায়

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

আমার জনৈক বন্ধু একমনে আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ছিলেন, তুনিয়ার কাগ্জী খবর জানবার জন্যে; এবং মধ্যে মধ্যে আমাকে তা প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন। আমি বল্লুম—"বাংলায় কে কে গ্রেপ্তার হল, তাদের নামগুলো পড় ত?" তিনি পড়তে শুরু করলেন। হঠাৎ একটা নাম শুনে আমি বল্লুম—

—সীতাপতি রায় যে গ্রেপ্তার হয়েছেন, তাতে আমি আশ্চর্য হইনি।

—সীতাপতি রায়কে তুমি চেন?

—এককালে তাঁকে খুব ভালই জানতুম, তবে বহুকাল তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ নেই।

—তিনি কে?

—অজ্ঞাতকুলশীল। তাঁর বাড়ি কোথায়, আর তিনি কি জাত, তা জানিনে।

—তাঁর সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কোথায়?

—গোলদিঘিতে। আমি যখন কলেজে পড়ি তখন তিনি পটোল বিশ্বাসের সঙ্গে প্রায় রোজই সন্ধ্যাবেলা গোলদিঘিতে বেড়াতে আসতেন।

—পটোল বিশ্বাসটি কে?

—পাটের দালাল অটল বিশ্বাসের একমাত্র সন্তান। শুনেছি অটল বিশ্বাস মস্ত ধনী। আর সীতাপতি ছিলেন পটোলের friend, philosopher and guide। তিনি থাকতেন পটোলদের বাড়িতেই এবং পুলিস কোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি ছিলেন পটোলের সহপাঠী। আর শেষটা হয়েছিলেন তার private tutor। পটোল বি. এ. পাশ করতে পারেনি, সীতাপতি খুব ভাল পাশ করেছিলেন। অটল বিশ্বাসের বাড়িতে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না, কিন্তু ছেলে যাতে বি. এ. পাশ করে সে বিষয়ে তার খুব ঝোঁক ছিল। পটোল বাপকে বল্লে "আমি একজনকে জানি, তাঁকে আমার private tutor নিযুক্ত করলে তিনি নিশ্চয় আমাকে বি. এ. পাশ করাবেন।" অটল বিশ্বাস

ছিলেন যেমন ধনী তেমনি কৃপণ। বাপে-ছেলেয় অনেক বকাবকির পর শেষটা স্থির হল, সীতাপতি রায় পটোলের private tutor হবেন, তাদের বাড়িতে থাকবেন এবং মাসিক ত্রিশ টাকা মাইনে পাবেন।

আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে, সীতাপতি অতি সুপুরুষ, ইংরিজী খুব ভাল জানে এবং গাইতে পারে চমৎকার।

পূর্বেই বলেছি সীতাপতি ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল। অনেকে সন্দেহ করত তিনি কোনো হিন্দুস্থানী বাইজীর ছেলে। এ সন্দেহের অনেক কারণও ছিল। সীতাপতি নামটি বাঙালীর ভিতর অতি দুর্লভ। আর তাঁর চেহারা ছিল কতকটা হিন্দুস্থানী ধরনের; নাক যেমন তোলা চোখ তেমন বড় নয়। আর তিনি গান গাইতেন পেশাদার গায়কদের তুল্য। আর হিন্দী বল্‌তেন মাতৃভাষার মত। এককালে তাঁর অবস্থা যথেষ্ট ভাল ছিল, আর তিনি থাকতেন বড়বাজারের কোনো গলিতে। হঠাৎ নিঃস্ব হয়ে পড়লেন।

সে যাই হোক, তিনি ছিলেন অতি বেপরোয়া লোক। আমি প্রথম থেকেই বুঝেছিলুম যে, সামাজিক জীবনের সঙ্গে তিনি খাপ খাওয়াতে পারবেন না। কিন্তু যখন যে অবস্থায় পড়বেন তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন।

(২)

অটল বিশ্বাসের পরিবারে সীতাপতি দিব্যি খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। এমন কি, স্বয়ং বিশ্বাস মহাশয়ের অতি প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। ইতিমধ্যে এক বিপদ ঘট্‌ল। অটল বিশ্বাস ছেলের জন্যে একটি মেয়ে দেখতে গিয়ে সেই সুরূপা ও কিঞ্চিৎ শিক্ষিতা মেয়েকে নিজে বিয়ে ক'রে নিয়ে চলে এলেন। তাঁর ছেলে তাতে মহা অসন্তুষ্ট হল। ফলে বাপে-ছেলেতে ছাড়াছাড়ি হবার উপক্রম। পটোল বিশ্বাস নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে চলে যেত, যদি সীতাপতির পরামর্শে সে নীরব থেকে বিমাতাকে ওষুধ গেলার মত গ্রাহ্য করে না নিত। পটোলের কথা ছিল এই যে, এই বয়সে বাবা আবার চতুর্থ পক্ষ করলেন! তার উত্তরে সীতাপতি বল্লেন, এই চতুর্থ পক্ষই সেজন্যে তোমার বাবাকে যথেষ্ট শাস্তি দেবে।

বৃদ্ধের এই তরুণী ভার্যাটি প্রথম থেকেই তার স্বামীকে বল্লে, আমি

কোন ঘরকন্নার কাজ করব না। আমি এবাড়িতে দাসীগিরি করতে আসিনি।

—তবে দিন কাটাবে কি করে?

—নভেল প'ড়ে ও গান গেয়ে।

অটল বিশ্বাস এ জবাব শুনে খুসী হলেন না। কিন্তু তাঁর চতুর্থ পক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সাহস করলেন না। মাসখানেক যেতে-না-যেতেই তাঁর চতুর্থ পক্ষ বল্লে, আমি ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখতে চাই এবং সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করতে চাই। আমার জন্যে একটি ইংরেজী শিক্ষক এবং একটি সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত করো।

অটল বিশ্বাস তাঁর ছেলেকে গিয়ে বল্লেন, সীতাপতি কি ওঁর ইংরিজী শিক্ষক হতে পারে না? কিন্তু সঙ্গীতশিক্ষক পাই কোত্থেকে?

পটোল বল্লে, মাষ্টারমশায় চমৎকার গাইয়ে। তিনি একাই এই দুই শিক্ষা দিতে পারেন। আমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখি।

তার পরদিন পটোল বল্লে, মাষ্টারমশায় রাজি আছেন যদি তাঁকে এই নতুন শিক্ষকতার জন্যে মাসে উপরি একশো টাকা ক'রে মাইনে দেওয়া হয়। অটল বিশ্বাস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তাতেই রাজি হলেন। এবং সীতাপতি তার পরদিন থেকে গৃহিণীরও গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হলেন।

পটোলের বিমাতার নাম ছিল কিশোরী। অল্পদিনের মধ্যেই সে মাস্টারমশায়ের অনুরক্ত ভক্ত হয়ে পড়ল। আর সীতাপতিরও প্রিয়শিষ্যা হয়ে উঠ্‌ল। গানই তাঁদের পরস্পরকে মুগ্ধ করেছিল। মাসখানেক পরে উভয়ে একসঙ্গে অন্তর্ধান হলেন। লোকে সন্দেহ করে এ পলায়নের সহায় ছিল পটোল বিশ্বাস।

(৩)

দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর সীতাপতি কলকাতায় ফিরে এলেন। এবং পটোল বিশ্বাসের বাড়ীতে অধিষ্ঠান হলেন। ইতিমধ্যে অটল বিশ্বাস গত হয়েছিলেন, আর পটোল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল এবং বিয়েও করেছিল। তার পৈতৃক ছোটবাড়ির পাশে পটোল একটি প্রাসাদ নির্মান করেছিল আর বাপের দালালি ব্যবসা ভালোরকমে্ই চালাতে শিখেছিল।

সীতাপতির ভ্রমণবৃত্তান্ত তিনি নিজেই আমাকে বল্লেন ; সেই কথাই এখন তোমাকে বলছি।

সীতাপতি ও কিশোরী প্রথমে পশ্চিমের একটি নামজাদা শহরে গিয়ে, বছর দু' তিন বাস করেন। সেখানে নাকি একটি প্রসিদ্ধ ওস্তাদ ছিলেন, তাঁরই কাছে কিশোরীকে আরও ভাল করে গান শেখাবার জন্য। সে শহরে তাঁরা গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। সীতাপতি নিজে সেখানে একটি মিশনারি ইস্কুলে ইংরিজী পড়াবার চাকরি নেন ; এবং বছরখানেকের মধ্যেই সেই ইস্কুলের হেড্মাষ্টার হন।

সীতাপতি অবশ্য পশ্চিমে গিয়ে নাম বদ্‌লে নিয়েছিলেন। সে দেশে তাঁর নাম হল রামচন্দ্র রাও। এবং বেশও হল হিন্দুস্থানীদের বেশ। কিশোরী হয়ে উঠ্‌ল অপূর্ব ঠুংরি-গাইয়ে। তার গলা ছিল যেমন মিষ্টি, তেমনি স্থিতিস্থাপক। সীতাপতি মিশনারী সাহেবের উপর চটে গিয়েছিলেন। কারণ, সাহেব কালা আদমীদের বিশেষ অবজ্ঞার চক্ষে দেখতেন। তিনি I. C. S. হলে দুর্দ্দান্ত হাকিম হতেন।

তার উপর সীতাপতি শুনলেন যে, রামচন্দ্র রাওয়ের সঙ্গে যে স্ত্রীলোকটি থাকে, সেটি তাঁর স্ত্রী কি না, মিশনারী সাহেব সে খোঁজ করছেন। সন্দেহের কারণ, কিশোরী বাই পেশাদার বাইজীর মত গান করেন।

এই সব কারণে তিনি ইস্কুলের চাকরি ত্যাগ করতে মনস্থ করলেন। এমন সময় পটোলের কাছ থেকে এক চিঠি পেলেন যে, অটল বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে। পটোল একমাত্র লোক, যে সীতাপতির নতুন নাম ঠিকানা জানত। এ সংবাদ শুনে কিশোরী বল্লে যে, সে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে' বৃন্দাবনে যাবে। তার মজলিশী গান শেখা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন সে বৃন্দাবনে গিয়ে কীর্তন শিখবে। আসল কথা, সে অসামাজিক জীবন আর যাপন করবে না। এবং সেই জীবন অবলম্বন করবে, যাতে তার পূর্ব জীবনের কালিমা ভক্তিরসে ধুয়ে মুছে যায়। সীতাপতি কিশোরীকে কোনো বাধা দিলেন না। যদিচ কোনো ধর্মে তাঁর বিন্দুমাত্রও ভক্তি ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইস্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

এর পর তাঁর জীবনের নতুন পর্যায় আরম্ভ হল। যদিচ সীতাপতি

কিশোরীকে কখনো ভুলতে পারেননি; এবং কিশোরীও সীতাপতিকে কখনো ভুলতে পারেনি।

(৪)

সীতাপতি কিশোরীর কথাবার্তায় বুঝেছিলেন যে, তার নূতন সংকল্প থেকে তাকে নিরস্ত করা অসম্ভব। অটল বিশ্বাসের মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত কিশোরী সীতাপতির অনুরক্ত ভক্ত ছিল। যার সে কস্মিনকালেও স্ত্রী ছিল না, তার মৃত্যুতে কিশোরীর মন যে কি করে' এমন বিপর্যস্ত হয়ে গেল, তা সীতাপতিও বুঝতে পারলেন না। যে-সব মনস্তত্ত্ববিৎরা মগ্নচৈতন্যের খোঁজখবর রাখেন, তাঁরা হয়ত বলবেন যে, নানারূপ সামাজিক অন্ধসংস্কার, যা কিশোরীর মনে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, এই মৃত্যু-সংবাদের ধাক্কায় সে-সব জেগে উঠ্‌ল। হিন্দু সধবার আচার সে অনায়াসে অগ্রাহ্য করেছিল; কিন্তু হিন্দু বিধবার আচার অবলম্বন করতে তার মন তাকে বাধ্য করলে। যাই হোক, আমার কাছে ব্যাপারটা একটা mystery থেকে গেল।

সীতাপতি কিশোরীকে বৃন্দাবন নিয়ে গিয়ে গৌরদাস বাবাজীর কাছে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে' দিলেন। এবং তাঁকে বল্লেন, এ মেয়েটি চমৎকার গাইয়ে। একে যেন কীর্তন শেখবার সুযোগ দেওয়া হয়। বাবাজী বল্লেন, তার জন্য ভাবনা কি? এখানে উঁচুদরের কীর্তনওয়ালী আছে যারা প্রথমজীবনে কীর্তন গেয়ে বাঙালীকে মুগ্ধ করেছিল। আমি এঁকে সেইরকম একজনের হাতে সমর্পণ করে' দেব।

সীতাপতি চলে আসবার পূর্বে কিশোরী তাঁকে বল্লে, এর পর তুমি কোথায় থাকবে, তার ঠিকানা আমাকে দিয়ে যেও। সীতাপতি বল্লেন, সেটা অনিশ্চিত। তুমি পটোল বিশ্বাসকে লিখলেই আমার ঠিকানা জানতে পাবে। সে চিরদিনই আমার অত্যন্ত অনুগত বন্ধু। আমি যখন যেখানে থাকি, তাকে জানাই। কিশোরী বল্লে, ভয় নেই, আমি তোমাকে চিঠি লিখে উৎপাত করব না। যদি কখনো মরণাপন্ন পীড়িত হই, তবেই তোমাকে আসতে লিখব। মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে একবার শুধু দেখতে চাই।— এই কথা বলে তাঁর চোখ জলে ভরে' উঠল। তখন সীতাপতি বুঝলেন যে, তাঁর প্রতি কিশোরীর ভক্তি হচ্ছে শাস্ত্রে যাকে বলে পরাপ্রীতি, যা অহৈতুকী এবং আমরণস্থায়ী।

সীতাপতি বল্লেন, আমি প্রথমে কাশী যাব। এক তীর্থে তোমাকে বিসর্জন দিলুম, আর এক তীর্থে মাকে বিসর্জন দিয়েছিলুম। এ দুজনের স্মৃতি আমার জীবন পূর্ণ করে থাকবে।— এর পর তিনি কাশী চলে গেলেন।

সীতাপতির প্রকৃতি অত্যন্ত অসামাজিক, তা পূর্বেই বলেছি; কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় সহৃদয়। এবং কিশোরী ও তাঁর নিজের মা, এই দুটি স্ত্রীলোক তাঁর হৃদয়ে শিকড় গেড়েছিল।

(৫)

সীতাপতি যখন কাশী গিয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর কাছে টাকাকড়ি কিছু ছিল না বল্লেই হয়। কিশোরীর গহনাবিক্রির টাকা সে তাঁকে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সীতাপতি কিছুতেই সে দান গ্রহণে সম্মত হননি। তিনি বলেছিলেন, অটল বিশ্বাসের স্ত্রীকে হস্তান্তর করতে পারি, কিন্তু তাঁর টাকা-পয়সা নয়। সে টাকা আমি পটোল বিশ্বাসকে দেব। তোমার যদি কখনো টাকার দরকার হয়, পটোলকে টেলিগ্রাফ করলে সে তোমাকে তা পাঠিয়ে দেবে।

কাশী সীতাপতির পূর্বপরিচিত স্থান। সেখানে বহুলোকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল, গাইয়ে বাজিয়ে, পুরুত পাণ্ডা প্রভৃতি। তিনি একটি পরিচিত পাণ্ডার বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। এবং নূতন কোন চাকরিতে ভর্তি হবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এইভাবে মাসখানেক কেটে গেল। অবসর সময়ে সীতাপতি একমনে শ্রীমদ্‌ভাগবত অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করলেন; বৈষ্ণবধর্ম ব্যাপরটা কি, তাই জানবার জন্যে। পটোল বিশ্বাসকে তিনি অবশ্য তাঁর নতুন ঠিকানা জানিয়েছিলেন। পটোল গয়াতে তার বাবার পিণ্ডদান করে' কাশীতে এসে উপস্থিত হল। সীতাপতি পটোলকে কিশোরীর সব টাকা বুঝিয়ে দিলেন। এবং এখন যে তিনি নিঃস্ব, তাও জানালেন। কিন্তু পটোলের কাছ থেকে কোন অর্থসাহায্য নিতে রাজী হলেন না।

তারপর তিনি কাশীবাসী কোন ধনী কায়স্থ পরিবারের মেয়ের সঙ্গে পটোলের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করলেন। উক্ত পরিবারের কি একটা কলঙ্ক ছিল, যার জন্য তাঁরা দেশত্যাগী হয়ে কাশীবাস করছিলেন। ফলে সে ঘরের

মেয়ের বিয়ে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু পটোল ছিল সীতাপতির শিষ্য। সে বিনা আপত্তিতে তার মাস্টারমশায়ের প্রস্তাবে সম্মত হল; বিশেষতঃ মেয়েটি সুন্দরী এবং শিক্ষিতা বলে'। উপরন্তু অটলরা যে কি জাত, তা' কেউ জানত না। বিবাহের ৩।৪ দিন পরে পটোল তার মাস্টারমশায়কে বল্লে, যদি চাওত তোমাকে ১০০।১৫০ টাকা মাইনের একটি চাকরি করে' দিতে পারি। এখানকার পুলিসের এক সাহেবের সঙ্গে আমাদের খুব বাধ্যবাধ্যকতা আছে। তিনি জাতে ফিরিঙ্গি, কিন্তু চলেন পুরোদস্তুর ইংরেজের কায়দায়। তাঁর মাইনে খুব বেশি নয়, কিন্তু টাকার দরকার বেশি। সে টাকা তাঁকে যে-কোন উপায়ে হোক সংগ্রহ করতে হয়। একবার তিনি পাঁচ হাজার টাকার জন্যে মহা বিপদে পড়েছিলেন। সে টাকা বাবা তাঁকে ধার দেন; কারণ বাবাও সে সময় একটি ফৌজদারী মামলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই পাঁচ হাজার টাকায় পুলিস সাহেব বেঁচে গেলেন, বাবাকেও বাঁচিয়ে দিলেন। তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করবেন। তুমি পুলিসের চাকরী করতে রাজী?

—হ্যাঁ, রাজী। এ চাকরিতে আমি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করব।

—কি অভিজ্ঞতা অর্জন করবে? পুলিসের কারবার ত শুধু চোর আর জুয়োচ্চোর নিয়ে।

—তাতে আপত্তি কি? সব ব্যবসারই ত ভিতরকার কথা ঐ চুরি আর জুয়োচ্চুরি। পৃথিবীতে যতদিন দরিদ্র আর ধনী থাকবে, ততদিন আইনকানুন সবই থাকবে। এবং আইনকানুনের রক্ষক পুলিসও থাকবে। সমাজ ত দরিদ্রকে দরিদ্রই রাখতে চায়, আর ধনীকে ধনী। এই দুয়ের পার্থক্য বজায় রাখাই ত সকল আইনকানুনের উদ্দেশ্য।

—কেন, লোকের সম্পত্তি রক্ষা করা ছাড়া কি আইনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই?

—তা ছাড়া আর কি আছে?

—কাঞ্চনের সঙ্গে কামিনীকেও রক্ষা করা আইনের অন্যতম বিধি। যা' অমান্য করবার নাম offences against marriage।

—সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকেও property হিসেবে গণ্য করা হয়।

—তাহলে offences against marriage বলে' কিছু নেই?

—অবশ্য আছে। যথা ধনী বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী চতুর্থ পক্ষ করা।

একথা শোনবার পর পটেল সীতাপতিকে সেই পুলিসের চাকরি করিয়ে দিলে।

(৬)

সীতাপতি অল্পদিনেই বড়সাহেবের খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। রিপোর্ট লেখা এবং তদন্ত করাই ছিল তাঁর কাজ। তাঁর লিখিত রিপোর্টের গুণে বড়সাহেবের মাইনে বেড়ে গেল। তাঁর তদন্তের বিষয় ছিল পশ্চিম অঞ্চলের স্বদেশী ছোকরাদের খুঁজে বার করা। তিনি অবশ্য সকলেরই খোঁজ পেয়েছিলেন, কিন্তু কাউকেই ধরিয়ে দেননি। হয়ত অনেকের সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে, কিন্তু স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি অর্থলোভী ছিলেন না। সুতরাং অবৈধ উপায়ে টাকা সংগ্রহ করতেন না। কিন্তু তাঁরও মাইনে বেড়েই চ'ল্‌ল। ফলে বড়সাহেবের তিনি প্রিয়পাত্রই রয়ে গেলেন ; কিন্তু নিম্ন পুলিশ কর্ম্মচারীদের অত্যন্ত বিরাগভাজন হলেন। তাঁকে কি করে' জব্দ করা যায়, তারা তার উপায় খুঁজতে লাগল। বছর তিনেক পুলিসের চাকরি করবার পর গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁকে একদিন গ্রেপ্তার করলে। রামচন্দ্র রাও বলে' একটি ঘোর anarchist নাকি ফেরার হয়েছিল। কোথায়ও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। গোয়েন্দা বিভাগ আবিষ্কার করলে যে, সীতাপতি রায়ই সেই রামচন্দ্র রাও। আর সে পুলিসের চাকরি নিয়েছে নিজের দলবলকে যতদূর সাধ্য সতর্ক করবার জন্যে। রামচন্দ্র রাওই যে সীতাপতি রায় সেজেছেন, তা প্রমাণ করলেন সেই মিশনারী ইস্কুলের সাহেব। আর তিনি সেই সঙ্গে বল্লেন, রামচন্দ্র ওরফে সীতাপতি রায় ইংরিজী খুব ভাল লেখেন এবং বাংলা ও হিন্দী এমন চমৎকার বলেন যে, তিনি বাঙালী কি হিন্দুস্থানী বোঝা অসম্ভব।

তাঁর গ্রেপ্তারে আপত্তি করলেন শুধু কাশীর পুলিসের সাহেব। কারণ সীতাপতিকে জেলে দিলে তাঁর ডান হাত কাটা যায়। সে যাই হোক্‌, তিনি হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেলে আটক থাকলেন, এক আধ মাসের জন্য নয়, তিন বৎসরের জন্য।

এ তিন বৎসর তাঁর বিষয় তদন্ত চলতে লাগ্‌ল। সরকারের লাল ফিতে ভয়ঙ্কর দীর্ঘসূত্র।

সীতাপতির মুরুব্বি পুলিস সাহেব জেলে তাঁর থাকবার ভাল বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি হকিম মেহেরালির সঙ্গে এক কামরায় আটক রইলেন। সেখানে অন্য কোন আসামী ছিল না। ফলে দুজনের ঘোর বন্ধুত্ব হল। হকিম সাহেব বল্লেন, তিনি নির্দোষী, তাঁকে ভুল করে' গ্রেপ্তার করেছে। সীতাপতি বল্লেন, তিনিও নির্দোষী, এবং তাঁকেও ভুল করে' ধরেছে। তাঁরা দোষী কি না, তারই তদন্ত হচ্ছে। আর যতদিন সে তদন্ত শেষ না হয়, ততদিন তাঁরা এখানে আটক থাকবেন। সে তিন মাসও হতে পারে, তিন বৎসরও হতে পারে। হকিম সাহেব বল্লেন, এই জেলে কাজ নেই, কর্ম নেই, এতদিন বসে বসে কি করা যায়?

—আপনি নমাজ পড়ুন, আর আমি গায়ত্রী জপি।

—নমাজ ত পাঁচ বখ্‌ত্‌ করতে হয়।

—আর গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা জপতে হয়।

বাদবাকী সময় নিয়ে কি করা যায়, সেই হল সমস্যা। শেষটা অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হল, সীতাপতি হকিম সাহেবের কাছে হকিমী বিদ্যা শিখবেন, আর হকিম সাহেবকে কবিরাজীর টোট্‌কা শাস্ত্র শেখাবেন।

তিন বৎসরকাল পরস্পরের এই অধ্যয়ন অধ্যাপনায় কেটে গেল, তার পর তাঁরা মুক্তি পেলেন। হকিম সাহেব চলে গেলেন মক্কায়, আর সীতাপতি কাশীতে। কিছুদিন পরে তিনি ত্রিহুতে গেলেন ডাক্তারি করতে। সেখানে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, হকিমী ব্যবসা সে দেশে চলবে না। কারণ মুসলমানরা হিন্দুর হাতে ওষুধ খাবে না, আর হিন্দুরা আমালতোষ জামালগোটা ফির্‌খিস্‌ প্রভৃতি ওষুধের ম্লেচ্ছনাম শুনেই ভড়কে যায়। তা খেলে নাকি তাদের জাত যাবে। অ্যালপ্যাথি চিকিৎসা তিনি শেখেননি; কিন্তু এটুকু জানতেন যে, অ্যালপ্যাথির অস্ত্রোপচারই প্রধান অঙ্গ, আর তার ওষুধ মাত্রা ভুল হলে মারাত্মক হতে পারে। তিনি জেলে বসে বসে ইংরিজী বাঙলা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বই পড়েছিলেন। তার থেকে তাঁর ধারণা জন্মেছিল যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নির্ভয়ে করা যায়। ও-চিকিৎসায়

উপকার থাক্ বা না থাক্, অপকার নেই। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চিকিৎসক না হতে পারেন, কিন্তু জল্লাদ নন। তাই তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের ব্যবসা ধরলেন। আর ক্রমে দেদার পয়সা রোজকার করতে লাগলেন।

তারপর সীতাপতি কলকাতায় এসে একজন নামজাদা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হয়ে উঠলেন। তিনি আস্তানা গেড়েছিলেন পটোল বিশ্বাসের পৈতৃক ছোট বাড়ীতে। সেইখানে তাঁর সঙ্গে আমার মধ্যে মধ্যে দেখা হত। এবং অজ্ঞাতবাসের ইতিহাস সেইখানেই তাঁর মুখে শুনি। দেখলুম তাঁর চেহারা সমানই আছে, আর তিনি আগের চাইতে ঢের বেশি চালাকচতুর হয়েছেন। উপরন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত পড়ে' পড়ে' সংস্কৃত ভাষা খুব ভাল শিখেছেন। কিশোরীকে সীতাপতি একদিনের জন্যেও ভুলতে পারেননি। তাই কিশোরী যে ধর্ম্ম অবলম্বন করেছিল, সে ধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করা তাঁর নিত্যকর্ম্ম হয়ে উঠেছিল। তিনি মতামতে আরও বেশী অসামাজিক হয়ে পড়েছিলেন।

একদিন সীতাপতির ডাক্তারখানায় গিয়ে শুনি যে, পটোল বিশ্বাসের কোন আত্মীয়া ভারী ব্যারামে পড়েছেন। এবং পটোল বিশ্বাস ডাক্তার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে কাশী চলে গেছেন। আর বলে' গেছেন দিন সাতেকের মধ্যে তাঁরা ফিরে আসবেন। তিনি কোথায় এবং কা'কে দেখতে গেছেন, সে বিষয় আমার সন্দেহ ছিল। সাতদিন পর আবার গিয়ে শুনলুম পটোল ফিরে এসেছে, কিন্তু ডাক্তার বাবু ফেরেননি। আমি পটোলের সঙ্গে দেখা করে জানলুম যে, পটোল ও ডাক্তার বাবু বৃন্দাবন গিয়েছিলেন, মরণাপন্ন কিশোরীকে দেখতে। কিশোরী একটি অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু তার মনের কোন বিকার ঘটেনি। তাঁদের দুজনের কি কথাবার্তা হল তা পটোল শোনেনি, জানেও না। সেইদিনই সীতাপতি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হলেন। তার পরদিন কিশোরী মারা গেল। কিশোরীর মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্বে তিনি তাকে বল্লেন— আমি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেছি। কিশোরী শেষ কথা বল্লে—তুমি শ্রীকৃষ্ণের অবতার। তারপর সীতাপতি বৈরাগী হয়ে কোথায় যে চলে গেলেন, তা আমি জানিনে। কিন্তু খবরের কাগজে যার নাম পড়লে, সে নিশ্চিত এই সীতাপতি রায়।

বন্ধুবর বিরক্তির সঙ্গে বল্লেন—এরকম লক্ষ্মীছাড়া ভবঘুরে লোকের জেলে থাকাই কর্তব্য।

—তোমার এ শুভকামনা শুনলে সীতাপতি বলতেন সে কথা ঠিক। আমরা সকলে বর্তমান সভ্যতার বিরাট জেলের মধ্যেই বাস করছি।

—তার অর্থ কি ?

—সে বিষয় কি আজও তোমার চোখ খোলেনি ? বর্তমান সভ্যতার চরম রূপ কি দেখতে পাচ্ছ না ? সীতাপতি এই বড় জেল থেকে মুক্তির উপায় চিরদিনই খুঁজেছেন। সে মুক্তি হচ্ছে মনের মুক্তি।

—তিনি কি সে মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন ?

—পান আর না পান, আজীবন খুঁজেছেন।

—বোধহয় সেকেলে ধর্মে পেয়েছেন ?

—একেলে অধর্মে ত নয়ই।

স্বরলিপি

"জননীর দ্বারে আজি ওই"

কথা ও সুর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

[র্রা র্সা না ধা পা হ্মাপহ্মা] ॥
II { নর্সা না ধা। পা হ্মা হ্মপহ্মা। গা হ্মা নধা। -া -া -া I
জ ন নী র দ্বা রেং আ জি ও ০ ০ ই

I (ধা না ধা। নর্সা -নর্সর্রা র্সনা। ধপা -া হ্মা। -পা -ধা -না)} I
শু ন গো শং ০০০ ঙ্খং বা ০ জে ০ ০ ০

I হ্মপা পা পা। পা পা পহ্মা। হ্মধা পা পমা। -া -া -া I
থে কো না থে কো নাং ও রে ভা ০ ০ ই

[ ]
I মমা মা মগা। গপা -হ্মা পা। পহ্মা -পা ধা। -না -র্সা -নর্সর্গা II
ম গ নং মি ০ থ্যা কা ০ জে ০ ০ ০০০

I পা -ধা ধপা। পর্সা র্সা র্সনা। নধা -র্সা র্সা। -া -া -া I
অ ০ র্ঘ্য ভ রি য়াং আ ০ নি ০ ০ ০
(২) আ জি উ ০ জ্জ্ব ল ভা ০ লে ০ ০ ০

I নর্সা না ধা। না র্সা নর্সর্রা। র্সা -না নর্সা। -ধা -া -না I
ধ রো গো পূ জা রং০ থা ০ লি ০ ০ ০
(২) তো লো উ ০ ন্ন তং০ মা ০ থা ০ ০ ০

[র্মা র্রা]
I র্সা র্সর্গা র্গা। র্রা র্সা র্সনা। নধা -ণা ধা। -া -া -ণা I
র তং ন প্র দী পং খা ০ নি ০ ০ ০
(২) ন বং স [০ ঙ্গী] ত তা ০ লে ০ ০ ০

I ধা ধণা ধা। পা পা পক্ষা। ক্ষধপা -া মা। -া -া -া I সমা মা মা।
য তং নে আ নো গোং জ্যাং০ ০ লি ০ ০ ০ ভ রি ল
(২) গা ও গ ০ ম্ভী রং গাং০ ০ থা ০ ০ ০ প রো মা

। মা মা মগা। গপা -ক্ষা ধপা। -া -া -া I মা গা গা। গা গা গমা।
যে দু ইং পা ০ ণি ০ ০ ০ ব হি আ নো ফু লং
(২)ং ল্য কং পা ০ লে ০ ০ ০ ন ব প ০ ল্ল বং

। মরা -া সা। -া -া -া I সা -মা মা। -া মা মগা। গপা -ক্ষা ধপা। -া -া -া I
ডা ০ লি ০ ০ ০ মা ব্ আ ০ হ্বা নং বা ০ ণী ০ ০ ০
(২) গাঁ ০ থা ০ ০ ০ শু ভ সু ০ ন্দ রং কা ০ লে ০ ০ ০

[ ]
I পধা না র্সা। র্সর্গা র্রা র্সনা। নধা -না নধা। -না র্সা -নর্সর্গা II
র টা ও ভু ব নং মা ০ ঝে ০ ০ ০ ০ ০
(২) সা জো সা জো ন ব সা ০ জে ০ ০ ০ ০ ০ [ ]

I সা সা সা। সা -মা মা। মা মগা পমা। -া -া -া I
আ জি প্র স ০ ন্ন প বং নে ০ ০ ০

I মা মগা মা। মগা গপা পক্ষা। পা পক্ষা ধপা। -া -া -া I
ন বীং ন জীং ব নং ছু টিং ছে ০ ০ ০

I পা পক্ষা পা। ধা -র্সা র্সধা। পা পক্ষা ধপা। -া -মা -া I
আ জিং প্র ফু ০ ল্লং কু সুং মে ০ ০ ০

I সমা মগা গা। গা -া গমা। রা রা সা। -া -া -া I
ন বং সু গ ০ ন্ধং উ ঠি ছে ০ ০ ০

সঞ্চয়ন

সাহিত্য ও রাজনীতি

রাজনীতিতে যেমন সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি বামপন্থী যাঁরা তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ ক'রে ভেবে দেখার সময় এসেছে। এদেশেও আজকাল একদল কবি ও সাহিত্যিক তাঁদের গল্পে প্রবন্ধে কবিতায় একটি নতুন সুর আমদানি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। শোনা যাচ্ছে যে, রাজনীতিতে যেমন সাহিত্যেও তেমনি, প্রগতির পথ এই দিকে।

জীবন নিয়েই যখন সাহিত্যের কারবার তখন রাজনৈতিক বিপর্যয়ের ঢেউ সাহিত্যের সীমানায় ঢুকে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে এতে আশ্চর্য নেই। কোথাও বা ভাঙচুর একটু হবে, কোথাও মাথা তুলবে নতুন চর, কিছু ভাসিয়ে নেবে, কিছু ফেনা কিছু বুদ্বুদও এদিক ওদিক থেকে ভেসে আসবে স্রোতের আবর্তে। আবার সবই মিলিয়ে যাবে একটা আপাত প্রশান্তির অতলান্তিক গভীরে— এ তো প্রাকৃতিক নিয়ম। একে অস্বীকার করার জো নেই। জীবনের গতিপ্রকৃতি ক্রমাগত বদলাচ্ছে, সুতরাং জীবনকে ঘিরে যা কিছু, এমন কি, সাহিত্যিক মতবাদ ও আদর্শের পরিবর্তন হ'তে বাধ্য। এই মাতামাতির পরে কী থাকবে কী থাকবে না, কোন্‌টা শাশ্বত কোন্‌টা বা সাময়িক তার বিচার করবেন মহাকাল:

> ছাই হয়ে গিয়ে তবু বাকি যাহা রহিবে
> আপনার কথা সে তো আপনিই কহিবে।

সে তো হ'ল। কিন্তু 'সাম্প্রতিক' যাঁরা, যাঁদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারিত নয়, তাঁদের কাছে 'এখন' ও 'এখানে'র কদর বেশি। আপাতত মার্ক্সবাদই তাঁদের কাছে সব দ্বিধাসন্দেহের চরম ও প্রকৃষ্ট উত্তর। এইরকম একজন বামপন্থী ইংরেজ কবি স্টিফেন স্পেন্ডার তাঁর নিজের ও তদীয় দলের সমর্থনে একটি পুস্তক লিখেছেন— বইটির নাম Life and the Poet। L. C. Nights 'Scrutiny' পত্রিকায় এই বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

এই বইয়ে স্পেনডার দেখাতে চেয়েছেন আজকালকার রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে কবি ও সাহিত্যিকদের কর্তব্য কি। সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও রাজনৈতিক বিপর্যয় লেখকের কাছে সমার্থক। তিনি বলেন রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ ও গঠন নিয়ন্ত্রণ করে প্রকৃতপক্ষে মানুষের ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য। মানবজীবনের এই চারটি বিভাগে বিগত কয়েক বছরে

আমাদের ভাবধারার আমূল পরিবর্তন হ'য়ে গেছে ও ফলে অতীতের পারম্পর্যের সঙ্গে বর্তমান কাল বিচ্ছিন্ন বিভক্ত হ'য়ে গেছে। ডিক্টেটরশিপ, ফ্যাশিজম, ক্যাপিটালিজম ইত্যাদি নাকি মূলত খ্রীস্টীয় সমাজের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে আধুনিক যুগের বিদ্রোহের নামান্তর।

এই যুগসন্ধির মুখে কবিকে দাঁড়াতে হবে তাঁর অজ্ঞাতবাসের অকৃতার্থতা ত্যাগ ক'রে। তিনি পরখ ক'রে দেখবেন কোন্ সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা ও শক্তিগুলি বিকাশ লাভ করতে পারছে না। যে-সমাজের সমূহ ব্যক্তি সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেখানে কবিকে দাঁড়াতে হবে তাঁর লেখনীরূপ ব্রহ্মাস্ত্র ধারণ ক'রে।

স্পেনডার অবশ্য মেনে নিচ্ছেন যে কবি প্রত্যক্ষভাবে সমাজসংস্কারক নন। তিনি তাঁর রচিত কাব্যের মধ্য দিয়েই প্রবর্তনা দেবেন নতুন যুগের, নতুন সমাজব্যবস্থার। তিনি এমন ভাবে মানবসাধারণের মন উদ্বুদ্ধ ক'রে দেবেন যাতে জীর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার বনিয়াদ আপনা হ'তেই ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে ও তার জায়গায় আসবে নতুন সমাজ— মানুষ যেখানে তার বিকাশের পথ খুঁজে পাবে, পাবে মানুষ হ'য়ে বেঁচে থাকার অধিকার। রাষ্ট্রজগতের সমুদ্রমন্থনে যে-হলাহল উদ্গীরিত হ'চ্ছে তারই পঙ্কিলতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কল্যাণী কাব্যলক্ষ্মীকে বলতে হ'বে— মা বিভেহি! কারণ কবিরা হ'লেন নতুন যুগের অগ্রদূত।

প্রগতিবাদী কবিরা কেন ও কোন্ পথে চলেছেন তার কথা বলতে গিয়ে স্পেনডার যে ইতিবৃত্ত দিয়েছেন তা এই: যে-সব কবিকিশোর ১৯২০ অব্দ বা তার কাছাকাছি একটা সময় থেকে কবিতা লেখা শুরু করেছেন তাঁদের রাজনৈতিক মতামত নিয়ন্ত্রিত হ'য়েছে দুটি ঘটনার দ্বারা। প্রথমত সেই সময়কার পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্যোগ এবং দ্বিতীয়ত অনাগত অথচ আসন্ন সংগ্রামের জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির তোড়জোড়। এই সময়টাতে তাঁরা এলিয়টের 'ফণীমনসার' দেশে 'ফাঁপা' মানুষদের প্রতিবাসী হ'য়ে কিছুদিন দুঃখবিলাসের একটা অকর্মণ্য অবসাদের মধ্যে নিজেদের ডুবিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এই ত্রিশঙ্কু অবস্থার অনিশ্চয়তা ও স্বেচ্ছানির্বাসনের অগৌরব থেকে তাঁরা মুক্তি চাইলেন; জগৎব্যাপী ধ্বংসস্তূপের উপর তাঁরা চাইলেন নতুন সৌধ রচনা করতে। সেই মুক্তি তাঁরা পেলেন কম্যুনিস্ট মতবাদের মধ্যে।

এই তো গেল স্পেনডার-এর কথা। তাঁর কথা যদি সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া হয় তবে প্রগতিবাদী কবিদের প্রত্যেককে এক-এক জন বিশ্বহিতৈষী ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। সেই অনর্থক আতিশয্যের মধ্যে না গিয়েও এটুকু নিঃসন্দেহে বলা চলে যে প্রগতির দীক্ষা নেবার কারণস্বরূপ যে-দুটি ঘটনার কথা তিনি বলেছেন, তা ছাড়াও অন্যবিধ কয়েকটি কারণ হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সত্য ছিল। যথা, ব্যক্তিবিশেষের অতিপ্রকটভাবে আত্মজাহির করার অভিলাষ; বিশেষ কোনো মতবাদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য (বিচারবুদ্ধির দ্বন্দ্ব ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক); এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব জীবনের উপর 'ফ্যাশনের' প্রভাব।

একথা সর্বথা স্বীকার্য যে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে সাহিত্যিক জগতে একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হ'য়েছে। তবে স্পেনডার যা বোঝাতে চান— অর্থাৎ এই পরিবর্তনের কারণ প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক— তা হয়তো ঠিক নয়। গতযুদ্ধের অব্যবহিত পরে একটা সময় এসেছিল যখন অধিকাংশ পাঠকসম্প্রদায় কাব্য ব্যাপারে সবিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। বোধ করি এরই ফলে কোনো কোনো কবি ও সাহিত্যিক নিজেদের নিজেদের এক-একটি গোষ্ঠী গঠন ক'রে পরস্পরের পিঠ চাপড়ানোর একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। এই রাষ্ট্রসচেতন যুগে সকল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বাঁধুনিই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে একটা বিশেষ রাজনীতিক মতের উপর। বেশির ভাগ কবিই কম্যুনিস্ট নীতি বরণ করেছেন, সকল মুশকিলের আসান, সকল সন্দেহ নিরসনের এমন একটি সহজ ও প্রকৃষ্ট পথ আর দ্বিতীয় নেই।

কাব্যের কমলবনে রাজনীতির মত্তহস্তীকে প্রবেশাধিকার দেবার ফলে একটি যে শোচনীয় ব্যাপার সংঘটিত হ'য়েছে সে হ'ল লেখকের সঙ্গে পাঠকের অসহযোগ। বামপন্থী মতামত কবিতায় এমন তির্যক ও বিকৃত ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে তার অর্থগ্রহণ করা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। এই যে দুর্বোধ্যতা এর মূলে কী— পাঠকের প্রতি কবির অবজ্ঞা না অভিমান— সে কথা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না। হয়তো বা প্রগতিবাদের কবিরা তাঁদের ব্যবহারের জন্য একটা বিশেষ আঙ্গিক আবিষ্কার করেছেন। শব্দযোজনায় ও ভাষার ব্যবহারে তাঁরা অনেক সময় একটা চমকপ্রদ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, কখনো বা সত্যকার কবিপ্রতিভা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা বড়ো বেশি আত্মসচেতন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা যেন উপযাচক হ'য়েই পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চান যে কবিতা এখনকার যুগে আর ললিত কলাবিধির অন্তর্গত নয়। প্রাগতিক কবিতা হ'ল, স্পেনডার যাকে বলেন 'serious activity'।

...

কিছুদিন পূর্বে প্রীস্টলি তাঁর একটি লেখায় বলেছেন যে যুদ্ধ ও তৎসংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য বিলাতের পাঠকসম্প্রদায় কবি ও সাহিত্যিকদের কাছে নাকি প্রায় আবেদন-নিবেদন করছেন। এই দাবি যাঁদের কাছে উপস্থিত করলে সুফল প্রত্যাশা করা যেত তাঁরা হ'লেন অর্থনীতিবিদ ও বিজ্ঞানী। সাহিত্যিকরা যদি এই অব্যাপারে হাত দিতে যান তবে সেটা ভারি শোচনীয় হবে। এর কারণ হ'লো এই যে, যেখানে সমস্যা খুব ব্যাপক, সেখানে মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে,— তখন তারা হয় আইডিয়া বা প্রতীকের সামিল। সাহিত্যের কারবার মানুষকে নিয়ে, আইডিয়াকে নিয়ে নয়।

কবি যাঁরা, সাহিত্যিক যাঁরা, তাঁরা হলেন মানবজীবনের চলিষ্ণু শোভাযাত্রার ভাষ্যকার। মানুষের জীবনকে মানুষ যে ভাবে ও যতভাবে দেখতে পারে, তার কোনোটাই

সাহিত্যেকের কাছে উপেক্ষণীয় নয়। আজকের যুগে একটা বিরাট যন্ত্রদানব এই পরস্পরকে জানবার পথে প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে ব'লেই আরো সচেতন ও সক্রিয়ভাবে সাহিত্যিককে জনসাধারণের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতাতে হবে। তিনি যদি কেবল তাঁর নিজেকে বা তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ করতে থাকেন, তবে সে সাহিত্য আত্মরতির রূপান্তর। যেখানে তিনি সমগ্র মানবসমাজের সঙ্গে একাত্মীভূত সেখানেই সত্যকার সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। মানুষের মনন, চিন্তন— তার হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ, এইগুলিই হ'ল সাহিত্যের শাশ্বত ও মুখ্য বিষয়। রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি গৌণভাবে সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত সেকথা সর্বথা স্বীকার্য; কিন্তু যা সনাতন তাকে যদি সাম্প্রতিক আবেগে স্থানভ্রষ্ট করা হয় তবে তুচ্ছতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে।

আসল কথা এই যে সাহিত্যিককে তাঁর আসন থেকে নামিয়ে যদি গণনেতা ও দেশত্রাতার পদ দেওয়া হয় তা হ'লে তিনি কেবল যে তাঁর জাত খোয়াবেন তা নয়, অন্যান্য দশজন নেতার মত তাঁরও অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটবে— কারণ, তিনি তো মানুষ। কবি ও সাহিত্যিকের একটা মস্ত গুণ এই যে তাঁরা বিচিত্র— তাঁরা আর পাঁচজনার মত নন। স্বেচ্ছাবিচরণের ক্ষমতা অপহরণ ক'রে যদি তাঁদের কোনো দলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, তবে তাঁদের চিত্তের ও অনুভূতির ব্যাপকতা ব্যাহত হবে এবং তাঁরা কোনো একটি বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে কলুর বলদের মত কপচানো বুলির ঘানি ঘুরোতে থাকবেন।

এই যে বৈচিত্র্যের কথা বলা হ'ল, এটাকে যিনি যতখানি বহুবিচিত্র ক'রে পরিবেশন করতে পারবেন, তিনি সেই পরিমাণে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবেন। এই বৈচিত্র্যের আস্বাদ পেতে হ'লে কবি ও সাহিত্যিককে যেতে হ'বে সেই তাদের কাছে যাদের বলা হয় জনসাধারণ;— কিন্তু কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে, নেতাহিসাবে নয়। এই জনসাধারণ— যারা অতিপ্রত্যক্ষ অথচ অগোচরে রয়েছে, এরা মিথ্যা ভব্যতার আড়াল সৃষ্টি ক'রে মানব-প্রকৃতির বিচিত্র অনুভূতিকে গোপন করতে শেখেনি। এদের কাছে জীবন জীবন্ত; এদের আত্মার সঙ্গে, এদের আশাভরসা সুখদুঃখের সঙ্গে যিনি একাত্মীভূত হ'তে পারবেন—

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন …
যে আছে মাটির কাছাকাছি …

সেই লেখকের সৃষ্ট সাহিত্য এমন একটা জায়গায় উন্নীত হবে যেখানে সাম্প্রতিকের স্থান নেই। এই যে একাত্মবোধ এর উৎস রাজনীতিতে নয়, এর উৎস সমাজের ব্যাপক সত্তায় নিজেকে বিলীন ক'রে দেওয়ায়— মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতি ও সহানুভূতির যোগে।— বাণীকান্ত